মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা

ডঃ জগদিন্দ্র মন্ডল

কলিকাতা, বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ, যাদবপুর ও বিশ্বভারতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এড. এবং বি. টি. পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা

[A Text Book of Mental Hygiene in Bengali]

[সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত সংস্করণ]

ডক্টর জগদিন্দ্র মণ্ডল, এম্. এ. (দর্শন),
এম্. এস্-সি. (মনোবিদ্যা), বি. এড্., পি-এইচ্. ডি.,
বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
হুগলী সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব ও
শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বর্তমানে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত
মনোবিদ্যা বিভাগের
অধ্যাপক

সোমা বুক এজেন্সী, ৪২/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পরিমার্জিত পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ

১৯৯৩-১৯৯৬

ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ ১৯৯৬—১৯৯৮

সপ্তম সংস্করণ ঃ ২০০০ - ২০০৩

প্রকাশক : শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সোমা বুক এজেন্সী

৪২/১, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা—৯

আর্থিক মূল্য ঃ একশত কুড়ি টাকা

গ্রাফিক রিপ্রোডাকশন

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

॥ উৎসর্গ ॥

পরম পূজনীয়
অধ্যাপক ডক্টর দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
পবিত্র স্মৃতির
উদ্দেশে

সপ্তম-সংস্করণের ভূমিকা

সপ্তম সংস্করণ এবার প্রকাশিত হচ্ছে। সংস্করণে কিছু সংশোধন পরিমার্জন ও সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিকতম তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এই সংস্করণে । মানসিক রোগের শ্রেণীকরণ, সমস্যামূলক আচরণের নব বিন্যাসে শ্রেণীকরণ, মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনে বর্তমান পটভূমি ও বিকাশ এসব বিষয়ে নূতন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেওয়া হ'ল।

বইটি সাম্মানিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা বিজ্ঞানে বহুলভাবে পঠিত ও সমাদৃত হয়েছে দেখে আনন্দিত হয়েছি। এ ছাড়া স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ স্তরেও বইটি প্রায় সব কলেজেই পঠন-পাঠনে কাজে লাগছে। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও পঠন-পাঠনের আন্দোলনে, একবিংশ শতাব্দীতে অন্য একটি মাত্রা পাবে আশা রাখি; আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে বইটি আরও প্রচার ও সমাদর পাবে বলে বিশ্বাস রাখি।

পরিশেষে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক-গবেষিকাদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন। প্রকাশক শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকেও অভিনন্দন বই প্রকাশে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ।

জগদিন্দ্র মণ্ডল

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

প্রথমেই সকল পাঠক-পাঠিকা, ছাত্রছাত্রীদের কাছে মার্জ্জনা চাইছি আমাদের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য। আমার কাছে, দোকানে বই না পেয়ে অনেকেই এসে অভিযোগ করেছেন— এর মধ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা যেমন আছেন, ছাত্রছাত্রীরাও আছেন। বেশ কয়েকমাস হল বইটি out of print হয়ে আছে। চতুর্থ সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে—এর জন্য প্রকাশক ও আমার পক্ষ থেকে মার্জ্জনা চাইছি।

নূতন পাঠ্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে আরও দু'টি নূতন অধ্যায় যেমন একাদশ অধ্যায়ের সংযোজন হিসাবে (মানসিক রোগের প্রকার) Transient Situational Disorders ''পরিবর্তিত অবস্থার চাপে মানসিক বিকার'' অধ্যায়টি সংযোজিত হয়েছে। Behaviouristic Catharsis, ''আচরণবাদভিত্তিক মনোচিকিৎসা'' সম্বন্ধেও আরও একটি অধ্যায় বর্তমান সংস্করণের সাথে সংযোজিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়গুলিও পরিমার্জিত, প্রয়োজনে, বর্তমান পাঠক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্ধিত হয়েছে।

বইটি সাম্মানিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণ স্তরে বহুলভাবে সমাদৃত হচ্ছে। এছাড়া সাধারণভাবে বহুমানুষ এই বইটি সম্পর্কে সবিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। মানসিক রোগ, মানসিক রোগের চিকিৎসা, এ সব বিষয় এখন সাধারণ মানুষের মধ্যেও জানার আগ্রহ অনেক বেড়েছে। এইসব বিবেচনা করে অনেকেই, আরও একটি বই লেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। অনুরোধকে আদেশ মনে করে, ভাবছি, এইরকম একটি বই শীঘ্রই হাতে নেব।

আশাকরি এই সংস্করণও আগের মতই সকলের আগ্রহের সঞ্চার করবে।

জুলাই, ১৯৯৩

জগদিন্দ্র মণ্ডল

ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৯২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য

[Nature of Mental Health]

॥ স্বাস্থ্যের স্বরূপ ॥

'স্বাস্থ্য' শব্দটি কোন জড় বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। যেখানে প্রাণের স্পন্দন অনুরণিত হয় না, সেখানে স্বাস্থ্যের প্রতিভাসও মেলে না। একটি 'টেবিল' সম্বন্ধে আমরা বলি না—এর স্বাস্থ্য আছে। কিন্তু একটি ছোট্ট অঙ্কুর ও বৃক্ষ সম্বন্ধে বলতে পারি—এর স্বাস্থ্য আছে বা এর স্বাস্থ্যহানি হয়েছে।

ক্রমবিবর্তনে জীব যত উন্নত, 'স্বাস্থ্য' শব্দটি তত বেশী ব্যবহৃত। এই স্বাস্থ্য কথাটি আবার দৈহিক ও মানসিক উভয় পটভূমি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। একটি গাছ যখন পত্রে পুষ্পে শোভিত, জীবন-স্পন্দনে আবর্তিত তখন বলতে পারি গাছটি সুস্থ,—আবার একটি গাছ যখন বিশুষ্ক বিশীর্ণ, তখন বলতে পারি গাছটি পীড়িত। তেমনি একটি প্রাণীর মধ্যে যখন দেখি যথার্থ প্রাণস্পন্দন রয়েছে—সমস্ত কর্ম-প্রয়াসের মধ্যে তার দেহগঠনের পঠভূমিতে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে, তখন বলি তার স্বাস্থ্য আছে। মোটের উপর **যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণস্পন্দন ও সক্রিয়তা আছে, যেখানে বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে, ও একটি লক্ষ্যে বিধৃতি আছে, সেখানেই স্বাস্থ্য আছে।**

একটা উপমা দিয়ে ধারণাটাকে আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে। যেমন একটা অর্কেস্ট্রাদলে অনেক বাদক আছে—বিভিন্ন সুর-যন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন বাদক বসেছে। যিনি যে যন্ত্রই বাজান, সে যন্ত্রটি কর্মক্ষম হতে হবে এবং তার লক্ষ্য একমুখী হওয়া চাই অর্থাৎ অর্কেস্ট্রায় যে মূল সুর, সেটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে—এই দিক্ থেকে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে কর্মের স্বাধীনতা থাকলেও সবগুলিই একই সুরে বাঁধা। কোন একটি বাদ্যযন্ত্র যদি অকেজো হয়ে যায় বা ভিন্নমুখী হয়, মূল সুর থেকে বিচ্যুতি ঘটে অর্থাৎ কোন বাদক যদি খেয়াল-খুশী মত তার যন্ত্র বাজাতে থাকে, তাহলে সমস্ত সুরটাই কেটে যায়—মূল সুর ব্যাহত হয়। সেই রকম দেহের বিভিন্ন অংশ যদিও বিভিন্ন কাজ করছে, তবু তাদের কাজের মধ্যে একটা একমুখীনতা থাকা চাই। সমগ্র দেহের যে কর্মক্ষমতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সঙ্গতি-সাধনের ক্ষমতা, তা পরিস্ফুট হওয়া চাই—তবেই বলব দেহের স্বাস্থ্য আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি **দেহের বিভিন্ন অংশ যেমন পাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, হৃদ্‌যন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি যখন সম্যকভাবে সক্রিয় থাকবে এবং এদের পরস্পরের কাজ মোটামুটি এক-একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় (system) হলেও, এরা কেউই ভিন্নগামী হবে না, এদের কাজের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহ-**

যোগিতা ও পরিপূরকতা থাকবে, তখনই দেহের স্বাস্থ্য উদ্ভাসিত হবে। মনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও একই ভাবে ভাবা যেতে পারে। যেমন, আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতা, মনে রাখার ক্ষমতা, আবেগ-অনুভূতি, বিচার-শক্তি, কল্পনা-শক্তি—এই সব শক্তি যখন সক্রিয় থাকে ও একের সঙ্গে অপরের একটা সহযোগিতা ও পরিপূরকতা থাকে, তখনই বলবো মনের স্বাস্থ্য ঠিক আছে। এই সকল মানসিক শক্তি ও ক্ষমতার সক্রিয়তা যখন একটি লক্ষ্যের দ্বারা বিধৃত, অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে ও নিজের সঙ্গে যথার্থ সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলার লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তখনই বলবো মানসিক স্বাস্থ্য অটুট আছে। মোটের উপর, মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে ও নিজের সঙ্গে যথাযথরূপে তার সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যে যত হারিয়েছে, তার তত মানসিক স্বাস্থ্যের অবক্ষয় ঘটেছে। একটি উন্মাদ বা পাগলের কথা ধরা যাক। তার স্মৃতি, কল্পনা, অনুভূতি এলোমেলো, একটির সঙ্গে আর একটির কোন সামঞ্জস্য নেই—মনে হবে অকারণে হাসছে, অকারণে কাঁদছে, পরিবেশের সঙ্গে ও নিজের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। এই সামঞ্জস্যহীনতাই মানসিক অস্বাস্থ্য। এটি হ'ল মানসিক অস্বাস্থ্যের একটি চরম দৃষ্টান্ত। এরই মাপকাঠিতে বলা চলে, যার নিজের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে, (যে পরিবেশ মানবিক ও মানসিক সম্পর্ক দিয়ে গড়া) সার্থকভাবে মানিয়ে চলার ক্ষমতা যত বেশি, মানসিক স্বাস্থ্যও তার তত অটুট বলে ধরে নেওয়া যায়। **মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে ও নিজের সঙ্গে যথাযথ-ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলার ক্ষমতা।** নূতন নূতন পরিস্থিতি ও বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পদ্ধতিতে ও সমাজ-অনুমোদিত পথে সমস্যার সমাধান ক'রে সন্তোষজনক ও আনন্দকর অগ্রগতি জীবনে নিয়ে আসার ক্ষমতাই মানসিক স্বাস্থ্য।[১]

॥ সঙ্গতি-সাধনের পটভূমিতে ॥

মানসিক স্বাস্থ্য সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি দিক্—দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য বিচ্ছিন্ন কোন অবস্থা নয়। কোন ব্যক্তি তার পরিপার্শ্ব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি-সাধনে কতটা সফলকাম হচ্ছে, সেইটিই তার স্বাস্থ্যের নির্ণায়ক। **দৈহিক স্বাস্থ্যই হোক আর মানসিক স্বাস্থ্যই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই এই সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা করার ক্ষমতাই যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়।**

ব্যক্তি একদিকে যেমন তার বাহিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলে (উষ্ণতা, শীত, আবহাওয়ার অন্যান্য পরিবর্তন, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব, বাহিরের জীবাণুর আক্রমণ প্রভৃতি), অন্যদিকে শরীর-অভ্যন্তরের পরিবর্তনের সঙ্গেও (ক্ষুধা, শরীরের আবর্জনা ত্যাগ, বিশ্রাম ইত্যাদি) সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে হয়। দেহ ও

১। Mental health is "the full and free expression of all our native and acquired potentialities in harmony with one another by being directed towards a common end or aim of the personality as a whole."

—Hadfield J. A.: Psychology & Mental Health

তার পরিপার্শ্ব জড় পরিবেশের (*Material environment*) সঙ্গে যে সঙ্গতি রক্ষা (*adjustment*), তা প্রায় সর্বদা আপনা-আপনি হয়ে থাকে, বস্তুতঃ এই সঙ্গতি-রক্ষায় ব্যক্তি তার পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সজাগ থাকে না। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, শরীরস্থান (*Anatomy*), শারীরবৃত্ত (*Physiology*), এই সকল বিজ্ঞান দিয়ে আমরা এই সঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করতে পারি। জড় জগতের (*Physical world*) সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলার জন্যে দেহের বিভিন্ন অংশের সংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ (*integrated*) কার্যকলাপ—দৈহিক স্বাস্থ্যের বিষয়বস্তু। দেহের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতার মধ্যে আছে পুষ্টি, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালনে, দেহের দূষিত পদার্থের নিঃসরণ, স্নায়বিক সাড়া ইত্যাদি। এই সকল শারীরিক কার্যাদির মধ্যে সংহতি আনয়ন করে (যে সংহতি মোটামুটিভাবে জীবনরক্ষা ও ধারণের জন্য প্রায় অপরিহার্য) দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং স্নায়বিক ক্রিয়া।

মানুষ স্বভাবতঃই তার চারদিকের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন। শরীরের কতকগুলি পরিবর্তন, যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা, ক্লান্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যক্তি স্বভাবতঃই অনুভব করতে পারে। ব্যক্তির নানাপ্রকার অনুভূতি ও আবেগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষমতা আছে। এই অনুভূতিগুলি কখনও সুখকর, কখনও বা দুঃখকর বলে মনে হয়। আবেগাভিজ্ঞতা অনেক প্রকারের হতে পারে—যেমন রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, ভালবাসা, ঘৃণা, অস্থিরতা ইত্যাদি। মানুষ একটা সীমা পর্যন্ত জড় জগৎ সম্বন্ধে ও আপন প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। ঘটনার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং অর্থ-সংগতি আবিষ্কার করার ক্ষমতাও (*intelligence*) মানুষের আছে। এই অর্থ-সংগতি, ব্যক্তির আবেগ, উন্নাস (*Attitude*) বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দেশ্য-পরিচালিত হয়েই মানুষ কাজ করে। এই কাজে যে সকল মানসিক ক্রিয়া (*mental activities*) অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাদের মধ্যে আছে **প্রত্যক্ষণ, স্মরণ, যুক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার আবেগের ক্রিয়া**। 'মন' বলতে আমরা সংক্ষেপে বুঝি তিনটি মানস ক্রিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানার ক্ষমতা—এর সম্বন্ধে অনুভব করা এবং পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে চলার প্রচেষ্টা।

মানুষের চারিদিকে কেবলমাত্র জড়জগৎ (*Physical environment*) নেই—মানবিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও তার চারিদিকে বিদ্যমান—**মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা খুবই সহজ হত যদি মানুষ কিভাবে জড় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলে, এই আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত**। পরীক্ষার জন্য আনীত একটি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর জৈবিক ও স্নায়বিক ক্রিয়া অনুশীলন করলে, 'অভ্যাস' (*Habit*)-এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রাণীর আচার-আচরণকে বিশ্লেষণ করলে, প্রাণীটি সম্বন্ধে প্রায় সব কিছু জানা যায়। কিন্তু মানুষকে জানা, তার আচার-আচরণকে বোঝা অত সহজ নয়। **বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জড় পরিবেশের প্রভাব ক্রমশঃই ক্ষীয়মান হয়ে আসছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন অল্প আয়াসেই মিটে যাচ্ছে।**

সভ্যতা, বিশেষ ক'রে শিল্প-সভ্যতা, ক্রমশঃ মানবিক সম্পর্ক জটিল ক'রে তুলছে ; এই জটিল মানবিক সম্পর্কনিচয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলার জন্য ব্যক্তির মানসিক শক্তিগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় হয়ে উঠতে হচ্ছে ও মাঝে মাঝে পরিবেশের জটিলতা হেতু সংগতি সাধনের এই শক্তিগুলির উপর যথেষ্ট চাপও পড়ছে। **এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের (*Psychological environment*) সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তি ও প্রক্রিয়াই মানসিক স্বাস্থ্য।** মানুষকে নিয়ে মানুষের যে জগৎ, মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যভূমিতে মানুষের যে ভাব-বিনিময়, যে সম্পর্ক—এবং এই সম্পর্কাশ্রিত যে জগৎ, যে পরিবেশ, তাকেই বলব মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ। জড়-পরিবেশ বা ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে যেমন একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য একটি ঘটনার সম্পর্ক আছে সেটা স্পষ্টই হোক বা প্রচ্ছন্নই হোক, ঠিক তেমনি মানুষে মানুষে ভাবের বিনিময়ে, ভাষার বাঁধনে, পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্য দিয়ে যে সম্পর্কের পরিবেশ গ'ড়ে উঠে, সেটাই হ'ল মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বা মানসিক পরিবেশ (*Psychological environment*)। মানুষকে চলতে গেলে হাঁটতে গেলে যেমন তাকে ভরসাম্য রক্ষা করে পথ দিয়ে চলতে হয়, ঠিক তেমনি, পরিবারে, সমাজে, স্বদেশে ও বৃহত্তর পটভূমিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চলতে গেলে তাকে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে হয়, নিয়ম অনুশাসন মেনে চলতে হয়—এই সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ক্ষমতা ও প্রক্রিয়াই মানসিক স্বাস্থ্য।

।। বিকাশ-পথে প্রভাব ।।

শৈশব থেকে বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্যন্ত বিকাশপথে শিশু নানাবিধ পারিবারিক, সামাজিক অনুশাসনগত প্রভাবের মধ্য দিয়ে যায়। এই সব **পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতার (Personality)-র মধ্যে গ্রথিত হয়ে যায়।** শৈশব অবস্থায় সে পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসনগুলিকে প্রায় সর্বাংশেই গ্রহণ করে, কেননা তখনও তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। বয়ঃপ্রাপ্তির পর যখন সে নিজে জীবনাভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে ও এইসব বিষয় সম্পর্কে যুক্তি-সহযোগে চিন্তা করতে পারে, তখন সে এই অনুশাসনগুলির কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য ও কোন্‌টা বর্জনীয়, তা বিচার করতে পারে। এ সত্ত্বেও এইসব পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন শৈশবে ও বাল্যকালে অলক্ষ্যে তার মানসিকতার মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়ে যেতে পারে যে, ইচ্ছা করলেও সে এগুলোকে পরে আর বর্জন করতে পারে না ; এর বিপরীতও আবার ঘটতে পারে ; সে পরিবারে ও সমাজে নিজেকে হয়ত খাপ খাওয়াতে পারছে না, কেননা পরিবারে ও সমাজে যে সব অনুশাসন ও সাংস্কৃতিক অনুজ্ঞা আছে, তার অনেকটাই সে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেনি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত মানসিক কার্যকারিতায় ভারসাম্য-রক্ষাকারী শক্তিগুলির মধ্যে (যেমন প্রতিন্যাস, মতামত, প্রেষণা, আশানিরাশা, স্থায়ী অনুভূতি, দ্বন্দ্ব, বিবেক, সংশয় (***attitudes, opinions, motivations, sentiments, conflict***), একটা

পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে—এই মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 'আমার' আমিত্বের মূলকেন্দ্র। এই 'আমি'কে সর্বদাই সমাজের আইন, বিবেকাদর্শ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন ইত্যাদি পারিবেশিক প্রভাবের সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলতে হবে। পারিবেশিক এই অভিযোজন (*Adjustment*) প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির যে ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়, তাকে আবার সমাজের ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। যে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি আজ তার পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলছেন, তাঁর বাল্যকাল কৈশোর ঠিকঠিক সেই পরিবার-কাঠামো ও সমাজ-কাঠামোর, পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কাটে নি, ফলে বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাকে কিছু ভিন্নতর পরিবার-প্রতিক্রিয়া ও সমাজ-প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয় ও সেইভাবে নিজেকে মানিয়ে চলতে হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য এই সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তি ও ক্ষমতা ; এই মানিয়ে চলার শক্তি সুস্থ ব্যক্তিত্বেরই ফলশ্রুতি।

॥ দেহ-মন ॥

মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই আমরা সাধারণভাবে 'মন' বলে অভিহিত ক'রে থাকি। এর ক্রিয়া-কলাপ নির্ভর করে 'মস্তিষ্কের' (*Brain*) সংহতি, স্নায়ুতন্ত্র এবং নালীশূন্য গ্রন্থির (*Endocrine glands*) উপর। এই স্নায়ুতন্ত্র, নালীশূন্য গ্রন্থি ও মস্তিষ্কের কার্যাদি ও সংহতি আবার নির্ভর করে—খাদ্যগ্রহণ, পুষ্টি, রক্ত-সঞ্চালন ও অন্যান্য আরও জৈবিক (*Physiological*) কার্যাদির উপর। **মানসিক ও দৈহিক কার্যাদি পরিণামে অবিচ্ছেদ্য।** আমরা যখন দেহ-মন শব্দ দুটি ব্যবহার করি, তখন সমগ্র ব্যক্তির দেহ-মনের সমন্বিত কার্যের পর্যায়ক্রমকে বুঝি। এর যে কোন পর্যায়ে বিচ্যুতি বা বিনষ্টি অন্য কোন কর্মসোপানকে বা অবস্থাকে নিষ্ক্রিয় না ক'রেও ঘটতে পারে, কিন্তু প্রায়শঃই আমরা দেখি শারীরিক ক্রিয়াকলাপের কোন প্রকার বিচ্যুতি মনকে, আবার মনের অসুস্থতা কম-বেশী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেহের অসুস্থতা ঘটিয়ে থাকে। অতএব **মানাসক স্বাস্থ্য দৈহিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে কিছু নয়, বরং দেহ-মনের অঙ্গাঙ্গী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সক্রিয়তা ব্যক্তিকে ভৌতিক ও মানসিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সক্ষম রাখে।**

॥ **ব্যক্তিত্ব** ॥

দুটি ব্যক্তি-মানস সর্বদিকে একপ্রকার হয় না, যদিও সকল ব্যক্তির মানসিকতার মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রত্যেক মানুষের মুখমণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—যেমন প্রত্যেকেরই চোখ, নাক, কান ইত্যাদি আছে, তাদের অবস্থিতিরও একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। এ সত্ত্বেও কিন্তু দু'টি মানুষের মুখমণ্ডল এক-প্রকার হয় না। একজনের মুখাবয়বের বিশেষত্ব থেকে আমরা যেমন তাকে চিনতে পারি, মানসিক বৈশিষ্ট্য থেকেও ব্যক্তিটিকে আমরা চিনতে পারি। কোন ব্যক্তির কাজ, তার

বাচনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতি থেকে যে মানস-বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্বিত হয়, তা থেকে ব্যক্তিটিকে চিনতে পারি। **কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারে এমন যে অদ্বিতীয় দেহ-মানস বৈশিষ্ট্য—সেইটিই তার ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতা (Personality)**। এই মানস-বৈশিষ্ট্য সকল ব্যক্তির মধ্যেই (যেমন, মুখাবয়বের দিক্ থেকে চোখ, নাক, কান) বিদ্যমান, এই সকল বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ ও একের সাথে অপরের সম্মিলনের প্রকারভেদের মধ্য দিয়ে যে অদ্বিতীয়তা প্রকাশমান, সেইটিই তার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তির দেহ-মন, তার গঠন-ভঙ্গিমা ও বিকাশ-প্রকৃতি অনুযায়ী যে বিশেষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাঃই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত ফলশ্রুতি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অর্থে ব্যাক্তত্ব আছে। **ব্যক্তিত্বের সুস্থতাই মানসিক স্বাস্থ্য।**

॥ স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য ॥

দেহের স্বাস্থ্য যেমন দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিষয়বস্তু, **ব্যক্তিত্বের স্বাস্থ্যই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিষয়বস্তু**। ব্যক্তি যেহেতু তার পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য সর্বদা প্রয়াসরত, ব্যক্তিত্ব সেইহেতু সর্বদা ক্রিয়াশীল ; এই অভিযোজন প্রয়াস কখনও বেশী কখনও কম পরিমাণে সাফল্য লাভ করছে। অভিযোজন প্রক্রিয়া **কঠিন কোন একটি আচরণাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়**—যা থেকে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকৃতিকে ছকে ফেলে বিশ্লেষণ করতে পারি। কিন্তু **সামাজিক অভিযোজন যখন একাদিক্রমে বারবার সুস্পষ্টভাবে ব্যাহত হয়, তখনই বলা যায় কোন প্রকার মানসিক অসুস্থতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিয়েছে।**

সামাজিক অভিযোজন বিঘ্নিত হলে মানসিক অসুস্থতা আছে, এ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। কিন্তু, মানসিক অসুস্থতা ভিতরে ভিতরে থাকলেও অনেক সময় সামাজিক অভিযোজন ব্যর্থ নাও হতে পারে। ধরা যাক, কোন ব্যক্তির মধ্যে শারীরিক কোন প্রকার অসুস্থতা রয়েছে ; যেমন, মূত্র-রোগ বা হৃদ্-যন্ত্রের কোন রোগ। তার শারীরিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়েছে—হৃদ্-যন্ত্র গঠনগতভাবেও কিছুটা বিপর্যস্ত হয়েছে, কিন্তু এহেন ব্যক্তিরও সর্বদা রোগ সংলক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে ; খুব ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলে হয়ত তার এই অসুস্থতা ও দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা ধরা পড়তে পারে। এরূপ ব্যক্তির একটা বিষয়ে কিছু কমতি থাকবে। ভবিষ্যতে সার্থক অভিযোজনের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, তা হ্রাস পাবে। ফলে মূত্র-রোগীটি যদি কখনও অধিক আহার করে কিংবা খুব বেশী দৈহিক কাজে নিজেকে নিয়োগ করে, তার সুপ্ত রোগ-লক্ষণটি হঠাৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। ঠিক সেরূপভাবে, **কোন অসুস্থ বা জীর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যখনই কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় (যে অবস্থার সঙ্গে সার্থক অভিযোজনের জন্য সুদৃঢ় ও সুস্থ মানসিক কাঠামোর প্রয়োজন), তখনই তার মধ্যে নানাপ্রকার মানসিক বিকৃতির সংলক্ষণ স্পষ্টতর হয়ে উঠে।**

॥ কোন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা ॥

যখন কোন ব্যক্তিত্বের শক্তি-সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লিষ্ট হয় ও তার পরিমাপ করা হয় এবং তার আন্তর-মানস-অভিজ্ঞতা ও সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সামাজিক আচার-আচরণের পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক অনুলিপি গ্রহণ করা হয়, তখনই একমাত্র কোন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

॥ মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদান ॥

(ক) অটুট দৈহিক স্বাস্থ্য।
(খ) যথাযথ বুদ্ধি।
(গ) যথাযথ সংযমের মধ্যে প্রবৃত্তিনিচয়ের ক্রিয়াশীলতা : বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী।
(ঘ) পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সহৃদয়তার সঙ্গে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ।
(ঙ) আত্মকল্যাণ, পারিবারিক কল্যাণ, গোষ্ঠী ও জাতীয় কল্যাণের দিকে দৃষ্টি।
(চ) আত্ম-নির্ভরশীলতা।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

স্বাস্থ্যের স্বরূপ→	১। স্বাস্থ্যের প্রকৃতি। ২। একটি উপমা। ৩। দৈহিক স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্য।
সঙ্গতি-সাধনের পটভূমিতে→	১। সঙ্গতি সাধনের ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য। ২। সঙ্গতি রক্ষা ও দৈহিক স্বাস্থ্য। মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও মানসিক ক্রিয়া। মানুষ ও তার চারিদিকের পরিবেশ—জড় পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। ৫। মানুষের সমাজ সংস্কৃতি ও মানসিক স্বাস্থ্য।
বিকাশপথে প্রভাব→	১। পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসনের ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব। ২। আমিত্ব ও পারিবেশিক সঙ্গতি।
দেহ-মন→	১। দেহ-মন : দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য।
ব্যক্তিত্ব→	১। ব্যক্তিত্বের ধারণা ব্যক্তিত্বের স্বাস্থ্যই মানসিক স্বাস্থ্য। ব্যক্তির অদ্বিতীয়তা। ব্যক্তিত্ব ও মানসিকস্বাস্থ্য।
স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য→	১। সামাজিক অভিযোজন.........মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। ২। গুপ্ত মানসিক অসুস্থতা—গুপ্ত দৈহিক অসুস্থতা—অবস্থা বিশেষে রোগ লক্ষণ প্রকাশ। ৩। কোন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণার উপায়।
মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদান→	

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড
World Health Organisation (WHO) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চলছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এ বিষয়ে অনেক উদ্যোগ নিচ্ছে। এখন সুস্বাস্থ্য সর্বজনীন করার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। যেহেতু মানসিক স্বাস্থ্য সমাজ ও পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, এবং যেহেতু পৃথিবীর পরিমণ্ডল, সংবাদ-সংস্কৃতি পরিবেশনের বৈদ্যুতিক মাধ্যমের অনেক উন্নতির জন্য, অনেক কাছাকাছি হয়েছে, সেইজন্য, মানসিক স্বাস্থ্যের যেকোন উদ্যোগ এখন সর্বজনীন উদ্যোগে রূপান্তরিত হচ্ছে। এইড্স্ (AIDS), মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার (Substance Abuse)— এইসব মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে এখন বিশ্বব্যাপী আন্দোলন চলছে, এই সব অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও চিকিৎসার বিধিব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা চলছে। বিভিন্ন দেশ এক জোট হয়ে এর প্রতিবিধানের চেষ্টা করছে। এই যৌথ প্রয়াস মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দায়িত্বের মধ্যে এখন পড়ে সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন করা এবং সেগুলি যাতে সর্বদেশে প্রযোজিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। United Nations এর অন্তর্ভুক্ত সকলদেশের ক্ষেত্রেই এই প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি প্রযোজ্য হতে পারে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৪৯ সালে প্রথম বসে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিনিয়ম প্রণয়ন করার জন্য। প্রথমে তারা জোর দেন দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে—দৈহিক রোগ, যেমন দেশে দেশে ম্যালেরিয়া ও সিফিলিস্ এবং হৃদরোগ দূর করার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলে। দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন। মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে যেহেতু শিক্ষা, বাসস্থান, পারস্পরিক সম্পর্ক, নানাবিধ অবস্থা জড়িত, সেহেতু মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে WHO আরও সতর্ক হন ও সার্বিক মানবিক বিকাশের উপর জোর দেন। এদিকে WHO-র উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে মানসিক রোগের প্রকার, বিকৃত সামাজিক অবস্থা যা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, সে সব বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা করতে আরম্ভ করে। ১৯৬৮ সালে WHO প্রথম report-এ 'International Classification of Mental Disorders' সম্বন্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা, গবেষণা আরম্ভ করার জন্য WHO উদ্যোগ নেয়। এই আন্দোলন আমাদের দেশেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ করার কর্মকাণ্ড স্কুল-কলেজে নেওয়া এখন বিশেষ জরুরী।

।। অনুশীলনী ।।

1. Bring out the significance of Mental Health.
   "Perfect Mental Health is a goal for living rather a Grogressive goal" — Discuss.
2. What is Personality ? How is it related to Mental Health ?
3. "Mental Health is the full and free expressions of all our native and acquired potentialities in harmony with one another by living directed towards a common end or aim of the personality as a whole." Elucidate the nature of Mental Health with particular reference to the above statement.
4. Discuss the modern concept of Mental Health. How is it related to adjustment ?
5. "Mental Health is dynamic not static, it is functioning of the whole organism towards an end, not the attainment of a certain state : it is not stagnation but a harmony of movement, living and active." Justify the statement and describe the salient features of Mental Health.
6. What methods would you adopt in ascertaining the Mental Health of an individual ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার স্বরূপ

[Nature of Mental Hygiene]

॥ স্বাস্থ্যবিদ্যা ॥

'*Hygiea*' একটি গ্রীক শব্দ। এই শব্দটির দ্বারা স্বাস্থ্যের দেবীকে অভিহিত করা হয়। '*Hygiene*' শব্দটি এই '*Hygiea*' শব্দ থেকেই উৎসারিত। *Hygiene* বলতে আমরা বুঝি স্বাস্থ্যবিদ্যা। পদার্থবিদ্যা যেমন পদার্থ-বিষয়ক বিজ্ঞান অর্থাৎ পদার্থ-সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ ধারাবাহিক নৈর্ব্যক্তিক (*objective*) জ্ঞান, জীববিদ্যা যেরূপ জীব ও প্রাণী সম্বন্ধে ধারাবাহিক বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যাও সেইরূপ স্বাস্থ্যবিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বস্তুনিষ্ঠ ধারাবাহিক জ্ঞান। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায়, **স্বাস্থ্যবিদ্যা হল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সত্য ও সূত্র। এই সূত্রগুলি বৈজ্ঞানিক ধারায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। সূত্রগুলি প্রতিপালনে স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, রোগাক্রান্ত হলে রোগমুক্তি ঘটে ও রোগাগম প্রতিরোধ করে।**

॥ স্বাস্থ্যের স্বরূপ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ॥

সক্রিয়তা ও সামঞ্জস্যই স্বাস্থ্যের মূল কথা। ভিতরে ও বাইরে সামঞ্জস্য বিধানই স্বাস্থ্যের লক্ষ্য ও ধর্ম। দেহের বিভিন্ন অংশের সজীব সক্রিয়তা, বিভিন্ন অংশের সক্রিয়তার মধ্যে সুস্বনতা বা সামঞ্জস্য (*Harmony*), সমস্ত ক্রিয়াকর্মের একটা লক্ষ্যে বিধৃতি এবং পরিণামে দেহের কর্মক্ষমতা ও বাইরের ভৌত (***Physical***) পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষা (যেমন শীত, উষ্ণতা, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি) দৈহিক স্বাস্থ্যের সূচক। **মানসিক স্বাস্থ্যের বেলায় মনের বিভিন্ন শক্তি ও সম্ভাবনাগুলি ; যেমন আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, বুদ্ধি, কল্পনা ইত্যাদি সক্রিয় ও কর্মক্ষম থাকবে, এদের ক্রিয়াকর্ম ভিন্নমুখী না হয়ে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক হবে এবং কয়েকটি কল্যাণ-চিন্তার দ্বারা সমগ্র মানসিক কার্যগুলি একমুখী হবে। এর ফলে যথার্থ কর্মক্ষমতা ও সমাজ-সঙ্গতি ব্যক্তির মধ্যে পরিস্ফুট হবে।** এই দিক্ থেকে মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যার বিষয়বস্তু বিস্তৃত, কেননা মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্ব (যাতে দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাও থাকে) ও ব্যক্তির সমাজ ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে এক সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

॥ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার সংজ্ঞা ॥

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বস্তুনিষ্ঠ

ধারাবাহিক জ্ঞান। এই জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ কোন ব্যক্তিকে তার সমগ্র মানসশক্তির পরিপূর্ণ ও সুষম বিকাশে সহায়তা করে। এর সঠিক প্রয়োগ দৈহিক ও মানসিক শক্তিনিচয়ের সম্যক ব্যবহার করতে সাহায্য করে। সমাজে ও কর্মস্থলে, এই শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি যথাযথ কর্মসম্পাদনে সক্ষম হয় এবং পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে সকল ব্যক্তির সঙ্গে সন্তোষজনক সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে সাহায্য করে। সংক্ষেপে বলা যায়, এই জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে, মানসিক বিকৃতি প্রতিরোধে ও রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। এই দিক্ থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা একটি প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞান (*Applied Science*)। ইহা একটি সদর্থক (***Positive***) বিজ্ঞানও বটে, কেননা এর উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুস্থ মানসিকতার অভ্যুদয় ঘটানো। এ পটভূমিতে বলা যায়, মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যার কাজ মানবিক কল্যাণকর্মের সঙ্গে জড়িত এবং যার প্রসার মানবিক সম্পর্কের সকল পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত।

॥ উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু ॥

দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দৈহিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ এবং ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে তার রোগ নিরাময় করা। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্যা, বিভিন্ন সমভাবী শাখাবিজ্ঞান, যেমন শরীরস্থান (***Anatomy***), শরীর-বৃত্ত (***Physiology***), রোগবিদ্যা (***Pathology***), ঔষধবিদ্যা (***Medicine***), জীব-রসায়ন বিদ্যা (***Bio-chemisiry***) থেকে তথ্যনিচয় সংগ্রহ ক'রে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যাও তার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলিকে (মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, মানসিক বিকৃতি ও রোগ-প্রতিরোধ, মানসিক রোগ নিরাময়) সফলকাম করার জন্য বিভিন্ন সমভাবী জ্ঞানশাখা যেমন শিক্ষা-মনোবিদ্যা, অস্বভাবী মানস-বিষয়ক মনোবিদ্যা, শরীরবৃত্ত, ঔষধবিদ্যা এবং সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে।

॥ করণীয় ॥

(১) সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বয়ঃক্রম অনুসারে কি ধরনের জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকাশোন্মুখ শিশুর যাওয়া সমীচীন—অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনে কি কি মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত ও পরিবেশে কি ধরনের মানবিক সম্পর্ক সন্নিবেশিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যার অবশ্য করণীয়। মানসিক অপসংগতি প্রতিরোধের প্রধান উপায় সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন।

(২) ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে সুস্থ জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটানোর জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন। এর দ্বারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়।

(৩) মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্য বিজ্ঞানসম্মত নানা প্রকার মনশ্চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন ও তাদের যথার্থ প্রয়োগ।

(৪) মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যায় ব্যক্তির সার্থক সঙ্গতি-সাধন প্রক্রিয়া বিশ্লেষিত হয়। এই সঙ্গতি-সাধন প্রক্রিয়া (সামাজিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে) প্রক্ষোভের কার্যকারিতা ও তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ে ও সুষম ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য প্রক্ষোভের *(emotions)* ধর্ম তার বয়ঃক্রমানুসারী বিকাশ বৈশিষ্ট্য ও প্রক্ষোভ-প্রবুদ্ধ ক্রিয়াকে, সামাজিক আচরণাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংযত করার উপায় প্রভৃতি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আরও একটি অপরিহার্য কাজ।

মানসিক স্বাস্থ্যচিন্তার প্রগতিমূলক স্বরূপ

এখন মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যায় Stress ও environment, মানসিক চাপ ও পরিবেশ এই সব বিষয় নিয়েও আলোচনা ও গবেষণা হচ্ছে। নিয়ত মানসিক চাপ ও তার প্রতিফল হিসেবে দেহের ও মনের নানাবিধ অস্বাচ্ছন্দ্য ও অসুখ কী ভাবে হচ্ছে তা নিয়ে বর্তমান মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বিশেষভাবে খোঁজ করছে! Psycho-Somatic Disease বা মানসিক কারণে দৈহিক রোগ কী করে হয়, মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যায় এখন এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। পেপ্‌টিক আলসার, এ্যাজমা, হৃদরোগ কীভাবে মানসিক কারণে অর্থাৎ মানসিক চাপ, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি উৎস থেকে হতে পারে, এইসব বিষয়ও এখন মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। মানসিক চাপ কীভাবে কমানো যায়, মানসিক চাপের বহির্জাত ও অন্তর্জাত উৎসমূল কী কী আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা এ নিয়েও নূতন নূতন তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

জীবনে নানা দুর্যোগ, দুর্বিপাক, বয়স্কদের অবসরান্তরে যে শূন্যতা ও তার জন্য যে পারিপার্শ্বিক সমস্যা দেখা দেয় তা কী করে মনের গভীরে অবসাদ ও বিষাদ নিয়ে আসে এবং এইসব সমস্যা কাটিয়ে উঠে, বয়স্করাও কীভাবে মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পারে, মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যায় এই সবের সমস্যা ও সমাধান নিয়েও পাঠ্যক্রম তৈরি হয়েছে।

ব্যক্তিত্বের গড়নের সঙ্গে, জীবনধারা ও জীবনাচরণ কীভাবে সংশ্লিষ্ট, কীভাবে এর দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য প্রভাবিত—Type-A ব্যক্তিত্ব, Type-B ব্যক্তিত্বের কী কী বৈশিষ্ট্য, এবং এই সব বৈশিষ্ট্য কীভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে ও তা থেকে কী কী দৈহিক ও মানসিক অসুখ হতে পারে—এইসব চিন্তাভাবনা অগ্রসরমান মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য হচ্ছে। Type-A ব্যক্তিত্বের লোকেরা সর্বদা কর্মমুখ, প্রতিযোগী, নূতন নূতন কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে আগ্রহী, সর্বদা সাফল্য আরও সাফল্যের দিকে ছোটাছুটি, আক্রমণমুখী, এই সব ব্যক্তিরা বেশী করে হৃদরোগের শিকার হয়। অপর দিকে Type-B ব্যক্তিত্বের লোকেরা অতটা প্রতিযোগী নয় বরং কিছুটা অবসর প্রিয়, অনাক্রমণমুখী অথচ উচ্চাভিলাষী।

মানসিক চাপ কে কতটা সহ্য করতে পারবে সেটাও ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি ও গড়নের উপর নির্ভর করে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিষয়-দিগন্ত এখন বহু নূতন নূতন দিকে প্রসারিত হচ্ছে।

।। অনুশীলনী ।।

1. Discuss the nature of Mental Hygiene.
2. What are the sources of knowledge of Mental Hygiene ? How can you justify the scientific status of Mental Hygiene ?
3. Elucidate the modern concept of Mental Health. How is it related to Mental Hygiene ?
4. What constitutes the subject-matter of Mental Hygiene ?
5. "Mental Hygiene is a positive science in that it sets out to establish a condition of healthy mindedness, it is a normative and not a pure science, because it has a norm or standard at which it aims, namely that of mental health ; it is an applied science in that it seeks to discover and apply the principles for the establishment of mental health and happiness in the individual and in the community."—Discuss.

তৃতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ও বিশদ উদ্দেশ্য

[Uses and the Aims of Mental Hygiene]

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ-জীবনযাপন ব্যক্তি-জীবনযাপনের মতই প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। সমাজ বলতে আমরা কেবল বাইরের সমাজকে বুঝি না—পরিবার, বিদ্যালয় ও ছোটখাট সমাজ; কেননা সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ও বিদ্যালয়-জীবনের মধ্যেও বহুলাংশে বর্তমান।

॥ ব্যক্তি-জীবনে ॥

শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে—তার দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে মানসিক বিকাশও ঘটতে থাকে, শিশুর মানসিক পরিসর ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে—মাতাপিতা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে ও শিশুটিও ক্রমে এই সকল সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকে। এই সম্পর্কের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার উপর অনেকাংশে শিশুর ব্যক্তিত্ব কোন্ ধারায় হবে তা নিরূপিত হয়। **সুষম স্নেহ-প্রীতি-প্রযত্ন-পরিবৃত উদ্দীপনাময় স্বতঃস্ফূর্ত যে পারিবারিক পরিবেশ তার মধ্যেই শিশুর যথার্থ মানসিক বিকাশ ঘটে, সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়,** পরবর্তী জীবনে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সে সার্থক অভিযোজন করতে পারে। **সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশ থেকেই সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তি সার্থক সঙ্গতি-সাধনের (Adjustment) মধ্য দিয়ে সমাজে আত্মশক্তির সম্পূর্ণ ও সম্যক প্রকাশ করতে পারে। এর দ্বারা সার্থক ও সৃজনশীল কর্মসম্পাদন সম্ভব হয়।** যথাবিহিত প্রতিযোজন ও যথাযথ কর্মসম্পাদনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন উভয়ই সুন্দর, আনন্দময়, ও স্বাস্থ্যময় হয়ে ওঠে। **অপর দিকে সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে না উঠলে পরিণামে নানাপ্রকার অপসঙ্গতিমূলক (Maladjusted) আচার-আচরণ প্রকাশ পায়।** চিন্তায়, কর্মে, মানবিক সম্পর্ক রক্ষায়, সকল বিষয়েই অস্বাভাবিকতা বা বিকৃতি ঘটে—এই বিকৃতি কখনও খুব স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়, কখনও বা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। এই অপসঙ্গতি পারিবারিক জীবন, সমাজ-জীবন, কর্ম-জীবন, জীবনের সকল অধ্যায়কেই কোন-না-কোন ভাবে আঘাত করে; ফলে ব্যক্তি-জীবনের সৌন্দর্য স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ—এক কথায় স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়।

॥ সমাজ-জীবনে ॥

মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি যেহেতু সামাজিক প্রকল্পগুলোকে ভেঙ্গে ফেলছে, সামাজিক

অনুশাসন বহির্ভূত চিন্তা ও কর্মের দ্বারা সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিঘ্নিত করছে, সেইজন্যে **ব্যক্তির অসুস্থ মানসিকতা সমাজ মানসিকতাকেও আক্রমণ করে। পরিণামে সমাজ-জীবনও আক্রান্ত হয়।** অন্যদিকে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হলে তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। পরিবারকে ও বৃহত্তর পটভূমিতে সমাজকে ব্যক্তি তার কর্ম উৎপাদন দিয়ে যে পরিমাণ সাহায্য করতে পারে, তা আর করতে পারে না, ফলে পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনের সমৃদ্ধি ও শান্তি বিঘ্নিত হয়।

॥ বিশদ উদ্দেশ্য ॥

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উদ্দেশ্য মূলতঃ দুটি। (ক) ব্যক্তি-মানসের সুস্থতা রক্ষা করা। (খ) সমাজ-জীবনের সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বা সমাজ-মানসের সুস্থতা রক্ষা করা। এই দিক্ থেকে দেখলে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সুদূর-প্রসারী। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা, বিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা, আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করা, সমাজ-জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা, সমাজকল্যাণ ও দেশ-সমৃদ্ধির জন্য মানবিক শক্তির (*man power*) যথাযথ ব্যবহারের জন্য, অর্থাৎ এক কথায় মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্য দিকে পরিবারে ও বিদ্যালয়ে বিপথগামী (*problem children*) শিশুদের অপসঙ্গতি দূরীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য, কিশোর অপরাধীদের ও বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ও তাদের অসুস্থ জীবনধারা সুস্থ করার জন্য, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ-নিরাময়ের জন্যও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সমভাবে বর্তমান। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা একটি সামাজিক ও বৃহত্তরভাবে একটি রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা অধীত না হলে, তার জ্ঞানালোকে পারিবারিক জীবন, বিদ্যালয়ের জীবন ও সমাজ-সম্পর্ক পরিশীলিত হয় না; অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনযাপন-প্রণালীকে নানাভাবে বিকৃত ও পঙ্গু করে ও সুষম ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার **বিশদ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে** নিম্নরূপে বিবৃত করা যায়:

॥ ক ॥ পারিবারিক জীবনে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন ও যথাযথ পারস্পরিক সম্পর্ক রচনা—এর মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনে আনন্দ ও শান্তি আনা, যাতে সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ শিশুর **সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।**

॥ খ ॥ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করা—এর জন্য বিদ্যালয়ে যথাযথ পরিবেশ রচনা, যাতে **শিক্ষার্থীর সুপ্ত শক্তি পূর্ণরূপে বিকাশ-লাভের সুযোগ পায় এবং পরবর্তী কালে সে একজন কর্মক্ষম সংহতিপূর্ণ নাগরিক হতে পারে।**

॥ গ ॥ ব্যক্তি-জীবন তথা সমাজ-জীবন থেকে বিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলা দূরীকরণ—

অর্থাৎ (১) বিপথগামী শিশুদের পুনর্বাসন, (২) অসামাজিক ও অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, (৩) মানসিক বিকৃতি ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ-নিরাময়।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

ব্যক্তি-জীবন→	১। ব্যক্তি-জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা : সঙ্গতি সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশ আত্মশক্তির সম্পূর্ণ নিয়োগ, সৃষ্টিশীল কর্ম।
সমাজ-জীবনে→	সমাজ জীবনে সমাজশৃঙ্খলা-রক্ষায় ও উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
বিশদ উদ্দেশ্য→	১। শক্তি শৃংখলা রক্ষা মানসিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার, বিপথগামী শিশুদের অপসঙ্গতি দূরীকরণ। ২। পারিবারিক জীবনে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি সুষমব্যক্তিত্ব গঠন। বিদ্যালয়ে সুপ্তশক্তি পূর্ণরূপে বিকাশে সহায়তা করা, যথার্থ নাগরিক বিপথগামী শিশুদের পুনর্বাসন।

চতুর্থ অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসর

[Scope of Mental Hygiene]

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উদ্দেশ্য তিনটি—প্রথমতঃ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠন, দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিত্বের সুস্থতা বা প্রকারান্তরে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ। তৃতীয়তঃ ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনপ্রকার বিচ্যুতি বা অসুস্থতা দেখা দিলে অর্থাৎ মানসিক বিকৃতি বা রোগ দেখা দিলে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সফল করতে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার যে কর্ম-পরিসর পরিলক্ষিত হয়, তা বহুমুখী ও বহুবিস্তৃত। বস্তুতঃ **মানব জীবনের প্রায় সকল পর্যায় ও সকল প্রকার মানবিক সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণই মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসরের অন্তর্গত।**

॥ দৈহিক স্বাস্থ্য ॥

সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য সুস্থ দৈহিক স্বাস্থ্যের গঠন ও তার সংরক্ষণ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। শিশু যদি যথাযথ খাদ্য না পায়, কিংবা অখাদ্য-কুখাদ্য খায় ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অন্যান্য দিকের প্রযত্ন যথাযথ না হয়—তাহলে তার দেহ অপুষ্ট ও রুগ্ন হয়ে উঠবে। অপুষ্ট ও রুগ্ন দেহে কখনই সুস্থ ব্যক্তিত্বের স্ফূতি ঘটে না। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে মানসিক বিকাশের একটা সম্পর্ক আছে। বুদ্ধি, স্মৃতি, মনোযোগ, মনঃপ্রকৃতি এদের সঙ্গে দৈহিক বিকাশের সম্বন্ধ বর্তমান। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এ বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যার কাজ কি? কোন্ খাদ্য কি পরিমাণে কোন বয়সে খাবে, এ বিষয় ও অন্যান্য দৈহিক-প্রযত্ন-প্রথার বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয় দৈহিক স্বাস্থ্য-বিদ্যায়। আমরা জানি অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ বা শিশুর একান্ত নির্ভরশীল আশ্রয় যে মাতাপিতা তাদের আচার, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী যদি সুস্থ না হয়, তাহলে তাদের বিকৃত আচরণ ও প্রতিন্যাসই (*Attitude*), শিশুর মনোরাজ্যে নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর ভাবের উদ্রেক করে, যা পরোক্ষভাবে তার দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্যও যদি প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে না খাওয়া যায়,—তাহ'লে অজীর্ণতা দেখা দেয়—গৃহ-পরিবেশে যদি কোনপ্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলা না থাকে, তা যদি অস্থির কোলাহলপূর্ণ হয়, তা হ'লে সেই পরিবেশে যথাযথ নিদ্রার বিঘ্ন ঘটে, ফলে দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। **কাজেই দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য বস্তুগত চাহিদা যেমন যথার্থভাবে মেটানো প্রয়োজন, মানসিক পরিবেশও** (Psychological environment) সুস্থ ও যথার্থ হওয়া প্রয়োজন। এই

মানসিক পরিবেশের গঠন সম্পর্কে তথ্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা দিয়ে থাকে। তাছাড়া দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গৃহের অভিভাবক ও পিতামাতার ধারণা ও আচরণ যদি সুস্থ না হয়, তা হলেও শিশুর মধ্যে অহেতুক স্বাস্থ্য-চর্চা বা অনাচর্চার ভাব নিয়ে আসতে পারে যাতে ক'রে দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিশুর মধ্যে সুস্থ মনোভঙ্গী সৃষ্টি হয় না। পরোক্ষভাবে ইহা দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। এ দিক্ থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসর দৈহিক স্বাস্থ্যের গঠন ও রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত।

।। পরিবারিক পরিবেশে সুস্থতা-অসুস্থতা ।।

সুস্থ মানসিক পরিবেশ বলতে আমরা মোটামুটি বুঝি পরিবেশে শিশুর মানসিক মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা (যেমন, শিশুর জন্য সুষম স্নেহ-প্রীতি, যত্ন, উৎসাহ, স্বতঃস্ফূর্তভাব) ও পরস্পরের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক। পারিবারিক পরিবেশে পিতামাতার সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক, ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্ক, গৃহ-পরিবেশে নিয়ম-শৃঙ্খলা—এসব বিষয় মানসিক পরিবেশ রচনায় কাজ করে। পিতামাতার সম্পর্ক যদি স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত না হয়, পিতামাতা যদি প্রায়শঃই কলহ ও মনোমালিন্যের মধ্যে থাকে, তাহলে শিশু নিজেকে অত্যন্ত নিঃসহায় বোধ করে। শিশুর মধ্যে একটা অস্থির উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়। পিতামাতাই শিশুর একমাত্র আশ্রয়স্থল। এই অস্থির দুশ্চিন্তা তার সুষম ব্যক্তিত্ব-গঠনকে বিঘ্নিত করে। পিতামাতার বিবাহিত জীবনের সঙ্গতি যদি নিশ্ছিদ্র না হয়—তাহলে পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যে অদৃশ্য উত্তেজনা বর্তমান থাকে, তা মানসিক পরিবেশকে অস্থির ও দূষিত করে। গৃহে জীবন-যাপন প্রণালীতে, সন্তান-প্রতিপালনে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব হলে, শিশু কিভাবে চলবে, কোন্ আচরণাদর্শ গ্রহণ করা সমীচীন হবে, সে সম্পর্কে একেবারে হতচকিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে ও এর ফলে তার সংহতিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠিত হতে পারে না।

অতএব ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে গৃহ-পরিবেশের কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও গৃহ পরিবেশকে কিভাবে শৃঙ্খলাপূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দকর ক'রে তোলা যায়, সন্তান প্রতি-পালনের সঠিক পদ্ধতি কি হওয়া উচিত, এসব বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

।। মানসিক বিকাশধারা পর্যবেক্ষণ ।।

মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিকের ও বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশধারার পর্যবেক্ষণ ও তাদের বিকাশ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ সত্য উদ্ঘাটনও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্মসূচীর অন্তর্গত। প্রক্ষোভের বিকাশ-ধারা ও বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধির বিকাশ-পর্যায়, সমাজ-চেতনার পর্যায়-পর্ব—এ সকলের বিজ্ঞান-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ একান্তভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তিত্ব হঠাৎ গড়ে ওঠে না। বিভিন্ন দিকের মানসিক বিকাশের সামঞ্জস্যের উপরই ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নির্ভর করে। মানসিক মৌলিক চাহিদা (*Mental Basic Needs*) সম্বন্ধে গবেষণা ও এ বিষয়ে যথার্থ তথ্যাদি সংগ্রহ করাও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্ম-পরিসরের

অন্তর্ভুক্ত, কেননা সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে মৌলিক চাহিদা পূরণের একটা গভীর যোগসূত্র আছে।

॥ বিদ্যালয় ॥

বিদ্যালয়ের কর্মধারার মধ্যেও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্মধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রসারিত। কেবল পুঁথিগত জ্ঞানার্জনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রতিটি শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তাকে জানা, এই সকল শক্তির পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ এবং তার মধ্য দিয়ে সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য। বিদ্যালয়ে শিশুর ব্যবহার, শিক্ষা-বিষয়ে উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে তার আচরণ, বিদ্যালয়ের নানাবিধ গঠনাত্মক ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ও অংশগ্রহণ—এ সকল বিষয়ই মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য।

পারিবারিক জীবনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার জন্য যেমন মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন—বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশোপযোগী ক'রে তোলার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের জীবন বলতে বোঝায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন। এক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যরক্ষার দু'টি দিক আছে—এক দিকে সংরক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক ও অপর দিকে নিরাময়মূলক দিক্।

॥ পাঠক্রম ঃ সহ-পাঠক্রম ॥

বিদ্যালয়ে বয়ঃক্রমানুসারী ও মনঃবিকাশানুযায়ী পাঠক্রম, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম (যেমন—খেলাধুলা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বিদ্যালয়ের প্রাচীরপত্র, শিক্ষা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, বিতর্ক-সভা) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয় ও মানসিক বৈকল্যকে প্রতিরোধ করা যায়।

॥ শিক্ষা-নির্দেশনা ॥

বর্তমানে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা-নির্দেশনা (*Elucational Guidance*) দেওয়া হয়, তার মধ্যেও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার একটা লক্ষ্য থাকে। যার যে বিষয়ে শক্তি ও রুচি, তাকে যদি সেই বিষয়পাঠে পরিচালিত ও উৎসাহিত না করা হয়, তাহলে পড়াশুনা সম্বন্ধে তার অনীহা আসে। বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যদি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে তাদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রম, ভিন্ন শিক্ষাধারা ও তাদের উপযোগী অন্যান্য ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে তাদের মধ্যেও একটা হতাশা আসে। এর ফলে তারা অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে যথার্থভাবে মানিয়ে চলতে পারে না। নানাপ্রকার অপসঙ্গতিমূলক আচরণ এসব ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে যা সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে।

এ ছাড়া, বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয়; যেমন—বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করা, জিনিসপত্র ভাঙ্গা, বিদ্যালয় থেকে

পালিয়ে যাওয়া, শিক্ষককে অপমান করা, সহপাঠীদের মারধর করা, মিথ্যাকথা বলা, চুরি করা, কিংবা পড়াশুনায় অমনোযোগিতা ও অনগ্রসরতা—এইসব সমস্যা মানসিক স্বাস্থ্যহানিরই প্রকাশ ও প্রতিফলন। এদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য অর্থাৎ এদের মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য ও মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্যও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্মকাণ্ড ব্যাপ্ত হতে পারে।

শিক্ষকদের সুস্থ ব্যক্তিত্ব ও সুস্থ মানসিকতা বিদ্যালয়ে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এ বিষয়েও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা অনেক পরিমাণে আলোকপাত করতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদান করতে পারে যার দ্বারা বিদ্যালয়ের অনেক সমস্যা শিক্ষক যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হতে পারেন।

।। কিশোর অপরাধী ও দুষ্ক্রিয়তা ।।

নিছক আইনের দৃষ্টিতে যারা দণ্ড পাওয়ার যোগ্য, সেই সব তরুণ অপরাধীদেরও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাময় ও পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করা হয়। ১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই সব কিশোর অপরাধীরা বড়দের মতই আইনানুগ শাস্তি পেত। ন্যুইয়র্কের ব্রুকলিনে প্রথম এই সব তরুণ অপরাধীদের (যাদের বয়স ১৬ থেকে ২১-এর মধ্যে) জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় স্থাপিত হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বিধিনিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এদের গোড়া থেকে দেখা না হয়, তাহলে এরাই পরবর্তী কালে সমাজে ভয়ঙ্কর দুষ্কৃতকারীরূপে দেখা দেয় ও সমাজ-জীবনকে বিধ্বস্ত করে। একদিকে এইসব কিশোর অপরাধীদের অন্যদিকে বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের আচার-আচরণকে সমাজানুগ করার জন্য, তাদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার অনেক কিছু করণীয় আছে। বর্তমানে কারাগার কেবল অপরাধীদের বন্দীশালাই নয়, তাদের মানসিক জীবনকে উন্নত করার নানাবিধ স্বাস্থ্য-সম্মত কর্মপঞ্জী প্রণয়ন ও রূপায়ণেও প্রয়াসী।

।। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ।।

মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যাদের আচার-আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা ও অসামাজিক ভাব প্রকট—তাদের চিকিৎসার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন ও তাদের যথার্থ প্রয়োগের জন্যও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার গবেষণালব্ধ সূত্রাদি কাজ করে। তাদের জীবনবিন্যাসে ও সুস্থতা আনয়নেও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উল্লেখযোগ্য কর্মধারা বর্তমান।

।। কর্মক্ষেত্র ।।

বিভিন্ন কর্ম-সংস্থাতেও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কর্মসীমা বর্তমানে প্রসারিত। যে কোন শিল্প-উৎপাদনই সাবলীল ও সচল যন্ত্র এবং সুস্থ যন্ত্রচালকের সমন্বিত কর্মফল। পূর্বে যন্ত্র ঠিক থাকলেই উৎপাদন ঠিক থাকে, এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে, শিল্পকর্মীদের দৈহিক সুস্থতার সঙ্গে মানসিক সুস্থতা যদি অটুট না থাকে, তাদের কারও মানসিক বৈকল্য দেখা দিলে তার নিরাময় না ঘটালে, শিল্প-ক্ষেত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও উৎপাদন হ্রাস পায়। কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যে ব্যক্তি যে কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তাকে সে কাজের জন্য নির্দিষ্ট

করা হয় ; এর ফলে তার মধ্যে কোন প্রকার ধূমায়িত অসন্তোষ থাকে না, সে সকল শক্তি দিয়ে তার কর্ম-সম্পাদনে প্রয়াসী হতে পারে। যথোপযুক্ত বিশ্রাম, যথোপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য উপকরণাদির অবতারণা করার বিষয়েও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার অনেক কিছু করণীয় আছে। এ ছাড়া, শিল্পক্ষেত্র ও অন্যান্য কর্ম-সংস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে মানবিক সম্পর্ক উন্নত ও সহৃদয় করার বিষয়েও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা কাজ করতে পারে।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

দৈহিক স্বাস্থ্য→	১। সুস্থ দৈহিক স্বাস্থ্য গঠন ও তার সংরক্ষণ। ২। মানসিক পরিবেশের সুস্থতা ও দৈহিক স্বাস্থ্য। ৩। দৈহিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যার প্রয়োজন।
পারিবারিক পরিবেশে সুস্থতা অসুস্থতা→	১। পারিবারিক পরিবেশ সুস্থ রাখায় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কাজ।
মানসিক বিকাশ ধারা পর্যবেক্ষণ→	মানসিক বিকাশ ধারার পর্যবেক্ষণ ও এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কাজ।
বিদ্যালয়→	শিশুর আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা—মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কাজ।
পাঠক্রম ঃ সহ পাঠক্রম→	পাঠক্রম ও সহ পাঠক্রম বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারিত।
শিক্ষা-নির্দেশনা→	১। শিক্ষা-নির্দেশনা ঃ বুদ্ধি, রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে পাঠদান……পরিচালনা করা—ওর অভাব অপসঙ্গতি দেখা দেয়। ২। বিপথ-গামী ছাত্রছাত্রীগণকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশনা। ৩। শিক্ষকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদান করে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা।
কিশোর অপরাধী ও দুষ্ক্রিয়তা→	কিশোর ও বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের মানসিক পরিবর্তন ও পুনর্বাসন—মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কাজ।
মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি→	মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিরাময় প্রয়াস।
কর্মক্ষেত্র→	১। শিল্প-কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও শিল্প উৎপাদনের মধ্যে যোগ আছে। ২। শিল্প পরিবেশ রচনায় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা নানাভাবে সাহায্য করতে পারে।

॥ অনুশীলনী ॥

1. Define the scope of Mental Hygiene.
2. Discuss the problems of Mental Hygiene.
3. Elucidate the aims and the uses of Mental Hygiene.
4. "In its broadest sense, the aim of Mental Hygiene is to help all persons achieve fuller, happier, more harmonious, and more effective lives."—Discuss.
5. Describe the nature and scope of Mental Hygiene.

পঞ্চম অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ঐতিহাসিক পটভূমি ও আন্দোলন

[Concept and the Movement of Mental Hygiene]

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনোপলব্ধি হঠাৎ একদিনে হয় নি। বস্তুতঃ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ধারণা (*concept*), তার প্রয়োগ ও প্রসার, চিন্তাজগতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল।

।। ফরাসী বিপ্লব ।।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই ক্ষীণভাবে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ধারণার অভ্যুদয় ঘটে। ডঃ ফিলিপ পিনেল এই সময় মানসিক বিকারগ্রস্ত ও উন্মাদ ব্যক্তিদের সম্পর্কে যথাযথ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ ও তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি এ বিষয়ে একদিকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে, অন্য দিকে তাঁর চিকিৎসক সহকর্মীদের তরফ থেকে যুগপৎ বাধা পেয়েছিলেন। সংস্কারের প্রথম পর্যায় হিসাবে তিনি উন্মাদ ও মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের শৃঙ্খল-বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে চিকিৎসাগারে রাখেন। এই সময় মানবিক সভ্যতার প্রগতিশীল ভাবধারা, যে ভাবধারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে মূল্যায়নের ঊর্ধ্বে রেখেছিল, তারই সময়। এই ভাবাদর্শ মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে সহৃদয় হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই দৃষ্টিকোণ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার উদ্ভব ও বিকাশে অনেকাংশে কাজ করেছে।

।। ইংল্যাণ্ডে টিউকের আন্দোলন ।।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইয়র্কে টিউব আন্দোলন আরম্ভ করেন। জনসাধারণকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিরা অসুস্থ ; তারা শয়তান শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বা অপরাধী নয়। তারা যাতে চিকিৎসার সুযোগ ও মানবিক আচরণ পায়, সেদিকে সমাজের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

।। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা ।।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ভাবধারা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়েও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার ভাবধারা সংহত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাধারায় শিশুর সার্বিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়—তার সমগ্র মানস বৈশিষ্ট্যকে গোচরে রেখে, তার সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষারীতি, পাঠক্রম, সহ-পাঠক্রম প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। কিণ্ডারগার্টেন ও নার্সারী স্কুলে সৃজনশীল ক্রীড়াভিত্তিক ও যৌথ জীবনা-

চরণের জন্য যে ক্রিয়া-কর্মের অবতারণা করা হয়, তার মূল উদ্দেশ্য হল শিশুর মধ্য থেকে আত্মকেন্দ্রিক ভাব বিদূরিত করা ও সামাজিকভাবে চলার শিক্ষা দেওয়া। এর আরও একটা উদ্দেশ্য হল, আত্মপ্রত্যয়, উৎসাহ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন তথ্যের পরিক্রমা ও তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া। নার্সারী বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কার্যক্রমই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সুদৃঢ় ও সুস্থ রাখার জন্য সৃষ্ট। মোটের উপর শিশুকেন্দ্রিক মনোবিদ্যাভিত্তিক শিক্ষা-আন্দোলন মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যাকে একটি প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেকখানি কাজ করেছে।

।। ফ্রএড্-এর চিন্তাধারা ।।

মানসিক রোগের কারণ অনুসন্ধান ও নির্ণয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন সিগমুণ্ড ফ্রএড্। নিজ্ঞান মনের (*Unconscious mind*) শক্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে এবং মানবিক চিন্তা ও আচরণে এর অদৃশ্য প্রভাব বিষয়ে আবিষ্কার ক'রে ফ্রএড্ মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নূতন ফলবতী অধ্যায় যোজনা করেন। তাঁর মনঃসমীক্ষণের ভাবধারাও তাঁর অনুগামী ও পরবর্তী কালে বিরোধী, এড্‌লার ও ইয়ুং-এর মতাদর্শ মনোরাজ্যের অনেক অজ্ঞাত গভীর রহস্যের সন্ধান দেয়। মনঃসমীক্ষণের মননে মানসিক রোগ নিরাময়, মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধ, মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যার এই ত্রিবিধ কার্যাবলী বিজ্ঞানসম্মত ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে মনঃসমীক্ষণ মতবাদের প্রসার ঘটে। পরে আমেরিকাতেও এ মতবাদের বিস্তার ঘটে। ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে উদ্বায়ু-রোগ (*Neurosis*) সম্পর্কে কার্মিক (*Functional*) মতবাদ (অর্থাৎ উদ্বায়ুরোগ মনের ক্রিয়া-কর্মের বিকৃতিহেতু সৃষ্ট, দেহজ কোন কারণে নয়) বিশেষ ক'রে মনঃসমীক্ষণ-মূলক মতবাদ সমধিক প্রচলিত হয়। ফ্রএড-এর মতে, মনের কার্যকারিতা অনুসারে মনকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়—'ইড্, ইগো' ও 'সুপার ইগো'। 'ইড্' হচ্ছে মনের অন্ধ কামনা-বাসনার আবাসস্থল বা একে বলা যায় প্রাবৃত্তিক সত্তা ; এই প্রাবৃত্তিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে নিজ্ঞান মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত। মনের এই অংশটি সুখান্বেষণে (*Pleasure Principle*) নিয়ত কর্মমুখর। 'ইগো' বা বাস্তব সত্তা, মনের এই অংশটির কিছুটা অবচেতন মনের মধ্যে থাকে, বেশীর ভাগই থাকে চেতন মনে ; এর কাজ হল প্রাবৃত্তিক সত্তার কার্যাবলীকে বাস্তবানুগ করা। 'সুপার ইগো' বা বিবেক সত্তা, এর অবস্থিতি বেশীর ভাগই নিজ্ঞান মনে, কিয়দংশ চেতন মনে ; এর কাজ হল বিবেকাদর্শে প্রাবৃত্তিক সত্তার ক্রিয়া-কর্ম নিয়ন্ত্রিত করা। প্রাবৃত্তিক মন, বাস্তব মন ও বিবেক মন এদের সকলেরই অধিষ্ঠান কম বেশী অবচেতন মনের মধ্যে, অর্থাৎ মনের সেই অংশে, যে অংশের কার্যকলাপ ব্যক্তির চেতন অবগতির মধ্যে নেই। ফ্রএডের মতে এই তিনের সুসমঞ্জস ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্য নিহিত। এদের ক্রিয়াকলাপের অসংগতিই মানসিক রোগের কারণ।

১৯১৮ সালে একদিকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে ক্লিফোর্ড বীয়ার্স-এর সার্থক

নেতৃত্বে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আন্দোলনের সংহতি ঘটে এবং আমেরিকায় মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের বিশেষ প্রভাব ঘটে।

॥ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আন্দোলন (১৯০৮) ॥

১৯০০ সালে চব্বিশ বৎসরের যুবক ক্লিফোর্ড বীয়ার্স পাঁচতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার নিষ্ফল প্রয়াস করে। বিচারক তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক মানসিকতা ও আচরণের জন্য তাঁকে মানসিক রোগীদের আবাসস্থলে প্রেরণ করেন। নির্মম ব্যবহার ও উদাসীনতার মধ্য দিয়ে তিন বৎসর তিনি বিভিন্ন উন্মাদাবাসে কাটান। ১৯০৮ সালে বীয়ার্স নিজ চেষ্টায় সুস্থ হয়ে তাঁর আত্ম-চরিত লেখেন। এতে তিনি এইসব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। এর পর থেকেই এ ধারণা আসে যে, শিশুর পরিণমন-কালে (*Maturation time*) যদি মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহ'লে পরবর্তী কালে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর তার একটা প্রভাব থাকে—এ থেকেই *Child guidance* বা শিশু-নির্দেশনার ধারণা আসে। এ্যাডলফ্ মেয়ার নামে একজন বিখ্যাত মনশ্চিকিৎসক বীয়ার্সকে এ বিষয় নিয়ে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন ও তিনি মনে করেন যে, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সুনিয়ন্ত্রিত গবেষণা করা প্রয়োজন এবং এর জন্য একটি নতুন বিজ্ঞান বিষয়ের সৃষ্টি সমীচীন। তিনি এই বিজ্ঞানের নামকরণ করেন মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বা *Mental Hygiene* এবং এই আন্দোলনকে বলা হয় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আন্দোলন বা *Mental Hygiene Movement.*

॥ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা-বিষয়ক প্রথম সংস্থা (১৯০৯) ॥

এই আন্দোলনের ফলে আমেরিকার কনেক্টিকাট্ শহরে প্রথম মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা সংক্রান্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ১৯০৯ সালে এ বিষয়ে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান (*National Committee for Mental Hygiene*) স্থাপিত হয়। মানসিক রোগ যে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যা, এ বিষয়ে আমেরিকার জনসাধারণকে সজাগ করার জন্য এ সংস্থা কাজ করে। মানসিক রোগীদের জন্য আরও চিকিৎসাগার স্থাপন ও এর কার্যাব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য সংস্থার কার্যনির্বাহক সমিতি উদ্যোগী হন। ক্রমে এই সমিতি মানসিক বৈকল্য ও বিকৃতি প্রতিরোধ ও মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে অধিক জোর দেন। সমিতির সভ্যগণ উপলব্ধি করেন যে, বিংশ শতাব্দীর জীবনধারার মধ্যে এমন অনেক অস্থিরতা ও নিরাশ্রয়তা আছে যা আবেগ-জীবনের (*Emotional life*) প্রশান্তিকে ব্যাহত করে।

॥ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক প্রথম আইন (১৯৪৬) ॥

১৯৪৬ সালে আমেরিকায় প্রথম জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য-আইন প্রণীত হয়। মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা বলে এই আইনে মেনে নেওয়া হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি ও যত্ন নেওয়াই মানসিক

স্বাস্থ্যবিদ্যার একমাত্র কাজ নয়—মানসিক ব্যাধির প্রতিরোধ এবং নিরাময়ও এর কাজ। মানসিক রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় যে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব—এ সত্যকে যথার্থভাবে গ্রহণ করা হয়। আরও একটি আইনের দ্বারা মানসিক রোগ বিষয়ে সুনিয়ন্ত্রিত গবেষণা-কার্য এবং এই গবেষণা-উৎসারিত যে সত্য, তা যথাযথ-রূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্য আর্থিক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়।

॥ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা-বিষয়ক সংস্থা (১৯৪৯) ॥

মানসিক স্বাস্থ্য-অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যকর নিয়ম প্রণালীর অবগতি ও তাদের প্রতি-পালনে জনসাধারণকে সহায়তা করার জন্য ১৯৪৯ সালে দুটি কর্মবিভাগ স্থাপিত হয়। প্রথমটি শিক্ষা-বিষয়ক বিভাগ, দ্বিতীয়টি রাষ্ট্র ও স্থানীয় বিষয়ক বিভাগ। এ দু'টি বিভাগেরই কাজ হল জনসাধারণের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার মূল নীতির প্রচার ও প্রসার করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সংস্থার সুপ্রতিষ্ঠা করা।

বর্তমানে এই সমিতির প্রধান প্রধান কার্যক্রমের কয়েকটি ধারা নিম্নে দেওয়া হল :

॥ **ক** ॥ মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা ও তার জন্য অর্থ সংস্থান।

॥ **খ** ॥ মনশ্চিকিৎসার সুবিধার্থে রোগ-সংলক্ষণগুলি (*symptoms*) প্রথম পর্যায়ে চেনার জন্য গবেষণা-কার্যে সহায়তা করা।

॥ **গ** ॥ সমাজ-স্বাস্থ্যরক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে বিপথগামী শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন ও তার পরিচালনা বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করা।

॥ **ঘ** ॥ মানসিক চিকিৎসাগারকে সাহায্য দান ও এগুলিকে যথার্থ মানে উন্নীত করতে সাহায্য করা।

॥ ঙ ॥ বিদ্যালয়ে, শিল্পাগারে, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলিতে মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা আছে, তার যথাযথ ব্যবহারে প্রেরণা দেওয়া।

॥ **চ** ॥ মানসিক বিকাশ রুদ্ধ ব্যক্তিদের পরিচর্যা ও তাদের কর্মে পুনর্বাসন।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

ফরাসী বিপ্লব→	১৭৯২, ফরাসী বিপ্লব ডঃ ফিলিপ পিসেল উন্মাদ ও মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের শৃংখল বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন—শয়তান অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।
ইংলণ্ডের টিউকের আন্দোলন→	টিউকের আন্দোলন সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন।
শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা→	শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রতিটি শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশই লক্ষ্য।
ফ্রএড্-এর চিন্তাধারা→	১। ফ্রএড্ নির্জ্ঞান মন মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়। ২। মনের গঠন—মনের রোগ মানসিক কারণে হয়। ৩। উক্ত-প্রাবৃত্তিক সত্তা, ইগো—বাস্তব সত্তা, সুপার ইগো ; বিবেক সত্তা—

	এদের সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের ফলে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য থাকে।
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আন্দোলন (১৯০৮)→	বীয়ার্স নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আত্মচরিত লেখেন—শিশুর পরিণমন কালে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ—শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে—শিশু নির্দেশনার ধারণাও এর থেকে আসে।
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা-বিষয়ক প্রথম সংস্থা (১৯০৯)→	মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রথম সংস্থা মানসিক রোগ যে একটা জাতীয় সমস্যা এ বিষয়ে জনসাধারণকে সজাগ করে।
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা-বিষয়ক প্রথম আইন (১৯৪৬)→	সামাজিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রথম আইন (১৯৪৬)—মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা একটি জাতীয় সমস্যা, এটা আইনসিদ্ধ হয়।
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা-বিষয়ক সংস্থা (১৯৪৯)→	১। ১৯৪৯ সালে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আরও একটি সংস্থা স্থাপিত হয়—এতে শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ ও রাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ থাকে। ২। রোগ-কারণ নির্ণয়—শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র, মানসিক চিকিৎসালয়কে সাহায্য দান করা।

॥ অনুশীলনী ॥

1. **Trace the developmental history of the Mental Hygiene Movement.**
2. **How did the modern trends in Education help the emergence of the concept of Mental Hygiene?**

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুর মৌলিক চাহিদা, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

[Basic needs of Children, Mental Health & Education]

।। চাহিদাজাত প্রেষণা ।।

বাঁচার জন্য আমাদের কতকগুলি প্রয়োজন মেটাতে হয়—প্রয়োজন ঠিকভাবে না মিটলে অস্তিত্ব বিষণ্ণ, বিশীর্ণ ও বিপন্ন হয়। বেঁচে থাকার জন্যই সতত কর্মপ্রয়াস। কাজ করার ইচ্ছা উদ্গত হয় অভাব-বোধ থেকে—শূন্যতাই সর্বদা আমাদিগকে পূর্ণতার অভিমুখী ক'রে তোলে। আমাদের অস্তিত্বের জন্য যা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, এমন সব প্রয়োজনকে মেটাবার জন্য যে তাড়না অনুভব করা যায়—এই তাড়নাই পরিণামে প্রাণীকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। অনেকক্ষণ খাবার না পেলে, আমরা একটা অস্বস্তি অনুভব করি। এই অস্বস্তি ধীরে ধীরে এমন তীক্ষ্ণ হয় ও এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে, যখন আমরা খাদ্যের সন্ধান না ক'রে পারি না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, খাদ্যের অভাববোধ থেকে অস্বস্তি ও উত্তেজনা, যাকে আমরা এক্ষেত্রে বলব ক্ষুধা, এবং এই অস্বস্তিই আমাদিগকে খাদ্য-অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। (*Need* বা চাহিদাকে বলা যায় কোন বস্তু বা ক্রিয়ার অভাব বা কম্‌তিকে, যে বস্তু বা ক্রিয়া সুস্থ জীবনের জন্য অপরিহার্য।) প্রেষণা (*Motivation*) কতটা তীক্ষ্ণ হবে সেটা নির্ভর করবে অভাববোধের তীক্ষ্ণতার উপর।

।। সমালোচনা ।।

এ সত্য সর্বদা ঠিক নয়। যদিও চাহিদাই প্রেষণার উৎস, তবু এ সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ আছে। কেবল চাহিদাই প্রেষণার উৎস কিনা, এ বিষয়ে প্রথম অভিযোগ যে, কর্মপ্রেষণার প্রবলতা চাহিদার প্রবলতায় সমানুপাতিক নয়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, একটি ইঁদুরকে চারদিন যদি খেতে না দেওয়া হয়, তাহলে খাদ্যের জন্য তার যে কর্মতৎপরতা, পাঁচদিনে, ছ'দিনে বা আরও বেশী দিন না খাইয়ে রাখলে কর্মতৎপরতা সমানে বেড়ে না গিয়ে তা কমতে থাকে। নীতিগতভাবে আরও একটা অভিযোগ আছে। অভাব সর্বদাই একটা নঞর্থক ঘটনা। সব প্রচেষ্টার মধ্যে যে বেগ ও শক্তির প্রয়োজন সেটা কেবলমাত্র কোন কিছুর অভাববোধ থেকেই উৎসারিত হতে পারে না।

।। প্রেষণা ও উদ্দীপক ।।

উদ্দীপক (*Stimulus*) একটি এমন শক্তি যা দেহের বিভিন্ন অংশকে বা সামগ্রিক-ভাবে দেহকে উদ্দীপ্ত করে এবং এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে কর্মস্পৃহা দেখা দেয়। উদ্দীপকই সাড়ার উদ্রেক ঘটায় এবং সেইজন্য প্রেষণার সঙ্গে উদ্দীপকের একটা সম্বন্ধ আছে।

একটি শিশুকে যদি পিন্ দিয়ে জোরে খোঁচা দেওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির মধ্যে কতকগুলি আচরণ দেখা দেয়। শিশুটি হাত পা ছুঁড়বে, চীৎকার করবে, এই উদ্দীপক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য শিশুটি প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এই বিপদ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশুটিকে কেউ রক্ষা করছে, ততক্ষণ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকবে। এ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, উদ্দীপকই শিশুটির মধ্যে কর্মে-প্রেরণার সৃষ্টি করছে। কেননা এ উদ্দীপক শিশুটিকে কর্মে উদ্দীপ্ত করছে ও কর্মে অনেকটা সময় নিরত রাখছে। এই ধরনের প্রেষণাকে বহির্জাত প্রেষণা বলা যেতে পারে। কেননা, এদের বেলায় বাইরের উদ্দীপক কাজ করে। অন্তর্জাত প্রেষণা যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা আরও জটিল প্রকৃতির। এসব ক্ষেত্রে উদ্দীপক অন্তর্জাত—এবং প্রকৃতিতে রাসায়নিক যা স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীল কোষের উপর কাজ ক'রে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। মোটের উপর **চাহিদা ও উদ্দীপক উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রেষণা বা কর্ম-প্রেরণার উদ্গতি ঘটে।**

উদ্দেশ্য (*motive*) বলতে আমরা কি বুঝি? বস্তুত: উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করা সহজ নয়। উদাহরণ দিয়ে উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। খাওয়ার ইচ্ছা ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা, এ দুটি ইচ্ছার দু'টি উদ্দেশ্য। যে কোন উদ্দেশ্যের পিছনেই একটা চাহিদা (*need*) বা অবস্থা (*situation*) কাজ করে, এ থেকে একটি অস্বস্তির (*tension*) উদ্ভব হয়। এই অস্বস্তি থেকেই আচরণ আসে এবং সঙ্গতি-সাধনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এর পরিণতি ঘটে। যে কোন উদ্দেশ্যের (*motive*) ধারণার মধ্যেই এই চারটি ধারণা বর্তমান থাকে। একটা ছকে আমরা সকল ঘটনাকে দেখাতে পারি—

চাহিদা
অন্তর্জাত ↓ ↑ বহির্জাত
উদ্দীপক
↓
অস্বস্তি
↓
কর্মপ্রেষণা
↓
দেহ-মনে ভারসাম্য আনয়নের জন্য আচরণ

চাহিদা, অস্বস্তি, কর্মপ্রেষণা—এ সমস্ত পর্যায়গুলিই একের সঙ্গে অপরে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। চাহিদা হল একটা স্থাণু অবস্থা, কিন্তু কর্মপ্রেষণা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, অস্বস্তি (*tension*) হল একটা অনুভূতি। সাবিক ঘটনার কোন্‌টির উপর জোর দেওয়া হবে তার উপর নির্ভর করে, এই সামগ্রিক ঘটনার কোন্ পর্যায়টির নাম করা হবে। যেমন, যখনই বলব ব্যক্তির মধ্যে কোন কিছুর চাহিদা আছে, তখনই বুঝতে হবে চাহিদাজনিত একটা অস্বস্তি আছে এবং অস্বস্তি থেকে দেহ-মনকে সাম্যভাবে

(*Homeostasis*) ফিরিয়ে আনার জন্য একটা কর্মপ্রেষণা আছে। আবার কর্মপ্রেষণা শব্দটি ব্যবহার করলেও বুঝতে হবে চাহিদা বা উদ্দীপকের কথা, অস্বস্তির কথা। কাজেই চাহিদা—অস্বস্তি—কর্মপ্রেষণা, এরা একক বা বিচ্ছিন্ন কোন কিছু নয়—একই ঘটনার বিভিন্ন পর্যায় মাত্র।

॥ চাহিদার প্রকার ॥

দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দৈহিক কতকগুলি মৌলিক চাহিদা আছে। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক কতকগুলি চাহিদা আছে। বিভিন্ন মনোবিদ্ এই মৌলিক চাহিদার বিভিন্ন প্রকারের কথা বলেছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য যেহেতু সার্বিক, সেইহেতু মৌলিক চাহিদার দৈহিক, মানসিক, এরূপ ভাগ বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। বোঝার সুবিধার জন্য এরূপ ভাগ করা হয়েছে মাত্র।

॥ দৈহিক চাহিদা ॥

দৈহিক চাহিদা দেহের অস্তিত্ব ও সুস্থতা রক্ষার জন্য অনিবার্য। শিশুর জন্মক্ষণ থেকেই তার খাদ্য, যথার্থ আশ্রয়, উন্মুক্ত বায়ু ও যথাযথ তাপমাত্রা প্রভৃতি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। ভৌতিক পরিবেশের (*physical environment*) সঙ্গে সার্থক প্রতিযোজনের জন্য দৈহিক চাহিদার পরিপূরণ একান্তভাবে প্রয়োজন। এই চাহিদাগুলি জন্মগত, মৌলিক ও প্রায় সর্বজনীন। এইসকল চাহিদাজনিত যে আচরণ, তাও সকল ব্যক্তির মধ্যে প্রায় একই রকম ভাবে পরিলক্ষিত হয়। শৈশবের প্রায় সকল আচরণের উৎস বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত দৈহিক চাহিদাগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়:

(ক) **খাদ্যের চাহিদা**
(খ) **আশ্রয়ের চাহিদা**
(গ) **যথাযথ পোষাক-পরিচ্ছদের চাহিদা**
(ঘ) **অস্তিত্ব বিপন্নকারী কোন অবস্থা থেকে মুক্তির চাহিদা**
(ঙ) **নিদ্রার ও বিশ্রামের চাহিদা**
(চ) **উপযুক্ত আলো ও নির্মল বায়ুর চাহিদা**
(ছ) **যথাযথ তাপমাত্রার চাহিদা**

॥ মানসিক চাহিদা ॥

দৈহিক অস্তিত্বই মানুষের সবটা নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মূলতঃ সমাজ-জীবন যাপনের জন্য মানুষের মধ্যে একটা মৌল চাহিদা রয়েছে। নিঃসঙ্গ ও সম্পূর্ণ একাকী জীবনযাপন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল জৈবিক জীবন-যাপনেই মানুষের জীবন-সীমা সীমিত থাকে না, পরিব্যাপ্তি (*expansion*) মানব জীবনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজ-জীবনের কতকগুলি মৌল চাহিদা রয়েছে—এ চাহিদাগুলিকে মানসিক চাহিদাও বলা যেতে পা'রে। অহংবোধকে পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করার জন্য যে চাহিদা রয়েছে,

সেগুলোকে বলা হয় মানসিক চাহিদা—যেমন **আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা, আত্ম-বিকাশের চাহিদা, ভালোবাসা পাওয়ার চাহিদা, অপরকে ভালোবাসার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা।** মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেইজন্য প্রত্যেক মানুষকেই প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে হয়। মানুষ বন্ধু চায়, প্রশংসা পেতে চায়, বিশ্বস্ততা, সম্মান, নেতৃত্ব পেতে চায়। এদিক্ থেকে তার কতকগুলো সামাজিক চাহিদাও রয়েছে।

মানুষের কতকগুলো বুদ্ধিগত চাহিদাও রয়েছে, যেমন মানুষ নতুন কিছু জানতে চায়, বুঝতে চায় সংগঠন করতে ও বিচার করতে চায়, সর্বোপরি মানুষ মননশীল হতে চায়।

॥ চাহিদার পর্যায়ভেদ ॥

মাস্‌ল্-এর মতে মানুষের চাহিদার কতকগুলি বিন্যাস বা পর্যায় আছে। তার সমস্ত কর্ম-প্রেরণা বা প্রেষণা (*motivation*) এই চাহিদার ক্রম-বিন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। মানুষের চাহিদাগুলির পর্যায়ক্রম হ'ল নীচের তলায় থাকে জৈবিক চাহিদা আর একবারে উপরে থাকে আপন শক্তির সম্পূর্ণ প্রকাশ ও পরিণতি লাভের চাহিদা। নীচের তলার অর্থাৎ জৈবিক চাহিদার পরিপূরণের জন্য যে কর্মপ্রয়াস, সেটাই মানুষের প্রথম পর্যায়ে কাজ করে—প্রাথমিক স্তরের চাহিদা যদি না মেটে, তাহলে আপন শক্তির সম্পূর্ণ পরিণতির জন্য প্রয়াস প্রাণলাভ করতে পারে না, যথার্থভাবে স্ফুরিত হয় না। সেইজন্য মানুষের খাদ্য ও আত্মরক্ষার চাহিদা যদি না মেটে, তার পরবর্তী চাহিদা-গুলি মেটাবার প্রয়াস যথাযথ হ'য়ে উঠতে পারে না। সেজন্য এ দু'প্রকারের চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষের কর্মপ্রয়াসে একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। মানুষ যদি কেবল তার জৈবিক চাহিদা পরিপূরণেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাহ'লে মানুষের মধ্যে যে বৃহত্তর পরিপূর্ণতার ও পরিণতি-লাভের চাহিদা রয়েছে, তা আবদ্ধ হয়ে মৃত্যু লাভ করে; মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। সেইজন্য মানুষের কর্মপ্রেষণার রূপ নিম্নপ্রাণীদের কর্মপ্রেষণার রূপ থেকে ভিন্নতর। বহু মানুষের জীবনে এমন ঘটনা দেখা যায় যে, প্রবল দারিদ্র্য ও অত্যাচারের মধ্যে থেকেও বৃহত্তর মূল্যবোধকে বিসর্জন দেন না। সেইজন্যই বলতে হয়, মানুষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আশ্রয়, খাদ্য বাসস্থানের প্রাথমিক চাহিদাই সব নয়—তার পরিপূর্ণতা, তার সার্বিক পরিণতির জন্য প্রয়াস মানুষকে তাড়িত করে, কর্মোদ্যোগকে প্রেরণা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই হেল্‌সন্ বলেছেন, *"The satisfaction of so-called basic needs is necessary but not sufficient for a full and truly satisfying life".*

॥ বয়স ও চাহিদা ॥

সকল চাহিদা ও চাহিদাজনিত কর্মপ্রেষণা সব বয়সে এক প্রকার থাকে না। কোন্ চাহিদা কোন্ বয়সে কতটা তীক্ষ্ণ ও কার্যকরী থাকে, তা দেখার জন্যে স্যানফোর্ড প্রমুখ মনোবিদদের বিশেষ গবেষণা এ বিষয়ে নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছে।

যত্নলাভ ও রক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা পাঁচ ছয় বৎসরে যেরূপ প্রবল থাকে, তেরো চৌদ্দ বৎসরে এ চাহিদা ততটা প্রবল থাকে না, এ সময়ে এ চাহিদা অনেক পরিমাণে কমে যায়। নতুন কিছু জানার ইচ্ছা এ সময়ে কমে গেলেও, কোন ঘটনা কেন হয়, এর কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের ইচ্ছা বেড়ে যায়। বন্ধুলাভের ইচ্ছা সব বিষয়ে কম-বেশী সমান থাকে। স্বাধীনতার চাহিদা, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার চাহিদা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে।

॥ চাহিদা ও কর্মপ্রেষণা ॥

এই প্রেষণাগুলো যত শক্তিশালী হতে থাকে, তত ব্যক্তির ভিতরে ভিতরে অস্বস্তির (*tension*) সৃষ্টি করে। এই অস্বস্তি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যে, এ প্রেষণা-শক্তিকে কার্যের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত না করলে দেহে ও মনে ব্যক্তির সাম্যভাব ফিরে আসে না। কোন শিশু মাতাপিতার একান্ত মনোযোগ ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে যদি দেখে যে, তার নবজাত ভ্রাতা বা ভগ্নীর দিকে বাবা মা'র মনোযোগ ও ভালোবাসা সরে গেছে, তাহলে সে একটা অস্বস্তি বোধ করে—তার মানসিক এই চাহিদাটি নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে সে তার হৃত ভালবাসাকে ফিরে পাওয়ার জন্য ও পিতা-মাতার মানোযোগকে আকৃষ্ট করার জন্য নানারূপ প্রয়াস করতে থাকে। যদি তার প্রয়াস তাকে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, তাহলে তার অস্বস্তি ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

জীবনে সব ইচ্ছা পূরণ হয় না। সব চাহিদা সমানভাবে মেটে না, চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু পাওয়া যায় না। কাজেই অস্বস্তি ও উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার চেয়ে ক্রমে তা বেড়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অস্বস্তি থাকে, ব্যক্তি আবেগ-প্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে। তার অহং সত্তা সন্তুষ্টি চায়, কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতা এই সন্তুষ্টি লাভে বাধা দেয়। যেমন, বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র তার সহপাঠীদের কাছ থেকে সামাজিক স্বীকৃতি পেতে চায়—কিন্তু এ চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্ভব হচ্ছে না, তার পিতামাতার দারিদ্র্য ও সামাজিক স্থান, তার বড় ভাইয়ের বিদ্যালয়ে পরীক্ষার খারাপ ফল এবং নিজের অপুষ্ট দুর্বল দেহ তার সামাজিক স্বীকৃতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার এই চাহিদা দিনের পর দিন যতই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, ততই তার ব্যর্থতা বোধ বেড়ে যাচ্ছে। অবশেষে সে অপরাধপ্রবণ ছেলেদের দলভুক্ত হয়ে নানা-প্রকারের দুষ্ক্রিয়া ও অপকর্মের মধ্যে সন্তুষ্টির ও আত্ম-স্বীকৃতির উপায় খুঁজে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন চাহিদা যদি স্বাভাবিক ও সুস্থ পথে পরিতৃপ্ত না হয়, তাহলে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক আচরণ ও বিকৃতি দেখা দেয়—মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। এমনিভাবে দেখা যাবে যে, যে সময়ের যে চাহিদা তা যদি যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত না হয়, তা হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক ধারায় ঘটে না, বিকৃতি ও বিচ্যুতি নানাভাবে দেখা দেয়।

॥ মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য ॥

চাহিদা	চাহিদা
↓	↓
অস্বস্তি	অস্বস্তি
↓	↓
কর্মপ্রেষণা	কর্মপ্রেষণা
(অনুকূল পরিবেশ)	**(প্রতিকূল পরিবেশ)**
↓	↓
পরিমিত পরিতৃপ্তি	চাহিদা-পূরণে ব্যর্থতা
↓	↓
মানসিক স্বাস্থ্য	দ্বন্দ্ব
↓	↓
সার্থক সঙ্গতি (*Adjustment*)	দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা
	↓
	মানসিক স্বাস্থ্যহানি
	↓
	অপসঙ্গতি (*Mal-adjustment*)

প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় এবং প্রত্যেকের মধ্যে আগে হোক পরে হোক, কোন না কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটে, যা এই ব্যর্থতাকে সহ্য করার ক্ষমতা দেয়। প্রতিযোজন বা সঙ্গতিসাধন বলতে যা বোঝায়, তা মূলতঃ ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে গিয়ে প্রতিক্রিয়া, যে প্রতিক্রিয়া এই ব্যর্থতাবশতঃ অস্বস্তিকর অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে বা সেই অবস্থার অস্বস্তিকে পেরিয়ে যেতে সাহায্য করে। সকল ব্যর্থতার মধ্যে যে বিষণ্ণ মানসিকতা দেখা দেয়, তাকে দূর করার জন্য ব্যক্তি নানাভাবে সচেষ্ট হয়।

ব্যর্থতার মধ্যে একটা অসহায়ভাব, হতাশা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ভাব থাকে। কোন কর্মপ্রেষণা বাধাপ্রাপ্ত হলে মনের মধ্যে এই অপ্রীতিকর ভাব আসে। এইসব জটিল অনুভূতির সঙ্গে থাকে একটা অনিশ্চয়তা, যে অনিশ্চয়তা পরবর্তী পর্যায়ে কি করবে, সে সম্পর্কে ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তোলে। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব সৃষ্ট হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন কর্মপ্রেষণায় প্রতিবন্ধ ব্যর্থতার সৃষ্টি করে, এই ব্যর্থতা নিয়ে আসে একটা উত্তেজনা বা অস্বস্তি—অস্বস্তি থেকে আসে অভিযোজন-প্রয়াসী প্রতিক্রিয়া।

প্রায় সকল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উৎস মানবিক মৌলিক চাহিদা। ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা ও তার পরিতৃপ্তির মধ্যে সর্বদাই একটা ফাঁক থাকে। চাহিদা ও তার পরিতৃপ্তি অচ্ছেদ্য নয়। এই চাহিদার পরিতৃপ্তি যদি যথার্থ কর্মপ্রেষণার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘটে, তাহলেই সার্থক সঙ্গতিবিধান সম্ভব হয়। যদি এই চাহিদার পরিতৃপ্তির পথে বহির্জাত বা অন্তর্জাত কোন বাধা আসে, তাহলে ব্যক্তির স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধান বিঘ্নিত

হয়—বিকৃতভাবে সঙ্গতিবিধানের একটা অপচেষ্টা (*pseudo adjustive behaviour*) শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রের মধ্যে আত্মস্বীকৃতির চাহিদা দেখা যাচ্ছে। এই স্বাভাবিক চাহিদা বিদ্যালয়ের অসুস্থ পরিবেশের জন্য পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। এমন হতে পারে যে, কোন ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা এত বেশী যে, শিক্ষকদের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না,—বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-প্রথা এত বিশৃঙ্খল যে, কোন ছাত্র যদি যথাসাধ্য পরিশ্রম ক'রে অধীত বিষয়ে ভাল পরীক্ষাও দেয়—পরীক্ষকের ত্রুটির জন্য শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য বিচার হয় না, বা তার আত্ম-শক্তির স্বীকৃতির কোন সুযোগই ঘটে না ; এমনও হতে পারে যে, পারিবারিক আর্থিক অনটনের জন্য শিক্ষার্থীকে পড়া ছেড়ে দিতে হল—এইভাবে বহির্জাত কারণের জন্য চাহিদার অতৃপ্তি ঘটতে পারে—আবার অন্তর্জাত কারণের জন্য যেমন শিক্ষার্থীর অসুস্থতা, যা তাকে অকেজো ক'রে ফেলল, যার ফলে পরিপূর্ণ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সে সাফল্য-লাভ ও আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা পূরণ করতে পারল না। বহির্জাত কারণেই হোক বা অন্তর্জাত কারণেই হোক, মৌলিক চাহিদা পূরণে অতৃপ্তি ঘটলে ব্যক্তি সঙ্গতিবিধানের জন্য নানারূপ অপচেষ্টা করবে। এইভাবেই ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। যেমন, শিক্ষার্থীটির ক্ষেত্রে, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা পরিতৃপ্ত না হলে, সে তার অতৃপ্তিজনিত যে ক্ষোভ, তা প্রকাশ করার জন্য নানারকম অস্বাভাবিক আচরণ করবে, যেমন সামাজিক নিয়ম-কানুন-গুলো ভেঙ্গে ফেলা, তাকে অমান্য করা প্রভৃতি। এই অস্বাভাবিক উপায়ে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলকে সচেতন ক'রে তোলার অপপ্রয়াস করবে। বিদ্যালয়ে মারধর করা, সহপাঠীদের বইপত্র চুরি করা, শিক্ষককে অপমানিত করা, গৃহ বা বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যামূলক আচরণ তার মধ্যে দেখা দেবে।

॥ গৃহপরিবেশ, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য ॥

জন্মাবার পর শিশু তার মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য তার পিতা-মাতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকে। খাদ্য, পরিধান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তার পিতা-মাতাই সংগ্রহ ক'রে থাকে। এই সব দৈহিক চাহিদার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, এই সময়ে মানসিক চাহিদারও পরিপূরণ ঘটাতে হয়। খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুসম্ভার পরিবেশন করলেই শিশুর সব চাহিদা মেটানো হয় না—শিশুর প্রতি পিতামাতার আচরণ প্রতিন্যাস, প্রযত্ন-পদ্ধতি, স্নেহ-ভালবাসা শিশুর মানস-চাহিদা মিটিয়ে থাকে। মাতৃস্তন্য পান ক'রে শিশু তবে দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করে—কিন্তু মাতৃস্তন্য পানের সময় শিশু যদি মার ভালবাসাভরা উজ্জ্বল মুখখানি দেখতে না পায়, তাহলে শিশুর মন ভরে না। মা যদি খাদ্যদানে ও অন্যবিধ আচার-আচরণে শিশুকে সর্বদা প্রত্যাখ্যানের ভাব দেখায়—যদি মাতাপিতা শিশুর মৌলিক চাহিদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে বা অস্বাভাবিকরূপে যত্নপরায়ণ হন, তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশ সুস্থ ধারায় হয় না। মোটের উপর, শৈশবকালে একদিকে দৈহিক চাহিদার পরিপূরণের জন্য, অন্যদিকে শিশুর নিরাপত্তাবোধ, সুষম ভালবাসা,

আত্মস্বীকৃতি প্রভৃতি মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্যও পিতামাতার ব্যক্তিত্ব, তাদের প্রযত্ন-প্রয়াস, আচার-আচরণ বহুল পরিমাণে দায়ী।

এ ছাড়া মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি সমাজ-স্বীকৃত পথে হওয়া সমীচীন। সমাজ-স্বীকৃত পথে মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য শিশুর শিক্ষা প্রয়োজন—এই শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পিতামাতার। শিশুর মৌলিক চাহিদাজনিত যে কর্মপ্রেষণা, তাকে আত্মকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক পথে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব গৃহে পিতামাতার, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের। এদিক্ থেকে সামগ্রিকভাবে গৃহ ও বিদ্যালয়ের পারিবেশিক প্রভাব যথেষ্ট কাজ করে।

ক্ষুধা পেলে কোন নির্দিষ্ট উপায়ে নবজাত শিশু খাদ্যের সন্ধান করে না। ক্ষুধারূপ অন্তর্জাত উদ্দীপকের জন্য শিশু কোন নির্দিষ্ট ধারায় সাড়া দেয় না। ক্ষুধার্ত শিশু সর্বতোভাবে কর্মপ্রবণ হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তখনও সে বিশেষ কোন ধারায় সঙ্গতি বিধান করতে শেখে নি। অর্থাৎ ক্ষুধা পেলে শিশু কাঁদে, হাত-পা ছোড়ে, কোন অবস্থায় শিশু যদি নিজেকে নিরাপদ বোধ না করে, তাহলেও এ রকম ক'রে থাকে অর্থাৎ কাঁদে, হাত-পা ছোড়ে ইত্যাদি। মোটের উপর শৈশবে মৌলিক চাহিদাজনিত যে কর্মপ্রয়াস, তার সবগুলির প্রকৃতিই প্রায় একপ্রকার। শিক্ষার মধ্য দিয়েই মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির উপায় সুশৃঙ্খল ও সামাজিক হয়। মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি শিশু কি ভাবে করবে, তার শিক্ষা পিতামাতা দেবে। খাদ্যের চাহিদাকে সামাজিক অনুশাসনের পটভূমিতে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শিশু কি খাবে, কতটুকু খাবে, কখন খাবে, এইসব বিষয়ে শিশু ধীরে ধীরে শিখবে ও পিতামাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে অভ্যস্ত হবে। এ ছাড়া শিশুটিরও যে গৃহে ও পরিবারে একটা যথাযোগ্য স্থান আছে, এই বোধ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য পিতা-মাতার আচার-আচরণ এমন হবে যাতে শিশু সর্বদা অনুভব করে যে, এ গৃহ তার ও এ গৃহের কল্যাণ তার কল্যাণ—এই বোধকে তীক্ষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর করার জন্য পিতামাতা শিশুকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী গৃহ-কাজ করতে দিতে পারেন, যা সম্পাদন ক'রে শিশু গৃহের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করতে পারে। এর দ্বারা আত্মস্বীকৃতি, নিরাপত্তাবোধ ও পিতা-মাতার নিকট থেকে স্নেহ-ভালবাসা পাওয়ার চাহিদা পরিতৃপ্ত হতে পারে।

॥ বিদ্যালয়, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য ॥

সকল চাহিদার পরিতৃপ্তি গৃহ-পরিবেশে হওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয়-পরিবেশে অনেক মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে, বস্তুতঃ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ও যথার্থ সমাজী-করণের জন্য বিদ্যালয়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দৈহিক চাহিদাপ্রসূত যে সব প্রেষণা, তাই কেবল শিশুকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে না। আপন অস্তিত্বকে সুস্থভাবে বজায় রাখার জন্য যে সব কর্মপ্রেষণা, তা ছাড়াও সামাজিক কর্মপ্রেষণা আছে। বিদ্যালয়ে এই সব সামাজিক কর্ম-প্রেষণাকে যথার্থভাবে পরিতৃপ্ত করতে হয় এবং এইসব সামাজিক কর্মপ্রেষণাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে শিক্ষার্থীদের

সুস্থ সমাজ-জীবনযাপনে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হয়। বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবেশ ও কর্মধারা এমনভাবে রচনা করতে হবে যে, শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদাগুলির সম্যক পরিতৃপ্তিতে কোন বাধা না আসে। শিক্ষার্থীর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে সচেতন হতে হবে—

।। ক ।। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একদিকে এককভাবে ও অন্য দিকে গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশেষ স্থান পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তার মৌলিক চাহিদা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করতে হবে ও তার চাহিদাজনিত কর্মপ্রেষণাগুলিকে সুস্থ ধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

।। খ ।। এমন পরিবেশে রচনা করতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপিত হবে, যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারবে যে, বিদ্যালয়ে তার একটি যথার্থ স্থান রয়েছে—মোটের উপর শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা ও আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা যাতে যথার্থভাবে পূরণ হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

।। গ ।। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহৃদয় হতে হবে—শিক্ষার্থী যেন এর মধ্য দিয়ে তার ভালোবাসার চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে। শিক্ষার্থী শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে চলবে—যাতে শিক্ষার্থীর আত্মসম্মানবোধের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয়।

।। ঘ ।। শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্বন্ধও যাতে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরস্পর মিলেমিশে বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর ও সুখী সমাজ সৃষ্টি করতে পারে, যাতে ক'রে তাদের বন্ধুত্বের চাহিদা তৃপ্ত হতে পারে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

।। ঙ ।। খেলাধুলা, শিক্ষা-ভ্রমণ, শিক্ষাপ্রদর্শনী ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের প্রবর্তন করতে হবে—এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব-লাভের চাহিদা কোন নেতৃত্বকে মেনে চলার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা প্রভৃতি পরিতৃপ্ত হতে পারে। এছাড়া খেলাধুলা, সংগঠনমূলক কাজ, সংগীত, সাহিত্যচর্চা, অভিনয়, অঙ্কন, বক্তৃতা প্রভৃতি সহ-পাঠক্রমিক কাজে উৎকর্ষ দেখিয়ে শিক্ষার্থী আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা, আত্ম-প্রকাশের চাহিদা নূতনকে জানার চাহিদাও পরিতৃপ্ত করতে পারে।

।। চ ।। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার চাহিদা যেন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত না হয়। বিদ্যালয়ের কল্যাণকর ছোট ছোট কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলে শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দিলে শিক্ষার্থী সে স্বাধীনতার অপচয়-করে না; কঠোর শাসন, নিয়ত আরোপিত নির্দেশদান—শিক্ষার্থীর প্রতি কার্যে ও চিন্তা-প্রবাহে বাধাদান শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার চাহিদাকে অপরিতৃপ্ত রাখে—ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়, সুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

।। ছ ।। পাঠক্রম হবে বয়স-উপযোগী, প্রত্যেক বয়সের যে চাহিদা তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, এমন পাঠক্রম নির্ধারণ করতে হবে। মৌলিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে

এবং বয়ঃক্রম অনুসারে চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম নির্ধারিত হবে।

॥ জ ॥ শিক্ষণ-পদ্ধতি বয়ঃক্রমানুসারী হবে—বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-পদ্ধতি এমন হবে যাতে শিক্ষক উপর থেকে তথ্যভার চাপিয়ে না দেন—শিক্ষার্থী যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় হবার সুযোগ পাবে—আপন চিন্তা-শক্তিকে ব্যবহার করবে, নিজে নিজে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করবে। সমস্ত পাঠন-পদ্ধতি একটা লক্ষ্যে বিধৃত থাকবে। মোটের উপর, বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতি এমন হবে, যাতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার চাহিদা স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও নূতনকে জানার চাহিদা, একটা বিশেষ লক্ষ্য সম্মুখে রেখে কাজ করার চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে।

॥ ঝ ॥ শিশুর মধ্যে সাফল্য লাভের চাহিদা ও কর্তৃত্ব করার চাহিদাজনিত যে কর্মপ্রেষণা, তাকে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে নেতৃত্ব, পাঠ্যবিষয়ে অধিকতর সাফল্যের প্রয়াস, সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে যোগদানের ঐকান্তিক আগ্রহ, সদ্যভাস অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বলাভের চাহিদা আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সাফল্যলাভের চাহিদাজনিত যে কর্মপ্রেষণা, তাকে শিক্ষক শিক্ষা-কাজে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে পারেন।

॥ ঞ ॥ নবযুবকালে স্বাধীনতার চাহিদা, আত্ম স্বীকৃতির চাহিদা, সমাজ-জীবনের চাহিদা, যৌন তৃপ্তির চাহিদা তীক্ষ্ণভাবে দেখা দেয়। শিক্ষকদিগকে এই সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আচরণ করতে হয়—তাদের উপর কিছু জোর ক'রে চাপিয়ে না দিয়ে তাদের স্বাধীন যুক্তিধর্মী চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের স্বেচ্ছায় কোন কিছু গ্রহণ-বর্জন করায় শিক্ষকগণ সাহায্য করবেন; সমাজ-জীবনে চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য এই সময়ে বিদ্যালয়ে দলগত ও সংগঠনমূলক নানারূপ কর্মকাণ্ডের প্রবর্তন করবেন। শিক্ষা-ভ্রমণ, সমাজসেবামূলক কর্মানুষ্ঠান, বিদ্যালয়ে শিল্প-প্রদর্শনী শিক্ষা-মূলক বিভিন্ন যৌথ আলোচনা-চক্র, প্রাচীরপত্র পরিচালনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের চাহিদা অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হতে পারে। যৌন চাহিদাকে এই সময়ে শিক্ষিত ও মার্জিত ক'রে তুলতে হয়। শিল্প-চর্চা, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, বিভিন্ন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, উপন্যাস পাঠ, ভাল গল্প ও কবিতা পাঠ ও সমাজ-উন্নয়নমূলক ছাট ছোট কাজ যৌন-শক্তির উদ্গাতিতে সাহায্য করে।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

চাহিদাজাত প্রেরণা→	চাহিদা পূরণের প্রয়াস থেকেই প্রেষণার জন্ম হয়।
সমালোচনা→	১। কর্মপ্রেষণার প্রবলতার চাহিদার প্রবলতার সমানুপাতিক নয়। ২। কেবলমাত্র অভাবই কর্মপ্রেষণার উৎস হতে পারে না।

প্রেষণা ও উদ্দীপক→ ১। যথাযথ উদ্দীপকই সাড়ার উদ্রেক করে। ২। বহির্জাত প্রেষণা। ৩। অন্তর্জাত প্রেষণা। ৪। চাহিদা একটি স্থানু অবস্থা, প্রেষণা-গতিশীল প্রক্রিয়া।

চাহিদার প্রকার ঃ

দৈহিক চাহিদা→

মানসিক চাহিদা→ ১। মানসিক চাহিদা অহংবোধকে পুষ্ট করার চাহিদা। ২। সামাজিক চাহিদা—প্রশংসা, সম্মান, নেতৃত্ব। ৩। বুদ্ধিগত চাহিদা।

চাহিদার পর্যায় ভেদ→ মানুষের মধ্যে—পরিপূর্ণতা ও পরিণতির চাহিদা।

বয়স ও চাহিদা→ বয়সের সঙ্গে চাহিদার প্রকৃতি ও মাত্রার তারতম্য ঘটে।

চাহিদা ও কর্মপ্রেষণা→ ১। প্রেষণার শক্তি অস্বস্তি সৃষ্টি করে। অস্বস্তি প্রশমিত করার জন্য কর্মপ্রয়াস। ২। অহং সত্তার সন্তুষ্টিতে পরিবেশের ব্যর্থতাবোধ,…অপসঙ্গতিও দেখা দিতে পারে। ৩। ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে গিয়ে যে প্রতিক্রিয়া তাই প্রতিযোজন। ৪। ব্যর্থতা থেকে অস্বস্তি আসে—অস্বস্তিই আনে অভিযোজন প্রয়াস। ৫। চাহিদার পরিতৃপ্তি যদি যথার্থ কর্ম-প্রেষণার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘটে, তাহলে সার্থক সঙ্গতি হয়। ৬। বিপরীত অবস্থায় সঙ্গতি রক্ষার অপচেষ্টা চলে মাত্র। ৭। মৌলিক চাহিদার পূরণে অতৃপ্তি ঘটলে (বহিঃজাত বা অন্তঃজাত) ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি আসে।

গৃহপরিবেশ, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য→ ১। পিতামাতা শিশুর মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে থাকে—পিতামাতার আচরণ মনোভাব ও প্রযত্ন পদ্ধতি শিশুর মনের চাহিদা মিটিয়ে থাকে ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রভাবিত করে। ২। সমাজ-স্বীকৃত পথে মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য গৃহশিক্ষা প্রয়োজন।

৩। শৈশবে মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য যে প্রয়াস, তার সবগুলির প্রকৃতিই এক প্রকার। ৪। পিতামাতার শিক্ষা।

বিত্তালয়, মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্য→

১। সামাজিক কর্মপ্রেষণা—বিদ্যালয়ে সামাজিক কর্মপ্রেষণা চরিতার্থ হবার সুযোগ পায়। ২। এককভাবে ও গোষ্ঠীর মধ্যে পর্যবেক্ষণ। ৩। বিদ্যালয়ে নিরাপত্তা ও আত্মস্বীকৃতির চাহিদা পূরণ। ৪। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ৫। বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক। ৬। সহপাঠক্রম ও চাহিদাপূরণ। ৭। বিদ্যালয় শৃংখলা নিয়ত শাসন, স্বাধীনতার চাহিদা অপরিতৃপ্ত রাখে। ৮। মৌলিক চাহিদা ও পাঠক্রম। ৯। শিক্ষণ পদ্ধতি মৌলিক চাহিদা। ১০। সাফল্য লাভের চাহিদা বিদ্যালয়ে পাঠ বিষয়ে সাফল্য, নেতৃত্ব। ১১। নবযুবকালের চাহিদা ও বিদ্যালয়।

॥ অনুশীলনী ॥

1. Write an essay on the basic needs of children.
2. How does the fulfilment of the basic needs bring in mental health in the school-going children ?
3. Explain the phenomenon of motivation in the context of human basic needs.
4. Discuss the role of the home & the school in the fufilment of the basic needs of the children for their healthy personality development.
5. How can you ensure true education making provisions for fulfilment of the basic needs of the children.
6. What is a basic need ? Why is it called 'basic' need ? Now does it influence human behaviour ? How is it related to the mental health of an individual ?
7. Delineate the causes of maladjustment with special reference to the concept of 'Basic need'.

সপ্তম অধ্যায়
মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ও শিক্ষা
[Mental Hygiene and Education]

।। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ও সঙ্গতি-সাধন ।।

মাতাপিতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-ধারণের ধারণা ও সচেতনতা থাকলেই চলবে না—তরুণদের জীবনধারণ ও জীবনে সংগতি-সাধন কিভাবে সুষ্ঠু ও যথার্থ করা যায়, সেদিকেও এঁদের মনোযোগ দিতে হবে।

একজন বয়ঃপ্রাপ্ত বাক্তির জীবনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচার-আচরণ, তার বংশানু-ধারায় প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও শক্তিনিচয়ের উপর বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ফল। একটি শিশুর জীবন ও সমাজে সঙ্গতি-সাধনের ক্ষমতা তার জন্মগত শক্তি ও প্রবণতা এবং এইসব শক্তির বিকাশকালে শিশুটি কি প্রকার পরিবেশের মধ্য দিয়ে যাবে তার উপর নির্ভর করবে। এই পরিবেশ সুস্থ হবে কি অসুস্থ হবে, তা নির্ভর করে পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উপর। বয়স্ক ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে, শিশুর ব্যক্তিত্বের যে ক্রমবিকাশ, সেইটিই হল তার শিক্ষাগত পরিবর্তন।

।। শিক্ষা ও সঙ্গতি-সাধন ।।

শিক্ষণ (*learning*) ও শিক্ষা (*Education*) পূর্বে একই অর্থে ব্যবহার করা হত। শিক্ষণ বলতে বুঝায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা আরও ব্যাপক। সমস্ত জীবন ধরেই শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন আর তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হওয়া নয়। সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমস্ত দৈহিক ও মানস শক্তির সম্পূর্ণ ও সুষম বিকাশ অর্থাৎ সুষম ব্যক্তিত্ববিকাশ ও তার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। "শিক্ষা জিনিসটা জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে।" তথ্যকে জীবনে অঙ্গীকৃত না করলে শিক্ষা হয় না। শিক্ষণের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ হয়, কিন্তু শিক্ষা হয় না। তথ্যকে অঙ্গীকৃত করার জন্য স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে যেমন পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করা ও তাকে দেহের সঙ্গে অঙ্গীকৃত করা সুকঠিন, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির পক্ষেও তথ্যকে জীবনে অঙ্গীকৃত করা প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ শিক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। আবার মানসিক স্বাস্থ্য যা সুষম ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস, তার জন্যেও শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা ভিন্ন সুষম ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না। সার্থক সঙ্গতি-সাধনের মধ্য দিয়ে সুষম ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনই দেখা যায় পরিবারে ও সমাজে। মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিফলনও দেখা যায় সার্থক সমাজ-সঙ্গতির মধ্যে। অতএব শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য ও

সমাজ-সঙ্গতি পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। এদিক্ থেকে শিক্ষাকে অর্থাৎ সমগ্র শিক্ষাধারাকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যেতে পারে।

বর্তমানে শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গতিসাধনের একটি অবিরাম প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার বেশীর ভাগই পরোক্ষভাবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলির পরিপাক (*maturation*) ও পারিবেশিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত ও উদ্দীপ্ত হওয়ার ফল। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই একটা বিশেষ সময় আসে যখন শিক্ষাকে কেবলমাত্র এইসব পরোক্ষ পরিবেশের প্রভাব ও উদ্দীপকের উপর ফেলে রাখা চলে না। একটা সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ধারার প্রয়োজনীয়তা থাকে যা শিশু বিদ্যালয়-জীবনে পায়। এই প্রত্যক্ষ শিক্ষাধারা যত সুনিয়ন্ত্রিত হবে, যত একদিকে ব্যক্তির প্রকৃতি ও শক্তির ও অন্যদিকে সামাজিক চাহিদার পটভূমিতে প্রণীত ও প্রযোজিত হবে, ততই স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষা হবে। এই সঙ্গে ব্যক্তির উপর পরোক্ষ যে সব পারিবেশিক প্রভাব (গৃহ-পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ) সেগুলোও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা না হলে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠন সম্ভব নয়।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য যে শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হবে, তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া সমীচীন।

শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে, তার চাহিদা (***needs***), প্রকৃতি, সামর্থ্য, প্রেষণা প্রতিন্যাস সম্বন্ধে সম্যক প্রণিধান প্রয়োজন। এর ওপর ভিত্তি ক'রেই শিক্ষাগত কার্যক্রম রচিত ও রূপায়িত হওয়া সমীচীন। প্রত্যেক শিক্ষকের এটা একটা অবশ্যকর্তব্য যে, তিনি শিক্ষার্থীর মানস প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের সব দিকের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং তার শিক্ষাধারাকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন।

শিক্ষার্থীকে ঠিকভাবে জানতে হলে মানব প্রকৃতির মূল ভিত্তি সম্বন্ধে জানতে হবে।

॥ মানব প্রকৃতির মূল ভিত্তি ॥

॥ এক ॥ **ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য**—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য সুনিশ্চিতরূপে বর্তমান। দু'জন ব্যক্তি কখনই সম্পূর্ণরূপে এক প্রকারের হয় না। দৈহিক দিক্ থেকে যেমন এই পার্থক্য দেখা যায়, মানসিক দিক্ থেকেও (যেমন বুদ্ধি, সামর্থ্য, আবেগকে সংযত করার ক্ষমতা, রুচি, প্রতিন্যাস প্রভৃতি দিক্ থেকে) এই পার্থক্য রয়েছে।

এ সব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। তার বিশেষ প্রকৃতির একটা শারীরিক গঠন আছে, তার শৈশবকালীন ব্যবহারের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ধীরে ধীরে পরিপক্কতায় (*maturation*) সঙ্গে সঙ্গে, তার মধ্যে কতকগুলি শক্তি ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যা তাকে আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলে এবং গোষ্ঠীজীবন যাপনে সহায়তা করে। **শিশুর পরবর্তী কালের**

বিকাশধারা নির্ধারিত হয় তার (ক) সহজাতশক্তি, (খ) পরিপকতার ধারা ও (গ) পারিবেশিক প্রভাবের দ্বারা।

পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার বয়স ছয় ধরা হয়েছিল এবং এও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ছয় বৎসরের সব ছেলেই বিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভের জন্য সমানভাবে প্রস্তুত। সময়গত বয়সকেই তখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা-আরম্ভের মাপকাঠি মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ধারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে এবং শিক্ষার্থীর গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলির উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তিত্বের অনভিপ্রেত সংলক্ষণগুলির দূরীকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে যথার্থরূপে শিক্ষিত ক'রে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে।

প্রত্যেকটি শিক্ষকের কর্তব্য (ক) সেইসব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখা যা সকল ব্যক্তির মধ্যেই বর্তমান, (খ) বিশেষ বিশেষ গুণাগুণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কতটা পার্থক্য বর্তমান তার সম্বন্ধে ধারণা করা, (গ) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণ নির্ণয়।

এইসব বিষয়ের সম্যক বিশ্লেষণ ও অনুধাবন ক'রে যদি শিক্ষা-সূচী রচিত হয় এবং যথাযথভাবে তার প্রয়োগ করা যায়, তা হলেই সে শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তি ভবিষ্যতে আপন অনুশীলন দ্বারা আরও শিক্ষিত হতে পারে ও আত্মকল্যাণকারী ও সমাজকল্যাণকারী লক্ষ্যে পৌছতে পারে। এতেই মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যাসম্মত শিক্ষা হতে পারে।

॥ দুই ॥ **পরিপাকের (maturation) প্রভাব**—বংশগত গুণাগুণ পরিপাক-ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকাশলাভ করতে থাকে। এর ফলে ব্যক্তিকে কতকগুলি বিকাশ-পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ; যেমন, প্রথম শৈশবকাল, ধীরে ধীরে বাল্যাবস্থা, প্রাক্ বয়ঃসন্ধিকাল, বয়ঃসন্ধিকাল, যুবাবস্থা প্রভৃতি। প্রত্যেকটি পর্যায়েই দৈহিক, শরীরবৃত্তগত এবং আচরণগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে—এই বিকাশ-পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রম ও পাঠপদ্ধতির পরিবর্তন মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য।

প্রত্যেকটি শিশুই, পরিমাণে যাই হোক, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি-সাধনের সুপ্ত শক্তি নিয়ে জন্মায়। এই শক্তি নবজাত শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের মধ্যে নিহিত থাকে। তার স্নায়ুতন্ত্রের নমনীয়তা ও তীক্ষ্ণ সংবেদন-শক্তি তাকে নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিক্ষালাভের ক্ষমতা দিয়ে থাকে। পরিপাক-ক্রিয়ার ফলে এই স্নায়ুতন্ত্রের যত বিকাশ ঘটতে থাকে—শিক্ষালাভের ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পায়। এই পরিপাক-ক্রিয়া আবার দৈহিক স্বাস্থ্য ও পারিবেশিক প্রভাবের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই শিক্ষাধারাকে স্বাস্থ্যকর করতে হলে ব্যক্তির দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্নবান হতে হবে ও পরিবেশ যাতে সুস্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ তিন ॥ **পারিবেশিক প্রভাব**—যে পরিবেশে ব্যক্তি বাস করে ও বড় হয়, সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিবেশ। দু'জন ব্যক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে একই পরিবেশের মধ্যে থাকলেও—মনস্তাত্ত্বিক দিক্ থেকে দু'জনের পরিবেশ ভিন্ন। ভৌতিক পরিবেশ ও

মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ এক নয়। ভৌগোলিক, জলবায়ুগত প্রভাব, খাদ্য, পোষাক এবং অন্যান্য ব্যক্তি ও বস্তুর সান্নিধ্য কোন গোষ্ঠীতে প্রায় একই প্রকার থাকে। কিন্তু এই আপাত একই প্রকারের পরিবেশ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটায় ও প্রতিভাত হয়। একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র পড়তে আসে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে সকলের নিকট একই প্রকারের। কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই পরিবেশে কোন ছেলের মধ্যে সার্থক বিকাশ হচ্ছে, পাঠ-বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে ও বিদ্যালয়ে যথাযথ সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলছে, আবার অনেক ছেলের মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। এই অপসঙ্গতির কারণ গৃহপরিবেশের মধ্যেও নিহিত থাকতে পারে—গৃহপরিবেশ যদি ভৌতিক (*physically*) দিক্ থেকে একই প্রকারের হয়, বিদ্যালয় পরিবেশও যদি এক প্রকারের হয়, তা হলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিদ্যালয়ে পার্থক্য দেখা যায়। কোন ব্যক্তির জন্মগত শক্তি ও পারিবেশিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিবেশ সেই ব্যক্তিকে যেভাবে উদ্দীপ্ত করবে ও যেভাবে তার নিকট প্রতিভাত হবে, অপর ব্যক্তির বেলায় ঠিক সেরূপটি হবে না। এই দিক্ থেকে পরিবেশটি একান্তভাবে ব্যক্তির নিজস্ব ও তার সঙ্গে সার্থক সংগতি কিংবা অপসংগতি সেটাও সম্পূর্ণ তার নিজস্ব।

ব্যক্তি যদি অনেক উন্নতমানের গুণাগুণ নিয়ে জন্মায় এবং উন্নত পরিবেশের প্রভাবের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটে, তা হলে তার জীবনও তত উন্নত ও পূর্ণ হবে। কোন ব্যক্তির বংশগত গুণাগুণ যদি উন্নতমানের থাকে, তাহলে অনুন্নত পরিবেশের মধ্যে থেকেও তার সে সার্থকতা আসবে, বংশগত গুণাগুণ যার মধ্যে কম অথচ উন্নতপরিবেশের মধ্যে মানুষ, তার মধ্যে ততটা সার্থকতা আসবে না, শিক্ষা-লাভ ও সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ততটা চলতে পারবে না। এ দুটি অবস্থার (বংশগত গুণাগুণ পারিবেশিক অবস্থা) যে কোন একটি যদি অধিক উন্নত ও শক্তিশালী থাকে, তাহলে সঙ্গতিরক্ষা কিছুটা সার্থক ও কার্যকরী হবে, কিন্তু যদি বংশগত গুণাগুণ ও পরিবেশ উভয়েই অনুন্নত ও দুর্বল হয়, তাহলে শিক্ষা ও সঙ্গতি অত্যন্ত দোষদুষ্ট ও দুর্বল থেকে যাবে।

বংশগত গুণাগুণকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমাদের সীমিত। সমাজের সকলেই সুজাত হবে, এ বিষয়ে সামাজিক প্রয়াস অত্যন্ত ক্ষীণ। গত পঞ্চাশ বৎসরে যদিও যৌন-শিক্ষা, সমাজ-স্বাস্থ্য, ঔষধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের মাধ্যমে এবিষয়ে অনেকটা অগ্রগতি করার চেষ্টা চলছে, তবু বংশগতিকে নিয়ন্ত্রণ এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। পারিবেশিক প্রভাবকে উন্নত ও স্বাস্থ্যকর করার দায়িত্ব আমাদের এবং এ বিষয়ে তৎপর হলে আমরা যথেষ্ট ফলপ্রসূ উপায় অবলম্বন করতে পারি। শিশুদের জন্য উন্নত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার দায়িত্ব যদিও বিভিন্ন সংস্থা, যেমন গৃহ, বিদ্যালয়, সমাজ-সংস্থা প্রভৃতির আছে, তবু বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে দায়িত্ব সমধিক। বংশগত গুণাগুণ যেরূপ নিয়েই একজন জন্মাক, তার জন্য এমন সুপরিকল্পিত শিক্ষাধারার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তার দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহের সম্পূর্ণ ও সুষম বিকাশ ঘটে এবং তার সম্ভাব্য সমাজীকরণ হয়।

।। মৌলিক চাহিদা ।।

।। ১ ।। **দৈহিক চাহিদা**—খাদ্য, আশ্রয়, বস্ত্র ও আচ্ছাদন্ (দৈহিক চাহিদা) দেহ রক্ষা ও পুষ্টির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। যতদিন পর্যন্ত শিশু এইসব চাহিদা পরিপূরণের জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকে, ততদিন তাদের একটা প্রধান কর্তব্য শিশুদের চাহিদা পূরণ করা, সঙ্গে সঙ্গে এই সব শিশুরা বড় হয়ে যাতে নিজেরাই আপন প্রচেষ্টায় নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারে, তার জন্য এদের আত্ম-নির্ভরশীল ও শিক্ষিত ক'রে তোলা।

শিশুর খাদ্য-তালিকা এবং তার খাদ্যভ্যাস স্বাস্থ্যকর হতে হবে। তার পোষাক-পরিচ্ছদও যথাযথ হতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তার খাদ্যভ্যাস কি প্রকার হবে, কি কি ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ পরবে, তার গৃহব্যবস্থা কি প্রকারের হবে, সবই অনেকাংশে তার শৈশবাবস্থায় জীবনধারণের রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। কাজেই এইসময় পিতা মাতা ও অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তিদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে।

।। ২ ।। **সামাজিক চাহিদা**—দৈহিক চাহিদার পূরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চাহিদাগুলির সম্যক পরিতৃপ্তি বাঞ্ছনীয়। জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তি নিয়ত তার চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করেছে—এই চাহিদা সম্পূর্ণ আত্মগত ও দৈহিক চাহিদা থেকে সামাজিক ও আত্মিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। দৈহিক চাহিদার যদি যথাযথ পূরণ না ঘটে তা হলে শিশুর মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এর প্রকাশ রাগ ও ভয়ের আকারে দেখা দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দৈহিক চাহিদার পূরণের সঙ্গে কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যই নয়, মানসিক ভারসাম্য-নির্ভর করে অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যও নির্ভর করে।

ব্যক্তির কর্মপ্রেষণার (*motivation*) পিছনে ব্যথা, বেদনা, ক্ষুধা ও অন্যান্য দৈহিক অসমতা ও অসুবিধা দূরীকরণের প্রয়াস থাকে। হতাশা, ব্যর্থতা, দুশ্চিন্তা, একঘেয়েমি এসব থেকে ব্যক্তি সর্বদা দূরে থাকতে চায়। ফলে, মানবিক আচরণ ও কর্মপ্রয়াস সর্বদাই কোন কিছু অর্জন করা, নূতন কিছুকে জানা, সাফল্য-লাভ, নিরাপত্তা-স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়।

শিক্ষকদের একটা প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য যে, তাঁরা মানবিক মৌলিক কর্মপ্রেষণা সম্বন্ধে জানবেন এবং এইসব কর্মপ্রেষণা আত্ম ও সমাজকল্যাণকারী কর্মে নিয়ন্ত্রিত করবেন। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কোন-না-কোন দিকে সাফল্য ও স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা কাজ করে। এই ইচ্ছাকে শিশুর সামথ্যানুযায়ী বিদ্যালয়ের পড়াশুনায় সাফল্য অর্জন, খেলাধুলা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে স্বীকৃতি ও সাফল্যলাভের ইচ্ছায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। শিক্ষককে এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। শিশু যে তার পরিবারে, গৃহে ও সমাজ-গোষ্ঠীতে গৃহীত ও স্বীকৃত, এটা জানার জন্য সে অধীরভাবে উৎসুক থাকে। এই পরিবারিক ও সমাজ-স্বীকৃতি সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। পিতা-মাতা এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাঁদের

যত্নাধীনে যে সব শিশু আছে, তাদের যেন দৈহিক, সামাজিক ও আর্থিক চাহিদার পূরণ ঘটে ও এ সব বিষয়ে তারা নিরাপদ বোধ করে। শিক্ষার্থীর পাঠক্রম ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম তার মৌলিক চাহিদা ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করতে হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীর জন্য তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী কর্মসংস্থান করতে হবে (*vocational guidance*) এবং সেই কর্মে যথাযথ যোগ্যতা-লাভের জন্য তাকে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা সুযোগ দিতে হবে।

শিশুর মধ্যে নতুনকে জানার যে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা আছে, তাকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হবে। নতুন দৃশ্য, নতুন শব্দ, বিদ্যালয়-কর্মসূচীতে মাঝে মাঝে হৃদয়গ্রাহী পরিবর্তন শিশুর কর্মোৎসাহকে বৃদ্ধি করে ও পাঠ-বিষয় ও শিক্ষাপর্বকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ও শিক্ষাকে যথার্থ করার জন্য শিশুর মধ্যে গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ সম্পর্কে একটা নিরাপত্তা-বোধের সৃষ্টি করতে হবে।

এই সব মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তির উপর শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ নানাভাবে বিঘ্নিত হয় যদি মৌলিক চাহিদার পূরণ না ঘটে, এ জন্য শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুর মানস শক্তির অপচয় ঘটায় ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে।

॥ পরিবার ও সমাজ-পরিবেশের প্রভাব ॥

ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এই সমাজ-পরিবেশের প্রভাব মুক্ত হতে পারে না। কোন ব্যক্তি সমাজে সার্থকভাবে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলতে পারবে কিনা, তা অনেকাংশে এই সমাজ-প্রভাব নির্ধারণ করে। সমাজ-পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূলও হতে পারে, আবার প্রতিকূলও হতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে।

শৈশবকালে গৃহ-পরিবেশে যে দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-ধারণ প্রথা ও অভ্যাস বর্তমান থাকে, তার দ্বারা শিশু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। শিশু যত বড় হতে থাকে, গৃহপরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়, প্রতিবেশী, গোষ্ঠী, বিভিন্ন সমাজ-সংস্থা, পত্রিকা, বেতার, চলচ্চিত্র প্রভৃতির দ্বারাও প্রভাবিত হতে থাকে। শিশুর ব্যক্তিত্বগঠন ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা অসুস্থতা এই সকল পারিবেশিক শক্তির দ্বারা বহুল পরিমাণে স্থিরীকৃত হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ও বয়ঃপ্রাপ্তিকালে পরিচয়-পরিসর আরও বৃহত্তর পটভূমিকায় বিস্তৃত হয়—বয়ঃসন্ধিকালে যৌনচেতনার উন্মেষ হয়, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ভাবাদর্শ ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। কোন বিকাশ-পর্যায়ে যদি এই সব পারিবেশিক প্রভাবের মধ্যে কোন বিচ্যুতি বা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, তা হলে তার পরবর্তী বিকাশ-পর্যায়েও এর প্রতিক্রিয়া ঘটে ও ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুষমতা ও সুস্থতা বিপর্যস্ত হয়। কাজেই যথার্থ শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কেবল বিদ্যালয় নয়, গৃহ ও সমাজ পারিবেশিক প্রভাবকে যথাসম্ভব সুস্থ ধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

॥ পারিবারিক পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ॥

ভূমিকা ঃ মানবিক শিক্ষণের (*learning*) মধ্যে বুদ্ধির দিক্ ছাড়াও পরিপাকের (*maturation*) ও প্রক্ষোভের (*emotion*) দিক্ আছে। এ তিনটি দিক্ কিভাবে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে ও কাজ করবে সেটা নির্ভর করে কি বয়স ও কি পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা-কার্য সমাধা হচ্ছে। একটি শিশু তখনই হাঁটতে শেখে, যখন তার মধ্যে শরীর বৃত্তগত পরিপাক হয়েছে। শৈশবকালীন প্রতিটি প্রয়াসের সঙ্গে পিতামাতার উৎসাহ ও প্রশংসা, তাদের নিন্দা বা ভীতি প্রদর্শন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিন্যাস (*attitude*) কোন-না-কোন ভাবে শিশুর আবেগগত (*emotional*) জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল অভিজ্ঞতা যে কেবল শিশুর বর্তমান প্রয়াস-কর্মকেই প্রভাবিত করে তা নয়, পরবর্তী জীবনের প্রয়াস ও সাফল্য সম্বন্ধেও মনোভাব সৃষ্টি করে। বয়ঃসন্ধি-কালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষায় বুদ্ধি ও প্রক্ষোভের পরিপাকের ক্রিয়া কাজ করে—সে শিক্ষা পুঁথিগত জ্ঞানার্জনই হউক বা সামাজিক শিক্ষাই হউক, কৃত্যই (*formal*) হউক, আর অকৃত্যই (*informal*) হউক। **প্রতিটি শিক্ষণ (learning) কার্যের মধ্যেই বুদ্ধির দিক্ যতই থাক, তার মধ্যে প্রক্ষোভের একটা ক্রিয়া ও তাৎপর্য থাকবেই এবং প্রক্ষোভের (emotion) দিক্‌টাই শৈশবকালীন শিক্ষায় বেশী কাজ করে।**

তিন বৎসরের কম বয়সের শিশুদের শিক্ষণ-ক্রিয়ায় বুদ্ধির দিক্ বড়দের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার তুলনায় অনেক কম থাকে। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে, অভিজ্ঞতা-অর্জনে ও সমস্যার সমাধানে বুদ্ধি অধিক পরিমাণে কাজ করে। বয়ঃপ্রাপ্তিকালে বুদ্ধির ও বিমূর্ত চিন্তন-ক্রিয়া অধিক পরিমাণে আরম্ভ হয়। এই সময়েও প্রক্ষোভ ও অনুভূতিসঞ্জাত পূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ (যা ব্যক্তিত্বের মধ্যে গভীরভাবে নিহিত থাকে) বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

মনস্তাত্ত্বিক এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায় পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষারম্ভের পূর্বেই পারিবারিক শিক্ষা যে কত গভীরভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে কাজ করে, তা যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

॥ ১ ॥ **মাতার প্রভাব ঃ** শিশু মা'র উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, জন্মক্ষণ থেকেই তার দৈহিক ও মানসিক চাহিদাগুলি মা ভিন্ন সে সংগ্রহ করতে পারে না। শিশুর শিক্ষা প্রথম মাকে কেন্দ্র ক'রেই আরম্ভ হয়। খাদ্য, ভালবাসা আশ্রয়, সবই সে মার কাছ থেকে পায় এবং এ থেকেই তার মধ্যে নিরাপত্তাবোধ আসে। এ মৌলিক চাহিদার যে-কোন একটির অভাব শিশুর মধ্যে নিরাশ্রয়তা, ভয় ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে। অতি শৈশবকালে শিশু জৈবিক উদ্দীপক ভিন্নও অন্যান্য উদ্দীপকে সাড়া দিতে আরম্ভ করে। দিনের অত্যন্ত নিয়মিত ঘটনাসমূহে, মা'র যাওয়া আসা, মা'র তার সম্পর্কে আচার-আচরণ, বাচনভঙ্গী, আদর করার ভঙ্গী, শিশুর মনোরাজ্যে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মা'র আচরণধারা (সুস্থ বা অসুস্থ) শিশুর মধ্যে হয় নিরাপত্তা বোধ,

নয় নিরাশ্রয়তা ও হতাশার ভাব নিয়ে আসে। খুব অস্পষ্টভাবে হলেও মা'র ব্যক্তিত্বের একটা ছায়া শিশুর মানসভূমিতে আনাগোনা করতে থাকে। মা'র সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের প্রকৃতি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থ কি অসুস্থ ধারায় হবে, তা নির্ণয় করে।

॥ ২ ৷ **পিতার প্রভাব :** এক বৎসর পর থেকেই, শিশু ধীরে ধীরে মা'র সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল হতে থাকে। এই সময় থেকে পিতার সংসর্গ ক্রমে প্রত্যক্ষ হতে থাকে। কোন কোন পারিবারে পিতা সর্বময় কর্তা। পিতার ব্যক্তিত্বও শিশুর মানস-লোকে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

সামগ্রিক গৃহ-পরিবেশের প্রভাব : মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্‌দের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা, কু-শিক্ষা ও অপসঙ্গতির (*maladjustment*) কারণ অসুস্থ গৃহ-পরিবেশ। পিতামাতার উদাসীন নির্দয় আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে বিঘ্নিত করে। যেসব পিতামাতা অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রতি কঠোর আচরণ করে, সন্তান সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করে এবং সর্বদা তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, তারা শিশুর মধ্যে গভীর হতাশা ও দ্বন্দ্বের উদ্রেক করে ও ফলে নানারূপ অপসঙ্গতিমূলক আচরণ শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায়। দুর্বল ও অতিপ্রশ্রয়কারী পিতা-মাতাও সন্তানকে তার খেয়াল-খুশীমত চলতে দেয়, সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে দূরে রাখে, সকল কল্পিত কষ্ট থেকে তাকে দূরে রাখতে চায় এবং এইভাবে সন্তানকে পর-নির্ভরশীল ক'রে তোলে। স্বভাবতঃই সে পিতামাতার নির্দেশমত চলে না, সে যখন শৈশবাবস্থা থেকে বয়ঃসন্ধিকালে পৌছোয়, তখন তার অপসঙ্গতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে, কেননা তখন তার পক্ষে আর আত্ম-নির্ভরশীল, আত্ম-বিশ্বাসী ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয় না। অপরদিকে যেসব পিতামাতা অত্যন্ত কর্তৃত্বাভিলাষী, তাদের সন্তানদের মধ্যে অধিক লজ্জা ও ভীরুতা দেখা দেয় এবং তারাও পরনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে ওঠে।

যথাযথ গৃহ-পরিবেশ শিশুকে সস্নেহ শাসনের মধ্যে রেখেও স্বাধীনতা দেয়, যে স্বাধীনতা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। গৃহ-পরিবেশে খেলাধূলা ও অন্যান্য নির্মল আনন্দময় কর্মকাণ্ডের অবতারণা হলে শিশু এতে যোগ দিয়ে আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরে ওঠে—সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলতে শেখে। যে গৃহে পিতামাতার মধ্যে অহরহ কলহ, অস্থিরতা বর্তমান, সেই সব দীর্ণ গৃহপরিবেশ শিশুর মানসিক বিকাশকে দীর্ণ করে। এই পরিবেশে শিশু শান্ত ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের কোন প্রকার সুযোগই পায় না।

পিতামাতাই শিশুর একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ এবং ব্যাপক অর্থে প্রথম শিক্ষাদাতা। তাঁদের শিক্ষাদান স্বেচ্ছায় না হলেও অলক্ষ্যে শিশুকে নানাভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলে। পিতামাতার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ, সন্তান-প্রতিপালনে যত্ন সব কিছুই শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ ও সঙ্গতিরক্ষার ধারা নিরূপণ করে। কাজেই শিক্ষার প্রথম যে আবাসস্থল গৃহ, তাকে সুস্থ আবহাওয়ায় সর্বদা কুসুমিত রাখতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা সুস্থ গৃহ-পরিবেশ রচনার বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায় প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে সাহায্য করতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে যাতে

পিতামাতা শিশুকে বুঝতে শেখে, তার সমস্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে পারে ও শিশুর বিকাশোপযোগী পরিবেশ রচনা করতে পারে, তার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রচার ও প্রসার হওয়া সমীচীন।

॥ বিদ্যালয় পরিবেশে, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ॥

বর্তমানে বিদ্যালয়গুলি কেবল পুঁথিগত বিদ্যাদানের যান্ত্রিক কেন্দ্র নয়। আধুনিক বিদ্যালয় ছোটখাট সমাজবিশেষ, যেখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সামাজীকরণ হয়ে থাকে। একটি শিশুর সুস্থ বিকাশকল্পে যে সব মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি প্রয়োজন, তার সবটা গৃহ-পরিবেশে পাওয়া যায় না—বিদ্যালয়ে এই সব চাহিদার অনেক পরিতৃপ্তি ঘটে—এই কারণে আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে কেবলমাত্র নির্দেশদান (*instruction*) পর্যায়ে ফেলতে পারি না। তদুপরি বিদ্যালয়েয় কাজ কখনই কেবল-মাত্র বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা নয়—প্রত্যেকটি শিক্ষণ-শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রক্ষোভ-ঘটিত একটা দিক্ থাকে। পাঠক্রম, সহপাঠক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্বন্ধ, সৎকাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কার ও খারাপ খাজ থেকে বিরত থাকার জন্য শাস্তি—এ সবই শিক্ষার্থীর মনে প্রতিক্রিয়া ঘটায়—মনোরাজ্যে পরিবর্তন আনে। পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভাবধারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রথিত হয়ে যায়। কাজেই শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বৈকল্য (অপসঙ্গতি) প্রতিরোধ ও অপসঙ্গতিমূলক আচরণ প্রকাশ পেলে অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হলে তার নিরাময়ের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যাসম্মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা সমীচীন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রত্যেক গবেষকই এ বিষয়ে একমত যে, শিক্ষা হচ্ছে একটি প্রগতিশীল শক্তি যা ব্যক্তিকে অভিপ্রেত অর্থাৎ আত্মকল্যাণ ও সমাজকল্যাণকারী জীবনযাপনে প্রস্তুত করে। মোটামুটিভাবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চারিটি (ক) আত্মশক্তির সম্যক ও সুষম বিকাশ, (খ) সুস্থ মানবিক সম্পর্ক, (গ) আর্থিক স্বাবলম্বন, (ঘ) নাগরিক হিসাবে যথাযথ দায়িত্বপালনে সামর্থ্য।

শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারাকে রচিত ও রূপায়িত করতে হবে।

(১) ॥ পাঠক্রম ॥

পাঠক্রম যদি মনগড়া ও শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠে কোন প্রকার উৎসাহ বোধ করে না—পাঠবিষয়ের সঙ্গে একাত্মীকরণ হয় না ফলে তার সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম ও শক্তি পাঠ্যবিষয় ছেড়ে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে—ধীরে ধীরে বিদ্যালয় সম্পর্কে তার একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়, পরোক্ষভাবে মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষুন্ন হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যসম্মত পাঠক্রম প্রণয়নে নিম্নলিখিত সূত্রগুলির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে—

(ক) শিক্ষা সম্পর্কে একটি ব্যবহারিক দর্শন।
(খ) শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা।
(গ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান।
(ঘ) সমকালীন জীবনের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা।
(ঙ) প্রচলিত পাঠক্রমের বিচার-বিশ্লেষণ ও তা থেকে নতুন সৃষ্টিধর্মী পাঠচয়ন ও উদ্ভাবন।

এ ছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একটি সপ্রাণ যোগাযোগ আছে কি না, সর্বস্তরের পাঠক্রম যেন পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক হয়, যাতে পরিণামে শিক্ষার্থীর মধ্যে সার্বিক বিকাশ ঘটে ও শিক্ষার্থী ব্যবহারিক জীবনে সেই জ্ঞান যথাযথরূপে কাজে লাগাতে পারে। পাঠক্রম যেন কঠিন কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকে—বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতা সর্বস্তরের পাঠক্রমে থাকা সমীচিন যাতে বিভিন্ন শিক্ষার্থী তার বিশেষ বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠ-বিষয় গ্রহণ করতে পারে।

॥ নার্সারী-বিদ্যালয় স্তরে ॥

নার্সারী-বিদ্যালয়ে সব শিশুই পড়ার সুযোগ পায় না। কিন্তু নার্সারী-বিদ্যালয়ের প্রভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ও ব্যক্তিত্ব গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। এই স্তরের পাঠক্রমে বা শিক্ষাধারায় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার অনেক প্রয়োজনীয় সূত্রাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। যথাযথ সস্নেহে পরিদর্শন ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে খেলাধুলা ও সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়াস শিশুকে উদ্দীপ্ত করে—এর মধ্য দিয়ে সে যে স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তির স্বাদ পায় ও গোষ্ঠী জীবনে পরিচিতি লাভ করে, তাতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থধারায় হয়। এ থেকে আত্ম-কেন্দ্রিকতা বিদূরিত হয় ও সমাজ-জীবনযাপনের হাতে-খড়িও হয়ে যায়।

॥ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্তরে ॥

এই স্তরে শিশু সেই সব প্রাথমিক কাজের অনুশীলন করবে যা ভবিষ্যতে তার শিক্ষাগত পাঠক্রম আয়ত্ত করতে সহায়তা করবে। গোষ্ঠী-জীবনযাপনের মূল সূত্রগুলির সঙ্গেও সে পরিচিত হতে থাকবে, দৈহিক চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হতে এবং পরিশেষে সে এমন কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করতে শিখবে, যা তার বর্তমান ও ভবিষ্যতে সমাজ-জীবন যাপনে সহায়তা করে।

এই সময়ে শিশু অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। এই সক্রিয়তাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌছানো দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এমন সব বিষয় থাকবে যা পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শেখা যায়—যেমন লিখন, পঠন ও গণন। পাঠ-বিষয় যতটা সম্ভব সহজ, সরল ও বস্তুগত করতে হবে।

শিক্ষণের প্রাথমিক জিনিসগুলি পরবর্তী শিক্ষণ-পর্যায়ের জন্য প্রয়োজন। পঠন, লিখন ও গণনা শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মৌলিক দায়িত্ব। বিষয়পাঠে যদি

শিক্ষার্থীর অধিক সময় লাগে, গণনায় যদি ক্রমাগত ভুল হতে থাকে, লেখা যদি অস্পষ্ট ও অগোছালো হয়, তাহলে পরবর্তী কালের শিক্ষণ নানাভাবে ব্যাহত হয়। শিশু শিক্ষার্থী পরবর্তী কালের পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না। এর ফলে নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, পরবর্তী কালের শিক্ষা জীবনে অপসঙ্গতি দেখা যায়।

সহজ সরল গল্পবহুল পাঠ বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা, কর্ম-কেন্দ্রিক সৃষ্টিধর্মী পাঠক্রম, খেলাধুলার প্রবর্তন করা, এই পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

।। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্তরে ।।

শৈশবকালে পারিবারিক প্রভাব যেমন গভীর ও ব্যাপক, বয়ঃসন্ধিকালে বিদ্যালয়ের প্রভাবও তেমনি গভীর। শিক্ষার্থীর বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তার শরীরবৃত্ত ও পরিপাক (*maturation*) ক্রিয়ার দিক্ থেকে অনেক পরিবর্তন ঘটে। তার সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতার পরিসরও বিস্তৃত হয়—শিক্ষার্থীর এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম নির্ধারিত করতে হবে। এই ভাবে শিক্ষার্থীর সমাজ-সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সে নিজেকে সমাজের একজন অংশীদার ও কর্মী হিসাবে ভাবতে শেখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবিকার প্রস্তুতি সংক্রান্ত পাঠক্রমও সন্নিবেশিত হবে। এ ছাড়া, পাঠক্রম নমনীয় ও বহুমুখী হবে। অনুবন্ধ-প্রণালীও গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্নিহিত মৌলিক সম্পর্ক শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। এ ছাড়া, সমাজ-সম্পর্কযুক্ত, স্বাস্থ্য ও অবসর-যাপনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পাঠক্রমের মধ্যে সন্নিবেশিত হবে।

।। ২। শিক্ষণ-পদ্ধতি ।।

শিক্ষার্থীর মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বয়ঃক্রমিক বিকাশ-ধারানুযায়ী যে মানস-বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠক্রম নির্ধারিত হবে, শিক্ষণ-পদ্ধতিও এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিরূপিত হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে, বিষয়বস্তুর সামগ্রিক (*whole*) উপস্থাপন ও পরে বিষয়বস্তুর বিশদ বিশ্লেষণ সমীচীন। মূর্ত জ্ঞান থেকে ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণায় যেতে হবে। সরল থেকে ধীরে ধীরে জটিল ভাব উপস্থাপন, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমে অজানা জ্ঞান-বলয়ে গমন, সহজ উদাহরণ থেকে সাধারণ সত্যে উপস্থিতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এ ছাড়া, শিক্ষা দান একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষকের আন্তরিকতা, বিষয়-জ্ঞান, শিক্ষার্থীদের রুচি ও অভিজ্ঞতার পরিধি সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান, শিক্ষাদানকে প্রাণবন্ত করে। বস্তুতঃ শিক্ষক প্রাণবান না হলে শিক্ষণ-পদ্ধতি কখনই প্রাণবন্ত হয় না। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার সম্যক জ্ঞান শিক্ষকের মধ্যে এমন একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ

ঘটাতে পারে যা শিক্ষককে শ্রেণীতে প্রশ্ন করা শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আহরণ তাদের পাঠ-বিষয়ে ও শ্রেণী-কক্ষের অন্যান্য কাজে আকৃষ্ট করা, ও মনোযোগ নেই, এমন শিশুকে মনোযোগী করা, এসব বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়-গ্রহণে সমর্থ করতে পারে।

॥ ৩ । **শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক** ॥

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেবল দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক নয়। জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থী জীবন ও মানুষকে নিজে দেখে বোঝার চেষ্টা করে—এই প্রয়াসকে শিক্ষক বন্ধুর মত পাশে থেকে সার্থক করতে সহায়তা করেন মাত্র। শিক্ষক হবেন বন্ধু—শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যময়। শিক্ষক হ'ল শিক্ষার্থীর সহ-যোগী জীবনপথের পথিকৃৎ। শিক্ষকের স্নেহ-প্রীতি শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাবোধ নিয়ে আসে—ভালোবাসার দ্বারা তার মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এ দু'টিই একান্তভাবে অপরিহার্য। বিদ্যালয়, ও পাঠ-বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়। সমস্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একাত্মকরণ ঘটে, যার ফলে বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারা ফলপ্রসূ হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যে যদি ফাটল থেকে যায়, তাহলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে সে সুপ্ত শক্তি সামর্থ্য থাকে তা অনাবিষ্কৃত থেকে যেতে পারে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথাযথভাবে হতে পারে না। ফলে সমস্ত শিক্ষাপর্বই প্রাণহীন তথ্য-সামগ্রী-জর্জর নিষ্ফল প্রয়াসে পরিসমাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক প্রগাঢ় না হলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যা, কোন প্রকার অবদমিত অপসঙ্গতি অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় ও পরিণামে শিক্ষাগত যোগ্যতা হ্রাস পায় এবং কখনও কখনও বিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

চেতনভাবেই হোক আর অবচেতনাভাবেই হোক, শিক্ষার্থী বড়দের অনুকরণ ক'রে থাকে। শিক্ষার্থীর সঙ্গে যাঁদের প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে ও যাঁদের উপর শিক্ষার্থী তার মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য নির্ভরশীল থাকে, তাঁদেরকেই শিক্ষার্থী অধিকভাবে অনুকরণ করার প্রয়াস করে। শিক্ষকের আচরণ, রচনাভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আবার শিক্ষার্থী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। কাজেই জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাভাবনা, কর্মপ্রয়াস সব বিষয় সম্পর্কে একটা অনুকরণযোগ্য জীবনাদর্শ গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের। শিশু শিক্ষার্থীর বিকাশে তার পারিবারিক প্রভাব অত্যন্ত বেশী কাজ করে, বিশেষ ক'রে নিরপত্তাবোধের দিক থেকে। বয়ঃসন্ধিকালে পিতা-মাতার প্রভাব ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং নবযুবা পারিবারিক নির্ভরশীলতা থেকে ক্রমে মুক্তিপ্রয়াসী হয়। অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তি, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক পূর্বে তত প্রগাঢ় ছিল না, তাদের সম্বন্ধে নবযুবক-যুবতী (*adolescent*) অনুরাগ অনুভব করতে থাকে—বিদ্যালয়ের প্রভাব এই সময় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়—এই সময়ে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহার্দ্র আচরণ, বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে।

॥ ৪। বিদ্যালয়ের শৃংখলা ॥

শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্তর্জাত : শাস্তি, ভয়, নিন্দা, স্তুতি এইসব কৃত্রিম পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়াস অস্বাস্থ্যকর। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের অবতারণা করেছে এবং পূর্বের ধারণাকে পরিবর্তিত করেছে ; আমরা এখন আর বিশ্বাস করি না যে, শিশু খারাপ হয়েই জন্মায়—খারাপ নীচ প্রবৃত্তির দ্বারা সে চালিত হয়—শাসন ও তথাকথিত কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে শিশুকে ভাল করতে হয়। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক সত্যাদি, বর্তমানে শৃঙ্খলা, শাস্তি এবং বিপথগামী শিশুকে নিয়মানুবর্তী করার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রবর্তন করেছে।

প্রতিটি শিশু স্বভাবতঃ কর্মচঞ্চল ও গতিশীল। অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং তাতে সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে—এর সমাধান অবশ্য সে নিজেই করার চেষ্টা করে। সে কোন-না-কোন দিকে নিজেকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করতে চায়, এতে তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশও ঘটে। অনেক সময় নিজেকে কোন বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণিত করার ইচ্ছা এত অস্বাভাবিকরূপে প্রবল হয় যে, অন্যের রুচি, ইচ্ছা এবং অধিকার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন হয়ে পড়ে। নিজেকে সার্থক করার ইচ্ছা যদি অপরের স্বীকৃতির অপেক্ষা না রাখে তা হলে নানা রূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখা দেয়। এই জন্যই দলীয় স্বীকৃতি অপেক্ষা শিক্ষকের স্বীকৃতি এ বিষয়ে অনেক বেশী কার্যকরী।

অন্তর্জাত প্রেষণা শক্তিগুলি শিশুর ব্যবহারের উৎস—কাজেই এই প্রেষণা-শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষায় কতগুলি প্রেষণাশক্তির উদ্গতি সাধন করা সমীচীন। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সুচিন্তা, সুদৃষ্টি ও সদাচরণ আসে।

শিশুর মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ না হলে শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে নানারূপ অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা দেয় ও এর দ্বারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্য অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদের ধৈর্য, সহৃদয় ভাব ও তাঁদের সুষম ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ আনয়নে অনেক পরিমাণে সহায়তা করে।

সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে যথেষ্ট কাজ করে।

মোটের উপর, **বিদ্যালয়ে শৃংখলা-রক্ষার অর্থ ই হল শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা।**

॥ ৫। বিদ্যালয়ে পরিমাপন ॥

মানসিক স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল সুস্থ ও সার্থক জীবনযাপনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তার সাম্যক বিকাশসাধনে সাহায্য করা, অপসঙ্গতির কোন সম্ভাবনা থাকলে তাকে গোড়া থেকেই দূর করা। এই উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য

শিক্ষক ও বিদ্যালয়ে নিযুক্ত মনোবিদ্‌দের প্রধান কাজ হল শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তি সম্পদ সম্পর্কে ও সেই সঙ্গে ব্যক্তির ক্ষতিকারী মানসিক জট (*complex*) ও বৃত্তিগুলিকে জানা।

শিক্ষার্থীর পাঠ বিষয়ে ও অন্যান্য দিকে উন্নতি-অবনতির একটা সঠিক চিত্র মাঝে মাঝে নিতে হবে—শিক্ষার্থীর বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্বের উপর চারিদিকের পারিবেশিক প্রভাব কতটুকু ও কিভাবে কাজ করছে, সে সম্বন্ধে যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধ, শিক্ষার্থীর শক্তির যথার্থ বিকাশ ও সেই শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য এবং শিক্ষার্থীকে যোগ্য ক'রে তোলার অভিপ্রায়ে বিদ্যালয়ে এই পরিমাপন অপরিহার্য।

॥ ৬ ॥ নির্দেশনা ॥

শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হয়, শিক্ষার্থীর শক্তি-সামর্থ্য, রুচি অনুযায়ী তাকে উপযোগী শিক্ষাধারা ও পাঠ বিষয়ে পরিচালিত করতে হয়। যে কোন নির্দেশনা-কার্যেরই দু'টি পর্যায় আছে—(ক) ভবিষ্যকথন (*prediction*) ও (খ) নিয়ন্ত্রণ (*control*)। ভবিষ্যকথনের জন্য শিক্ষার্থীকে সম্যকভাবে জানতে হয়—মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা, জীবনপঞ্জী প্রভৃতি থেকে শিক্ষার্থীকে জানা হয়—তার ভিত্তিতে সে কি হবে, সে কোন্ শিক্ষা-পর্বে যাবে, তার শক্তি-সামর্থ্য কোন্ দিকে, এ সব জেনে তার মানস-সম্পদ ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় (*control*)।

বিদ্যালয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারূপ অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা যায়। এই আচরণ কখনো আক্রমণধর্মী (যেমন মারধোর করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, স্কুল পালানো, চুরি করা, শিক্ষককে অপমানিত করা, অবাধ্য হওয়া) কখনো অবদমিত (যেমন অত্যধিক ভয়, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, নিদ্রাহীনতা) অবস্থায় থাকে। এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষক ও মনঃচিকিৎসক মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গোড়া থেকেই এই সব সংলক্ষণ (*symptom*) আবিষ্কার করতে পারে, বংশগত ও পারিবেশিক প্রভাবসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে পারিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গতি ও পুনর্বাসনে সাহায্য করতে পারে।

বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ও শিক্ষা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। প্রকৃত শিক্ষার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত শিক্ষাধারা রচিত ও প্রযোজিত হওয়া অপরিহার্য।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা ও সঙ্গতি সাধন→	১। জীবনে যথার্থ সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলা শিশুর একটি লক্ষ্য। ২। বয়স্ক ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশই শিক্ষা।

শিক্ষা ও সঙ্গতি সাধন→

১। শিক্ষণ ও শিক্ষা। ২। শিক্ষণের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ হয়। তথ্যকে জীবনে অঙ্গীকৃত করার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। ৩। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও শিক্ষা প্রয়োজন। ৪। পরোক্ষ শিক্ষা। ৫। প্রত্যক্ষ শিক্ষা।

শিক্ষার্থীকে সম্যকরূপে প্রণিধান করা→

শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, প্রকৃতি, ইচ্ছাকে জানা।

মানব প্রকৃতির মূল ভিত্তি→

১। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৈহিক ও মানসিক দিক্ থেকে পার্থক্য আছে। ২। মানুষের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ঠ্যও আছে। ৩। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা, শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য।

(ক) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য→

১। সাধারণ মানবিক গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখা। ২। বিশেষ বিশেষ গুণাগুণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কতটা পার্থক্য তার সম্বন্ধে ধারণা করা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণ নির্ণয়।

(খ) পরিপাকের (Maturation) প্রভাব→

১। পরিপাক ও বিকাশ পর্যায় অনুযায়ী দৈহিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য—এর সঙ্গে তাল রেখে পাঠক্রম ও পাঠ-পদ্ধতি। ২। সুপ্ত সঙ্গতি সাধনের শক্তি স্নায়ুতন্ত্র। ৩। শিক্ষা-লাভের শক্তি ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ।

(গ) পরিবেশিক প্রভাব→

১। ভৌতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ। ২। পরিবেশ-ব্যক্তির নিজস্ব পরিবেশের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া করে। ৩। উন্নতমানের জন্মগত গুণাগুণ × উন্নত পরিবেশ = উন্নতজীবন। ৪। অনুন্নত বংশগত গুণাগুণ × অনুন্নত পরিবেশ = অনুন্নত-জীবন। বংশগতি নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণাধীনে।

(ঘ) মৌলিক চাহিদা→

১। দৈহিক চাহিদা—খাদ্য, আশ্রয়, আচ্ছাদন খাদ্য-তালিকা, পোষাক, গৃহব্যবস্থা সুষ্ঠু হতে হবে। দৈহিক চাহিদা ও মানসিক ভারসাম্য। ২। সামাজিক চাহিদা, চাহিদার পূরণ না হলে শিশুর মধ্যে ক্ষোভ, রাগ, ভয় হয়। নতুন কিছুকে জানা নতুন কিছু অর্জন করা। মৌলিক কর্মপ্রেষণা সম্বন্ধে শিক্ষকদের অবগতি। পারিবারিক ও সমাজ স্বীকৃতির চাহিদা। পাঠক্রম: শিক্ষার্থীর চাহিদা: মৌলিক চাহিদা ও সামর্থ্য।

(ঙ) পরিবার ও সমাজ পরিবেশের প্রভাব→

সমাজ পরিবেশ ও ব্যক্তিত্ব। শৈশবকাল: গৃহপরিবেশ, বিদ্যালয় প্রতিবেশীর প্রভাব। অস্বাভাবিক ও বিকৃত পরিবেশ ব্যক্তিত্বে বিকৃতি আনে।

পারিবারিক পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা→

শিক্ষণের পরিপাক ও প্রক্ষোভের সঙ্গে যোগ আছে। শৈশবকালে শিক্ষায় প্রক্ষোভের দিক বেশী কাজ করে। বিভিন্ন বয়স : বুদ্ধি ও প্রক্ষোভের কাজ। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পূর্বেই পরিবারের শিক্ষা আরম্ভ হয়।

মাতার প্রভাব শিশুর মৌলিক চাহিদা মা'কে দিয়েই প্রথম মেটে, মা'কে কেন্দ্র ক'রেই প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। পিতার প্রভাব এক বৎসর পর থেকেই পিতার সংসর্গ ক্রমে প্রত্যক্ষ হতে থাকে। পিতার ব্যক্তিত্বের প্রভাব।

সামগ্রিক গৃহ পরিবেশ→

পিতামাতার আচরণ সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য। খোলামেলা সুস্থ গৃহ-পরিবেশ, খেলা ধুলা। স্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিবেশ রচনায় মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োগ।

বিদ্যালয় পরিবেশে মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা→

মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে কেবল গৃহ-পরিবেশ নয় বিদ্যালয়ের ভূমিকাও যথেষ্ট আছে। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভাবধারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। শিক্ষা প্রগতিশীল শক্তি।

পাঠক্রম→

শিক্ষার্থীর মাতাপিতা ও স্বাতন্ত্র্যের অনুকূল হবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, সমকালীন জীবনের চাহিদা, প্রচলিত পাঠক্রমের বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঠক্রম নির্ধারণ।

নার্সারী ও প্রাথমিক স্তরে→

নার্সারী-বিদ্যালয় স্তরে খেলাধুলা ও সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়াস। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে প্রাথমিক কাজের অনুশীলন। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে গঠনমূলক কাজে নিয়ন্ত্রণ। কর্মকেন্দ্রিক সৃষ্টিধর্মী পাঠক্রম।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণ পদ্ধতি→

মাধ্যমিক সমাজ-চেতনা উন্মেষকারী ভবিষ্যৎ জীবিকার প্রস্তুতি সংক্রান্ত পাঠক্রম। নমনীয় ও বহুমুখী।

শিক্ষণ-পদ্ধতি বিষয়বস্তুর সামগ্রিক উপস্থাপন মূর্ত থেকে বিমূর্ত, সরল থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানাতে যাওয়া। শিক্ষকের প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক→ ভালবাসার সম্পর্ক, প্রীতি ভালবাসার দ্বারা মানসিক চাহিদা মেটে, মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ রাখে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সুস্থ না হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শক্তি-সামর্থ্য জানতে পারে না, অনেক সময় ছাত্রের অপসঙ্গতি ধরা পরে না। ছাত্রছাত্রী বড়দের অনুকরণ করে, শিক্ষকের আচরণ, বাচনভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী, ছাত্ররা অনুকরণ করে। বয়:সন্ধিকালে পিতা-মাতার প্রভাব কিছুটা কমে, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

বিদ্যালয়ের শৃংখলা→ বিদ্যালয়ের শৃংখলা আন্তর্জাতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি। বড় হওয়ার ইচ্ছা অস্বাভাবিক হলে উচ্ছৃংখলা আসে। অন্তর্জাত প্রেষণা শক্তির (প্রবৃত্তির) উদ্বৃতি (sublimation)। মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি। পিতামাতা ও শিক্ষকের ধৈর্য্য ও ব্যক্তিত্ব, সহপাঠক্রম।

বিদ্যালয়ের পরিমাপন নির্দেশনা→ শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির যথাযথ বিকাশ মানসিক অপসঙ্গতি প্রতিরোধের জন্য পরিমাপ প্রয়োজন।

নির্দেশনার দুই পর্যায়, ভবিষ্যকথন ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ। অপসঙ্গতিমূলক আচরণ এর কারণ নির্ণয় ও প্রয়োজনে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত।

॥ অনুশীলনী ॥

1. Define the scope of Mental Hygiene. "The problems of Hygiene are allied closely with those of Education."—Discuss.
2. What is Mental Hygiene ? Discuss its importance and usefulne.s in the field of Education.

3. Delineate the importance of Mental Hygiene in the field of education.
4. Develop the idea that an acquaintance with the basic principles of Mental Hygiene is indispensable for the teacher.
5. Indicate the responsibility of school in preserving the Mental Health of the children.
6. Discuss the importance of the home in preserving the Mental Health of the children.
7. "Education is a continuous process of individual adjustment from birth to death."—Discuss the scope of Mental Hygiene with particular reference to the above statement.
8. What suggestion from the Mental Hygiene point of view do you have to offer for motivating learing ?
9. Formulate an educational programme for your school taking in consideration the basic principles of Mental Hygiene.
10. Discuss the procedures you would use to increase efficiency-adjustment of the children in your school.
11. How is Mental Hygiene related to Education ?

অষ্টম অধ্যায়

নবযুবকাল ও তার সমস্যা

[Adolescence and its Problem]

'*Adolescence*' শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ 'বৃদ্ধি-পাওয়া'। মানব জীবনের বিকাশ-পর্যায়ের এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিকাশ-পর্যায়টি একটি অন্তর্বর্তীকাল—বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ বয়ঃপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয় নি, এমন সময়। প্রভাতকালে সমাপন হয়েছে, কিন্তু দ্বিপ্রহর হয় নি। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আলিঙ্গন করার যে প্রাণচঞ্চল অনিশ্চিত প্রয়াস—এইটিই যেন আমরা নবযুবকালে দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—(এই সময়ে নবযুবক) "শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে, মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে।"

এ সময়ে দেহ-মনে একটা আলোড়ন ঘটে। অনিশ্চয়তার স্পর্শকাতরতায় ভরা এ সময়টা বিভিন্ন সমস্যার দ্বারা পরিকীর্ণ জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় কাল। মানসিক ভারসাম্য এ সময়ে ভেঙ্গে গিয়ে নতুনভাবে নতুন পরিমণ্ডলে পুনরায় সৃষ্ট হয়। জীবন ও জগতের সঙ্গে সঙ্গীত বিধান করতে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কবি *Keats* এক জায়গায় বলেছেন, ***"The imagination of a young boy is healthy and the mature imagination of a man is healthy, but there is a space of life in between, in which the soul is in a ferment, the character undecided, the way of life uncertain."***

।। নবযুবকালের পরিবর্তন ।।

দৈহিক বিকাশের চরম পর্যায়টি এই নবযুবকালে পরিলক্ষিত হয়। পিটুইটারি গ্রন্থির (যা মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত থাকে) কার্য-কারিতা বৃদ্ধির ফলে এই সময়ে দেহ-বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই নালীবিহীন গ্রন্থির রস শরীরের কোষ ও কোষতন্ত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটায়। অন্যান্য নালীবিহীন গ্রন্থি (*Endocrine glands*) যেমন থাইরয়েড, এড্রিনাল ও গোনাড (যৌন গ্রন্থি) প্রভৃতির কার্যমাত্রা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। এর ফলে শারীরিক বিকাশ বৃদ্ধি-মাত্রা উচ্চকিত হয়ে ওঠে। থাইরয়েড গ্রন্থির রস নিঃসরণের ফলে

হাড়, দাঁত এবং মধ্যবর্তী স্নায়ুতন্ত্রের (*Central nervous system*) বিকাশবৃদ্ধিও বহুগুণিত হয়। যৌন গ্রন্থির কার্যকারিতার জন্য ছেলেমেয়ে উভয়ের বেলাতেই যৌন ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা লাভ ঘটে এবং শরীরের বিভিন্ন প্রকার যৌনগত বৈশিষ্ট্যের (*Secondary sexual character*) প্রতিফলন ঘটে।

।। মানসিক পরিবর্তন ।।

মানসিক ও প্রাক্ষোভিক (*emotional*) যে সব পরিবর্তন নবযুবক-যুবতীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তার অনেকটাই এই সব জৈবিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা ও অনুশাসনের দ্বারাও (*Social & cultural norms*) কিয়দংশে এই মানসিক ও প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন ঘটে। নবযুবক তার শারীরিক বৃদ্ধি ও নূতন শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। বয়ঃপ্রাপ্তির সীমানায় পৌঁছবার জন্যে তার মধ্যে নানা প্রকার প্রয়াস দেখা যায়। শৈশবকালীন পরনির্ভরতা থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সে সচেষ্ট হতে থাকে, কিন্তু তার যেসব জৈবিক ও মানসিক চাহিদা আছে, সেগুলির পরিপূরণের জন্য তখনও তাকে পরিবারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। একদিকে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস, অন্যদিকে পরনির্ভরতা তাকে যন্ত্রণা-বিধ্বস্ত ক'রে তোলে। সে জানতে চায় তার আপন পরিচয় এবং ভবিষ্যতে কি হবে, এই চিন্তা তাকে আকুল ক'রে তোলে। তার মানস-বিকাশ এমন একটা পর্যায়ে পৌছে, যখন সে উন্নত মানের বিমূর্ত চিন্তাও করতে শেখে।

শৈশবকালে শিশুর নিকট সমস্ত জগৎ যেন অপরিচিত। এই অপরিচিতি থেকে শিশু ধীরে ধীরে তার চারপাশের মানুষ, পরিবার ও সমাজের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। শৈশবকালে দৈহিক-মানসিক দিক্ থেকে কোন প্রকার সংহতি থাকে না। সব কিছু এলোমেলো। বাল্যকালে এই এলোমেলো ভাব ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে একটা স্থিতি আসে। পরিবেশের সঙ্গে প্রয়োজনও (*adjustment*) স্বাভাবিক ও সুস্থ হয়ে আসে। নবযুবকাল আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থিতি নষ্ট হয়ে যায়—সমস্ত দেহ-মনে আবার একটা আন্দোলন ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। জগৎ ও জীবনকে সে আবার নতুন ক'রে দেখতে ও বুঝতে শেখে। নতুনভাবে আবার পরিবেশের সঙ্গে যুঝতে হয়। পারিবেশিক শক্তির প্রবলতার কাছে তার সঙ্গতিরক্ষার শক্তি অপ্রতুল মনে হয়, ফলে একটা যন্ত্রণাকাতর মানসিকতার উদ্ভব হয়। ফ্রয়েড, আর্নেস্টজোন্স্ নবযুবকালকে শৈশবের পুনরাগমন বলে মনে করেন। শারীরিক ও মানসিক এই সব পরিবর্তনের পটভূমিতে নবযুবক-যুবতীদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।

।। নবযুবকালের সমস্যা ।।

।। ১ ।। **দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধি ও দৈহিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা :** দৈহিক বিকাশ ও বৃদ্ধি হঠাৎ ত্বরান্বিত হওয়ার ফলে সঙ্গতি-বিধানে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। দৈহিক বিকাশ এই সময়ে সমানুপাতিক হয় না। একজন নবযুবকের হাত, পা, নাক বা কান

শরীরের অন্যান্য অংশের অনুপাতে অনেক বড় মনে হতে পারে, এর ফলে তার মধ্যে একটা লজ্জা ও অপমানকর অনুভূতি তাকে সর্বদা তাড়িত করতে পারে। সে দেহ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং তার সমবয়সীদের মধ্যে যাদের শারীরিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক, তাদের সম্বন্ধে একটা ক্ষোভ ও ঈর্ষা অনুভব করে। এই সময়ে এ বিষয় নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও বিরক্তও করতে পারে। এর ফলে এই সময়ে কেউ কেউ নিজেকে অন্যের কাছ থেকে গুটিয়ে নেয়, আবার কেউ কেউ বিরক্তকারীকে আক্রমণ করে। এদের সব বিষয়েই একটা আক্রমণ-ধর্মী প্রতিন্যাস (*attiude*) সৃষ্টি হয়।

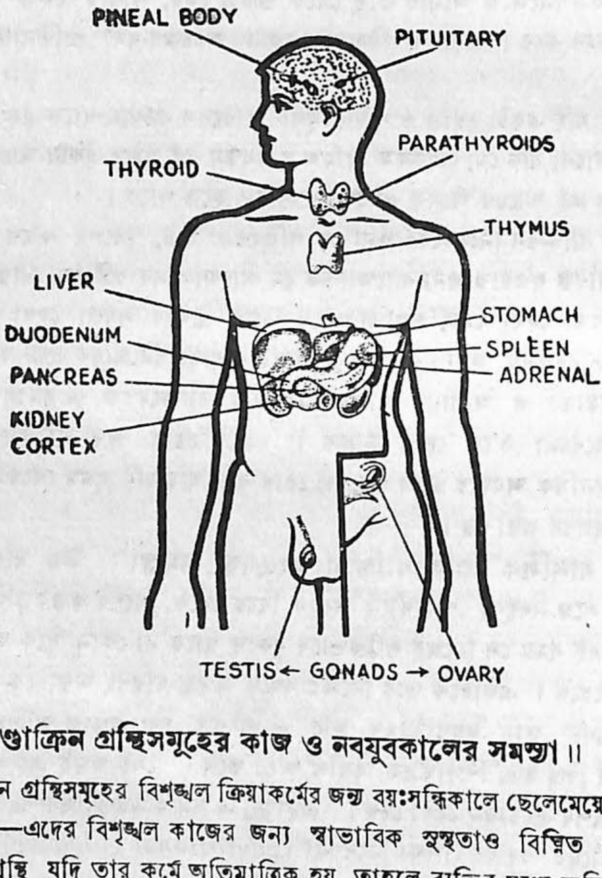
বিদ্যালয়ে যদি একটা দয়ার্দ্র ও সদিচ্ছামূলক পরিবেশ বর্তমান থাকে এবং শিক্ষার্থীদের যদি এটা বোঝানো যায় যে, এইরকম দৈহিক পরিবর্তন এই সময়ে একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা, তাহলে এই সময়ের অনেক সমস্যা তিরোহিত হতে পারে।

এই সময়ে গ্রন্থি-রস নিঃসরণের জন্য যে পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ ক'রে যৌন-গ্রন্থির কার্যকলাপ আরম্ভ হওয়ার জন্য প্রাক্ক্ষোভিক যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তার ফলে একটা মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়, সঙ্গতিবিধানে নানা প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় সঙ্গতিবিধানের জন্য নব যুবক-যুবতীদের সাধ্যমত নিজেদের চেষ্টা করা উচিত— শিক্ষক, পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদেরও এ সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। গ্রন্থিক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা-জনিত যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়, তা রোধ করা যায় যদি প্রথম থেকেই এ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

॥ ২ ॥ **মানসিক প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সমস্যা :** উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নবযুবক শিক্ষার্থীকে অনেক বিষয় থেকে, বিশেষ কতকগুলি বিষয় বেছে নিতে হয়। এই সময় সে নিজেই সঠিকভাবে বুঝতে পারে না কোন্ দিকে তার প্রবণতা এবং সামর্থ্য রয়েছে। একদিকে তার নিজের সম্বন্ধে অস্বচ্ছ ধারণা, অন্যদিকে পিতামাতার ইচ্ছা ও অভিরুচি, তার সহপাঠীদের রুচি ও প্রবণতা এবং অন্যান্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন মত, শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত ক'রে ফলে। সেই জন্যই এই সময়ে শিক্ষা-নির্দেশনার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়া, এ সময়ে উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্ষীণবুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষা-নির্দেশনা (*Educational guidance*) একান্তভাবে প্রয়োজন। অনুন্নত বুদ্ধি-সম্পন্ন ছেলেদের যদিও বিদ্যালয়ে পড়তে হয়, এদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রমের প্রবর্তনা সমীচীন, কেননা উচ্চবুদ্ধি ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমতা রেখে এরা চলতে পারে না এবং পরিণামে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসে। এই ব্যর্থতা-বোধ থেকে এদের মধ্যে এমন মনোভাব ও অভ্যাস সৃষ্টি হয়, যা এদের ধীরে ধীরে নিয়ে আসে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ এবং পরবর্তী জীবনেও নানারূপ অসঙ্গতি।

এ সময়ে উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও তাদের পিতামাতা, শিক্ষক, কখনও বা নিজেদের অবিজ্ঞোচিত অতি-অভিলাষের জন্য নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়। নেতৃত্ব করার ও সার্থকতা লাভের ক্ষমতা থাকার জন্য তাকে তার সমকক্ষ সহপাঠীদের সঙ্গে

কেবল পাঠ-বিষয়েই নয়, অন্যান্য সমাজ-কর্মেও প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়—এই প্রতিযোগিতা এত কঠোর এবং এত শক্তিক্ষয়কারী হতে পারে যে, তার বিকাশোন্মুখ স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। পাঠ-বিষয়ে প্রতিযোগীকে পরাজিত করার জন্য পাঠ-অনুশীলনেই বিদ্যালয়ের সর্ব সময় ও পরে গৃহের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে।



॥ ৩। এণ্ডোক্রিন গ্রন্থিসমূহের কাজ ও নবযুবকালের সমস্যা ॥

এণ্ডোক্রিন গ্রন্থিসমূহের বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকর্মের জন্য বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা নানাভাবে ভুগতে পারে—এদের বিশৃঙ্খল কাজের জন্য স্বাভাবিক সুস্থতাও বিঘ্নিত হতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থি যদি তার কর্মে অতিমাত্রিক হয়, তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অস্থিরতা, কোপন স্বভাবতা (*irritability*), হঠাৎ ক্রোধ, অধিক স্পর্শকাতরতা দেখা দেয় এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা আর্তবক্ষয়ের সময় বিশেষভাবে দেখা যায়। নিরুৎসাহতা, শক্তি-স্বল্পতা একঘেয়ে ভাব দেখা যায়, যখন থাইরয়েডের কর্মমাত্রা কমে যায়। পিটুইটারী গ্রন্থির বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকর্মের জন্যও নানারূপ অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্প কর্মের ফলে, অস্থিরতা, অমনোযোগিতা ইত্যাদি দেখা দেয়। আবার এড্রিনাল গ্রন্থির বিশৃঙ্খল কার্যকারিতার জন্য উত্তেজনা, রাগত ভাব, বিকৃত যৌনবিকাশ হতে পারে।

যৌন গ্রন্থিরাজির বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ তীক্ষ্ণভাবে যৌন ইচ্ছার উদ্রেক করে। ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। যৌন গ্রন্থির ও লিঙ্গের অকর্মকারিতা হেতু ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধে একটা বীতশ্রদ্ধভাব ও চাপা ক্ষোভ দেখা দিতে পারে।

নব যুবক-যুবতীদের এই সময়ে কতকগুলি রোগাক্রান্তির সমূহ ভয় থাকে ; যেমন হৃদরোগ, ক্ষয়রোগ, ম্যানেনজাইটিস প্রভৃতি। অপুষ্টি, অতিমাত্রিক শরীর-বৃদ্ধি, অস্বাভাবিক ক্ষীণ মাত্রায় বৃদ্ধি প্রভৃতিও এদের মধ্যে স্বাভাবিক সঙ্গতি-বিধানে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে, কেননা শারীরিক বিকৃত বিকাশ কিংবা অবাঞ্ছিত অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজ-প্রতিযোজনে বিঘ্ন আনে। যে সকল যুবক শারীরিক শক্তিহীনতার জন্য স্বাভাবিক ও সুস্থ যুবকদলের সঙ্গে তাদের পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারে না, তাদের মধ্যে নানারূপ অপসঙ্গতি দেখা দেয়। এই কারণে দৈহিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা এবং সুনিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য-শিক্ষা এসময়ে বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হওয়া সমীচীন।

কাজেই সাধারণভাবে সকলের জন্য ও বিশেষ ক'রে উন্নত ও অনুন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন নববুবক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাকালে নির্দেশনা (*guidance*) একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এই সময়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনা (*Educational & Vocational Guidance*) উভয়েরই প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয়।

।। ৩ ।। **প্রক্ষোভঘটিত সমস্যাবলী :** প্রক্ষোভঘটিত অপসঙ্গতিকে জীবনের বিকাশ-পর্বের একটা বিচ্ছিন্ন ও একক অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় না। প্রক্ষোভঘটিত বিশৃঙ্খলার কারণ অনেক সময় ব্যক্তির স্নায়ু ও গ্রন্থি তন্ত্রের বিকৃত ও অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নিহিত থাকে। এই স্নায়ুতন্ত্র ও গ্রন্থিতন্ত্রের বিকৃত ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয় পরিবেশের উদ্দীপকের দ্বারা, যে উদ্দীপকের দ্বারা ব্যক্তি প্রভাবিত হয় এবং যে উদ্দীপকধারায় সাড়া দিতে দিতে ব্যক্তির মধ্যে প্রতিন্যাস ও অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

নবযুবকালে ব্যক্তির দ্রুত শারীরিক গঠনের পরিবর্তন হয়। শরীরবৃত্তগত (*Physiological*) ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক ক্রিয়াকলাপ মানসিক অভিজ্ঞতার পরিধির বৃদ্ধির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বাল্যকালীন আচরণ ও অভ্যাস তাকে আর সন্তুষ্ট রাখতে পারে না। সে অত্যন্ত আত্মসচেতন হয়ে ওঠে, নূতন নূতন পরিবেশের সম্মুখে তার অনিশ্চিয়তার ভাব তাকে নিজের সম্বন্ধে ও তার চারিদিকের ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ক'রে তোলে। তার বয়ঃপ্রাপ্ততার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য তার যে সংগ্রাম, তা তার মধ্যে সাময়িক প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

শিক্ষকদের ও অন্যান্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটা প্রধান কাজ হল প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলার সংলক্ষণগুলো (*symptoms*) আবিষ্কার করা। এই সময়ে প্রক্ষোভগত (*emotional*) আলোড়ন বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। দিবাস্বপ্ন, উদাসীনতা, বিদ্যালয়ের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া প্রভৃতি সংলক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাক্ষোভিক অপসংগতি প্রকাশ পায়। কখনও কখনও শিক্ষকের

বিরুদ্ধাচরণ করা, বদমেজাজ, সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, বিদ্যালয়ের সম্পদ নষ্ট করা প্রভৃতি আচরণের মধ্য দিয়েও ব্যক্তির প্রাক্ক্ষোভিক বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়।

যদিও একজন স্বাভাবিক ও সুস্থ নবযুবকের মধ্যে কখনও কখনও অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়, কিন্তু এই ধরনের মারাত্মক অপসঙ্গতিমূলক সংলক্ষণ সম্বন্ধে বড়দের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই প্রকারের আচরণ ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণ তাঁদের অনুসন্ধান ক'রে দেখতে হবে। নবযুবকদের সম্বন্ধে যদি সহানুভূতিশীল ও স্নেহার্দ্র হওয়া যায় এবং তাদের সমস্যা যদি মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অবলোকন করা যায় ও প্রথম থেকেই এর সমাধানে সাহায্য করা যায়, তা হলে অনেক সমস্যার বিমুক্তি ঘটতে পারে। কোন কোন শিক্ষক এই বয়সের, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কখনই ক্রধের বিস্ফোরণ দেখতে পান না, আবার কেউ কেউ প্রতিনিয়তই অভিযোগ করেন যে, তাকে ছাত্ররা মানছে না বা নানারূপ অস্বাভাবিক ও অশোভন আচরণ শ্রেণীকক্ষে করছে। এর কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ছাত্ররা নয়, শিক্ষক নিজের শ্রেণীকক্ষে এই বয়সের উপযোগী যে পরিবেশের অবতারণা করা দরকার, তা করতে সক্ষম হন না। নবযুবকরা স্বভাবতঃই কিছু পরিমাণে যন্ত্রণা-বিধস্ত থাকবে, আর সেই কারণেই তাদের জন্য এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে যা হবে প্রশান্ত ও যার মধ্যে একটা কার্যকরী নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকবে। বিদ্যালয়ে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত আনন্দকর-কাজ ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

যাদেব মধ্যে গৃহ-পরিবেশের অসুস্থতা ও অস্থিরতার জন্য কিংবা দৈহিক অসুস্থতার জন্য প্রাক্ক্ষোভিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, যার ফলে পাঠ-বিষয়ে অবনতি, জীবিকার পথ বেছে নিতে অক্ষমতা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানে নানারূপ সমস্যা দেখা যাচ্ছে, এমন সব ছেলেমেয়েদের জন্য যথাযথ নির্দেশনার (*guidance*) ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্ম-পরিচালকবৃন্দ সুস্থব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং যে বিদ্যালয়ের পাঠ-ক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক কর্মকাণ্ড এমন ভাবে প্রণীত ও প্রবর্তিত যে, নবযুবকদল এতে নিজেদের সার্থক ক'রে তোলার যথার্থ সুযোগ পায় এবং যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষকদের সহানুভূতিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত সাহায্য পায়, সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা অপসঙ্গতি কম দেখা দেয়। এ বিষয়ে বিদ্যালয়কে অবশ্যই গৃহ ও অন্যান্য সমাজ-সংস্থার সাহায্য নিতে হবে। এ ছাড়া, এদের জন্য যৌন শিক্ষার ব্যবস্থাও করা দরকার। যৌন-কৌতূহলের স্বাস্থ্যসম্মত নিবৃত্তির উপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নব যুবক-যুবতীদের এ বিষয়ে আলোকিত করা যেতে পারে।

।। নবযুবকাল ও তার চাহিদা ।।
(Adolescence and its needs)

নবযুবকালে দৈহিক ও মানসিক যে বিকাশ ঘটে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শরীর ও মনের কতকগুলি নূতন চাহিদা দেখা দেয়। এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি না হলে ব্যক্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়, মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, ফলে নানাবিধ অপসঙ্গতির উদ্ভব ঘটে।

এই চাহিদাগুলিকে মোটামুটি আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি—(ক) শারীরিক চাহিদা, (খ) মানসিক চাহিদা।

দৈহিক বিকাশ ও বৃদ্ধি যে হারে এই সময়ে হয়ে থাকে, তার সঙ্গে সমতা রেখে চলতে গিয়ে নবযুবকযুবতী অধিকতর সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা অনুভব করে। এই খাদ্যের চাহিদা ঠিকভাবে পরিতৃপ্ত না হলে এই সময়ে অপুষ্টিজনিত নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা দেয়। এছাড়া, মুক্ত বায়ু, রোদ ও প্রকৃতির অকৃত্রিম দান পর্যাপ্তভাবে প্রয়োজন। ব্যায়াম, খেলাধুলা, অবাধ ও পর্যাপ্ত দৈহিক সক্রিয়তা ব্যক্তির এই সময়ে প্রয়োজন।

॥ মানসিক চাহিদা ॥

॥ ১ ॥ **আত্ম-অবগতির চাহিদা :** দৈহিক বিকাশ-বৃদ্ধির তীক্ষ্ণতাহেতু ব্যক্তির মধ্যে একটা নতুন শিহরণ ও চাঞ্চল্য আসে—একটা অতৃপ্তি ও অস্থির ভাব তাকে উদ্বেল ক'রে তোলে। সে নিজেকে অধিকভাবে জানতে চায়। তার জন্ম-বৃত্তান্ত, তার শক্তি-সামর্থ্য, পরিবার ও সমাজে তার স্থান, এ সব বিষয়ে জানার জন্য সে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই আত্ম-অবগতির চাহিদা পিতামাতা ও শিক্ষকের দ্বারা যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত।

॥ ২ ॥ **স্বাবলম্বনের চাহিদা :** শিশু জন্মক্ষণ থেকে তার মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য সম্পূর্ণভাবে মাতাপিতার উপর নির্ভরশীল থাকে। সমস্ত বিষয়েই সে পিতামাতার মতামতের উপর নির্ভর করে। নবযুবকালে তার মধ্যে এক নূতন পরিবর্তন আসে। দৈহিক দিক্ থেকে তার বিকাশ এমন একটা পর্যায়ে পৌছে যখন সে নিজেকে তার চারিদিকের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমকক্ষ বলে মনে করতে আরম্ভ করে। এতদিনের পরনির্ভরশীলতা থেকে সে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে। সে সব বিষয়েই আত্মনির্ভর হতে চায়। এই স্বাবলম্বনের চাহিদা যথার্থভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। এই সময়ে পরিবারে ও বিদ্যালয়ে তাকে ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব দিয়ে, তার মতামতকে মর্যাদা দিয়ে, ব্যক্তি হিসাবে তাকে যথার্থ সম্মান দেখিয়ে তার এই মানসিক চাহিদার পরিপূরণ করা উচিত।

॥ ৩ ॥ **আত্মসম্মানের চাহিদা :** এই সময় আত্ম-সম্মানবোধ যুবকযুবতীদের মধ্যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়। নিজের সম্বন্ধে নিজের মূল্যায়নের প্রয়াস আরম্ভ হয়। সামান্য আঘাত বা অপমান তাদের মর্ম-পীড়ার কারণ হয়। পরিবারে ও সমাজে তার অস্তিত্বের যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, এ সম্বন্ধে সে স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে। এই সময়ে দৈহিক শাস্তি বা সকলের সম্মুখে হেয়কারী কথা বা মতামত, তাকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে। এই আত্মসম্মানের চাহিদা যথার্থভাবে পরিপূরণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হতে পারে।

॥ ৪ ॥ **আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদা :** নবযুবকযুবতীরা তাদের আচার-আচরণ ও বিভিন্ন কর্ম-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সর্বদা নিজদিগকে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিদ্যালয়ে পাঠবিষয়ে, খেলাধুলা, শিল্প-সৃষ্টি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজেদের সকলের মধ্যে

প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই চাহিদাটির পরিতৃপ্তির উপর সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন বহুলাংশে নির্ভর করে।

॥ ৫ ॥ **অজানাকে জানার চাহিদা ঃ** বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ এই সময়ে একটা পরিণতিতে এসে পৌছে। নব যুবকযুবতীদের কৌতূহল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সে জীবন ও জগৎকে নতুন উদ্যম নিয়ে জানতে চায়। প্রকৃতির ঘটনা-প্রবাহকে তারা আর কেবল যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মনে করে না—এই ঘটনা-প্রবাহের অন্তরালে যে সত্য নিয়ত ক্রিয়াশীল, তাকে জানতে চায়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি তাকে আকৃষ্ট করে। এই অজানাকে জানার প্রয়াস ও উদ্যম এদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা যায়। শিক্ষা-ক্ষেত্রে এর যথার্থ প্রয়োগ এদের শিক্ষাগত জীবনকে সার্থক করতে পারে।

॥ ৬ ॥ **স্বাধীনতার চাহিদা ঃ** বাল্যকালের শাসনের সীমানা ছেড়ে নব যুবক-যুবতীরা স্বাধীনভাবে চলতে চায়। নিজের সম্বন্ধে নিজেরাই ভাবতে শেখে, সকল বিষয়ে নিজের মতের দ্বারা চালিত হওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা এদের মধ্যে দেখা যায়। কোন কাজের দায়িত্ব পেলে তারা খুশী হয়, পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মতামত দিতে পারলে আনন্দ পায়।

অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিরা এই স্বাধীনতাকে কখনও স্পর্ধা, কখনও উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করেন। নবযুবক-যুবতীদের মনের এই ইচ্ছার যথার্থ মূল্যায়ন এঁরা করতে পারেন না, ফলে শৃঙ্খলাজনিত নানাপ্রকার সমস্যার উদ্ভব হয়। এই স্বাধীনতার চাহিদাকে সহানুভূতির সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে ব্যক্তিত্ববিকাশ যথার্থরূপে হতে পারে।

॥ ৭ ॥ **যৌন-চহিদা ঃ** যৌন-অঙ্গ ও যৌন-গ্রন্থির বিকাশ ও পূর্ণতার ফলে নব যুবক-যুবতীদের মধ্যে যৌন চেতনার উদ্ভব হয়। ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা এদের পেয়ে বসে। ছেলেরা সঙ্গিনী এবং মেয়েরা সঙ্গী খোঁজে। যৌন কৌতূহলও এই সময় বিশেষভাবে দেখা দেয়। যৌন জীবনের বিভিন্ন দিক্ জানার জন্য তাদের মধ্যে একটা প্রবল কৌতূহলের উদ্রেক হয়।

এই সময়ে খেলাধূলা, শিল্পচর্চা ও অন্যান্য সমাজ-সংগঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে যৌন শক্তির উদ্গতি সাধন (*sublimation*) মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত যৌন জীবন সম্বন্ধে শিক্ষাদানও বাঞ্ছনীয়।

॥ ৮ ॥ **সমাজ-সংসর্গের চাহিদা ঃ** বাল্যকালের পরিবারের গণ্ডি থেকে নব যুবক-যুবতীরা বৃহত্তর সমাজসংসর্গের চাহিদা অনুভব করে। অপরিচিতদের সঙ্গে পরিচিত হতে, সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে নিজেকে পরিস্থাপন করার জন্য তাদের মধ্যে আকুলতা দেখা দেয়।

বিদ্যালয়ের নানাবিধ সংগঠনমূলক যৌথ কাজকর্ম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজ-সেবামূলক কাজকর্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নব যুবক-যুবতীদের এই চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো যায়। বস্তুতঃ সমাজ জীবনযাপনের শিক্ষায় এই সময়টাই যথার্থ কাল।

॥ ৯ ॥ **নৈতিক চাহিদা:** শিশুর মধ্যে উচিত-অনুচিত বোধ থাকে না। শৈশবকালে আত্মসুখের জন্য তার কর্মপ্রয়াস নিয়োজিত হয়। ভালমন্দ বিচার তার পিতামাতা ও অভিভাবকদের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নৈতিক মান তার মধ্যে তখন সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না।

নবযুবকালে বুদ্ধি-পরিপাকক্রিয়ার সমাপনে যুবক-যুবতীরা যুক্তিগ্রাহ্য বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে। বৃহত্তর সমাজ ও আত্মিক কল্যাণের পটভূমিতে তার ভালমন্দ বিচার করার প্রয়াস আরম্ভ হয়। আপন নৈতিক মানের মাপকাঠিতে তারা নিজের ও অন্যের কাজকর্মের বিচার বিশ্লেষণ ক'রে থাকে।

এই নৈতিক বোধ পরিমিত না হলে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। আবার নৈতিক মান যদি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব হয়, তা হলে স্বাভাবিক কাজেও তীক্ষ্ণ অপরাধবোধ নানারূপ মানসিক দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটায় ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে।

॥ ১০ ॥ **আদর্শের চাহিদা:** নব যুবক-যুবতীরা এই সময়ে বীরপূজার একটা চাহিদা অনুভব করে, কোন ব্যক্তিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ক'রে তার মতাদর্শে চলার একটা প্রবণতা এদের মধ্যে দেখা দেয়। সমাজনৈতিক রাজনৈতিক ও ধর্মদর্শন বিষয়ক প্রশ্নাদি এদের মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি করে। বিহ্বলভাবে সে একটা জীবনাদর্শের চাহিদা অনুভব করে।

সুস্থ জীবনাদর্শ গড়ে ওঠার জন্য গৃহ-পরিবেশে ও বিদ্যালয়ে একটা সুস্থ পরিবেশ রচনা করা দরকার। এ ছাড়া, পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে যদি সদাদর্শ থাকে, তা হলে তাঁদের জীবন-দর্শন ও জীবনভঙ্গী নব যুবক-যুবতীদের সুস্থ জীবনাদর্শ গঠনে অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে। বস্তুতঃ এই সময়ে একটি জীবনভঙ্গী ও জীবনাদর্শ গ্রহণ করার সময়। পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন-ধারা, মূল্যবোধ ও আদর্শ, নবযুবক-যুবতীরা এই সময়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে, প্রশ্ন করে,—পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাঁদের সম্বন্ধে যে প্রত্যাশিত সার্বিক মানস-ছবিটি শৈশবকাল থেকে শাশ্বত মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে, তাকে যাচাই করতে শেখে, পিতামাতার আচার-আচরণকে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করে। প্রত্যাশিত (*role-expectation*) মানস মূর্তি থেকে যদি পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার জীবন-ধারা, ভাবনা-চিন্তা, আচার-আচরণ বিক্ষিপ্ত হতে থাকে (*role frustration*), তাহ'লে সন্তানের, ছাত্রছাত্রীদের এই নবযুবকালে হতাশা পেয়ে বসে। আর এই হতাশা কখনও বা নবযুবককে আক্রমণধর্মী ক'রে তোলে, কখনও বা হতাশায়, ব্যর্থতায়, ঘৃণায় জর্জরিত ক'রে তোলে। আর এ থেকে ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা প্রকার অশুভ ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পিতামাতা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নবযুবক-যুবতীরা তাদের প্রত্যাশিত মানস মূর্তি থেকে ভ্রষ্টা দেখলে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদিষ্ট যে সব নীতি-নির্দেশ, সামাজিক পটভূমিতে তাদের মেনে চলার কথা তাদের ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হয়, একদিকে সমস্ত সামাজিক নীতি-মান ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা, অন্যদিকে সামাজিক প্রকল্পগুলোকে মেনে চলার ইচ্ছা (যে ইচ্ছা পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ভালবাসার জন্য ও তাঁদের আদিষ্ট

বলে) দ্বন্দ্বজর্জ্জর করতে থাকে, এ যেন যাকে ভালবাসা তাকেই আবার ঘৃণা করা (*ambivalence*), আর এর জন্য দ্বন্দ্ব ও বিক্ষেপ।

এই কারণে, পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদর্শনিষ্ঠ জীবনধারা, সন্তান ও ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ জীবনের জন্য সব সময়েই অপরিহার্য, নবযুবকালে এর প্রয়োজন যেন আরও বেশী ক'রে অনুভূত হয়।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

ভূমিকা : এই সময়ে জীবন ও জগতের সঙ্গে
সঙ্গতি রেখে চলতে নানা সমস্যা দেখা যায়।

নবযুবকালের পরিবর্তনঃ

দৈহিক পরিবর্তন→ নালীবিহীন গ্রন্থির সক্রিয়তা—শারীরিক বিকাশ। স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ। যৌনগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন।

মানসিক পরিবর্তন→ আবেগ বা প্রক্ষোভগত জীবনে পরিবর্তন। আত্ম-নির্ভর হওয়ার চেষ্টা ও দ্বন্দ্ব। দেহ-মনে আন্দোলন। মানসিক দিক্ থেকে নবযুবকাল শৈশবের পুনরাগমনের মত।

নবযুবকালের সমস্যা→ ১। দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধি ও দৈহিক স্বাস্থ্য-জনিত সমস্যা :—হঠাৎ দেহের অসমবিকাশ ও তার সমস্যা। গুটিয়ে নেওয়া বা আক্রমণধর্মিত। যৌন চেতনার উন্মেষ ও মানসিক অস্থিরতা।

২। মানসিক প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সমস্যা : —বিষয় নির্বাচনের সমস্যা। উন্নত ও ক্ষীণবুদ্ধি-সম্পন্ন ছাত্রদের সমস্যা। শিক্ষা-নির্দেশনা না দেওয়ার সমস্যা। উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের অতি অভিলাষজনিত সমস্যা। বিভিন্ন গ্রন্থির অতিমাত্রিক ও নিম্নমাত্রিক কাজ ও তার সমস্যা। শারীরিক রোগ ও বিকৃতি নানা সমস্যা নিয়ে আসে।

৩। প্রক্ষোভঘটিত সমস্যাবলী :—স্নায়ু ও গ্রন্থির কাজে বিকৃতি ও পরিবেশের উদ্দীপক। প্রক্ষোভ জীবনে সাময়িক বিশৃঙ্খলা। দিবাস্বপ্ন, বদমেজাজ, ঝগড়া করা প্রভৃতি সংলক্ষণ।

করণীয় :— শিক্ষক অভিভাবকদের এই সময় সজাগ, সহানুভূতিশীল ও স্নেহার্দ্র দৃষ্টি। বিদ্যালয়ে প্রশান্ত পরিবেশ, সুনিয়ন্ত্রিত কাজ ও খেলাধুলা। নির্দেশনা—সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মপরিচালক শিক্ষক। পাঠক্রমে যৌনশিক্ষা।

নবযুবকাল ও তার চাহিদা→

১। শারীরিক চাহিদা ও মানসিক চাহিদা :

(১) আত্ম-অবগতির চাহিদা; দৈহিক বিকাশ বৃদ্ধির তীক্ষ্ণতা, নিজের সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা।

(২) স্বাবলম্বনের চাহিদা : বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমকক্ষ বোধ, পরনির্ভরতা থেকে আত্ম-নির্ভরতা।

(৩) আত্ম-সম্মানের চাহিদা : তীক্ষ্ণ আত্ম-সম্মান বোধ।

(৪) আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদা : পাঠ্য বিষয়, খেলাধুলা শিল্প-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

(৫) অজানাকে জানার চাহিদা : কৌতূহল বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করা।

(৬) স্বাধীনতার চাহিদা : পরিবারে বিদ্যালয়ে স্ব-শাসিত হতে চায়, এই স্বাধীনতার চাহিদাকে যথার্থ মূল্য দেওয়া।

(৭) যৌন চাহিদা : যৌন-চেতনার উন্মেষ, উদ্গতি সাধন।

(৮) সমাজ সংসর্গের চাহিদা : পরিবার থেকে সমাজে, বিদ্যালয়ের সংগঠনমূলক যৌথ কাজ।

(৯) নৈতিক চাহিদা : শিশুর আত্ম-সুখ থেকে আত্মিক চেতনায় উত্তরণ, বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা, নৈতিক মান ও মানসিক স্বাস্থ্য।

(১০) আদর্শের চাহিদা : সুস্থ জীবনাদর্শ, সুস্থ গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ।

॥ অনুশীলনী ॥

1. Show your acquaintance with some of the common behaviour problems of adolescent students. How would you tackle them ?
2. Discuss some of the basic problems of adolescence. Indicate your own ideas regarding the guidance of the adolescent.
3. Give a brief account of some problems of maladjustment of adolescent students to their academic and social surroundings.
4. State problems of adolescence. Why are the symptoms of many abnormalities first observed in the adolescent ?
5. Briefly describe the importance of keeping the Mental Health of the adolescent sound.

6. Indicate the measures you would adopt for keeping the Mental Health of an adolescent sound.
7. Mention the chief characteristics of the mind of the adolescent and suggest the procedure you would adopt for guiding him for his mental health.
8. What are the chief characteristics of the mind of the adolescent ? Discuss the importance of Mental Hygiene in adolescence.
9. How do you explain the emotional disturbances that you experienced during adolescence ?
10. List as many differences as you can observe between childhood behaviour and adolescent behaviour.
11. Discuss the needs of the adolescent. How can they be satisfied ?
12. Why is adolescence called the period of 'stress & strain' ? How can the adolescent get rid of this stressed condition ?

নবম অধ্যায়
যৌন-শিক্ষা
[Sex-Education]

যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :

ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের শান্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য যৌন জীবনের সুস্থতা অসুস্থতার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যৌন-জীবন কেবলমাত্র বংশরক্ষার সঙ্গেই জড়িত নয়—যৌন-শক্তি আধুনিক মনঃসমীক্ষণের মতানুসারে যৌন-মানস-শক্তি (*Psycho-sexual-energy*) বা জীবন-শক্তি ; সমস্ত কর্মপ্রবাহের অগোচর উৎস। এই যৌন-শক্তির উদ্গমন ও রূপান্তরের মধ্যেই ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা, শান্তি ও সৌন্দর্য নির্ভরশীল। শিল্প-চর্চা, সাহিত্য-প্রীতি, সমাজ-সেবা, সঙ্গীত, দর্শন ও ধর্মাচরণ সবই অনেকাংশে যৌন শক্তির উদ্গতির মধ্য দিয়ে ঘটে। জীবনে শিল্প বা জীবনকে শিল্পায়িত করা কখনই সম্ভব নয় যদি যৌন জীবনের মধ্যে শৃঙ্খলা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা না থাকে। পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র যৌন-জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে যৌন-শক্তির যে সার্থক ব্যবহার হয়, তার মধ্য দিয়েই সুস্থ জীবন যাপনের ভিত্তি স্থাপিত হয় ও যথার্থ মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়। প্রাক্ষোভিক (*emotional*) জীবনের সঙ্গে যৌন-জীবনের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ব্যক্তিত্বগঠনে যৌনজীবনের সুস্থতা অসুস্থতা বহুলাংশে দায়ী।

যৌন জীবনের বিকৃতি মানসিক বিকৃতি নিয়ে আসে—সমস্ত জীবনধারার মধ্যে একটা অস্বাস্থ্য ও বিকৃতি আনে। যৌনবিকৃতি ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে। একদিকে যথার্থ শিক্ষা দ্বারা সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ না ঘটলে ও অন্যদিকে যৌন-জীবনের সুস্থতা ও অসুস্থতার নির্ণায়কগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে, ব্যক্তির মধ্যে যৌন বিকৃতি নিয়ে আসতে পারে। এই অবস্থা ব্যক্তির মধ্যে কালে নানা প্রকার মানসিক বৈকল্য নিয়ে আসবে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষুণ্ণ করবে।

বিভিন্ন বিকাশ-স্তর ও যৌন-জীবনের বৈশিষ্ট্য :

যৌন-জীবনের সুস্থতা অসুস্থতার উপর সমাজ-জীবনের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য নির্ভর করে। সমাজে যৌন শৃঙ্খলা না থাকলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। বিকৃত রুচি, বিকৃত জীবনধারণ সমাজ-সংহতিকে বিনষ্ট করে।

নবযুবকালের প্রধান বিকাশ বৈশিষ্ট্য হল তার যৌন-বিকাশ। এই বিকাশকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় পরিচালিত না করা যায়, তা হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ ক্ষুণ্ন হয়—মানসিক স্বাস্থ্যের বিপর্যয় ঘটে। ডঃ জোনসের মতে ব্যক্তির এই সময়ে তার শৈশবকালীন যৌন-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাল্যকালের শেষার্ধে (*later childhood period*) অবদমিত যে সব যৌনস্পৃহা থাকে, সেগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সময়ে এই সব যৌন ইচ্ছা আর অবদমিত অবস্থায় থাকে না—পিতামাতা ভিন্ন অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিদের সম্পর্কেও এই সব অবদমিত যৌনেচ্ছা প্রক্ষিপ্ত হয়। এই পুনরাবৃত্তি তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। প্রথম স্তরে থাকে আত্মরতি (*auto eroticism*)। নবযুবকালে স্ব-কাম (*self-love*) দেখা দেয়, যখন যুবক-যুবতীরা গোপনে স্বীয় অঙ্গচর্চ্চা ও প্রসাধনে মনোযোগ দিয়ে থাকে। তার পরের পর্যায়ে দেখা যায় সমলিঙ্গকাম (*Homosexual*)। নবযুবকরা যুবকদের সঙ্গে, যুবতীরা যুবতীদের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়, যে বন্ধুত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কামভাবও থাকে। এই সময়ে কামশক্তি আত্মগত তৃপ্তি ছেড়ে, বহিরভিমুখী হতে থাকে। অবশেষে ইতর-রতির (*heterosexuality*) পর্যায় আরম্ভ হয় এবং এই স্তরের কার্যকারিতা ও তার বৈশিষ্ট্য সকল স্তরের বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে ওঠে। যুবকরা যুবতীদের প্রতি ও যুবতীরা যুবকদের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ অনুভব করে।

যৌন-বিকাশের এই তিনটি পর্যায় পরপর না এসে এক সঙ্গে বর্তমান থাকতে পারে। এই সময়ে শিক্ষকের একটা প্রধান কর্তব্য যে, তিনি শিক্ষার্থীদের যৌন-জীবনের উদ্ভাসে যে যন্ত্রণা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, তাকে অনুধাবন করবেন এবং এই সময়কার যৌনজীবনের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তার মধ্যে যে কোন বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা নেই, সেটা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। আত্মরতি ও সমলিঙ্গতা এই সময়ে বর্তমান থাকলেও যে সেটা বিকৃতি নয়—স্বাভাবিক বিকাশেরই পরিণতি, এটা নবযুবকযুবতীদের সম্যকরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে। এই সময়ে নবযুবকযুবতীদের সঙ্গে বয়ঃপ্রাপ্তদের আচরণ যদি নির্দয় হয়, তা হ'লে নবযুবকযুবতীদের মধ্যে একটা দিশেহারা ও যন্ত্রণাকাতরভাব দেখা যায়, এতে মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

নবযুবকালে যৌনতা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে যৌন-শক্তি জীবনের চারিদিক পরিপ্লাবিত করে—এই শক্তিকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে জীবন সুন্দর ও সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে। নবযুবকালের শিক্ষার একটা মূল লক্ষ্য হল এই শক্তির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ। পূর্বে এইসব নবযুবকদের কঠিন দৈহিক কাজ ও খেলাধুলার মধ্যে মগ্ন রাখা হত। এর দ্বারা যৌনতার কিছু স্বাস্থ্যকর নিয়ন্ত্রণ হয় বটে, কিন্তু এরূপ দৈহিক শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়েই কেবল নবযুবকের যৌন উদ্বেলতা দূর হয় না। যৌনশক্তি

মানসশক্তি বিশেষ, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে যৌনশক্তির উদ্গমন ঘটে তার কারণ হল যে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে মানস শক্তির একটা স্বাস্থ্যকর প্রকাশ ঘটে থাকে। যৌনজ অস্বাস্থ্য থেকে মুক্তির পথ হল বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে যৌন-শক্তির উদ্গতিসাধন (*Sublimation*)।

এ প্রসঙ্গে যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। লজ্জা ও কুসংস্কার যৌন-বিষয়ে সর্বদা পিতামাতাকেও বড়দের নিস্তব্ধ ক'রে রাখে এবং এই নীরবতায় নবযুবকযুবতীরা অন্ধভাবে তাদের যৌন-কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর উৎস থেকে এই সব জ্ঞান আহরণ ক'রে পরিণামে এরা নিজেদের ক্ষতি করে। নবযুবকযুবতীদের জীবন সম্বন্ধে অনেক জানতে হবে। যৌন-বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান আহরণ করতে হলে শরীর-স্থান (*Anatomy*) ও শরীরবৃত্তিক (***physiological***) জ্ঞান নবযুবকযুবতীদের পরিচ্ছন্ন উৎস থেকে চয়ন করতে হবে। বিকৃত কথাবার্তা, যৌন-চিত্র ও অসাধু সাহিত্য প্রভৃতি থেকে যে যৌন-জ্ঞান হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে অস্বাস্থ্যকর ও বিকৃত—এই অস্বাস্থ্যকর যৌন-জ্ঞান থেকে পরবর্তী জীবনেও মুক্ত হওয়া কঠিন। সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন কোন ব্যক্তির নিকট থেকে একান্তে যৌনবিষয়ক জ্ঞান আহৃত হওয়া সমীচীন। এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত-ধর্মিতা নয়, যথাসময়ে পরিষ্কার খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা হওয়াই স্বাস্থ্যসম্মত।

যৌন-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান-দান সহজ নয়। ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে এর যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব, তার দিকে লক্ষ্য রেখে, কোন বিজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে জ্ঞানদান কঠিন নয়। এই সময়ে নবযুবকযুবতীদের মধ্যে সংশয় সন্দেহের উদ্রেক হয়, এরা এই সময়ে যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত থাকে, এ থেকে মুক্তি দিতে পারে জ্ঞানী ও সহানুভূতিশীল কতিপয় ব্যক্তি যাঁদের যৌন-বিষয়ে বিজ্ঞাননিষ্ঠ জ্ঞানদানের ক্ষমতা রয়েছে। অনেক যুবকযুবতীই এই সময়ে তাদের দেহে ও মনে কি পরিবর্তন হচ্ছে, সে সম্পর্কে সঠিক বুঝতে পারে না। ফলে, একটা শঙ্কা ও আচ্ছন্নভাবের দ্বারা আবিষ্ট থাকে—কখনও নিজেদের বিকৃত বা রোগগ্রস্ত মনে করে। যৌনবিষয়ক জ্ঞানদানে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হল, সেটা বড় কথা নয়—জ্ঞানদাতার সহানুভূতি ও খোলামন এ বিষয়ে যথার্থ উপকার করতে পারে। নবযুবকযুবতীদের কাছে এ ভাবনাটাও অনেকটা স্বস্তির কারণ যে, তাদের মত যন্ত্রণা, মনোকষ্ট ও সাময়িক অপসঙ্গতি তাদের সমবয়সী প্রায় সকলের মধ্যেই আছে এবং একজন সহৃদয় বয়স্ক ব্যক্তি তাদের এ যন্ত্রণা ও দুঃখ বোঝার চেষ্টা করছে।

॥ যৌন-শিক্ষা বলতে বস্তুতঃ কি বোঝায় ? ॥

যৌন-শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা এখনও নির্দিষ্ট নেই, ফলে যৌনশিক্ষা

সম্বন্ধে এখনও অনেক বিরোধ ও অস্বচ্ছ ধারণা বর্তমান। কারও কাছে এটা হচ্ছে বালক-বালিকার নিকট স্ত্রী ও পুরুষ যৌন অঙ্গের বৃত্তান্তসহ জন্মচক্র বিবৃত করা, কারও নিকট আবার যৌনশিক্ষা হল, বালক-বালিকা হিসাবে দেহের বিকাশবৃদ্ধির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—কারও নিকট নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গের বিকাশ এবং এই বিকাশ নবযুবকযুবতী ও স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কি ভাবে পরিবর্তন আনে, প্রাক্-বিবাহিত ও বিবাহিত জীবনের সমস্যার সঙ্গে কিভাবে সঙ্গতি রক্ষা করা যায়, এসব সমস্যার উপায় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানদানই যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য।

যৌন-শিক্ষা কেবলমাত্র মৌখিক জ্ঞানদান নয়, যৌনশিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নীরবে ভাবের আদান-প্রদানও হয়ে থাকে—শিক্ষকের নিজের যৌন-বিষয়ক ধারণা ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর মধ্যে নীরবে সঞ্চারিত হয়। যৌন-জীবনকে স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণকর ক'রে তুলতে হলে কি করা উচিত, যৌনবিষয়ে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী কি ক'রে আনা যায়, এই সব বিষয়ই হল যৌনশিক্ষার উদ্দেশ্য। এই দিক্ থেকে যৌনশিক্ষা একটা ক্রমাগত ভাষাভিত্তিক (*verbal*) ও অভাষিক বা ইঙ্গিতে (*non-verbal*) ভাব-বিনিময়, যা শিক্ষার্থীর চেতন ও অবচেতন মনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবর্তন আনে। যৌন-জীবনের সঙ্গে আবেগগত জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ফলে যৌন-জীবনের বিকৃতি বা অস্বাস্থ্য আবেগগত জীবনের সুস্থতা হানি করে, ব্যক্তিত্ব বিকাশকে ব্যাহত করে। সেইজন্য সংযমরক্ষা, দৈহিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ, ব্যক্তিত্ব বিকাশোপযোগী শৈশবকালীন পরিবেশ, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যথাযথ ভাবে মেলামেশা করা, স্বামীস্ত্রী সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর মনোভঙ্গী সৃষ্টি করতে পারে, এমন সব বিষয়বস্তু যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত।

মোটামুটিভাবে যৌনশিক্ষার বিষয়বস্তু হবে—

(১) যৌন সম্বন্ধে শরীরগত (*anatomical*) ও শরীরবৃত্তগত (*physiological*) জ্ঞান।

(২) যৌন সম্পর্কে এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে যেসব সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে, সে সম্বন্ধে সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষসাধন।

॥ যৌন-বিষয়ে শিক্ষাদাতা ॥

প্রত্যেক শিশুই যখন বড় হতে থাকে তার যৌনশিক্ষা কোন-না-কোন ভাবে ঘটে। শিশুর এ শিক্ষার স্বরূপ কি? কার কাছ থেকে এ শিক্ষা আরম্ভ হয়?

শিশু তার পিতামাতার এ বিষয়ে জ্ঞান ও প্রতিন্যাসের (*attitude*) দ্বারা যথে

পরিমাণে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া, শিশুর ও নবযুবকযুবতীদের সঙ্গে যেসব ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট, তাদের আচরণের বৈশিষ্ট্য ও যৌন বিষয়ে ভাব ও জ্ঞান শিশু ও নবযুবক-যুবতীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অনেকে যৌন-বিষয়কে জীবনের আর সব বিষয় থেকে আলাদাভাবে দেখে এবং অবচেতন মানসে যৌন বিষয় সম্বন্ধে একটা ভয় পোষণ করে থাকে—এই ভয় অনুচ্চারিত ভাবে নবযুবকদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়—এ ভাবে যৌন বিষয়ে একটা অস্বাস্থ্যকর ভয় ও শঙ্কা নবযুবক-যুবতীদের আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে ও যৌন বিষয়ে অসুস্থ প্রতিন্যাসের সৃষ্টি করে।

যৌন বিষয়ে সুস্থ মনোভঙ্গী গঠনের জন্য জ্ঞানের প্রকার :

যৌন বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োজন ; সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে জ্ঞান প্রদত্ত হচ্ছে, সেটাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। জ্ঞানদানের পদ্ধতি, নিছক যৌন-তথ্যজ্ঞান অপেক্ষা যৌন বিষয়ে প্রতিন্যাস (*attitude*) সৃষ্টিতে অধিকতর প্রভাবশালী।

এটা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর হবে যদি তার পিতামাতা যৌন বিষয়ে সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী হন এবং শৈশবে ও নবযুবাকালে যৌন কৌতুহলকে স্বাস্থ্যকর তথ্য পরিবেশন ক'রে নিবৃত্ত করতে পারেন।

পরিবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের পোযাক-পরিচ্ছদ পরা, স্নানকরা প্রভৃতি শিশু দেখে ও তার মধ্য দিয়ে যৌন পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখে। সে নিজে কোন্ দলভুক্ত, সেটাও বোঝার চেষ্টা করে। তিন বৎসর বয়সের কাছাকাছি সময়ে, শিশু নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ করে এবং সে যে নিজে ভাল ক'রে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া ও খেতে শেখার আগে মাতৃগর্ভেই বড় হয়েছে, এ জেনে পরিতৃপ্তি বোধ করে। কোন প্রাণীর জন্মবৃত্তান্ত দেখে শিশুর এ বিষয়ে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে শিশু জানতে চায় মাতৃজঠর থেকে সে কিভাবে এ পৃথিবীতে এসেছে এবং তার জন্মবৃত্তান্তে তার পিতার ভূমিকাই বা কি। এই সময়ে পিতামাতা ও শিশুর ঘনিষ্ঠ শিক্ষক শিশুকে এ বিষয়ে সহজ ভাষায় আলোকিত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন।

পিতামাতা ও শিক্ষকদের, নবযুবকালের আগমনে নবযুবকযুবতীদের দেহে, মনে ও মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তন আসবে, সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ ক'রে তাঁদের জানতে হবে যে, মেয়েরা ছেলেদের দু'তিন বৎসর পূর্বেই নবযুবকালে পৌঁছে যায় এবং ছেলেদের থেকে সব দিক্ দিয়েই মেয়েরা সম্ভবতঃ বেশী পরিপক্কতা লাভ করবে। যে সময়ে মেয়েদের নবযুবকালীন বিকাশধারা নিম্নগামী হবে, ছেলেদের বিকাশধারা তথনই দ্রুত হবে, মেয়েদের বিকাশ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পরও

কয়েক বৎসর ধরে ছেলেদের এই দ্রুত বিকাশ চলতে থাকবে, পারিণামে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে আকৃতিতে প্রায়ই বড় হয়ে থাকে। যেসব মেয়েরা প্রথম দিকে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যেসব ছেলেরা একটু বেশী বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাদের ক্ষেত্রে এই বিকাশ-পর্ব যথেষ্ট যত্ন নিয়ে লক্ষ্য করা উচিত, কারণ এই অকাল ও অসম বিকাশ নারীত্ব বা পৌরুষ সম্বন্ধে তাদের মনের মধ্যে নানাপ্রকার অসুস্থ ধারণার উদ্রেক করতে পারে।

নবযুবকালে ছেলে ও মেয়েদের এ সত্যটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে যৌনচেতনা এক সময়ে আসে না; সাধারণতঃ মেয়েদের যৌন-চেতনা কিছুটা বিলম্বে আসে এবং এই চেতনা কিছুটা ব্যাপ্ত; ছেলেদের যৌনচেতনা সেখানে কিছু পূর্বেই দেখা দেয় এবং এ চেতনা যৌনলিঙ্গের উপর বেশী নিবদ্ধ থাকে। এই সময়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে নবযুবকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের তাৎপর্য কি এবং এইসব পরিবর্তন কিভাবে সুস্থধারায় নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। নিছক যৌনাকাঙ্ক্ষাকে প্রেমাকাঙ্ক্ষা বলে ভুল ক'রে এই সময়ে নবযুবকযুবতীরা কিভাবে না বুঝেসুঝে বিবাহাদি ঘটিয়ে ফেলতে পারে যা পরিণামে অস্বাস্থ্য ও অশান্তি নিয়ে আসে—এ বিষয়ে নবযুবকযুবতীদের বুঝিয়ে দেওয়া সমীচীন। এদের বুঝিয়ে দিতে হবে অন্ধ কামার্ততা, রূপজ আকর্ষণ এবং পরিণত প্রেমাকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য কোথায়—বিবাহিত জীবন সার্থক ক'রে তুলতে হলে প্রথম থেকেই কামজ ইচ্ছাকে কিভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করা সমীচীন, সে বিষয়েও শিক্ষাদান প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী ও সংহত ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিভাবে মুখোমুখী হওয়া যায় এবং স্বামী-স্ত্রীর যথার্থ ভূমিকা কি, তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ ও তাকে উন্নত করার উপায় সম্পর্কে শিক্ষাদানও যৌন-শিক্ষা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

॥ যৌনশিক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশ ॥

যৌনবিষয়ে সন্তানদের মধ্যে সুস্থ প্রতিন্যাস (*attitude*) সৃষ্টির জন্য, পিতামাতার নিজেদের যৌনবিষয়ে সুস্থ মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। পিতামাতার নিজেদেরই শৈশব-কালীন ও নবযুবকালীন যৌনবিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, যৌন বিষয়ে যদি তাদের একটা অবচেতন ঘৃণা ও লজ্জা থাকে, যদি তাদের যৌনজ্ঞানের উৎস বিকৃত হয়, তাহলে এইসব বিকৃতি বয়ঃপ্রাপ্তকালে তাদের মানসিকতার মধ্যে যৌনবিষয়ে অসুস্থ ও বিকৃত প্রতিন্যাসের সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে পিতামাতা হিসাবে তাদের সন্তানদের মধ্যেও এই বিকৃত প্রতিন্যাস সংক্রামিত হয়। কাজেই প্রথমতঃ পিতামাতার কর্তব্য হবে যৌনবিষয়ে সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

যৌন শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। অধিকাংশ ব্যক্তিই 'লিঙ্গ' শব্দটি কেবল শরীরবৃত্ত ও শরীরস্থানের পটভূমিতে বিচার ক'রে থাকে। নারী ও পুরুষের পার্থক্য নির্ণায়ক হিসাবে লিঙ্গকে দেখে থাকে। কিন্তু লিঙ্গ বা যৌনের অর্থ যে আরও ব্যাপক, এ বিষয়ে পিতামাতাকে সমূহ সচেতন হতে হবে।

নারী ও পুরুষের ভালবাসা ও প্রেমের উৎপত্তি যৌন-বিকাশ থেকেই হয় এবং এ থেকেই পারিবারিক জীবনের উৎপত্তি। সমস্ত পারিবারিক শান্তি ও সুস্থতা নির্ভর করে পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ওপর—এমনিতর পরিবেশই বিকাশোন্মুখ শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ ক'রে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য, একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। কাজেই পারিবারিক পরিবেশের একটা প্রধান দিক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—যে সম্পর্ক নির্ভর করে সুস্থ যৌন জীবনের উপর। এই দিক্ থেকে যৌন-জীবনের কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী।

যৌনজ প্রেম ও ভালবাসা থেকেই শিল্পসৃষ্টি, কাব্য, সঙ্গীত, ছবি ও নৃত্য-কলার সৃষ্টি। এ ছাড়া, অনেক মহৎ কাজের উৎসও এই যৌন-শক্তি। বিজ্ঞানচর্চা, ধর্মাচরণ এ সমস্ত কিছুর মূলেও যৌনশক্তির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও উদ্গমন কাজ করে।

আবার যৌন-শক্তির অপচিতি ও অপব্যবহার কিভাবে জীবনে অসুখ ও অশান্তি নিয়ে আসে ; যৌন বিষয়ে অজ্ঞানতা, বিকৃত জ্ঞান, বা যৌনবিষয়কে জীবনের আর সব দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে দেখার মত অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে যৌন জীবনে নানাপ্রকার বিকৃতি আনে,—ব্যক্তিকে যৌনবিষয়ে ব্যভিচারী করে তুলতে পারে, এ সকল বিষয় জানাও যৌন-শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া সমীচীন। বৈজ্ঞানিক যৌন-শিক্ষার অভাবে যৌন শক্তির অতি-অবদমনের ফলে নানাবিধ মানসিক রোগ হতে পারে। যৌন শক্তির সামগ্রিক তাৎপর্য সহজ সরল ভাষায় সন্তানদের বুঝিয়ে দেওয়া পিতামাতার একান্ত কর্তব্য। কিন্তু অনেক পিতামাতাই যৌন বিষয়ে তাদের সন্তানদের সঙ্গে আলোচনায় ব্রতী হতে চান না, অথচ এঁরাই কিন্তু এঁদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নানাপ্রকার অশ্লীল গল্প ও যৌনবিষয়ে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন না। অবচেতন মনে এঁদের যৌন বিষয়ে একটা অপরাধবোধ ও লজ্জা-জড়িত ভাব থাকে—অবচেতন মানসের এইরূপ বিকৃতভাব পিতামাতার শৈশব কালের পরিবেশ-প্রতিক্রিয়ার ফল ; কাজেই পিতামাতার প্রথম কাজ যৌন বিষয়ে নিজেদের মনোভঙ্গীকে স্বাস্থ্যকর করা—এ জন্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে পিতামাতাদের জ্ঞান সঞ্চয় করা সমীচীন।

এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শিশুর যৌন-শিক্ষা একটা একক ঘটনা নয়। তার যৌনবিষয়ে প্রতিন্যাস, পরবর্তী জীবনে যৌন-বিষয়ে সংযমশিক্ষা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে যৌনশিক্ষার মধ্য দিয়ে হয় না—তার বিকাশ-পর্বে যে সব পারিবেশিক শক্তি কাজ

করে, তার সবগুলিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুর যৌন জীবনকে প্রভাবিত করে। কাজেই যৌন-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সমগ্র পরিবেশকেই পর্যালোচনা ক'রে দেখতে হবে।

॥ ক ॥ **পারিবারিক সম্পর্ক**—যদি কোন পরিবারে শিশু দেখে যে, বাবা মাকে কেবলমাত্র পরিচারিকারূপে বা দাসীরূপে ব্যবহার করে এবং বাবার যে কোন রকম নির্দেশ মা'কে একবাক্যে পালন করতে হয়, যদি সে দেখে যে সব বিষয়েই বোনদের প্রতি ভাইদের তুলনায় বিরূপ ব্যবহার করা হয়, তা হলে তাদের মধ্যে এ ধারণাটা বদ্ধ হয়ে যায় যে, স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব কেবলমাত্র পুরুষদের সুবিধা ও আরামের জন্য। এরূপ ধারণা নিশ্চিতরূপে শিশুদের পরবর্তী যৌনজীবনে সুস্থতা আনে না। এ সব ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যেও পুরুষজাতি সম্পর্কে একটা ক্ষোভের ভাব জন্মে—পুরুষদের যে কোন উপায়ে বশে রাখা ও সুযোগ পেলেই অপমানিত করার একটা প্রবণতা পরবর্ত্তী জীবনে এদের মধ্যে দেখা যায়।

প্রত্যেক গৃহে নারীপুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। ছেলেমেয়েরা পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করবে। পিতামাতা যদি নিশ্চিতরূপে ছেলে কিংবা মেয়েকে এককভাবে পছন্দ বা অপছন্দ করেন এবং সংসারে যাদের কেবল মেয়ে হয়েছে তারা ছেলের জন্য ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেন ; অথবা যাদের কেবল ছেলে আছে, তারা মেয়ের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেন, এমনি সব ক্ষেত্রে মেয়েরা পিতামাতার ভালবাসা ও মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ছেলেদের মত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে ; আবার ছেলেরা বাবা-মার মন পাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব মেয়েদের মত আচার-আচরণ করতে থাকে। পরবর্তী জীবনে এর পরিণাম দেখা দেয় স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এবং কখনও কখনও বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতেই এরা ভয় পায়। ছেলের ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্বাভাবিক পুরুষোচিত ভাব ফুটে উঠে না, আবার মেয়ের মধ্যে মেয়েদের যথার্থ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে না—ছেলের মধ্যে মেয়েলিপনা, মেয়ের মধ্যে পুরুষালি ভাব— স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনে নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

॥ খ ॥ **সংযম-শিক্ষা**—যৌন-সংযম সম্ভব হয় না, যদি শিশুদের মধ্যে অন্য বিষয়ে সংযম শেখানো না হয়। যে শিশুকে পিতামাতা সর্বদা আহ্লাদ দেয় এবং সে যা চায় তাই দিয়ে থাকে— সেরকম শিশুর পক্ষে যৌন-তাড়নের মত প্রবল• তাড়নাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আত্ম-সংযম অভ্যাস করা সম্ভব নয়। পিতামাতার অত্যন্ত আদর পেয়ে পেয়ে যে সব শিশু পরবর্তী জীবনে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাতে থাকে, তাদের সম্বন্ধেই পিতামাতা শেষকালে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। শিশুদের সর্বদাই সহিষ্ণু হতে, অপরের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে এবং প্রয়োজন হলে তার জন্যে আত্ম-সুখ

বিসর্জন দিতে শেখাতে হবে। পরার্থে আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা তাদের যৌনবিষয়েও এমন একটা মনোভঙ্গীর সৃষ্টি করবে যা যৌন-জীবন ও বিবাহিত সম্পর্ককে পরবর্তী কালে সুন্দর ও সুষম ক'রে তুলবে।

॥ গ ॥ **আনন্দানুষ্ঠান**—যৌনবিষয়ে মাত্রাধিক ও অকাল চিন্তা থেকে বিরত করার জন্য শিশুকে সর্বদা তার আত্মশক্তি-বিকাশমূলক কর্ম-প্রকল্পে নিযুক্ত রাখতে হবে ; খেলাধুলা ও অন্যান্য আনন্দময় ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অবসর-যাপনকে মুখরিত ক'রে তুলতে হবে। শিশুর শক্তি যদি সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে নিছক দৈহিক যৌনতার মধ্য দিয়ে তার শক্তি অপচিত হতে পারে না।

নবযুবকালে যৌন চেতনার উন্মেষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সিনেমায় যাওয়াটা এই সময়ে একটা রেওয়াজ। সব চিত্র এই সময়ে নবযুবকযুবতীদের উপযোগী নয়—অনেক ছবি এদের মধ্যে যৌন বিকৃতি আনে, কখনও ছেলেমেয়েদের মধ্যে অকাল যৌনতার প্রাদুর্ভাব ঘটায়। বড়দের জন্য যে ছবি অত্যন্ত ভাল, সেই ছবিই ছোটদের জন্য ভাল না'ও হতে পারে। কোন ছেলে বা মেয়ে যদি অল্প বয়স থেকেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে যৌনবিষয়ক সিনেমা (যাতে অধিককাল ধরে আলিঙ্গন, চুম্বন ও অন্যান্য যৌনক্রিয়াদি থাকে) দেখে, তাহলে এই সব ছেলেমেয়ের মধ্যে অকালে যৌন-চেতনা আন্দোলিত হতে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক দিক্ থেকে যৌন সাড়া দিতে আরম্ভ করে, এ থেকেই পরে এদের মধ্যে যৌন-স্খলন আরম্ভ হয়। কাজেই শিশুদের উপযোগী নয়, এমন কোন চলচ্চিত্র শিশুদের দেখা সমীচীন নয়। এ বিষয়ে শিশু চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়—যার মধ্য দিয়ে শিশুরা নির্মল আনন্দ পেতে পারে।

॥ ঘ ॥ **সামাজিক মেলামেশা**—বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত, ছেলেমেয়েদের মেলা-মেশার মধ্যে কোন প্রকার যৌন পৃথকীকরণ করা উচিত নয়। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলা করবে। শৈশব ও বাল্যকালে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়, তা অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু বন্ধুত্বের সৌন্দর্য ও অকৃত্রিমতা অনেক পরিমাণে ম্লান হয় যদি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছেলেমেয়েদের এই সরল সহজ মেলামেশাকে বিকৃতভাবে দেখে ও এ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের সামনেই নানাপ্রকার মন্তব্য করে এবং তাদের মধ্যে যে যৌনগত পার্থক্য রয়েছে, সে সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দেয়। এ থেকে তাদের মধ্যে লজ্জা আসে ও পরস্পর মেলামেশার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। মোটের উপর শিশুদের যতদিন সম্ভব মনের দিক্ থেকে শিশুই থাকতে দেওয়া উচিত।

একটা সময় স্বাভাবিকভাবেই আসবে যখন ছেলেমেয়েরা যৌন-চেতনা অনুভব করবে—কিন্তু এই চেতনা যাতে কোন প্রকারেই অকালে না আসে, সেদিকে পিতা-

মাতা ও বাড়ীর অন্যান্য ব্যক্তিদের সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। শৈশবকালে ছেলেরা ছেলেবন্ধু, ও মেয়েরা মেয়েবন্ধু পেতে চায়, কিন্তু ছেলেদের মেয়েদের সঙ্গে মেশা, আবার মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মেশার সুযোগও থাকা চাই। শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে সর্ব পর্যায়েই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি স্বাস্থ্যকর মেলামেশা না থাকে, তাহলে পরবর্তী কালে সঙ্গতিবিধানে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

॥ ঙ ॥ **দৈহিক যত্ন**—শিশুদের দৈহিক প্রযত্ন প্রয়োজন। তাদের সুষম পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে এবং অধিক আহারে যাতে অভ্যস্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শয্যা যেন খুব কোমল বা খুব কঠোর না হয়। সকালে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পরও বিনা কাজে ছেলেমেয়েদের বিছানায় থাকতে দেওয়া উচিত হবে না। খেলাধুলা ও দৈহিক কাজ-কর্মে উৎসাহ দিতে হবে, কেননা এর দ্বারা ছেলেমেয়েদের অসুস্থ যৌন কল্পনা আসতে পারে না। খেলাধুলা ও শরীর-চর্চা যেন মাত্রাধিক না হয় ও এ যেন জোর ক'রে ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়—অনেক ছেলেমেয়ে খেলাধুলা ও শরীর-চর্চা অপেক্ষা অন্য সৃষ্টিশীল কাজে বেশী আনন্দ পায়।

॥ বিদ্যালয় ও যৌনশিক্ষা ॥

অনেক বিদ্যালয়ই যৌন-শিক্ষা বিষয়ে নেতিবাচক (*Negative*) মনোভাব পোষণ করে। এই সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বিদ্যালয় যৌন-শিক্ষার স্থান নয়। কোন কোন কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে সিডোনাই গ্রুয়েনবার্জের 'মানব জন্মের বৃত্তান্ত' গল্পাকারে শিশুদের সামনে পাঠ করা হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানব জীবনের আরম্ভকাল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও তাদের পিতা-মাতাদের এক সঙ্গে দেখানো হয়। এতে পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভাব ও জ্ঞানের অংশীদার হতে উৎসাহিত বোধ করে। কোন কোন বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'মলি বড় হচ্ছে' এই মর্মে সিনেমা দেখানো হয়—এতে থাকে মেয়েদের রজঃসৃষ্টির ঘটনা এবং এর সঙ্গে দেখানো হয় 'মানব বিকাশ' সংক্রান্ত চলচ্চিত্র, যার মধ্যে মানব বংশ উৎপাদনের বিবরণ থাকে। এটা ক্রমশঃ অনুভব করা গেছে যে, শিশুদের জুনিয়ার হাইস্কুল স্তরে পৌঁছাবার পূর্বেই অর্থাৎ যৌনচেতনা আসার পূর্বেই ও যৌনবিষয়ে সজ্ঞান কৌতূহল প্রকাশের পূর্বেই, এই সব বিষয়ে জ্ঞানদান করা সমীচীন।

স্বমেহন প্রভৃতি বিষয়ে যৌথ আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ছাড়া, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রভৃতি দেখিয়ে ও এ সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা ক'রেও এ সময়কার যৌন-সমস্যার সমাধানের পথ দেখানো যায়। সার্থক ও অসার্থক বিবাহিত জীবনের জন্য কি কি গুণ-দোষ কত পরিমাণে কাজ করে, এ সব বিষয়ের পুস্তকাদি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাছে এনে দিতে হবে। এছাড়া রজঃসৃষ্টির বৃত্তান্ত, মেয়েদের দৈহিক

পরিবর্তন ও এর সঙ্গে মাতৃত্বের সম্বন্ধ ; এসব বিষয়েও ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে জ্ঞানদান প্রয়োজন, যাতে এইসব ঘটনাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকর দৃষ্টিকোণ থেকে ছাত্ররা বিচার করতে শেখে।

যৌন-শিক্ষা মূলতঃ সুস্থ বিবাহিত জীবনের প্রস্তুতিপর্ব এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে একটা নীতি ও শালীনতা বজায় রেখে চলার শিক্ষা। এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য বিশেষ ক'রে উপন্যাস, কবিতা ও নাটক প্রভৃতি বিষয় থেকে শিক্ষক তথ্য সংগ্রহ ক'রে ছাত্র-ছাত্রীর মানস লোক উন্নত ও পরিশীলিত করতে পারেন ; শ্রেণীর ছাত্ররা যখন যৌন-শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করবে, তখন মহৎ লেখকদের সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, সমাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের মননে তাদের সমস্যাকে বিশ্লেষিত ক'রে দেখাবেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব এমন উন্নত ও মার্জিত হবে যে, সেই পরিবেশ ছাত্রদের মধ্যে একটা উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচির উন্মেষ ঘটাবে। বৃহত্তর পটভূমিতে নরনারী সম্পর্কের মধ্যে নিস্বার্থপরতা, সত্যাচার, মহৎ অনুভূতি আনয়নই যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য। কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ যৌনবিষয়ক জ্ঞানদানই বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য নয় ; কাজেই বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষার পাঠক্রম একদিকে যেমন যৌনবিষয়ে শরীরবৃত্তগত পরিবর্তন ও তার কারণ, যৌন বিকার ও তার কুফল সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান দেবে—অন্যদিকে মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে প্রেম, প্রীতি ও নিস্বার্থপরতা আছে, সে সম্পর্কেও ছাত্রদের সচেতন ক'রে তুলবে। ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রীতিপূর্ণ মনোভঙ্গীর সৃষ্টি ও পরবর্তী কালে দাম্পত্যজীবনকে সুন্দর ও মহিমমণ্ডিত করার জন্য স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কেও ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন ক'রে তুলতে হবে। এছাড়া, খেলাধুলা, শিল্পচর্চা, সংগঠনমূলক কর্মপ্রয়াস, ভ্রমণ ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের যথাযথ ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখতে হবে। এ সব বিষয়ে অংশগ্রহণ ক'রে শিক্ষার্থীরা সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পাবে—যৌনশক্তির সার্থক উদ্গতি সম্ভব হবে।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা→	যৌন-শক্তির উদ্গমন ও রূপান্তর ; যৌন জীবনে শৃঙ্খলা ; প্রক্ষোভগত জীবন ও যৌন-জীবন ; যৌন-জীবনের বিকৃতি, মানসিক বিকৃতি আনতে পারে।
বিভিন্ন বিকাশ-স্তর ও যৌন-জীবনের বৈশিষ্ট্য→	ডঃ জোন্সের মতে নবযুবকালে শৈশবকালের যৌন-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে ; আত্মরতি—সমলিঙ্গতা-ইতর রতি। শিক্ষকের কর্তব্য ঃ এই সময়কার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করা ঃ সহৃদয় আচরণ ; যৌন-শক্তির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ; সৃষ্টিধর্মী কাজ ;

যৌন-শিক্ষা ; শরীর-বৃত্তিক জ্ঞান ; খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা ; নবযুবকযুবতীদের সংশয়, সন্দেহ দুশ্চিন্তা ; যৌন বিষয়ে জ্ঞানদানের পদ্ধতি শুধু নয়—জ্ঞানদাতার সহানুভূতি ও খোলা মন।

যৌন-শিক্ষা কি ?→

যৌন-শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত ; যৌন-শিক্ষার লক্ষ্য—বালক-বালিকা হিসাবে দেহের বিকাশ-বৃদ্ধি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ; প্রাক্‌-বিবাহ ও বিবাহিত জীবনের সমস্যা ; নবযুবকযুবতী ও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক ; যৌন-শিক্ষা ভাষাভিত্তিক ও ইঙ্গিতে ভাব-বিনিময় ; যৌন-জীবন ও আবেগগত জীবন।

যৌন বিষয়ে শিক্ষাদাতা→

যৌন বিষয়ে পিতামাতার জ্ঞান ও মনোভাব শিশুকে প্রভাবিত করে ; যৌন বিষয়ে ভয়।

যৌন বিষয়ে সুস্থ মনোভঙ্গী গঠনের জন্য জ্ঞানের প্রকার→

জ্ঞানদানের পদ্ধতি ; নিছক তথ্য-জ্ঞান অপেক্ষা যৌন বিষয়ে সুস্থ প্রতিন্যাস (attitude) সৃষ্টি অধিকতর প্রভাবশালী। কি পরিবেশে শিশুর মধ্যে যৌন-জ্ঞানের উন্মেষ হয় : তিন বৎসর বয়স—নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ—মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম—প্রাণীর জন্মবৃত্তান্ত থেকে জ্ঞান। পাঁচ ছয় বৎসর—পিতামাতার ভূমিকা তার জন্মবৃত্তান্তে—মাতৃজঠর থেকে কিভাবে তার আসা—এসব বিষয় জানতে চায়—শিক্ষক ও পিতামাতা সহজভাবে আলোকপাত করতে পারে। নবযুবকালে ছেলে-মেয়েদের বিকাশগতি ; নবযুবকালে ছেলেমেয়েদের যৌন-চেতনায় পার্থক্য ; যৌনাকাঙ্ক্ষা ; প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও বিবাহিত জীবন।

যৌন-শিক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশ→

পিতামাতার কর্তব্য যৌন-বিষয়ে সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ; 'যৌন' শব্দটির ব্যাপকতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া ; নারী-পুরুষের ভালবাসা ; স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—সুস্থ যৌন-জীবন—শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ; যৌন-শক্তির উদগমন ও নিয়ন্ত্রণ। যৌন-শক্তির অপচয় জীবনে অশান্তি আনে। যৌন-শক্তির সামগ্রিক তাৎপর্য সন্তানদের বুঝিতে দিতে হবে ; যৌন-শিক্ষা ও সমগ্র পরিবার পরিবেশ ও বিকাশপর্ব।

(ক) পারিবারিক সম্পর্ক→	স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব কেবল পুরুষদের সুবিধার জন্য এরূপ ধারণা শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীতে অসুস্থতা আনে—অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়।
(খ) সংযম শিক্ষা→	গৃহে নারীপুরুষের সমান অধিকার থাকবে; অপরের জন্য আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতে হবে—সকল বিষয়ে শিশুকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতে হবে—সব বিষয়েই সংযম শিক্ষা দিতে হবে।
(গ) আনন্দানুষ্ঠান→	যৌন বিষয়ে যাতে অহেতুক ও অত্যধিক চিন্তা না আসে, সেজন্য খেলাধুলা ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান করতে হবে। নবযুবকালে (adolescence) যৌন-উত্তেজক চলচ্চিত্র বর্জন; শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণ।
(ঘ) সামাজিক মেলামেশা→	বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে মেলামেশা করবে। অকালে যাতে যৌন-উত্তেজনা না আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সব পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক মেলামেশা দরকার।
(ঙ) দৈহিক যত্ন→	সুষম খাদ্য, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও সৃষ্টিশীল কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে হবে—দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার সব ব্যবস্থা করতে হবে।
বিদ্যালয় ও যৌন-শিক্ষা→	যৌন-চেতনা আসার আগেই মানব-বিকাশ ও বংশ উৎপাদন সম্পর্কে চলচ্চিত্র। বিবিধ যৌন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে চলচ্চিত্র ও পুস্তক। যৌন-শিক্ষা সুস্থ বিবাহিত জীবনের প্রস্তুতিপর্ব ধর্ম, সাহিত্য ও ইতিহাস পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে উন্নত মানসিকতার উন্মেষ। শারীর-বৃত্তগত পরিবর্তন ও তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা ও এর সঙ্গে সঙ্গে সহ-পাঠক্রমের প্রবর্তন।

॥ অনুশীলনী ॥

1. Write an essay on Sex Education.
2. Discuss the place of Sex Education in the school curriculum. How should it be imparted to the children?
3. Critically discuss the importance of Sex Education in the life of the adolescent. Formulate a comprehensive programme of Sex Education for the adolescent.
4. Write with your own comments about the uses and the abuses of Sex Education.

দশম অধ্যায়

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা

[Problem Behaviour and Delinquency]

সমস্যামূলক আচরণের স্বরূপ :—

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা এখন একটা বহু-আলোচিত সমস্যা। বিদ্যালয়ে ছাত্ররা নিয়ম-শৃঙ্খলা আর আগের মত মানছে না, এ রকম একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। তা ছাড়া, পরীক্ষার হলে চেয়ার-টেবিল ভাঙ্গাচোরা, এরকমের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা সকলেই অবহিত। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিদ্ ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার সমস্যাটিকে নানাদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ ক'রে দেখার প্রয়াস করছেন। এ রকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ছাত্ররা কেন করে? এর যথার্থ কারণগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা হচ্ছে। ছাত্রদের আচরণ যদি বিদ্যালয় ও সমাজপ্রেক্ষিতে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তা হলে নিশ্চয়ই সেটা বিদ্যালয় ও সমাজের পক্ষে একটা সমস্যা। কেননা, কতিপয় ছাত্রের এরূপ আচরণ শ্রেণী-কক্ষের, বৃহত্তরভাবে সমগ্র বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করে; গৃহেও যদি কোন ছেলের আচার-আচরণ অস্বাভাবিক ও বিকৃত হয়, তা হলে সার্বিক গৃহ-পরিবেশের সুস্থতা ও শান্তি বিঘ্নিত হয়। কাজেই এ দিক্ থেকে সাধারণভাবে উচ্ছৃঙ্খল আচরণকেই সমস্যামূলক (*Problem behaviour*) আচরণ বলা যেতে পারে। তাছাড়া, এসব আচরণ পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট একটা গভীর সমস্যারূপে দেখা দেয়।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা :

কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিচারে, সমস্যামূলক আচরণ হল একটি পরিণতি, আচরণকারীর ব্যক্তিত্ববিকাশ স্বাভাবিক পথে না হওয়ার পরিণাম। ব্যক্তিত্ববিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের কোন-না-কোন স্তরে, তার কোন-না-কোন প্রকার জটিলতা বা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং এর পরিণতি হিসাবেই উচ্ছৃঙ্খল বা সমস্যামূলক আচরণ তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। কাজেই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, সমস্যামূলক আচরণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ-পর্যায়ে সমাজীকরণের (*socialization*) জন্য যে সব অন্তর্জাত ও বহির্জাত প্রভাব ক্রিয়ারত, তার কোনটির অভাব বা বিকৃত কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত। এখানে ব্যক্তিত্ববিকাশের পর্যায়গুলি কি, ব্যক্তিত্ববিকাশ কিভাবে হয়, ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝায়, এ সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। সহজভাবে বলা যায়, শিশু যখন জন্মায়, তখন সে দৈহিক ও

মানসিক কতকগুলি নিহিত শক্তি-সামর্থ্য, দৈহিক ও মানসিক গঠন ও প্রকৃতি, কতকগুলি মানসিক প্রবণতা, প্রবৃত্তিগত ইচ্ছা নিয়ে জন্মায়। এইসব নিহিত শক্তি একদিকে উপযুক্ত খাদ্য, আশ্রয়, পরিণমনের (*maturation*) মধ্য দিয়ে স্ফুরণ লাভ করে ; পরিবেশের প্রভাব-প্রকৃতি অনুসারে স্ফুরণ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত সীমা পর্যন্ত কখনো হয়, কখনো প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে বিকাশ ও স্ফুরণ প্রত্যাশিত সীমা পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই স্তব্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া, পরিবেশের প্রভাবে আবেগ-প্রবৃত্তির উপর সংযম, নিয়ন্ত্রণ-শিক্ষা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ, আবেগ-প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণকে অবিন্যস্ত ক'রে তোলে, আবার বিপরীত দিক্ থেকে পরিবেশ সংযত ও বিন্যস্ত হলে, শিশুর আবেগ ও প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাস দেখা যায়, বিকাশ সুস্থ ও সাবলীল হয়ে ওঠে। শিশুর নিহিত শক্তি-সামর্থ্য ও আবেগ-প্রবৃত্তির ও পরিবেশের প্রভাব নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে সার্বিক দেহ-মানসের অবয়ব-প্রকৃতিটি গড়ে উঠে ও এর প্রকাশ-রূপে যে স্বাতন্ত্র্য ও অদ্বিতীয়তা ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা, আচার আচরণ, প্রতিন্যাসে মূল্যবোধ প্রতীত হয়, তার সামগ্রিক রূপ-রেখাই তার ব্যক্তিত্ব। কাজেই ব্যক্তিত্ব-বিকাশ দুটি শক্তির—একদিকে শিশুর নিহিত ও সহজাত শক্তি ও প্রকৃতি ও অন্যদিকে পরিবেশের মধ্যে যে নিহিত নিয়ম ও রূপান্তরণের শক্তি তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটে। কাজেই আচার-আচরণের স্বাভাবিকতা বা বিকৃতি, শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশেরই পরিণাত।

সাধারণ ধারণা হল, উচ্ছৃঙ্খল আচরণই অসামাজিক আচরণ। উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এমন একটা বিকৃত আচরণ, যা পরিবার ও সমাজের আচরণের বিধিবদ্ধ ধারা থেকে আলাদা। মনস্তাত্ত্বিক দিক্ থেকে এ আচরণকে বলা হয় সংলক্ষণপূর্ণ আচরণ (*symptomatic act*) বা বিকৃত উপায়ে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার অপপ্রয়াসপূর্ণ আচরণ (*pseudo-adjustive act*)। দৈহিক রোগ হলে যেরূপ রোগীর মধ্যে কতকগুলি রোগের সংলক্ষণ বা অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পায়, যেমন, দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে নানাপ্রকারের বিকার দেখা দেয়, অনেক সময় সে আবোল-তাবোল বকে, ঠিক সেইরকম, মানসিক কোন প্রকার বিকৃতি হলে ব্যক্তি নানাপ্রকার বিকৃত আচরণ করে (*symptoms*)। মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতাই সমস্যামূলক আচরণ এবং দুষ্ক্রিয়তার কারণ। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, তার নিজের কাছেও কিন্তু এরূপ আচরণ একটা সমস্যা। তার সমস্যা হল যে, তার ব্যক্তিত্ব সুস্থধারায় বিকাশ লাভ করছে না—বাইরের অবাঞ্ছিত প্রভাব তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি অবাঞ্ছিত চেহারা নিয়ে এসেছে যে, সে তা দিয়ে যথার্থভাবে পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। সে নানা কৌশল অবলম্বন ক'রে

অস্বাভাবিক পথে সমাজ-পরিবার-পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থতা ও হতাশার সম্মুখীন হচ্ছে (*Pseudo-adjustive behaviour*)।[১]

এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যামূলক আচরণ আমরা কোন্ কোন্ আচরণকে বলবো ? উচ্ছৃঙ্খল আচরণই কি কেবল সমস্যামূলক আচরণ ? যে সব ছেলেমেয়েরা সমস্যামূলক আচরণ ক'রে থাকে, তাদের আমরা বিপথগামী ছেলেমেয়ে বলতে পারি। যাদের মধ্যে বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম, তারাও এক দিক্ থেকে সমস্যাকারী শিশু—কেননা বুদ্ধির স্বল্পতাহেতু তারা এমন সব আচার-আচরণ ক'রে থাকে, যাকে আমরা সমস্যামূলক আচরণ বলতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ এসব ছেলেমেয়েদের আমরা পশ্চাদ্গামী (*Backward or subnormal*) শিশুই বলে থাকি, বিপথগামী (*problem*) শিশু বলি না। যাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ বিশেষ ক'রে প্রক্ষোভগত বিকাশ (*emotional development*) ও সমাজগত বিকাশ (*social development*) বিকৃত ধারায় হয়েছে অর্থাৎ যারা অসুস্থ ও বিকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন (*abnormal*), তাদেরকেই আমরা বিপথগামী শিশু (*problem children*) বলে থাকি।

পিতামাতা, শিক্ষক ও মনশ্চিকিৎসকগণ সমস্যামূলক আচরণের স্বরূপ এবং এর গুরুত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। শিশুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দৈনন্দিন যোগাযোগ রক্ষা ক'রে যাঁদের চলতে হয়, যেমন পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক, তাঁরা মনে করেন যে, সেই আচরণকেই সমস্যামূলক আচরণ বলা হবে, যে আচরণ তাঁদের কর্তৃত্ব, নির্ধারিত আদর্শ ও কর্মতালিকাকে অগ্রাহ্য ক'রে খেয়াল-খুশীমত চলে। কিন্তু মনশ্চিকিৎসক, যাঁরা শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নন, তাঁদের কাছে উপরি-উক্ত প্রকারের আচরণ ছাড়া আরও কতকগুলি আচরণ আছে, সমস্যামূলক আচরণ হিসাবে যাদের অনিষ্টকারিতা ও বিপদ আরও অধিক। এঁদের মতে, অত্যধিক বশংবদভাবে বা নতুন কোন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, অস্বাভাবিক ভয় ও দুশ্চিন্তা, সব সময় জড়সড় হয়ে থাকা প্রভৃতি আচরণ ও সমস্যামূলক আচরণের পর্যায়ে পড়ে।

॥ সমস্যামূলক আচরণের প্রকার ॥

বিপথগামী শিশুদের, বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে শ্রেণীকরণ (*classification*) করার চেষ্টা করেছেন। সিরিল বার্ট (*Bart, C.*) এদের প্রধানতঃ দু'টি শ্রেণীতে

১। 'The complaint behaviour or problem behaviour or symptom, is the expression of the underlying problem and represents an unacceptable or inadequate solution to difficulties in adjustment'.—Loutitt, C. M : Clinical Psychology of Exceptional children.

ভাগ করেছেন—(১) আক্রমণধর্মী সমস্যামূলক শিশু (*Aggressive type*), (২) চাপা ও অত্যধিক শঙ্কাপরায়ণ (*Repressed type*) সমস্যামূলক শিশু। আক্রমণধর্মী বিপথগামিতা সাধারণতঃ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাদের প্রতি একটা নেতিবাচক মনোভাব (*Negativism*), যে সকল নিয়মশৃঙ্খলা পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে বর্তমান, সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা (*Obstinacy*), সম্পত্তি ও মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙ্গাচোরা (*Destructiveness*), মারধর করা (*Assault*), চুরি করা (*Stealing*), না বলে-কয়ে বিদ্যালয় বা বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া (*Truancy*), সহপাঠীদের সঙ্গে সর্বদা ঝগড়াবিবাদ করা (*Quarrelling*), বিকৃত যৌন আচরণ (*sex offences*) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

চাপা ও শঙ্কাপরায়ণ সমস্যামূলক (*repressed type*) আচরণের অন্তর্ভুক্ত হল অত্যধিক ভয় (*excessive fear*), দুশ্চিন্তাপরায়ণতা (*excessive anxiety*), বিছানায় প্রস্রাব করা (*Enuresis*), অনিদ্রা (*Insomnia*), অত্যধিক বশংবদ (*submissive*) হয়ে যাওয়া, নূতন কোন পরিস্থিতি থেকে গুটিয়ে নেওয়া (*withdrawal*), পাঠবিষয়ে অমনোযোগিতা (*Absentmindedness*) প্রভৃতি।

॥ সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার সম্বন্ধ ॥

এই সব সমস্যামূলক ও বিপথগামী আচরণের সঙ্গে দুষ্ক্রিয়তার (*delinquency*) সম্বন্ধ কি? সমস্যামূলক আচরণকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা থেকে বলা যেতে পারে যে, দুষ্ক্রিয়তা সমস্যামূলক আচরণেরই একটা দিক্। আক্রমণধর্মী সমস্যামূলক আচরণগুলি যখন আইনের আওতায় আসে এবং দেশজ আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় বলে সাব্যস্ত হয়, তখনই আমরা সেইসব আচরণকে দুষ্ক্রিয় আচরণ (*delinquency*) বলে আখ্যায়িত করি। তা হলে কৈশোর কালের সেইসব অস্বাভাবিক আচরণকেই দুষ্ক্রিয় আচরণ বলা যায়, যা যথার্থভাবে পরিদৃষ্ট হয় (*overt*) এবং যে সব আচরণ সামাজিক দিক্ থেকে বিধিবহির্ভূত, সামাজিক শান্তি ও সমতা নষ্টকারী এবং তদুপরি দেশের বিধিবদ্ধ আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় বলে নির্দিষ্ট। বস্তুতঃ, শৈশবে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ-স্তরে যদি কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক এসে ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বিকৃত ও পঙ্গু ক'রে রাখে, তাহ'লে নানাপ্রকার অপসঙ্গতিমূলক আচরণের উদ্ভব ঘটে—এইসব অপসঙ্গতি দূরীকরণের জন্য যদি প্রথমাবস্থাতেই মনোযোগ না দেওয়া যায়, তাহলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বের বিকৃতি ও অসুস্থতা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, এইসব ছোটখাট অপসঙ্গতি থেকেই দুষ্ক্রিয় আচরণ (*delinquent behaviour*) দেখা দেয়।

মনস্তাত্ত্বিক দিক্ থেকে সমস্যামূলক আচরণের সঙ্গে দুষ্ক্রিয় আচরণের কোন তফাৎ নেই—সাধারণভাবে, অপরাধমূলক আচরণ সমস্যামূলক আচরণেরই একটা

দিক্। কেবলমাত্র দেশের প্রচলিত আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দুষ্ক্রিয় শিশুদের অন্যান্য সমস্যামূলক আচরণকারী শিশুদের থেকে আলাদা ক'রে দেখা হয়।

॥ অল্পবয়সী দুষ্ক্রিয় আচরণ ॥

দুষ্ক্রিয়তা (*delinquency*) শব্দটির দ্বারা আমরা বুঝি কর্তব্যকর্মে অবহেলা বা কোন প্রকার দুষ্ক্রিয় কাজ—কিন্তু এ শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর দ্বারা আমরা কেবল শিশু ও তরুণদের (৭—২১ বৎসর) "আইনে দণ্ডনীয়" দুষ্ক্রিয় কর্মকেই বুঝি। একজন বয়স্ক দুষ্কৃতিকারীকে আমরা *delinquent* বলে বুঝি না। দুষ্ক্রিয়তার (*Juvenile-delinquency*) সম্পূর্ণ সমস্যাটি উদ্ভূত হয়েছে এই জন্য যে, সামাজিক ও ব্যবহারিক দিক্ থেকে অল্পবয়স্ক দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে একটা বিশেষ মনোভঙ্গী নিয়ে চলতে হয়, শাস্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক ক'রে তোলার একটা প্রচেষ্টাও চলতে থাকে।

মনশ্চিকিৎসকের নিকট শৈশবকালীন দুষ্ক্রিয় আচরণের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। মনঃসমীক্ষকদের মতে ভবিষ্যতের অপরাধপরায়ণতার কারণ শৈশবকালেই নিহিত থাকে। সাত বৎসরের পূর্বে যে অসামাজিক আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা যায়, সেটা আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় বা বিচার্য নয়, কিন্তু মনশ্চিকিৎসকের নিকট এরকম আচরণের সঙ্গে দণ্ডনীয় আচরণের চরিত্রগত কোন প্যার্থক্য নেই। আমাদের দেশে ৭ বৎসর থেকে ১১ বৎসর বয়স্ক যে কোন অসামাজিক আচরণকারী ও আইন-ভঙ্গকারীকেই দুষ্কৃতিকারী (*delinquent*) বলে আখ্যায়িত করা হয়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মানসিক ও দৈহিক পরিপক্কতার (*maturation*) সীমায় পৌঁছুবার বয়স ২১—২২। সেইজন্যই এইসব অপ্রাপ্তবয়স্ক দুষ্কৃতিকারীদের একটা বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত করা হয় এবং এদের বিশেষ যত্ন সহকারে দেখাশোনা করতে হয়। কোন কিশোর অপরাধীকেই সংশোধনকারী বিদ্যালয়ে (*Reformatory school*) রাখা হয় না, যখনই তার বয়স আঠার বৎসরে পৌঁছে। কিন্তু কিশোর অপরাধীদের বন্দীশালায় ১৫ থেকে ২১ বৎসরের অনেক দুষ্কৃতিকারী অবশ্য থেকে যায়—পুনর্বাসন ও প্রশাসনের দিক্ থেকে সুবিধা হয় বলেই নিছক ওদের এখানে রাখা হয়।

সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর মধ্যে যদি অস্বাভাবিক ও অসামাজিক আচরণ পরিলক্ষিত হয় এবং সাত থেকে বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুরা যদি অসামাজিক আচরণ করে, তা হলে তাদের বাড়ীতে রেখেই, শিশু নির্দেশনা চিকিৎসালয়ের (*Child Guidance Clinic*) সাহায্য নিয়ে শুধরে নেবার চেষ্টা করা হয়। এই দুই

বয়সের ছেলেমেয়েদের গোষ্ঠীকেই সাধারণভাবে *Problem children* বা সমস্যামূলক আচরণকারী শিশু বলা হয়। ৭—১৫ বৎসর বয়স্ক দুষ্কৃতিকারী তরুণদের নির্দিষ্ট বিচারালয়ে (*Juvenile Courts*) বিচার করা হয় এবং শাস্তি হিসাবে এদের সংশোধনাগারে (*Reformatories*) প্রেরণ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রায় ১৫টি সংশোধনাগার (*Reformatory Schools*) আছে। সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাবার পর ছেলেদের পরবর্তী প্রযত্নের জন্য কতকগুলি সংস্থাও আছে। ১৫ বৎসর থেকে ২১ বৎসরের দুষ্কৃতিকারীরা, সাধারণতঃ আইনের বিচারে প্রাপ্তবয়স্ক দুষ্কৃতিকারীদের অপেক্ষা, কোন বিশেষ ব্যবহার পায় না—এরাও কারাগারে প্রেরিত হয়ে থাকে। কারাগার কর্তৃপক্ষ যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তাহলে এইসব অপ্রাপ্তবয়স্ক দুষ্কৃতিকারীদের বিশেষভাবে পরিচালিত কারাগারে (*Juvenile Jails*) পাঠিয়ে দিতে পারেন।

॥ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দুষ্ক্রিয়তা ॥

অনেক মনশ্চিকিৎসকের মতে ব্যক্তির অতি শৈশবকালীন পরিবেশের মধ্যেই দুষ্ক্রিয়ার কারণ নিহিত থাকে। সামাজিক, নীতিবোধ ও অর্থনৈতিক সম্পর্কযুক্ত সকলপ্রকার প্রভাবই একসঙ্গে ব্যক্তির পারিবারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই প্রভাব যদি অস্বাস্থ্যকর হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভাবী দুষ্ক্রিয়ার বীজ উপ্ত হয়ে থাকে। মনশ্চিকিৎসক ও শিশু-নির্দেশনা-চিকিৎসালয় (*Child Guidance Clinic*) সমস্যাসৃষ্টিকারী বিপথগামী শিশুদের এই ভাবেই বিচার ক'রে থাকে। এই সত্যের উপর ভিত্তি ক'রেই মনশ্চিকিৎসকগণ সমাজকর্মীর সাহায্য নিয়ে পিতামাতাকে যথার্থভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলতে চান। এঁরা সন্তান প্রযত্নে পিতামাতার মধ্যে সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া সমীচীন, শিশুর মৌলিক চাহিদা কি, এই সব চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি কি ভাবে ঘটানো যায়, এ সব বিষয়ে পিতামাতাকে তথ্য পরিবেশন করেন ও শিক্ষিত ক'রে তোলেন। এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে পিতামাতা গৃহ-পরিবেশটিকে সুন্দর ও সুস্থভাবে রচনা করতে পারেন, যে পরিবেশ বস্তুতই শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে অটুট ও সুদৃঢ় রাখতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে শৈশবকালে শিশু যে মানসিক আঘাত পেয়েছে, তাকে দূর করার জন্য এঁরা মানসিক চিকিৎসা করবেন। অন্যান্য মানসিক বিকৃতির মত দুষ্ক্রিয়াতেও এ প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিলভাবে দেখা দেয় যে, বংশধারা (*Heredity*) ও পারিবেশিক প্রভাব (*Enviroment*), এর কোন্‌টা দুষ্ক্রিয়ার জন্য অধিক পরিমাণে দায়ী। দুপক্ষেই এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি আছে, এবং বংশধারার প্রভাবের উপর

জোর দেন এমন ব্যক্তির সংখ্যাই বেশী। দুষ্ক্রিয়া-রোধে বংশধারার প্রভাবের উপর আমাদের হাত খুবই কম, সেজন্য দুষ্ক্রিয়া থেকে কোন ছেলেকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমরা খুবই হতাশা বোধ করি। কিন্তু বস্তুতঃ আমরা জানি পারিবেশিক প্রভাব ও বংশধারার প্রভাব এরা উভয়েই ব্যক্তিত্ব-গঠনে কাজ করে এবং কে দুষ্ক্রিয়া করবে আর কে করবে না, সেটাও এই দুই শক্তিই সমন্বিতভাবে নিরূপণ করে। কাজেই বংশধারার প্রভাব রোধ করতে না পারলেও, পারিবেশিক প্রভাবকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ব্যক্তিত্বকে অনেকটা সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনা যায়। সম্পূর্ণ সুস্থ বংশধারা নিয়ে জন্মেও কোন ছেলে যদি চোর-গুণ্ডাদের মধ্যে গিয়ে থাকে ও লালিত হয়, তাহলে তার মধ্যে দুষ্ক্রিয়া দেখা দিতে পারে—কিন্তু যেহেতু এ ক্ষেত্রে দুষ্ক্রিয়ার কারণ সম্পূর্ণরূপে পারিবেশিক—সেইহেতু ছেলেটিকে এরূপ পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যদি উন্নত ও সুস্থ পরিবেশে কিছুকাল রাখা যায়, তা হলে কিছুদিনের মধ্যে ছেলেটির দুষ্ক্রিয়ার প্রবণতা অনেক পরিমাণে কমে গিয়ে সুস্থতা ফিরে আসতে পারে। কিন্তু যেখানে এর কারণ সম্পূর্ণভাবে বংশধারাজনীত, সেখানে দুষ্কৃতিকারীকে সুস্থ ক'রে তোলা অপেক্ষাকৃত কঠিন—মনশ্চিকিৎসক ও সমাজকর্মীদের (*Social worker*) আন্তরিকতা ও নিপুণ চিকিৎসা-জ্ঞান সহকারে পরিচর্যা ও প্রযত্নই এরকম দুষ্কৃতিকারীকে সমাজ-নির্ধারিত আচরণপথে ফিরিয়ে আনতে পারে—অনেকটা সুস্থ ক'রে তুলতে পারে।

এক প্রকারের দুষ্কৃতিকারী আছে, যারা জন্মের সঙ্গে এমন একটা বিকৃতি (দেহগত কোন বিকৃত গঠন) নিয়ে জন্মায় যে, এই গাঠনিক বিকৃতি থেকে তাদের দেহগত কার্যকারিতায় (মস্তিষ্কের কোন অংশের বিকৃত কাজ ও নালীবিহীন গ্রন্থির রসক্ষয়ে বিকৃতির জন্য) বিকৃতি দেখা দেয়, মানসিক সুস্থতা বিঘ্নিত হয়, ফলে এদের মধ্যে নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়া দেখা দেয়। কখনও কখনও যথাযথ চিকিৎসার দ্বারা এরূপ গাঠনিক (*organic*) বিকৃতিকে রোধ করা যায়। এপিলেপটিক অবস্থার সঙ্গে কোন কোন প্রকারের দুষ্ক্রিয়ার একটা সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়ই এপিলেটিক আক্রমণের পর, যে একটা উদ্‌ভ্রান্ত আচ্ছন্নকারী সময় আসে, তখনই এপিলেপসি-আক্রান্ত ছেলে দুষ্ক্রিয়া ক'রে থাকে। এ সময়টা কেটে গেলে সে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। *Electroencephelography* (মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মসী চিত্রলিপি) এ বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা ক'রে এর সত্যতা প্রমাণ করেছে।

এরকম একজন অল্পবয়স্ক দুষ্কৃতিকারী ছেলে ছিল, যে বাল্যকাল থেকেই রাত্রিবেলা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে, ঘুম থেকে আচ্ছন্নভাবে উঠে বাইরে বেরিয়ে পড়তো। ঘরে যদি তালা দেওয়া থাকতো, তাহলে সে দরজা ভেঙ্গে ফেলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

করত। কেউ যদি এসে এ সময়ে বাধা দিত, তাহলে তাকে মারধর পর্যন্ত করত। এ রকম অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর, তার আচ্ছন্নভাব কেটে যেত ও মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসত। বংশধারার মধ্যে তার কতকগুলো বিকৃতি ছিল—তার মা ছিল উন্মাদ, তার এক কাকাও ছিল অত্যন্ত বদমেজাজের লোক। দুষ্কৃতিকারীর এক ভাইও অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির ছিল।

আর একটি তেরো বৎসরের ছেলে। সে মাঝে মাঝে বাবামা'র ও সহপাঠীদের টাকা-পয়সা চুরি করত এবং বাড়ী থেকে পালিয়ে টিকেট না কেটে কোন দূর দেশে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠে পড়ত। রেল কর্তৃপক্ষের বা গাড়ীর কোন লোক যদি তার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে বা তার গতিবিধি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করত, তাহলে সে নানারকম বানানো গল্প বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। কিছুদিন বাইরে ঘুরে সে বাড়ীতে একটা অনুশোচনার ভাব নিয়ে ফিরত। এই ছেলেটিরও আচ্ছন্নাবস্থা (*Fugue*) এক-নাগাড়ে কিছুদিন থাকত। এপিলেপসির চিকিৎসা ক'রে ছেলেটির আচ্ছন্নাবস্থার রোগ ও দুষ্ক্রিয়তা একই সঙ্গে চলে যায়।

আরও একটি চৌদ্দ বৎসরের ছেলে আচ্ছন্নাবস্থায় (*Fugue*) উদ্ভ্রান্তের মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ত এবং বেরিয়ে একটানা অনেকটা পথ চলত—চলতে চলতে পথে যতরকমের অসদাচরণ সম্ভব করতে থাকত। কয়েক ঘণ্টা পর হঠাৎ যেন সে 'জেগে' উঠত এবং অবাক হয়ে দেখত যে, সে একটা একেবারে অপরিচিত জায়গায় চলে এসেছে। তখন পথের লোকদের জিজ্ঞাসা ক'রে বাড়ীর রাস্তা জানার চেষ্টা করত। বাড়ী ফিরে অবশ্য ছেলেটি রাস্তার কোন ঘটনার কথা আর বলতে পারত না। রাস্তার লোকজনের কাছ থেকে জানা যেত যে, সে রাস্তায় মারধর, চুরি এবং আরও নানা প্রকারের নষ্টামি করেছে। এ ক্ষেত্রেও এপিলেপসির চিকিৎসা ক'রে ছেলেটিকে সুস্থ ক'রে তোলা হয়।

এইসব উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দুষ্ক্রিয়তায় (*delinquency*) শারীরবৃত্তগত (*Physiological*) কার্যকারিতা ও শারীরিক গঠনের বিকৃতি প্রভূত পরিমাণে দায়ী হতে পারে।

এ ছাড়া, আর এক প্রকারের দুষ্কৃতিকারী আছে, যাদের মধ্যে নৈতিক বোধ (*moral sense*) খুব অপুষ্ট বা একেবারে নেই। এদের মধ্যে বুদ্ধি যদিও স্বাভাবিক পরিমাণেই থাকে, তবু নৈতিক বোধ অবর্তমান। তবে কারও কারও মতে বুদ্ধির ক্ষীণতা ভিন্ন নৈতিক বোধের অভাব ঘটতে পারে না। প্রায়শঃই দেখা যায় যে, বুদ্ধির কমতির ফলেই এরূপ নৈতিক বোধের অভাব দেখা যায়।

নিম্নে এরূপ একটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পনেরো বৎসর বয়সের একটি ছেলে। শৈশবে সে অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিল এবং মাঝে মাঝে একটা গভীর হতাশার দ্বারাও সে আক্রান্ত হত। সে সব বিষয়েই অত্যন্ত নোংরা প্রকৃতির ছিল। অস্বাভাবিক রকমের খেতে পারত সে। তার কোনপ্রকার নীতিবোধ ছিল না। সে সহপাঠীদের বই, কলম প্রভৃতি চুরি করত ; চিঠি ও চেক্ জাল ক'রে একটা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টাও সে করেছে। সে বুঝতেই পারত না যে, সে কোন রকম অন্যায় কিছু করছে। বুদ্ধি পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, তার বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে কিছু কম। তার বংশধারা থেকে দেখা যায় যে, তার প্রথম এক ভাই অপরিণত ও বিকৃত দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মাবার কিছুকাল পরেই মারা গিয়েছিল। তার আর এক ভাই ছিল একজন মদ্যপ। তার এক কাকাও ছিল মদ্যপায়ী। তার ঠাকুরদাদাও ছিল মদ্যপ এবং ঠাকুরদাদার এক ভাই উন্মাদ ছিল।

এপিলেপ্‌সি থেকে যে দুষ্ক্রিয়তা তার চিকিৎসা করা যেত, কিন্তু বংশধারাজনীত যে নীতিবোধহীনতা ও তজ্জনিত যে সব দুষ্ক্রিয়া, তাকে চিকিৎসার দ্বারা সারিয়ে তোলা যেত না। এহেন দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে প্রায়ই বুদ্ধির স্বল্পতা থাকে এবং এর সঙ্গে বাতুলতার (*Psychosis*) নানারূপ লক্ষণও দেখা যায়। মনশ্চিকিৎসার দ্বারা এদের সারিয়ে তোলা প্রায়ই খুব দুঃসাধ্য হয়, কারণ রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করা দরকার, তা এরা ক'রে উঠতে পারে না। অন্যান্য সমস্যামূলক শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ ঘটে না—তারা মনশ্চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব দেখায়।

॥ দুষ্ক্রিয়তার সামাজিক দিক্ ॥

মনস্তাত্ত্বিক দিক্ থেকে দুষ্ক্রিয়তা এক প্রকারের রোগ-সংলক্ষণ (*symptom*)। মানসিক অসুস্থতার প্রকাশ ঘটে এই দুষ্ক্রিয় আচরণের মধ্য দিয়ে। মানসিক অসুস্থতার মধ্যে উদ্বায়ু (*Psychoneurosis*) ও বাতুলতাও (*Psychoses*) পড়ে, কিন্তু এইসব অস্বাভাবিক আচরণ সামাজিক বিধিবদ্ধ নিয়ম কাঠামোর মধ্যে ভাল বা মন্দ হিসাবে বিচার করা হয় না। কিন্তু দুষ্ক্রিয়তা সর্বদাই সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়ম-কানুনে বিচার্য। এইসব সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়ম-কানুনকে ভেঙ্গে ফেলা ও আক্রমণ করা দুষ্ক্রিয়তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাজেই দুষ্ক্রিয়তার সঙ্গে সমাজের একটা বিশেষ যোগ আছে।

বস্তুতঃ ব্যারণের (*Barron*) মতে সেই শিশুকে বলা হবে দুষ্কৃতিকারী, যে শিশুর সমাজসঙ্গতি-সাধনের ধরন সমাজ-নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত।[১]

॥ দুষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ॥

দুষ্ক্রিয়তার সমস্যাটিকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে, দুষ্কৃতিকারীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে বোঝা দরকার। গোষ্ঠীভুক্তভাবে দুষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যগুলি জানা থাকলে, কোন একজন বিশেষ দুষ্কৃতিকারীর সমস্যা আরও গভীরভাবে প্রণিধান করা যেতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের আরও বৈজ্ঞানিক পটভূমিতে পর্যালোচনা করা যায়—এদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও যথাযথভাবে করা যেতে পারে।

বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবিদ্ দুষ্কৃতিকারীদের অনেকগুলি গোষ্ঠীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এঁদের মধ্যে হিলি (*Healy*), বার্ট (*Burt*) এবং গ্লুয়েক (*Glueck*)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মতে **দুষ্কৃতিকারীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল**ঃ (১) শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ দুষ্কৃতিকারীদের বুদ্ধি কম। (২) প্রাক্ষোভিক (*emotion*) দিক্ থেকে এরা অত্যন্ত অস্থির। (৩) বিদ্যালয় সম্বন্ধে এদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বৈরিতাপূর্ণ। (৪) এদের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ শৈশবকাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়। (৫) সামাজিক দিক্ থেকে দুষ্কৃতিকারীরা একেবারে একাকী নয়; কেননা প্রায়শঃই এরা এদের মত দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে একটা গোষ্ঠী ও সমাজ সৃষ্টি ক'রে থাকে। (৬) (ক) দুষ্কৃতিকারীরা প্রায়শঃই নীচ মানের সমাজ ও আর্থিক স্তর থেকে আগত ও নিম্ন নৈতিকমানসম্পন্ন পরিবার থেকে উদ্ভূত হয়। (খ) যে সব পরিবারে পারিবারিক সম্বন্ধ সুস্থ নয় অর্থাৎ পিতামাতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ অত্যন্ত কুৎসিৎ রূপ নেয়, পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ প্রভৃতি দেখা দেয়, সেই সব পরিবার থেকেই দুষ্কৃতিকারীরা বেশী আসে। (৭) দুষ্ক্রিয়তা সেই সব অঞ্চলে বেশী ক'রে দেখা যায়, যে সব অঞ্চল রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে সংহতি হারিয়ে ফেলেছে।

দুষ্ক্রিয়তার প্রকারভেদ:

জে, এ, হেড্ফিল্ড (*J. A. Hadfield*) দুষ্ক্রিয়তাকে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুসারে চারভাগে ভাগ করেছেন—

(ক) নির্দোষ দুষ্ক্রিয়তা (*Benign Delinquencies*)।

১। "Delinquent is a child whose pattern of adjustment deviates from the code of conduct society is attempting to enforce."

—Barron, M. H. The Juvenile in Delinquent Society.

(খ) মেজাজগত দুষ্ক্রিয়তা (*Temperamental Delinquencies*)।

(গ) সাধারণ দুষ্ক্রিয়তা (*Simple Delinquencies*)।

(ঘ) প্রতিক্রিয়ামূলক দুষ্ক্রিয়তা (*Reaction Delinquencies*)।

॥ ক ॥ **নির্দোষ দুষ্ক্রিয়তা :** নির্দোষ দুষ্ক্রিয়তা বলতে সেই সব আচরণ বোঝায়, যেগুলোকে সামাজিক দিক্ থেকে দুষ্ক্রিয়তা বললেও, মানসিক স্বাস্থ্যের দিক্ থেকে দুষ্ক্রিয়তা বলা চলে না। যেমন, কোন ছেলে রাস্তায় ফুটবল খেলছে, এখন রাস্তায় ফুটবল খেলে পথচারীদের অসুবিধা সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই সামাজিক দিক্ থেকে ও পৌর আইনের দিক্ থেকে অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু যে এরূপ আচরণ ক'রছে সে তো নির্দোষ আনন্দলাভের জন্য করছে, তার মনের দিক্ থেকে কোন প্রকার জটিলতা নেই। কোন ছেলে হয়তো জাহাজ দেখার জন্য বন্দরের নিষিদ্ধ এলাকা অতিক্রম ক'রেই চলে গেল। এখানে ছেলের মন অসুস্থ নয়, তার আকাশচুম্বী মনই তাকে আইন অমান্য করায়। এটা নির্দোষ দুষ্ক্রিয়তা।

॥ খ ॥ **মেজাজগত দুষ্ক্রিয়তা :** এর মূল কারণ শরীরবৃত্তগত কার্যকলাপের মধ্যে কোনপ্রকার চ্যুতি বা বিকৃতি। যেমন, শর্করার ভাগ রক্তে অত্যন্ত কমে গেলে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে। এছাড়া, নালীবিহীন গ্রন্থির রস নিঃসরণে যে সমতা থাকা প্রয়োজন, সে সমতা যদি (*Endocrene glands*) কোন বিশেষ একটি গ্রন্থিরসের বিকৃত কার্যকারিতার জন্য নষ্ট হয়, তা হলেও প্রাক্ষোভিক দিক্ থেকে একটা অসাম্য ও মেজাজের মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দেয়। এই অস্থিরতার মধ্যে শিশু নানাপ্রকারের দুষ্ক্রিয় কাজ করতে পারে। এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির মাত্রাধিক কার্যকারিতার ফলে যে রস নিঃসরণ হয় তা শারীরিক দিকে রক্তরসায়নের মধ্যে (*Blood Chemistry*) কতকগুলি বিকৃত পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং এই বিকৃতি মানসিক কার্যকারিতাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এক্ষেত্রে, ব্যক্তি অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নানাপ্রকারের দুষ্ক্রিয়া ক'রে ফেলে। এসব ক্ষেত্রে শারীরিক বিকৃতি প্রতিরোধ করা গেলে, দুষ্ক্রিয়তাও দূর করা যায়।

॥ গ ॥ **সাধারণ দুষ্ক্রিয়তা :** সাধারণ দুষ্ক্রিয়তা তাকেই বলা হয় যা মূলতঃ পারিবেশিক প্রভাব থেকে উদ্ভূত। অতি দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবেশ, ভগ্ন পরিবার (***Broken home***), পিতামাতার মধ্যে মনোমালিন্য, নিয়ত কলহ, এমন কি উভয়ের মধ্যে সম্পর্কচ্যুতি, গৃহে অতি জনবহুলতা, পরিবারের কোন ব্যক্তির অধিক মদ্যপায়িতা, পরিবারিক উচ্ছৃঙ্খলতা, অতি আদর, অতি শাসন, কুশাসন, সন্তানের প্রতি উদাসীনতা প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয়ে ছেলেপুলে মানুষ হলে যে দুষ্ক্রিয়তার উপক্রম ঘটে তাকেই সাধারণ দুষ্ক্রিয়তা বলে।

॥ ঘ ॥ **প্রতিক্রিয়ামূলক দুষ্ক্রিয়তা :** পিতামাতার কাছ থেকে যদি সন্তান তার প্রাপ্য স্নেহ-প্রযত্ন না পায় এবং অন্যায়ভাবে অতিশাসিত ও অত্যাচারিত হয়, তাহলে তার মনের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়, সেই ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ারূপে নানা-প্রকারের বিদ্রোহাত্মক আচরণ প্রকাশ পায়। পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে যে সমস্ত বিধিবদ্ধ আচরণ-ধারা আছে, তাকে ভেঙেচুরে ফেলার নানাপ্রকারের প্রয়াস চলতে থাকে। এ প্রয়াসগুলি, সামাজিক ও দেশের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, দুষ্ক্রিয়তারূপে অভিহিত হয়।

পিতামাতা সন্তানের একমাত্র আশ্রয়—তার নিরাপত্তাবোধ নির্ভর করে পিতামাতার সামগ্রিক সম্পর্কের উপর ; অর্থাৎ পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যদি সৌহার্দ্য, পরস্পর বোঝাবুঝি ও স্থিরতা থাকে এবং শিশু যদি এটা অনুভব করতে পারে, তাহলে সে নিজেকে নিরাপদ বোধ করে। অন্যথায় পিতামাতার অসুস্থ সম্পর্ক সন্তানের মধ্যে একটা গভীর নিরাপত্তাবোধের অভাব ও তজ্জনিত দুশ্চিন্তার ভাব নিয়ে আসে। নানাবিধ দুষ্ক্রিয় আচরণের মধ্য দিয়ে দুশ্চিন্তাজনিত যে পুঞ্জীভূত আবেগ, তার প্রকাশ ঘটিয়ে সে নিজেকে কিছুটা হাল্কা করার চেষ্টা করে।

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার মূল কারণ :

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মনস্তাত্ত্বিক দিক্ থেকে দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণ সমধর্মী, উভয়েই ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিকৃতি ও তজ্জনিত মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা থেকে উদ্ভূত। একমাত্র দেশজ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি আচরণ দুষ্ক্রিয়তা বলে চিহ্নিত হয়। কাজেই দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণের কারণ বিশ্লেষণে আমরা একই কেন্দ্র-বিন্দু থেকে আলোচনা করব।

দুষ্ক্রিয়তামাত্রই সমস্যামূলক আচরণ ; কিন্তু সব সমস্যামূলক আচরণই দুষ্ক্রিয়তার পর্যায়ে পড়ে না, যদিও ক্ষীণ সমস্যামূলক আচরণ থেকে দুষ্ক্রিয়তার সূচনা।

প্রধানতঃ, সমস্যামূলক আচরণ (problem behaviour) এবং দুষ্ক্রিয়তার (Delinquency) কারণ বংশগতি ও পারিবেশিক ক্রিয়াকলাপের পরিণত ফল। কোন শিশুর আচার-আচরণ কি প্রকারের হবে, সেটা নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব কি ভাবে গড়ে উঠেছে এবং তার ব্যক্তিত্বের জন্মগত উপাদানগুলি স্বাভাবিক কিংবা বিকৃত তার উপর। ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থভাবে গড়ে ওঠে তাহলে সেই সুস্থ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে সুস্থ আচরণের মধ্যে, আর ব্যক্তিত্ব যদি অসুস্থভাবে গড়ে ওঠে তাহলে তার আচার-আচরণ হবে অপ্রকৃতিস্থ বা বিকৃত। ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে ব্যক্তি জন্মগতির দিক্ থেকে কতটা স্বাভাবিক (অর্থাৎ বংশধারাক্রমে দৈহিক ও মানসিক গঠন নিয়ে জন্মেছে) এবং শিশু

জন্মাবার পর যে সব পারিবেশিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, সেটা কতটা তার মানসিক বিকাশ বৃদ্ধির সহায়ক বা প্রতিবন্ধক, তার উপর।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, বংশগতি ও পারিবেশিক এই দুটি ব্যক্তিত্ব গঠনকারী শক্তির কোন্‌টি সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা সৃজনে অধিক দায়ী। এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে যে, বিকৃত শারীরিক গঠন নিয়ে জন্মালে বা প্রতিকূল শারীরবৃত্তিক (*Physiological*) ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মালে, শিশুর বিপথগামী বা দুষ্কৃতিকারী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে শৈশবকালীন পরিবেশ প্রভাবের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশেষ প্রভাবশালী ও কার্যকরী হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐ একই ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশে সুস্থ ও স্বাভাবিক বংশগতি নিয়ে যদি কেউ জন্মায় ও প্রতিপালিত হয়, তবে সে শিশুর মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ বা কোন প্রকার ব্যক্তিত্বের বিকৃতি দেখা যায় না। গ্লুয়েক (*Glueck*) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ সমস্যামূলক আচরণ ও নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়তা সৃষ্টিতে বংশগতি ও পরিবেশ-প্রভাব সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের শতকরা পঞ্চাশজনের পারিবারিক ইতিহাসেই নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়তা ও কঠিন অপরাধ সংঘটনের নজির রয়েছে। যদিও এ ঘটনা বংশগতির প্রভাবেই দুষ্ক্রিয়তার জন্য অধিক দায়ী বলে ইঙ্গিত দেয়, তবু এ থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কেননা, আরও বহু দুষ্কৃতিকারীর পারিবারিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বংশগতি ও পারিবেশিক প্রভাব উভয়ই সমানভাবে দুষ্ক্রিয়তার সৃজনে প্রভাব বিস্তার করে। তবে বার্ট (*Burt*), হিলী (*Healy*) এবং ব্রোনার (*Bronner*) প্রমুখ সমাজবিদ্‌ মনস্তাত্ত্বিকগণ দেখেছেন যে, দুষ্কৃতিকারীদের (*delinquents*) মাত্র শতকরা ২৫ ভাগের মধ্যে বংশানুক্রমিক বিকৃতি বা অপরাধপরায়ণতার নজির আছে। **ছোট খাটো সমস্যামূলক আচরণ বা দুষ্ক্রিয়তাতে বংশধারার প্রভাব অনেক পরিমাণে কম ; যদিও যেসব অপরাধী একটার পর একটা কঠিন অপরাধ সমাজে করে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে বংশধারার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।** এসব পরীক্ষালব্ধ সত্য থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, **পরিবেশ ও বংশগতি দুটি শক্তিই যদিও একই সঙ্গে দুষ্ক্রিয়তা বা সমস্যামূলক আচরণ সৃজনে কাজ করে, তথাপি পরিবেশের প্রভাবই বেশী কাজ করে।** কাজেই এ বিষয়ে পরিবেশের কি কি প্রভাব কাজ করছে, আমরা সেদিকেই বেশী ক'রে আলোকপাত করব। বস্তুত বংশগতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু পারিবেশিক প্রভাবকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে আমরা শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে

তুলতে পারি, যার ফলে শিশুর আচার-আচরণ সুস্থ ও সামাজিক হবে। যদি কারও কোন প্রকার সমস্যামূলক আচরণ দেখাও দেয়, তাহলেও সেটা যাতে গুরুতর আকার ধারণ করতে না পারে, তার জন্য পূর্ব থেকেই যথোচিতভাবে পারিবেশিক প্রভাবশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার কারণগুলিকে, আলোচনার সুবিধার জন্য, আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—যেমন বংশানুক্রমিক ও পারিবেশিক। এই পারিবেশিক প্রভাবকে আবার প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—যথা, (ক) পারিবারিক, (খ) বিদ্যালয়, (গ) সামাজিক।

বংশানুক্রমিক কারণ :

সাধারণতঃ খুব বড় রকমের জৈবিক কোন বিকৃতি (বংশগতি থেকে প্রাপ্ত) সমস্যামূলক আচরণকারী বা দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, এপিলেপ্‌সি রোগ যে সব শিশুদের মধ্যে আছে, তাদের অনেকেই সমস্যামূলক আচরণকারী বা দুষ্কৃতিকারী হয়ে উঠতে পারে। চিকিৎসার দ্বারা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এই এপিলেপ্‌সি রোগকে যদি সারিয়ে তোলা যায়, তাহলে দুষ্কৃত আচরণও শিশুর মধ্য থেকে দূর হয়। তবে কোন প্রকারের বড়ই হোক বা ছোটই হোক, শারীরিক বিকলাঙ্গতা যদি শিশুর মধ্যে বংশধারাক্রমে আসে, তাহলে শিশুর মনেও তার একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিশু একটা হীনমন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতাবোধ থেকে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হতে থাকে। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানাপ্রকারের অস্বাভাবিক প্রয়াস ও আচরণ করতে থাকে। এই অস্বাভাবিক আচরণগুলো সমস্যামূলক আচরণ হিসেবে দেখা দেয়। কখনও কখনও তা দুষ্ক্রিয়তা রূপেও প্রকাশ পায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, দুষ্কৃতিকারীদের বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম থাকে। বুদ্ধি যেহেতু বংশগতিপ্রসূত, সেহেতু দুষ্ক্রিয়তায় বংশগতির প্রভাবও এ সব ক্ষেত্রে বর্তমান। কোন শিশুর বুদ্ধি যদি স্বাভাবিক মাত্রায় না থাকে, তাহলে সে নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা সমাজে ভালমন্দ গ্রহণ-বর্জন করতে পারে না। এরা প্রবৃত্তি ও আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়—কুসংসর্গে পড়ে অল্প প্ররোচনাতেই বিপথে চলে যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধি স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক থেকে বেশী থাকলেও দুষ্ক্রিয়তা দেখা যায়। এ সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই দুষ্ক্রিতার অন্য সব কারণ অধিক সক্রিয় থাকে।

বংশগতি ব্যক্তিত্বগঠনে, নালীশূন্য গ্রন্থির (*Endocrene Glands*) ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে কাজ করে। এই সব গ্রন্থিরসের

কোনটির যদি স্বাভাবিক থেকে কম বা বেশী নিঃসরণ ঘটে, তাহলে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। যেমন, অ্যাড্রিন্যাল, পিটুইটারি, থাইরয়েড এবং গোনাড প্রভৃতি গ্রন্থির রস নিঃসরণের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে এবং এদের কোনটির মধ্যে যদি মাত্রাধিক সক্রিয়তা থাকে, তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অস্থিরতা, অতিকর্ম-প্রবণতা, আক্রমণাত্মক সক্রিয়তা প্রভৃতি দেখা যায়। এ থেকে সমস্যামূলক আচরণ বা দুষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে।

পারিবেশিক কারণ :

(ক) গৃহ ও পরিবার পরিবেশ—

পারিবেশিক প্রভাবকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে তার দুটি দিক দেখতে পাবো।

১। ভৌতিক পরিবেশ (*Physical environment*)।

২। মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ (*Psychological environment*)।

মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশই আমাদের যথার্থ বিচার্য, তবু ভৌতিক পরিবেশ কিভাবে শিশুর মানস-ভূমিতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে, সেটিও আমাদের লক্ষণীয় বিষয়।

ভৌতিক গৃহ-পরিবেশ ও তৎসঙ্গে তার মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য :

১। দারিদ্র্য এবং গৃহে স্থান সংকুলানের অভাব (এক বাড়িতে অনেক লোকে গাদাগাদি ক'রে থাকা)।

২। ঘন বসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বিশৃঙ্খল নগর-কোণ যে সব স্থানে বেকারী ও অসাচ্ছন্দ্য রয়েছে, সমাজ-জীবনের বাঁধন যেখানে শিথিল এবং নানাপ্রকারের অপরাধ কার্য (যেমন চুরি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি) প্রায়ই যেখানে ঘটে, সেই সব অঞ্চলে দুষ্ক্রিয়তার নজির শহরের অন্যান্য অঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা বেশী পরিমাণে দেখা যায়। কাজেই এরূপ পরিবেশ যে ব্যক্তিত্বের সুস্থভাবে গড়ে ওঠার পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে এবং দুষ্ক্রিয়তা নিয়ে আসে, এরূপ সিদ্ধান্তে আসার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে।

উপরি-উক্ত দুটি অবস্থাই ভৌতিক পরিবেশের অবস্থার কথা বলছে, যে অবস্থা দুষ্ক্রিয়তা বা সমস্যামূলক আচরণ সৃষ্টির সহায়ক। কিন্তু আমরা জানি ভৌতিক পরিবেশ মনের ওপরে যখন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায়, তখনই সেটা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। যেমন, দারিদ্র্য যদি গৃহপরিবেশে বর্তমান থাকে, তাহলে ব্যক্তিত্বকে সুস্থভাবে গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত বস্তু একান্তভাবে প্রয়োজন (যেমন, সুষম খাদ্য, যথার্থ আশ্রয়, উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, অবসর-বিনোদনের প্রয়োজনীয় সুস্থ

উপকরণ প্রভৃতি) সেগুলি যথাযথভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না—ফলে শিশুর মৌলিক দৈহিক চাহিদাগুলি মেটে না। এর দ্বারা তার দৈহিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং স্বভাবতঃই তার মানসিক বিকাশ-বৃদ্ধিও রুদ্ধ হয়। তাছাড়া, এই সমস্ত চাহিদার অপূরণজনিত যে অতৃপ্তি, তা থেকে তার মধ্যে ক্ষোভ, নিরাপত্তার অভাববোধ ও একটা হতাশার ভাব আসে। তার প্রক্ষোভের মধ্যে নানাপ্রকার জটিলতা দেখা দেয় ও পরিবার-সমাজ সম্বন্ধে একটা আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী তৈরি হয়।

সমাজ-জীবনের বাঁধুনি ও শৃঙ্খলা যদি দৃঢ় না হয়, তাহলে সেই সমাজ-পরিবেশে যে সব শিশুরা বড় হয়, তাদের জীবনকে ঠিকভাবে গড়ে তুলবার জন্য কোন স্থির আদর্শ বা লক্ষ্য তাদের চোখের সামনে থাকে না।

শিশু প্রথম অনুকরণের মধ্য দিয়েই শেখে। তার চারিদিকে সমাজ-জীবনের মধ্যে যদি সর্বদা একটা বিশৃঙ্খলা সে দেখে এবং বয়স্কদের মধ্যে চুরি, রাহাজানি এরকম নানাপ্রকারের অসাধু ও অসামাজিক আচরণ দেখে, তাহলে তারাও সে জিনিসগুলো অনুকরন করে। এইসব অস্থির ও নিয়ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে শিশুদের মানসিক স্থিরতা আসতে পারে না। সর্বদাই তাদের মনের মধ্যে একটা নিরাশ্রয়বোধ ও ভয় থাকে। কোন বিষয়েই গভীরভাবে মনোনিবেশ তারা করতে পারে না। এইসব কারণে এরূপ পরিবেশ তাদের ব্যক্তিত্বকে অসুস্থ ক'রে ফেলে, দুষ্ক্রিয়তা ধীরে ধীরে এদের মধ্যে দেখা দেয়।

মূল গৃহপরিবেশ ও পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক :

পরিবেশ বলতে আমরা কেবল বাড়ী-ঘর-দোরই বুঝি না, সেই বাড়ীর মধ্যে যাঁরা বাস করেন, তাদের পরস্পরের সম্পর্ককেও বুঝি। মনস্তাত্ত্বিক দিক্‌ থেকে এ সম্পর্কের মূল্যায়ন, এর সুস্থতা-অসুস্থতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কেননা এই পারস্পরিক সম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশকে অত্যন্ত শক্তিশালী উপায়ে প্রভাবিত করে —তার মানসিক সুস্থতা-অসুস্থতা, তার দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্য-বোধ প্রভৃতি এ সম্পর্কের হের-ফের দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়।

শৈশবকালে মানব শিশু প্রায় সম্পূর্ণভাবে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে। স্পর্শকাতর এবং অত্যন্ত নমনীয় এ সময়টিতে শিশু পিতামাতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়ে থাকে। পিতামাতাই এই সময়ে শিশুর নিকট একমাত্র আদর্শ,—তাঁদের আচার-আচরণ, চিন্তাভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী মোটের উপর তাঁদের ব্যক্তিত্ব শিশুর ব্যক্তিত্ব কি রকমের হবে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা বহুলাংশে নির্ণয় করে। অতএব গৃহ-পরিবেশে পিতা-

মাতার ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক না হয়, তা হলে এসকল পিতামাতা গৃহ-পরিবেশটিকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে রচনা করতে অক্ষম হয় এবং এই অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ বিকৃত ও রুদ্ধ হয়ে যায়।[১] মনস্তাত্ত্বিক দিক্ থেকে যে সকল মৌল উপাদানের দিকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, তাদের মধ্যে আছে (ক) পিতামাতর বিবাহিতা জীবনের সঙ্গতি বা অপসঙ্গতি, (খ) পিতামাতার সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, (গ) বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁদের নীতিবোধ ও অন্যান্য বিষয়ে সঙ্গতি রক্ষার ক্ষমতা এবং (ঘ) ভাইবোনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

পিতামাতা দুষ্ক্রিয়া বা সমস্যামূলক আচরণ নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে না করলেও তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি কোনপ্রকার অগোচর অসুস্থতা বা বিকৃতিও থাকে, তাহলেও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ বা দুষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে। প্রতিকূল গৃহপরিবেশ, বিশেষভাবে অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতামাতাই, সন্তানের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি করে।[২]

(ক) পিতামাতাই সন্তানের আশ্রয়স্বরূপ। পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা শিশুর একান্ত কাম্য। এখন পিতামাতার মধ্যে যদি সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান না থাকে, যদি তাঁদের বিবাহিত জীবনের মধ্যে অশান্তি, অস্থিরতা, ছেদ (*Temporary separation*), এমন কি বিচ্ছেদ (*Divorce*) পর্যন্ত দেখা দেয়, তাহলে সেই গৃহ-পরিবেশে (*Conditions of broken home*) শিশু অত্যন্ত নিরাশ্রয় ও অনিরাপদ (*feeling of insecurity*) বোধ করে। এই বোধ থেকে শিশুর মধ্যে যে প্রবল দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও ভয়ের সৃষ্টি হয়, সেটা তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর, তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একটি বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ। এই অবস্থা থেকে শিশুর মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধও দেখা দিতে পারে।

১। "The inadequacy of the home both emotionally and physically impairs the mental health of the growing children. There are many factors which make a home inadequate, usually the prime factor is the inadequacy of the parent.—Ford, D : The Delinquent Child and Comnunity".

২। "It is not necessary for parents to demonstrate specifically delinquent tendencies to disperse their children to delinquency or problem behaviour, any form of inadequency may result in delinquent behaviour in the children." —Ford, D.

"It is emotional instability and inability of parents to make effective relationships which are the outstanding cause of children becoming deprived of a normal home life "—Bowlby, John ; Child Care and the Growth of Love

পিতামাতা নিজেরাই যদি সর্বদা কলহ ও মনোমালিন্যে জর্জরিত থাকেন তাহলে তাঁদের পক্ষে সন্তানের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। সন্তানের মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে এঁরা অত্যন্ত উদাসীন (*Indifference*) থাকেন। ফলে, সন্তানের ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে গড়ে ওঠে না।

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ও নির্দয় হয়ে থাকেন (*Rejection & hostile attitude*)। এঁরা সব কিছুই ওপর থেকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিতে চান। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত যে চাওয়া পাওয়া, তার দিকে এঁদের কোন লক্ষ্য থাকে না। এঁরা সর্বদাই শিশুকে উপহাস করেন। অহেতুক সমালোচনা, পদে পদে বাধা এবং অধিক শাসন শিশুকে ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত করে ফেলে। এ সব ক্ষেত্রেও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে হতে পারে না—নানা-প্রকারের সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়।

কোন কোন পিতামাতা শিশুদের অত্যন্ত আদর দিয়ে থাকেন। শিশুরা খেয়াল খুশীমত যখন যা চায় তখনই তাদের সে সব সাধ তাঁরা পূরণ করার জন্য অতিপ্রয়াসী হয়ে ওঠেন। শিশু এ থেকে নিজের সম্পর্কে একটা অতি অবাস্তব উচ্চ ধারণা পোষণ করে—যে ধারণার বশবর্তী হয়ে সে নিজেকে এবং আর সকলকে বিচার করতে আরম্ভ করে। এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার মধ্যে নানাপ্রকারের সমস্যামূলক আচরণ এমনকি দুষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়।

(গ) **অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতামাতার, বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী অসুস্থ ও বিকৃত থাকে।** ফলে তাদের প্রতিযোজন (*adjustment*) প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক রূপ নেয়। এই সমস্ত অস্বাভাবিকতা তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সর্বদা প্রতিফলিত হয়। শিশুদের কাছে পিতামাতাই হল প্রথম জীবনাদর্শ (*ego-ideal*)। **পিতামাতার অসুস্থ ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের অপ্রকৃতিস্থ আচার-আচরণ** শিশুর মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে। সে জীবনে যথার্থ আদর্শ খুঁজে পায় না। এর ফলে শিশুদের আচার-আচরণ ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ও ছন্নছাড়া ভাব দেখা দেয়। এ থেকে সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে। পিতামাতার নৈতিক চরিত্র শিশুর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পিতামাতার স্বভাব চরিত্র যদি সামাজিক ও নৈতিক-শীলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত না হয়—যদি তাঁরা নিজেরাই দুর্নীতিপরায়ণ হন, তাহলে পারিবারিক জীবনের সংহতি ও পবিত্রতা নষ্ট হয়। এরূপ গৃহপরিবেশে শিশুরা অতি সহজেই দুষ্কৃতকারী হয়ে ওঠে।

মূলতঃ ভাইবোনের সম্পর্কের মধ্যে সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ণীত হয় পিতামাতার সম্পর্কের দ্বারা। পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক যদি সুস্থ থাকে এবং পরিণামে সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যদি একটা সুস্থতা ও সমতা থাকে, তাহলে ভাই-বোনদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কও সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়। কিন্তু শিশুরা যদি পিতামাতার কাছ থেকে যথার্থ পরিমাণে স্নেহ ও ভালবাসা না পায় এবং পিতামাতার মধ্যে পারস্পরিক অসৌহার্দ্য-জনক সম্পদের জন্য সর্বদাই গৃহ-পরিবেশের মধ্যে একটা অস্থিরতা ও উত্তেজনা বর্তমান থাকে, তাহলে সেই পরিবেশে প্রতিপালিত সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক:ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর আবেগ-জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা থেকে পরবর্তী কালে তাদের মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়।

বিদ্যালয়ের প্রভাব (সাধারণভাবে) ঃ

শিক্ষক যদি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্মম হন, সামান্য অপরাধে অধিক শাস্তি দেন, পদে পদে শিক্ষার্থীকে সমালোচনা করেন ও বাধা দেন, শিক্ষার্থীদের আত্মসম্মানকে অহেতুক ক্ষুণ্ণ করে কথা বলেন বা আচরণ করেন, তাহলে শিক্ষার্থীর মনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা ক্ষোভ থেকে যায়—এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একদিন নানাপ্রকার শৃঙ্খলাভঙ্গকারী আচরণের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে। এই ক্ষোভ শিক্ষকের প্রতি ক্রোধ, বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া, বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র ভাঙ্গা, শিক্ষকদের অপমান করা এ-সব দুষ্ক্রিয়তা শিক্ষকদের বিকৃত ও নির্দয় আচার-আচরণ থেকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দিতে পারে।

শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মানস-বৈশিষ্ট্যের দিকে, তার সুবিধা-অসুবিধার দিকে যথাযথ নজর না দেন, তা হলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে অলক্ষ্যে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন শিক্ষক যদি বয়সধর্ম অনুযায়ী বাড়ীর পড়া করতে না দেন, অধিক বাড়ীর পড়া দেন, যদি তা আবার শিশু বাড়ী থেকে ঠিক মত করে না আনে, তার জন্য অধিক শাস্তি দিয়ে থাকেন তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়—পড়াশুনায় তার স্বচেষ্টা, উৎসাহ প্রভৃতি তো হ্রাস পায়ই, এছাড়া নিজের সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। এ থেকে ছাত্রের মধ্যে পাঠবিষয়ে অনীহা দেখা দেয়, পাঠের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। হীনমন্যতাবোধ শিশুর মধ্যে আসে এবং এ থেকে মুক্তিলাভের জন্য সে নানাপ্রকার বিকৃত আচরণ করে থাকে ; যেমন কখনো কখনো নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেয়—কখনো-বা নিজেকে সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানাপ্রকার অপপ্রয়াস অবলম্বন করে থাকে, যা বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলার পরিপন্থী ; পরীক্ষায় নকল

করা, সহপাঠীকে মারধর করা—যারা পড়াশুনা ভাল করবে তাদের কটাক্ষ করা, শিক্ষকদের অপমানিত করা ইত্যাদি আচরণ এরা করে থাকে। শিক্ষক সম্বন্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, নানাবিধ সমস্যা শিশুর মধ্যে দেখা দেয়—মোটের ওপর শিক্ষক যদি পঠন-পাঠন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন না হন—মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ না হন, তা হলে বিষয়জ্ঞানে শিক্ষক পণ্ডিত হলেও সেই বিষয়কে পড়ানো, তাকে যথাযথভাবে পরিবেশন করার যে কলা-কৌশল, তা শিক্ষক না জানার জন্য তার পড়ানো শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন উৎসাহ ও প্রাণের সঞ্চার করবে না। এরূপ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের পাঠবিষয়ে অমনোযোগিতা দেখা দেয় এবং বয়স ধর্ম অনুযায়ী প্রাণশক্তিকে নানাপ্রকার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে নষ্ট করে—ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে বিকাশ লাভ করে না। নানাপ্রকার বিকৃতি শিশুর ব্যক্তিত্বে দেখা দেয়—সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা অবৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন থেকেও উদ্ভূত হতে পারে।

বিদ্যালয়-পরিবেশের মৌল উপাদান ও তার প্রভাব (বিশদভাবে):

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গৃহপরিবেশের পরে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে প্রভাব সর্বাধিক কাজ করে, তা হল বিদ্যালয়ের পরিবেশ। বিদ্যালয় পরিবেশ যদি সুস্থ ও খোলামেলা না হয়, শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ ও সুন্দর না হয়, তাহলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুর ব্যক্তিত্বকে তা বিকৃত করে ফেলতে পারে—বিদ্যালয় সম্বন্ধে তার একটা নেতিবাচক মনোভঙ্গী দেখা দেয়—পড়াশুনায় গভীর অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর বিদ্যালয় শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সুনিশ্চিতভাবে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী উপাদান। গৃহপরিবেশের পরেই বিদ্যালয় পরিবেশের প্রভাব শিশুর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে—দিনের অনেকটা সময়ই শিশুকে বিদ্যালয়ে কাটাতে হয় এবং শিশুর স্পর্শকাতর মন নানাবিধ প্রভাবশালী মৌলশক্তির সান্নিধ্যে আসে। আমরা বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির কথা একে একে আলোচনা করব।

॥ ক ॥ **শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ:** গৃহপরিবেশে শিশুরা পায় পিতামাতাকে। এঁরাই শিশুর একান্ত আশ্রয় ও ভালবাসার জন। বিদ্যালয়ে পিতামাতার স্থান নিয়ে থাকেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের আচার আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী, স্নেহপ্রীতি, নিয়মানুবর্তিতা, পড়ানোর বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ, বিষয়-জ্ঞান, সবকিছুই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশু-শিক্ষার্থীর মনকে আন্দোলিত ও প্রভাবিত করে।

শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের নিকট থেকে যথোপযুক্ত ভালোবাসা, উৎসাহ না পায়, তা

হলে শিক্ষক যে বিষয় পড়ান, সে সম্পর্কে এবং সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব তার মধ্যে তৈরি হয়।

॥ খ ॥ **অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম :** শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও বিকাশ পর্যায়ের সাথে সমতা রেখে যদি পাঠক্রম নির্ধারিত না হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠবিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, স্বতস্ফূর্তভাবে কোন উৎসাহও বোধ করে না। শিক্ষার্থী হয় পাঠক্রমের অধিক চাপে জর্জরিত হয়ে পড়ে, না হয় অত্যন্ত অপ্রতুল পাঠক্রমের জন্য অনেক সময় অন্যভাবে অপচিত করার প্রচুর অবসর পায়। সুস্থ ব্যক্তিত্বের জন্য যথোচিত পাঠক্রম নির্ধারণ হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। এর অভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সঠিকভাবে ঘটে না এবং নানপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ দেখা দিতে পারে।

॥ গ ॥ **সহপাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অভাব ও অত্যধিক শৃঙ্খলার চাপ :** ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের জন্য ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য পড়াশুনার সাথে সাথে বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, শিল্পচর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, যৌথপ্রয়াসে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিশুর যে প্রাবৃত্তিক শক্তি রয়েছে তার যথার্থ নিয়ন্ত্রণও হতে পারে—মানসশক্তিনিচয় সুষমভাবে বিকশিত হতে পারে। খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ পাঠক্রমিক স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে যে আনন্দ শিশু শিক্ষার্থী পায়, তা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয় এর মধ্য দিয়ে তার মৌলিক চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তিও ঘটতে পারে। তা ছাড়া, বিষয়-শিক্ষার জন্যে যে প্রস্তুতি ও আগ্রহ, সেটা একটা খণ্ডিত প্রস্তুতি বা আগ্রহ নয়। সামগ্রিকভাবে পাঠ-বিষয়ে অনীহা, কেবলমাত্র ইতিহাস বিষয়ে খুব আগ্রহ, এটা স্বাভাবিক নয়। পঠন-পাঠনের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি (Readiness) ও আগ্রহ, সেটা সামগ্রিক শিক্ষা ও শিক্ষা-পরিবেশের প্রতি মানসিক প্রস্তুতি ও আগ্রহেরই ফলশ্রুতি। আর এই প্রস্তুতি সামগ্রিক বিকাশ-বৃদ্ধি, দৈহিক-মানসিক বিকাশ ও পরিণমন (maturation) এর উপর নির্ভরশীল। এক দিকের বিকাশ, অন্য দিকের বিকাশকেও প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। শিক্ষার্থীর দেহ-মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ও প্রস্তুতি যদি কোন দিকে ব্যাহত হয়, তাহ'লে, তার প্রভাব অন্যদিকের কর্ম-প্রস্তুতি, পঠন-পাঠন পর্বে পড়বে। কাজেই খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কর্মপ্রয়াসে যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ, দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির অবতারণা হয়, সেই মানসিকতা, পঠন-পাঠন পর্বেও প্রবাহিত হয়। মানসিকতা অচ্ছেদ্য—ব্যক্তিত্ব যেমন সামগ্রিক। যে শিক্ষার্থীর মনে আনন্দ আছে, সে সব কিছুর মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পায়। খেলায় তার যে আনন্দ, পড়াতেও তার সে আনন্দ আগ্রহ ও প্রস্তুতি। অতএব

বিষয় শিক্ষা, পঠন-পাঠন পর্ব, সামগ্রিক বিদ্যালয়ের কর্মপ্রবাহ ও পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়।[১] এ সব কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে ভালবাসতে শেখে—বিদ্যালয়ের সাথে একটা একাত্মতা গড়ে ওঠে; তাছাড়া শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থী যদি বিদ্যালয়কে ভালবাসে তাহলে বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা তারা আপনা আপনি মেনে চলে—বিদ্যালয়ের কোন অগৌরব তাদের আহত করে। কাজেই সহপাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অবতারণার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে যদি শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়াস করা হয়, তাহলে তা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবেই রক্ষা করা যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে যদি এ সকল কর্মপ্রয়াসের অভাব থাকে এবং জোর করে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ওপর থেকে চাপ দেওয়া হয়, অনবরত শাস্তির ভয় দেখানো হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যালয় সম্বন্ধে ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হয়—বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা নেতিবাচক প্রতিন্যাসের (*negative attitude*) উদ্ভব হয়। এ থেকে শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠে অমনোযোগ, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, বিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলাকে ভেঙে ফেলার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তিজনিত যে অবদমিত প্রক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে যে জট (*complex*) এর সৃষ্টি হয়, তা শিক্ষার্থীর আচার-আচরণকে বিকৃত ও সমস্যামূলক করে তোলে, সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় পরিবেশকে সে ঘৃণা করে, ফলে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি নানা প্রকারের সমস্যামূলক আচরণ তার মধ্যে দেখা দেয়।

॥ ঘ ॥ **বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনার অভাব :** শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বর্তমান। একের সাথে অপরের অনেক বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও

১। Readiness in the learning situation is not readiness merely for certain subject matter. One is ready or unready for the total learning situation. Readiness depends on the over-all growth, development and maturation processes, both physical and mental, of the growing students in the schools. All aspects of development inter-act. A change in any facet of the student's readiness can alter his whole system of responses. When the normal sequence of development is interrupted in any way, effects are to be seen throughout the students' development......Sports, games and other recreational activities contribute to mental health. Recreation is a well organised human activity whose function is to recreate the individual, thus resulting in an inner state of refreshment, the state of well-being and the re-creation or is its essential feature. (Martin, P. A. Play, Racreation and Mental Health, The Encyclopedia of Mental Health. Vol. V, New York : Franklin Watts, 1963)

সার্বিকভাবে ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রভেদ থাকে। বুদ্ধি, মেজাজ, বিশেষ সামর্থ্য, রুচি, প্রবণতা পরিশ্রম করার শক্তি, অধ্যবসায়, এ সব বিষয়ে শিক্ষার্থীতে শিক্ষার্থীতে পার্থক্য কম-বেশী বর্তমান। এ সকল ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে পাঠক্রম গ্রহণে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। পাঠক্রম নির্ধারণে যদি ভুল হয়ে যায়, যদি যথাযথ পদ্ধতিতে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনা (*Educational guidance*) দেওয়া না হয়, তা হলে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে তার যথার্থ বিকাশ হয় না, ব্যর্থতা জীবনকে বিষণ্ণ করে তোলে। হীনমন্যতা ও নিরাপত্তা-বোধের অভাব, দুশ্চিন্তাজর্জরতা •প্রভৃতি শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-ক্ষেত্রে যেমন অনগ্রসরতা দেখা দেয়, সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্বের মধ্যেও নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী হয় নিজেকে সবকিছু থেকে সরিয়ে নিতে চায়, না হয় শিক্ষার্থী নিজের শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারছে না ভেবে ও অপরের দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়েছে বলে, একটা ক্ষোভ ও রাগ অনুভব করে। এই ক্ষোভ নানাপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্যের মাধ্যমে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

॥ ঙ ॥ **পরীক্ষা পদ্ধতি:** বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির উপর বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের কার্যক্রম অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পরীক্ষা গ্রহণে যদি বিদ্যালয় সতর্কতা ও আন্তরিকতা অবলম্বন না করে; পরীক্ষা নিয়ে, পরীক্ষা পত্র যদি যথাযথভাবে দেখা না হয়, তা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। আবার প্রশ্নপত্র যদি পঠন-পাঠন অনুযায়ী না হয়, তা হলেও শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা ও প্রস্তুতির যথাযোগ্য বিচার করার সুযোগ পায় না, ফলে নিজের সম্বন্ধে নিজের সঠিক ধারণা তৈরি হতে পারে না। এর দ্বারা শেষ পরিণতি হিসাবে এমন হতে পারে যে, শিক্ষার্থীরা সামগ্রিক ভাবে পড়াশুনা সম্বন্ধে বীতরাগ হয়ে উঠতে পারে—পরীক্ষা বিষয়ে যদি শিক্ষকগণ সুবিবেচনা ও পক্ষপাতহীনতার স্বাক্ষর না রাখতে পারেন তাহলে পরিণামে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে—একটা ক্ষোভ তাদের ভিতরে ভিতরে জমা হতে থাকে। এর ফলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচার-আচরণ, যেমন বিদ্যালয় হতে পলায়ন (*Truancy*), বিদ্যালয়ের-নিয়মশৃঙ্খলা নষ্ট করা, শিক্ষকদের অপমান করা, নেতিবাচক মনোভাব (*Negativism*) প্রভৃতি দেখা দেয়।

॥ চ ॥ **উচ্ছৃঙ্খল ও অসামাজিক বিদ্যালয় পরিবেশ:** বিদ্যালয়ে যদি নিয়মশৃঙ্খলা না থাকে, বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম যদি অবিন্যস্ত ও এলোমেলো হয়, শিক্ষকদের ক্লাশে যাওয়া-আসা যদি নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা পরিশীলিত না হয়, চিৎকার হৈ হুল্লোড় যদি সর্বদা বিদ্যালয়ে চলতে থাকে তা হলে শিক্ষার্থী অশান্ত ও অস্থির পরিবেশের

মধ্যে নিয়ত থেকে সমাজীকরণের (*Socialization*) সুযোগ ঠিকভাবে পায় না। বিন্যস্ত ও সুস্থ বিদ্যালয় পরিবেশ সমাজীকরণের একটি প্রধান শক্তি ও হাতিয়ার।

॥ বৃহত্তর পরিপার্শ্ব ॥

জন্মক্ষণ থেকে প্রথমে শিশু গৃহ-পরিবেশের প্রভাব শক্তির দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, পরে কিছু বড় হয়ে সে আসে বিদ্যালয়ে, আরও বড় হয়ে বিদ্যালয়ের সাথে সাথে পরিপার্শ্ব-প্রভাব দ্বারাও সে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়। পিতামাতা, শিক্ষক ভিন্নও বাইরের ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় ক্রমে অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হয় এবং এইসব ব্যক্তির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মনের উপর ছাপ ফেলে—তার দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ, সার্বিকভাবে ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। দুষ্কৃতকারী অসামাজিক কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে যদি শিশু এই সময়ে আসে, তাহলে তার কোমল ও স্পর্শকাতর মনে এই ব্যক্তির আচার-আচরণ প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে—নানাপ্রকারের আরামপ্রদ অথচ অসামাজিক চিন্তায় ও কাজে সে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নবযুবকালে এ রকম অস্বাস্থ্যকর প্রভাব ব্যক্তিত্বকে অসামাজিক ও বিকৃত করে তুলতে পারে।

এ ছাড়া পরিপার্শ্ব অবস্থার মধ্যে যদি অনেক খুনী, চোর প্রভৃতি দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি থাকে, বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, পরিপার্শ্ব অবস্থায় যদি একটা স্থির সুসমঞ্জস ও সুস্থ জীবনাদর্শ না থাকে, যদি এতে আনন্দ-আহ্লাদ প্রকাশের কোন সুযোগ না থাকে, তা হলে শিশু এরকম পরিবেশ থেকে বিহ্বল ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কেননা বিদ্যালয়ে ও গৃহে তাকে যেরকমভাবে চলতে উপদেশ দেওয়া হয়, তার চোখের সামনে সে তার কোন প্রকার চিহ্নই দেখতে পায় না, জীবনে তার কোন প্রতিফলনই দেখা যায় না। **প্রচারিত আদর্শ ও জীবনে তার অনুশীলন, এর মধ্যে যত পার্থক্য থাকে, ততই শিশুর মনে দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।** সে কেমন ভাবে চলবে, কী ভাবে ভাববে তার কিছুই ঠিক করতে পারে না। সুখান্বেষী জীবন ক্রিয়ায় সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। যুদ্ধ, মহামারী, রাজনৈতিক উত্থান-পতন কালে এরকমের অবস্থা প্রবল হয়ে ওঠে। এরকম অবস্থাই মানসিক দিক্ থেকে ছন্নছাড়া গৃহ-পরিবেশের (*Broken Home Condition*) অবতারণা করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবের জন্য দুষ্ক্রিয়তা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়, কারণ প্রতিকূল পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে পঙ্গু করে ফেলে। দৈহিক কারণেই হোক বা মানসিক কারণেই হোক, বিপথগামী শিশুর মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধ, নিরাপত্তা-হীনতা এবং পিতামাতা বা শিক্ষক-

শিক্ষিকা কর্তৃক অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মনোভাব কাজ করে। মৌলিক চাহিদা অপূর্তিজনিত ও পিতামাতার যথোচিত ভালবাসা না পাওয়ার জন্য যে গভীর ব্যর্থতা ও হতাশার ভাব মনের মধ্যে কাজ করে, তা থেকে শিশুর মধ্যে একটা গভীর ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এরা প্রক্ষোভের বিকল্প ও নিয়ন্ত্রণের দিক্ থেকে অপরিণত থেকে যায়। আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রায়ই পিতামাতা, বিদ্যালয় ও সমাজের উপর প্রতিফলিত হয়। এরা বাইরে যে সব অপরাধপরায়ণ ব্যক্তি থাকে তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকে, অসামাজিক ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করতে ভালবাসে। যখন যা মনে হয় তাই করে ফেলে, বিবেক-নির্দেশ মানার মত মানসিক সংহতি এদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না।

দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণ উদ্ভবের কারণ :

বংশধারা ও পরিবেশের উপাদান

(সংক্ষিপ্তভাবে দেখানো হল)

বংশানুক্রমিক :

(ক) অস্বাস্থ্যকর বংশধারা—অর্থাৎ যে বংশে পাগল, খুনী, দুশ্চরিত্র, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি ও এ্যাপিলেপসি প্রভৃতি রোগের প্রাবল্য দেখা যায়।

(খ) বুদ্ধির স্বল্পতা—সাধারণ দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্ক ৮৫-৯০-এর মধ্যে থাকে —১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক থাকে না, তবে তিনভাগের দুই ভাগ দুষ্কৃতকারীর বুদ্ধিই স্বাভাবিক বা স্বাভাবিক থেকে বেশী।

(গ) ভাষাজ্ঞানার্জনের ক্ষমতা কম, ফলে বিদ্যালয়ের পাঠোন্নতি বিঘ্নিত হয়।

(ঘ) কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রকমের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও শক্তির অহেতুক প্রাবল্য দেখা যায়—যা থেকে আক্রমণধর্মিতা, অধিক কর্ম চাঞ্চল্য, অস্থিরতা উদ্ভুত হয়।

গৃহ পরিবেশ[১] :

(ক) দারিদ্র্য ও এক বাড়ীতে অনেক লোকের গাদাগাদি করে বাস।

১। A 'delinquent' environment consists of three main elements : a home in which parents are unsuccessful economically, are of not more average native ability, are of undesirable personal habits, and are of questionable morality, who are ineffective in discipline, unable to furnish emotional security, and inclined to reject their delinquent child both before and after his misdeeds ; a neighbourhood that is devised for adults, quite without safeguards for children, largely without safe outlets for emotional and social life and full of unsatisfactory models and conflicting standards : and a school that tries to make scholars out of nonacademic material and sometimes furnishes teachers who are too rejective in their attitudes. When all three elements are affecting the same unstable child at the same time, a delinquent is likely to be produced.

—Cole, Luella—Psychology of Adolescence

(খ) বাবা, মা ও বড় ভাইবোনদের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তা ও বড় রকমের অপরাধ-পরায়ণতার নজির।

(গ) ছন্নছাড়া গৃহ-পরিবেশ (*Broken Home*)—পিতামাতার মৃত্যু, তাদের মধ্যে নিত্যকলহ এমন কি বিচ্ছেদ, পিতামাতা কর্তৃক বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া, পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা থেকে সন্তানের বঞ্চিত হওয়া—সবই ছন্নছাড়া গৃহ-পরিবেশের বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) নিরাপত্তার অভাব বোধ, গৃহে সর্বদা অস্থিরতা ও উত্তেজনা, পিতামাতার প্রাক্ষোভিক জীবনের (*emotional life*) ভারসাম্যহীনতা।

(ঙ) গৃহ-পরিবেশে যথাযথ ও ধারাবাহিক নিয়মশৃঙ্খলার অভাব।

(চ) পিতামাতা কর্তৃক সন্তান-প্রযত্নে অবহেলা, সন্তানকে মনের দিক থেকে প্রত্যাখ্যান বা সন্তান সম্পর্কে উদাসীনতা।

বিদ্যালয় পরিবেশ :

(ক) বিদ্যালয়ের কাজকর্মে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব—সব কিছুতেই উদ্দীপনা ও প্রাচুর্যের অভাব।

(খ) বিদ্যালয়কে ভাল না লাগা।

(গ) বিদ্যালয় থেকে প্রায়ই পালিয়ে যাওয়া।

(ঘ) শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীকে অকারণে প্রত্যাখ্যানের মনোভাব প্রকাশ করা, শিক্ষার্থীর সাথে নির্দয় আচরণ, সব সময় তাদের উপর কর্তৃত্ব করার আগ্রহ প্রকাশ করা।[১]

বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ ঃ

(ক) সমাজ-পরিবেশে অপরাধী ও খুনীর বহুল নজির।

(খ) সমাজ-সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে শিশুদের যত্ন ও রক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকা।

১। It is highly probable that some teachers also contribute to the creation of the delinquent child. They influence him, as they do all other children, through the emotional atmosphere of their classroom. If they are demanding, harsh, domineering and authoritarian, they arouse the aggressive hostility of the already rejected child, who now finds himself rejected once more...One can hardly blame him for hating school, for playing truant, or for leaving as soon as possible.

School discipline is sometimes so administered as to be thoroughly unacceptable even to well-balanced, normal children and adolescents. The effect upon delinquents is disastrous and stimulates them to even greater hospility toward their school.

—Cole, Luella : Psychology of Adolescence

(গ) শৈশবের ও নবযুবকালের শক্তির যথার্থ ও স্বাস্থ্যকর প্রবাহ ও উদ্গমনের ব্যবস্থা না থাকা।

(ঘ) সমাজে নীচমানের নৈতিক অনুশাসন বর্তমান বা কারও মধ্যে উচ্চমানের ও কারও মধ্যে নীচমানের নৈতিক অনুশাসনজনিত সমাজে দ্বন্দ্ব।

পারিবেশিত এইরকম প্রভাবের মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশ পর্যায় অতিবাহিত হওয়ার ফলে—শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা, নিরাপত্তাবোধহীনতা ও প্রত্যাখ্যানের মনোভাব সৃষ্টি হয়, নিয়ত একটা হতাশা ও ব্যর্থতা অনুভব করে এবং এর জন্য একটা **আক্রমণধর্মী মনোভাবের সৃষ্টি হয়।** প্রক্ষোভিক বিকাশ অপরিণত থেকে যায়। আক্রমণমুখিতা পিতামাতা, বিদ্যালয় এবং সমাজের দিকে প্রভাবিত হয়। পরিপার্শ্বে যে সব অসামাজিক ব্যক্তি থাকে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করার চেষ্টা করে—এদের সঙ্গে মেলামেশা করে, **অসামাজিক কাজকর্ম করে অবদমিত আবেগের স্ফূর্তি ঘটিয়ে থাকে।**

॥ মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে দুষ্ক্রিয়তার কারণ ॥

(Delinquency Psychoanalytic point of view) :

মনঃসমীক্ষকদের মতে শিশু গৃহ-পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে পা বাড়াবার পূর্বেই অর্থাৎ অতিশৈশবকালীন ব্যক্তিত্ব বিকাশপর্বের মধ্যেই, শিশু পরবর্তীকালে দুষ্কৃতকারী হবে কি হবে না, তা নির্ণীত হয়ে যায়। সব শিশুই জন্মাবার পর দুই তিন বৎসর পর্যন্ত 'দুষ্কৃতকারীই' থাকে—কেননা তখন তাদের আচার-আচরণ সম্পূর্ণরূপে জৈবিক ও সুখান্বেষী কর্মপ্রয়াসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তাদের যা ভাল লাগে তাকেই তারা চায়—তাই পেতে চেষ্টা করে। এতে সমাজ পরিবেশের অনুমোদন আছে কি নেই, সে দিকে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিন বৎসর বয়স হওয়ার সাথে সাথে তাদের কিছু রয়ে সয়ে চলার অভ্যাস করতে হয়, কোন কোন আরামপ্রদ জিনিসকেও ছাড়তে শিখতে হয়, একটা জিনিসের বদলে অন্য একটা জিনিসকে পেয়েই তুষ্ট থাকতে হয়। মোটের ওপর, তাদের শিখতে হয় যে, যা চাওয়া যায় তা সব সময় সে ভাবেই পাওয়া যায় না। বাবা মা'র ভালবাসা, মা'র কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া একদিকে, আর অন্যদিকে আরামপ্রদ কোন অবস্থা ও এক্ষুণি পেতে ইচ্ছে করছে এমন কোন বস্তু—এ দুই এর দ্বন্দ্বে, বাবা মা'র ভালবাসা পাওয়ার জন্য তাঁদের কথামত যা বর্জনীয় এমন বস্তুকে বর্জন করতে যখন শিশু শ্রেয় বলে শেখে, তখনই তার মধ্যে বিবেকসত্তা (*Super-ego*) গড়ে ওঠে। যদি শিশুর মধ্যে এ বোধ না জন্মে, যদি তার এ শিক্ষা না ঘটে, তাহ'লে সে, এই ক্ষণেই যা পাওয়া যাচ্ছে, তাকে পাওয়ার জন্য কোন

কিছুর দিকেই তাকাবে না, বাবা মা'র নিষেধ ও শাসন বাক্যও তাকে নিরস্ত করতে পারবে না।

শিশু যত বড় হতে থাকে, বাস্তব জীবনের সমস্যা ও বাধা নিষেধের সম্মুখীন ততই তাকে হতে হয়—গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, কিন্তু যার মধ্যে শৈশবকাল থেকেই বাবা মা'র মুখ চেয়ে, ক্ষেত্র বিশেষে কোন কিছু ত্যাগ করার শিক্ষা না হয়, তারা বড় হয়ে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হলে সেই বাস্তব সমস্যার সমাধান না করে জীবনের অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত পিছন দিকে চলতে থাকে অর্থাৎ শৈশবকালীন আচরণের মধ্য দিয়ে চলতে চায়। শৈশবকালে যখন যেমন, যা মনে আসত সেইরকম ভাবে চলতে চাইত, বড় হয়েও সেই রকম ভাবে চলতে চায়। বাবা-মার ভালবাসা পাওয়ার জন্য আপাতমধুর কোন কিছুকে বর্জন করতে শিশু তখনই পারে, যখন বাবা মা'র কাছ থেকে সে যথার্থ ভালবাসা যত্ন পায়। বাবা মার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দুঃখকর অভিজ্ঞতা যদি কোন শিশুর মধ্যে থেকে থাকে, তাহ'লে বাবা-মার ভালবাসা পাওয়ার জন্য সে কোন কিছু বর্জন করা, কোন কিছু ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না—এ নিয়ে তার মধ্যে কোন সংশয় ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না—পিতামাতার অকৃত্রিম ভালবাসাকে চেয়ে যদি সে না পায় তাহলে তার ভালবাসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। বাবা মা'র প্রতি একটা গভীর রাগ জন্মে, সে রাগ নানাভাবে শিশু প্রকাশও করে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পিতামাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক-ধারা বহুলাংশে শিশুর ব্যক্তিত্বকে নিরূপণ করে। যদি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে, তাহলে তিন থেকে ছ'বৎসর বয়সের মধ্যেই, তার মধ্যে বিবেকসত্তা (*Super-ego*) তৈরী হয়ে যায়। একটি বাস্তব সত্তাও (*Ego*) প্রায় গড়ে ওঠে, যা বাস্তব জীবনে কোনটা গ্রহণীয় ও কোনটা বর্জনীয় সেটা বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একজন দুষ্কৃতকারী বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হলে তার সাথে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার চেষ্টা করার পূর্বেই পিছনদিকে চলে যায় অর্থাৎ শৈশবে যেমন কোন কিছু না মেনে সুখান্বেষণে (*Pleasure seeking*) ছুটত, সেইরকমভাবে চলতে চায়। এদের মধ্যে বিবেকসত্তাও (*Super-ego*) ঠিকভাবে গড়ে উঠে না। সুপার-ইগো যদি একেবারেই অপুষ্ট ও দুর্বল থাকে, তা হলে দুষ্কৃতকারীর কোন অসুবিধা হয় না, কেননা তার প্রবৃত্তি তাকে যে দিকে তাড়িয়ে নেয়, সে সেদিকেই ছুটতে থাকে, বিবেকের সাথে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। কিন্তু প্রায়ই বিবেক-সত্তা এদের মধ্যে এমন অপুষ্টভাবে গঠিত হয় যে, প্রবৃত্তিগত তাড়নের জন্য দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং অপুষ্ট বিবেক সত্তার কশাঘাতে অপরাধবোধও প্রবলভাবে উপস্থিত হয়। বিবেক-সত্তা এমন দৃঢ় ও পুষ্ট থাকে না, যা যথার্থভাবে ব্যক্তিকে ঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়

যে, ব্যক্তি বিবেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে আরও অসামাজিক কাজ করে বসে এবং এর মধ্য দিয়ে সে যেন নিজেকে আরও শাস্তি দিয়ে থাকে। প্রায়শঃই নিজের বিবেক-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, ব্যক্তি অক্ষমভাবে পরিপার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তিকে নিজের যন্ত্রণার জন্য দোষারোপ করে থাকে।

জীবন যতই জটিল হতে থাকে এবং বাস্তবের দাবী কঠিন হতে থাকে, শিশু ততই প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতে থাকে। সে বাস্তব পরিবেশের দাবীর দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে প্রাথমিক প্রাবৃত্তিক ইচ্ছাগুলির চরিতার্থ করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকে। সে সুখান্বেষী (*Pleasure Principle*) ইচ্ছার দ্বারা চালিত হতে থাকে। কারও সম্বন্ধেই এদের কোন গভীর ভালবাসা বা আগ্রহ নেই যা এদের এইসব অসামাজিক কাজ করা থেকে বিরত করতে পারে। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন দুষ্কৃতকারীর ব্যক্তিত্বের কাঠামো এমন, যার প্রাবৃত্তিক প্রেষণা অত্যন্ত প্রবল, অথচ বিবেক-সত্তা অত্যন্ত দুর্বল এবং বাস্তব-সত্তা (*Ego*) প্রচলিত নিয়মধারাকে অগ্রাহ্য করে তাৎক্ষণিক সুখের দিকে সর্বদা ঝুঁকে থাকে। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের এরূপ সন্নিবেশ প্রায়শই তাকে দ্বন্দ্ব জর্জরিত করে রাখে এবং সে বাস্তব জগৎকে সর্বদা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এরকম ব্যক্তির পক্ষে দুষ্ক্রিয় আচরণ হল তার নিকট প্রতিভাত এক বিরক্তিকর ও ভীতিকর বাস্তব থেকে সবচেয়ে সন্তোষজনক আত্মরক্ষার উপায়।

॥ দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণ প্রতিরোধের সাধারণ উপায় ॥

সমস্যামূলক আচরণ দেখা দিলে তার প্রতিকার ও নিরাময় অপেক্ষা সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা যাতে আদৌ দেখা না দেয় সেইরূপ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, সমস্যামূলক আচরণের কারণ বংশক্রম ও পারিবেশিক প্রভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে। বিকৃত বংশক্রমের উপর আমাদের তেমন কোন হাত নেই। কিন্তু পারিবেশিক প্রভাবকে স্বাস্থ্যপ্রদ করার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি।

পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা যতটা সহজ বলে মনে হয় ততটা সহজ নয়। পরিবেশ বলতে আমরা যদি কেবল গৃহ-পরিবেশ বুঝি বা বিদ্যালয়-পরিবেশ বুঝি তাহলে ভুল করা হবে। সমাজ-পরিবেশ, রাজনৈতিক আবাহওয়া সবকিছুকেই পারিবেশিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সমাজ ও রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয়-পরিবেশকে প্রভাবিত করে। কাজেই সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধ করতে হলে সমাজ, বিদ্যালয়, গৃহ পরিবেশকে যথার্থরূপে স্বাস্থ্যকর

করে রচনা করতে হবে। অনেক সময় অত্যন্ত সুস্থ পরিবেশের মধ্যেও দুষ্ক্রিয় ও সমস্যামূলক আচরণ ছেলেমেয়েদের করতে দেখা যায়। সেজন্য মনস্তাত্ত্বিক, ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী (*Questionnaire*)-ও অভীক্ষা (*test*) দিয়ে আগে থেকেই ছাত্রদের মাঝে মাঝে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করে দেখে নেবেন কোন্ ছেলের অপরাধপরায়ণ বা সমস্যামূলক আচরণ করার সম্ভাবনা কতটা রয়েছে। অধিকাংশ প্রাক্ দুষ্কৃতকারীকে কোন অত্যন্ত গর্হিত অপরাধমূলক আচরণ করার পূর্বেই অভীক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধরা যায়। এ সময় থেকেই যদি যথাযথ যত্ন, পারিবেশিক প্রভাবকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও প্রয়োজন হলে প্রথম থেকেই মানসিক চিকিৎসা করা যায়, তা হ'লে অপরাধ-পরায়ণতার কারণ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে পারে ও ব্যক্তিত্বকে সুস্থ করে তোলা যায়। কাজেই একদিকে পরিবেশকে সম্যকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার দিকে এবং এর মধ্য দিয়ে অপরাধপরায়ণতাকে প্রতিরোধ করার প্রয়াস করতে হবে, অন্যদিকে শিশুদের উপর উপরি-উক্ত অভীক্ষা (*tests*) প্রভৃতি দিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে হবে কোন্ কোন্ ছেলের মধ্যে সুস্থ পারিবেশিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও অপরাধপরায়ণতার বীজ উপ্ত হচ্ছে। এদের ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, আক্রমণধর্মী ও প্রাক্ষোভিক আচরণে শিশুর মত অসংযত। এইসব ছেলেকে আলাদা করে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে ; না হলে ক্রমে এইসব ছেলে নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়া ও সমস্যামূলক আচরণ করে গৃহে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করবে ও সামগ্রিকভাবে অন্যান্য ছেলেদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

॥ এক ॥ সুস্থ গৃহ-পরিবেশ ঃ

গৃহ-পরিবেশ এমন হবে যাতে শিশু নিজেকে নিরাপদ বোধ করে। পরিবেশ থাকবে শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ। বাবা মার মধ্যে শিশু দেখবে পরস্পর বোঝাপড়া, মতের মিল, তার সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি। শিশু গৃহে পাবে খেলাধুলার সুযোগ, আপন ছন্দে আনন্দের সাথে সে বড় হয়ে উঠবে। পরিবেশের মধ্যে একটা স্বতস্ফূর্ত খোলামেলা ভাব থাকবে। পরিবারে পরস্পরের সম্বন্ধ হবে মধুর ও পরস্পর বিশ্বাসনির্ভর। পিতামাতার সম্বন্ধ, পিতামাতা ও সন্তানের সম্বন্ধের কোথাও যেন চিড় না থাকে। প্রগাঢ় প্রীতি ও খোলা মন নিয়ে সবাই চলবে। শিশু যেন পিতামাতার নিকট থেকে ভালবাসা পায়, স্বীকৃতি পায়।

পিতামাতার আচরণ হবে সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিশুর প্রতি তাদের সুষম ভালবাসা থাকবে। অনাদর, অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন, কুশাসন, অতিরিক্ত শৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলা, এর যে কোন একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং শিশুর

মনের গভীরে নানাপ্রকার জটের (*Complex*) উদ্ভব ঘটায়। এ থেকে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়।

॥ দুই ॥ সুস্থ বিদ্যালয়-পরিবেশ :

বিদ্যালয় হল সমাজীকরণের (*Socialisation*) প্রকৃষ্টতম স্থান। শিশু বিদ্যালয় থেকে যে কেবল জ্ঞান আহরণ করে তাই নয়, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রভৃতি পরস্পরের সংযোগ ও সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে সামাজিক হতেও অভ্যস্ত হয়। এই সকল সম্পর্ক যদি স্বাস্থ্যকর না হয় তা হলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থ ধারায় হতে পারে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষকই পিতামাতার পরিবর্ত-স্বরূপ, সেই শিক্ষকের নিকট থেকে শিশু যদি যথাযথ প্রযত্ন, পরিমিত ভালবাসা ও স্বীকৃতি না পায়, তাহলে শিশুর মনে ক্ষোভ ও গভীর দুঃখের সঞ্চার হয়—এ থেকে শিক্ষক ও সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধে শিশুর ধারণা প্রতিন্যাস নেতিবাচক হয়ে উঠে। কাজেই শিক্ষক-শিক্ষর্থীর সম্বন্ধ হবে পরস্পর বিশ্বাসভিত্তিক ও প্রীতিপূর্ণ। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, এতে খেলাধূলা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক ক্রিয়াকাণ্ডের যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। খোলামেলা, প্রশস্ত পরিবেশে বিদ্যালয় রচনা করতে হবে।

পাঠক্রম, পঠন-পদ্ধতি, সব কিছুই হবে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক। প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিত্বকে, তার মানস স্বাতন্ত্র্যকে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে তার বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা-নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ছাড়া বিদ্যালয়েও মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা প্রয়োগ করে কোন্ কোন্ ছেলের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তা বা সমস্যামূলক আচরণ করার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তা আবিষ্কার করা যেতে পারে। এইসব ছেলেদের জন্য পাঠক্রম আলাদাভাবে নির্ধারিত হওয়া সমীচীন অর্থাৎ যে চলিত পাঠক্রমের জন্য অধিক মনযোগ, বিমূর্ত চিন্তা, প্রযত্ন অধ্যবসায় দরকার হয়, তা বাদ দিয়ে অন্য কোন পাঠক্রম, যাতে হাতে-নাতে কাজ শেখা, শিক্ষার্থীর রুচি অনুযায়ী কিছু তৈরি করতে দেওয়া, এই রকমের কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। এই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হবে এইসব ছেলেদের ঠিকভাবে চলতে শেখানো, সামাজিক হতে সাহায্য করা এবং তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এমন কিছু শেখানো যার দ্বারা তারা উপার্জনক্ষম হতে পারে।

হাতে হাতে কিছু করতে পারার মধ্যে যে আনন্দ, নিজে কিছু নির্মাণ করতে পারছে, যার ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে, এই মানসিকতার ফলশ্রুতি হিসাবে ছেলেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, জীবন সম্বন্ধে সদর্থক (Positive) প্রতিন্যাসের বিন্যাস ঘটে, তা এই সব ছেলেদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে, বিপথগামিতা থেকে সুস্থ জীবনাচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

এ সব ছেলেদের এমন বিদ্যালয়ে রাখতে হবে যেখানে সকাল থেকে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত এদের চোখে চোখে রাখা যায়। এদের বিদ্যালয়েই দুবার খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, বিদ্যালয়ের যে খেলার মাঠ, তাতেই খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব ছেলেদের বাড়ী ও পরিপার্শ্ব অবস্থার মধ্যে নানারূপ অস্বাস্থ্যকর প্রভাব কাজ করে—সেইজন্য বিদ্যালয়কেই মূলতঃ গৃহ ও পরিপার্শ্ব অবস্থার সকল স্বাস্থ্যকর চাহিদা মেটানোর ভার নিতে হয়। এইসব ছাত্ররা যত বড় হতে থাকবে, তত তাদের প্রত্যক্ষ ভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এ শিক্ষালাভ করেই তাদের যথার্থ কর্মসংস্থান ঘটে। এই সব ছেলেদের সর্বস্তরেই তাদের আবেগ প্রকাশের সুনিয়ন্ত্রিত পথ পন্থা (খেলা-গান) থাকা দরকার। এটা সত্য যে, বিদ্যালয়ে এইসব কর্মপ্রয়াসের অবতারণা করলেই যে ভাবী সকল দুষ্কৃতকারীকেই বিপথগামিতা থেকে স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনা যাবে, নিশ্চিতভাবে তা বলা যায় না, তবে উপরি উক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলে অনেকটা যে কাজ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ তিন ॥ সুস্থ সামাজিক, পরিবেশ :

দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধে ও প্রতিকারে সমাজের দায়-দায়িত্ব অনেক। বস্তুতঃ সামাজিক পরিবেশ যদি অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ ও অসুস্থ থাকে, তা হলে তার প্রভাব চুঁইয়ে চুঁইয়ে গৃহ-পরিবেশ ও বিদ্যালয়-পরিবেশকেও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। কাজেই বৃহত্তরভাবে সমাজ পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করে তোলা একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে, সমাজ সংস্থার ও বৃহত্তর ভাবে সরকারের যে সব দায়-দায়িত্ব আছে, তা সম্যক্‌ভাবে পালন করতে হবে।

(ক) শিল্পাঞ্চল ও বস্তিঅঞ্চলে যে সব পরিবার বাস করে তাদের আবাসিক অঞ্চলে পুনর্বাসন করা সমীচীন। এমন আইন প্রণীত হতে পারে যে, যে সব পরিবারে সন্তান-সন্ততি আছে, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে আবাসিক স্থানে বাস করতে হবে। এতে সরকার এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে অল্প টাকায় সুন্দর সুন্দর বাড়ী আবাসিক পরিবেশে (শিল্পাঞ্চল থেকে দূরে) তৈরি করা যায় এবং এই অঞ্চলের আবাসিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যাতে কেউ নষ্ট করতে না পারে, তার জন্য আইন প্রণয়নও করা যেতে পারে।

যে সব অঞ্চল অস্বাস্থ্যকরভাবে ঘন বসতিপূর্ণ সে সব স্থানকে পরিচ্ছন্ন ও সুষম

বসতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। ব্যবসা ও অপরিচ্ছন্ন শিল্পাঞ্চল ক্ষেত্রে যাতে কিশোর-কিশোরীরা অহেতুক গমনাগমন না করে, সরকারী পুলিশ সে দিকে নজর রাখবে, এবং যদি কোন সময়ে কোন ছেলে এ সব অঞ্চলে চলে আসে, পুলিশ এদের যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়ে আনবে।

খেলাধুলার জন্য পাড়ায় পাড়ায় মাঠ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পার্ক, সাঁতার কাটার পুল (*Swimming pool*), ক্লাব, সমাজ-কল্যাণকর ছোটখাট কাজের জন্য সমাজ সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো যেতে পারে। যেসব চলচ্চিত্র ছেলেমেয়েদের বয়সোপযোগী নয়, অর্থাৎ যে সকল চলচ্চিত্র বা নাটকানুষ্ঠান অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মনে অকালে যৌনবোধের সঞ্চার করে, অহেতুক ভয় প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর মানসিকতার উদ্ভব ঘটায়, সে সব অনুষ্ঠানে যাতে ছেলেমেয়েরা প্রবেশাধিকার না পায়, তার জন্য সমাজ সংস্থার ও সরকারের বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

সমাজ-সংস্থা ও সরকারকে অনেক বিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে ; জনসংখ্যা, স্থান ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে একই বিদ্যালয়ে ছাত্র বিস্ফোরণ না ঘটে। শিক্ষকের মর্যাদা ও দক্ষিণা-মান এমন হবে যাতে তাঁরা সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করে এবং জীবনধারণের মানও স্বচ্ছন্দ ও উন্নত হয়—সমাজ এরূপ ব্যবস্থা করতে পারলে সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সত্যিকারের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা শিক্ষকতা বৃত্তিতে আকৃষ্ট হবেন এবং সুস্থ শিক্ষাদর্শ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বকে সুস্থভাবে গড়ে তোলা যাবে—সৎ নাগরিক গড়ে তোলা যাবে, পরোক্ষভাবে দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধ করা যাবে।

সুস্থ জীবন-যাপনে যেসব বাধা তা দূর করার জন্য সমাজ অগ্রণী হতে পারে—দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে, যে দারিদ্র্যের জন্য অগণিত ব্যক্তি অসুস্থ জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। বেতন বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্যের সীমা নির্ধারণ, শিক্ষা ও চিকিৎসার অবাধ সুযোগ প্রদান এবং প্রত্যেক নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির ব্যবস্থাদি করে, সাধারণের দারিদ্র্য দূর করতে হবে।

এটা ঠিক যে, এ সব ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলেই যে দুষ্ক্রিয়তা সমাজ-জীবন থেকে একেবারে চলে যাবে তা নয়, তবে পরিবারে যে সমস্ত মৌলিক প্রয়োজনাদি রয়েছে তা মিটলে, পরিবার ও সমাজ-জীবন থেকে অনেক ব্যর্থতা, হতাশা, অসুবিধা ও অভাব দূর করা যেতে পারে, যা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশকে রুদ্ধ করে।

দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে[১] :

(ক) শিশুদের বিবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেমন শিল্প-চর্চা, সঙ্গীত-চর্চা, খেলাধুলা, যৌথ কর্ম প্রভৃতি যার কোন-না-কোনটিতে সে আনন্দ পায় ও যথার্থ সাফল্য দেখাতে পারে।

(খ) প্রত্যেকটি শিশুর যথার্থ শক্তি-সামর্থ্য ও মানস-বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে। তাকে তার সামাজিক, বৌদ্ধিক, শৈল্পিক শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে হবে—তার মধ্যে যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক অপূর্ণতা রয়েছে, বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে তা স্বীকার করে নিতে হবে।

(গ) তাকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে, তার শক্তি সামর্থ্যকে তার প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে সে যত কম সম্ভব ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ও কর্মকৌশল আয়ত্ত করতে পারে।

(ঘ) বিদ্যালয়ে শ্রেণী বিন্যাস ও পরিচালনা এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সমাজ-সচেতন হয়ে ওঠে ও পরস্পর মেলামেশার মধ্য দিয়ে আনন্দ ও স্ফূর্তি পায়।

(ঙ) আবেগের যাতে স্বাভাবিক বিকাশ হয় তার সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং যদি কোন ছেলেমেয়ে বাড়ীতে বা শ্রেণীকক্ষে ছোট-খাটো খারাপ ব্যবহার করেও, তাকে অন্য কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে, তা এড়িয়ে যেতে হবে।

(চ) যদি কোন ছেলের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তামূলক কোন আচরণ দেখা যায়, তার জন্য বিচলিত না হয়ে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ আচরণের কারণ নির্ণয় করতে হবে—সহৃদয়তায় সঙ্গে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে।

(ছ) গৃহ-পরিবেশ, বিদ্যালয়-পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশ থেকে এমন সব অবস্থা সরিয়ে ফেলতে হবে যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হবে, তার স্বাভাবিক আচরণে অহেতুক শক্তিক্ষয় ঘটাবে অর্থাৎ অত্যধিক ভয়, পুঞ্জীভূত ক্রোধ পদে পদে দ্বন্দ্ব

১। Most of the recommended procedures for the prevention of delinquency or for its treatment during its early stages—are aimed at providing activities in which the child or adolescent can be successful, experiences that make him feel accepted, and outlets that are socially approved for his emotional drives. The attack upon the problem is indirect and consists essentially in substituting acceptance for rejection by means of activities that are within the established social norm but are more satisfying to the adolescent than his delinquency.

—Cole : Childhood and Adolescence.

সংশয়, হতাশাবোধ প্রভৃতি ক্ষতিকর মানসিকতার উদ্ভব না ঘটে—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা যে, **বিপথগামী শিশু বা কিশোরকে সুস্থ করে তুলতে হলে তাকে প্রথম আন্তরিকভাবে ভালবাসতে হবে। যত কঠিন অপরাধই সে করুক না কেন—ভালবাসা দিয়ে তার হৃদয় মনকে অভিসিঞ্চিত করতে হবে।** অনুচ্চারিত প্রত্যাখ্যানের ভাবও শিশুর স্পর্শকাতর মন অনুভব করতে পারে, সে প্রত্যাখ্যান যত সুমিষ্ট বাক্য ও সুন্দর আচরণের মধ্য দিয়েই আসুক না কেন। যেহেতু প্রায়শই দুষ্কৃতকারী কিশোররা শৈশবকাল থেকেই অকৃত্রিম ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেইজন্য সামান্যতম ভালবাসার স্পর্শ, স্নেহের আপ্যায়নও তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে—যা স্নেহপ্রীতিশূন্য হাজার রকমের নিষ্প্রাণ চিকিৎসার মধ্য দিয়েও করা সম্ভব হয় না।

॥ দুষ্ক্রিয়কারীদের সুস্থ ক'রে তোলার উপায় ॥
(Treatment)

দুষ্ক্রিয়কারীদের সুস্থ করে পুনর্বাসিত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী হল এদের জন্য বিশেষ ধরনের আবাসিক শিক্ষায়তন। বাড়ীর পরিবেশের মধ্যে যে অসুস্থতা ও অস্থিরতা আছে তা থেকে সরিয়ে না নিলে দুষ্ক্রিয়কারীর অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সুস্থ ও সুস্থির হওয়ার কোন অবকাশই পায় না। অথচ এরা যদি বিশেষ ধরনের আবাসিক শিক্ষায়তনে থাকে, তা হ'লে পরিবেশের ও বিভিন্নভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে সুশৃঙ্খলভাবে কি অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে—জীবন সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ হতে পারে। এই আবাসে একদিকে যেমন যথোপযুক্ত খাদ্য, বিশ্রাম ও কর্মশিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকবে, অন্যদিকে প্রতিটি আবাসিকের জন্য শিক্ষায়তনের শিক্ষক ও পরিদর্শকের কাছ থেকে স্বতন্ত্র মনোযোগ সহৃদয় আচরন সুনিশ্চিত করতে হবে। এর সঙ্গে থাকবে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া, যৌথ মনঃচিকিৎসা এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের যথাযথ প্রয়াস। এই যৌথ জীবনযাপন এমন কতকগুলি নিয়মাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে যে, বিপথগামী ছেলেরা ধীরে ধীরে সুস্থ সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে ও সমাজীকরণে অভ্যস্ত হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে আবাসিক বিপথগামী শিশুদের পিতামাতার সাথে পরামর্শ করে গৃহ পরিবেশেও কিছু কিছু সুস্থ ও অভিপ্রেত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে, যাতে এই সব ছেলেরা বাড়িতে ফিরে গিয়ে সুস্থভাবে ও আকাঙ্ক্ষিত পথে থেকে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। প্রয়োজনবোধে, বিপথগামী শিশুদের বেশ কিছুদিন আবাসিক শিক্ষায়তনে রেখে,

অল্পদিনের জন্য বাড়িতে পাঠিয়ে তাদের পরিবর্তন পরীক্ষা করে দেখা আবাসিক বিদ্যায়তনে অর্জিত অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা কতটা লাভবান হয়েছে, তা বাড়ীর পরিবেশে তাদের আচার-আচরণ দেখে পরিমাপ করা। বিপথগামী শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের আবাসিক শিক্ষায়তনে এরূপ ব্যবস্থাও করা যেতে পারে যে, এই সব শিশুরা এই শিক্ষায়তনে থাকাকালে বাইরে কোন কর্মসংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে এমন কোন কাজের সাথে জড়িত হতে পারে যা থেকে একদিকে এই সব শিশুদের অন্যদিকে সমাজের গঠনাত্মক কাজে লাগে। সমাজ-জীবনের তারা যে অচ্ছেদ্য অঙ্গ, সমাজ যে তাদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করে এবং সমাজ তাদের কাছ থেকে যত সামান্যই হোক কিছু পাচ্ছে, এর স্বীকৃতি তাদের মধ্যে থাকা একটা আত্মপ্রত্যয় ও জীবন সম্পর্কে একটা কল্যাণকর দৃষ্টি নিয়ে আসতে পারে।

কিন্তু একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, যে সব বিপথগামী শিশুর অপরাধ তেমন মারাত্মক নয়, তাদের বাড়ীতে রেখেই, তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য সমাজসেবক, মনস্তাত্ত্বিক এই সব শিশুদের প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন —এদের বাড়ী গিয়ে পিতামাতার সাথে পরামর্শ করবেন, শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করবেন। মনস্তাত্ত্বিক নির্দেশনা ও সহৃদয় উপদেশ বিপথগামী শিশুদের সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে। পরিবেশান্তর ও বিশেষ আবাসিক শিক্ষায়তনে মারাত্মকভাবে অপরাধপ্রবণ ও লঘু শিশু অপরাধী যদি একত্রে বসবাস করে, তাহলে পরিণামে মারাত্মকভাবে অপরাধপ্রবণ শিশুদের দ্বারা লঘু অপরাধী শিশুরা খারাপভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

॥ সংক্ষিপ্তসার ॥

সমস্যামূলক আচরণের স্বরূপ→

সমাজপ্রেক্ষিতে সমস্যামূলক আচরণ।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা→

ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক পথে না হওয়ার পরিণাম। ব্যক্তিত্ব বিকাশ-সমাজীকরণে বিকৃত প্রভাব। সংলক্ষণপূর্ণ আচরণই (symptomatic behaviour) মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সমস্যামূলক আচরণ। মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতাই সমস্যামূলক আচরণের কারণ। সমস্যামূলক আচরণ সমাজ-সঙ্গতি রক্ষা করার অপকৌশল।

প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য→

সমস্যামূলক আচরণকারীদের বিপথগামী শিশু বলা হয়। বুদ্ধির স্বল্পতাহেতু যে সব শিশু বিপথগামী তাদের বিপথগামী না বলে 'পশ্চাদ্‌গামী' শিশু বলাই ভাল। প্রক্ষোভ ও সমাজগত বিকাশ স্তরে বিকৃতির হেতু, ব্যক্তিত্বের জটিলতায় যারা ভুগছে তাদের বিপথ-গামী বলা হয়। পিতামাতা, শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যামূলক আচরণ—নিয়মনীতি না মানা। মনশ্চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যামূলক আচরণ —অত্যধিক বশংবদ ভাব, নতুন কোন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, অস্বাভাবিক ভয় ও দুশ্চিন্তা, সব সময় জড়সড় হয়ে থাকা।

সমস্যামূলক আচরণের প্রকার→

আক্রমণধর্মী সমস্যামূলক আচরণ (Aggressive) (জিনিসপত্র ভাঙ্গা, চুরি করা, পালিয়ে যাওয়া, যৌন অপরাধ ইত্যাদি)। চাপা ও শঙ্কাপরায়ণ আচরণ (Repressed) (অত্যধিক ভয়, বিছানায় প্রস্রাব করা, অনিদ্রা, অত্যধিক বশংবদ হয়ে যাওয়া, নতুন কোন পরিস্থিতি থেকে গুটিয়ে নেওয়া, পাঠ্য বিষয়ে অমনোযোগিতা।)

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার সম্বন্ধ→

দুষ্ক্রিয়তা—সমস্যামূলক আচরণের একটা দিক। আইনে দণ্ডনীয় সমস্যামূলক আচরণই দুষ্ক্রিয় আচরণ। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয় আচরণ এক।

অল্পবয়সের দুষ্ক্রিয়তা ও বয়ঃপ্রাপ্তদের দুষ্ক্রিয়তা→

সাত বৎসরের পূর্বের অসামাজিক আচরণ আইনে দণ্ডনীয় নয়—মনশ্চিকিৎসকের নিকট দুই-ই চরিত্র-গত দিক থেকে সমান। অপ্রাপ্তবয়স্ক দুষ্কৃতকারীদের বিশেষ যত্ন দিয়ে দেখা শোনা করা হয়। সাত থেকে বার বৎসর বয়সের বিপথগামী শিশুদের Problem Children বলা হয়। ১৫–২১ বৎসরের দুষ্কৃতকারী-দের কখনো কখনো বিশেষভাবে পরিচালিত কারাগারে (Juvenile Jail)-এ পাঠানো হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দুষ্ক্রিয়তা→

দুষ্ক্রিয়ার কারণ শৈশবকালের পরিবেশে নিহিত থাকে। বংশধারা ও পরিবেশ—দুষ্ক্রিয়ায় কোন্‌টি অধিক দায়ী? —ব্যক্তিত্ব গঠনে দুই-ই কাজ করে। দৈহিক বিকৃত গঠন থেকে দুষ্ক্রিয়তা। Epilepsy ও দুষ্ক্রিয়া-উদাহরণ। দুষ্ক্রিয়তার শারীর-

বৃত্তগত (physiological) কারণ। নৈতিক বোধের অভাবও দুষ্ক্রিয়তা। বুদ্ধির স্বল্পতা, নীতিবোধহীনতা ও দুষ্ক্রিয়তা—বংশগতি।

দুষ্ক্রিয়তার সামাজিক দিক→

দুষ্ক্রিয় আচরণ সামাজিক মূল্যমানে বিচার্য—সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুনকে ভেঙ্গে ফেলা ও আক্রমণ করা দুষ্ক্রিয়তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দুষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য→

দুষ্কৃতকারীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে ধরা যেতে পারে (Healy Burt and Glueck।)

বুদ্ধি কম ; আবেগগত জীবনে অস্থিরতা, বিদ্যালয় সম্বন্ধে বৈরিতাপূর্ণ দৃষ্টি ; শৈশবকাল থেকে সমস্যা-মূলক আচরণ ; দুষ্কৃতকারীরা নীচমানের সমাজ থেকে আসে, পরিবারে পিতামাতার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ কুৎসিত রূপ নেয় ; সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা যেখানে বেশী সেখানে দুষ্ক্রিয়তা বেশী দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা।

দুষ্ক্রিয়তার প্রকারভেদ→

(ক) নির্দোষ দুষ্ক্রিয়তা—সামাজিক দিক থেকে দুষ্ক্রিয়তা, মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে নয়। (খ) মেজাজগত দু[illegible]—শারীরবৃত্তগত কারণে হয়। (গ) সাধারণ দুষ্ক্রিয়তা—অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য। (ঘ) প্রতিক্রিয়ামূলক দুষ্ক্রিয়তা পিতামাতার আচরণ ও তার প্রতিক্রিয়ার জন্য।

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার মূল কারণ→

দুষ্ক্রিয়তা মাত্রই সমস্যামূলক আচরণ। বংশগতি ও পরিবেশ : বংশগতি দুর্বল হয়ে সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। Glueck-এর গবেষণা। ছোট-খাট সমস্যামূলক আচরণে বংশধারার প্রভাব কম-পরিবেশের প্রভাব বেশী। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ।

সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার কারণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়→

বংশানুক্রিমিক ও পারিবেশিক।

পরিবেশ :—
- পারিবারিক
- বিদ্যালয়
- সামাজিক

বংশানুক্রমিক কারণ→

বংশগতিতে শারীরিক বিকলাঙ্গ—মনের উপর এর অসুস্থ প্রভাব। বংশগতিতে বুদ্ধির স্বল্পতা—এর জন্য আবেগের দ্বারা চালিত দুষ্ক্রিয়তা। বংশগতি—নালীশূন্য গ্রন্থির তাৎপর্য।

পারিবেশিক কারণ→

(ক) ভৌতিক পরিবেশ (Psysical environment)। (খ) মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ (Psychological environment)

ভৌতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য :

দারিদ্র্য ও শিল্পাঞ্চলে বসতি : দৈহিক চাহিদার অভাব, মানসিক প্রতিক্রিয়া ; সমাজ বিশৃঙ্খলা ও স্থির আদর্শের অভাব ; নিরাশ্রয়তা ও ভয় : দুষ্ক্রিয়তা।

মূল গৃহপরিবেশ ও পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক→

পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিত্ব। পিতামাতার ব্যক্তিত্ব ও দুষ্ক্রিয়তা। পিতামাতার বিবাহিত জীবনের প্রভাব। পিতামাতা কর্তৃক সন্তান অনাদৃত : দুষ্ক্রিয়তা। পিতামাতার অতি-আদর; সন্তানের দুষ্ক্রিয়তা। পিতামাতার অসুস্থ ব্যক্তিত্ব—সন্তানের অসুস্থ আচরণ। ভাইবোনের সম্পর্ক পিতামাতার সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিদ্যালয়ের প্রভাব→

শিক্ষকদের অসুস্থ ব্যক্তিত্ব ও বিকৃতি ছাত্রদের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তা আনে। শিক্ষার্থীর মানস-বৈশিষ্ট্যের দিকে উদাসীনতা দুষ্ক্রিয়তা আনে। অবৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন থেকে সমস্যামূলক আচরণ আসতে পারে। খেলাধূলা শিল্পচর্চা প্রভৃতি সহপাঠক্রমের অভাব : অতিশাসন, আরোপিত শৃঙ্খলা সমস্যামূলক আচরণও দুষ্ক্রিয়তা আনতে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-নির্দেশনা না হলে ব্যর্থতা, হীনমন্যতাবোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে অপসঙ্গতি আনে। পরীক্ষা যদি ঠিক ভাবে না নেওয়া হয় : ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ আসে, সমস্যামুলক আচরণ দেখা দেয়। উচ্ছৃঙ্খল বিদ্যালয় পরিবেশে সমাজীকরণ হয় না।

বৃহত্তর পরিপার্শ্ব ও তার প্রভাব→

শিশুর স্পর্শকাতর মন দুষ্কৃতকারী ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুস্থ জীবনাদর্শ না থাকলে, শিশু অস্থির হয়ে পড়ে, দ্বন্দ্ব হয়, দুষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়। প্রতিকূল পরিবেশ, শিশুর ব্যক্তিত্বপ্রকাশ পঙ্গু করে—এই সব শিশুর প্রক্ষোভজীবন অপরিণত থাকে—অসামাজিক ব্যক্তিদের সহজেই অনুকরণ করে।

মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে দুষ্ক্রিয়তার কারণ→

দু' বৎসর পর্যন্ত যা চাই, তাই পাই, এই রকম চলে। তিন বৎসর বয়স থেকে র'য়ে স'য়ে চলতে হয়। বিবেকসত্তার গঠন—পিতামাতার ভালবাসা বিবেকসত্তা ও দুষ্ক্রিয়তা। যারা দুষ্কৃতকারী হবে, তাদের মধ্যে বিবেকসত্তা গড়ে উঠতে পারে না বা অত্যন্ত অপুষ্টভাবে থাকে। যাদের ব্যক্তিত্বের কাঠামোতে প্রবৃত্তি দুর্জয়ভাবে প্রবল, অথচ বিবেক-সত্তা দুর্বল, এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়—দুর্বল বাস্তবসত্তা (Ego) তাৎক্ষণিক সুখের দিকে ঝুঁকে থাকে।

দুষ্ক্রিয়তা ও সমস্যামূলক আচরণ প্রতিরোধের সাধারণ উপায়→

গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা। মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা দিয়ে দুষ্কৃতকারী হতে পারে এমন ছাত্রছাত্রীদের আগেই খুঁজে বের করা।

সুস্থ গৃহ-পরিবেশ→

শান্তি, শৃঙ্খলা ও পরস্পর সুস্থ সম্পর্ক পিতা-মাতার আচরণ।

সুস্থ বিদ্যালয় পরিবেশ→

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরস্পর সুস্থ সম্পর্ক। সুস্থ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা। পঠন-পাঠন মনোবিজ্ঞানসম্মত। ব্যক্তিত্ব-অভীক্ষা প্রয়োগ। ভিন্ন পাঠক্রম, সমাজ সঙ্গতি, শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা। নির্দিষ্ট বিদ্যালয়-গৃহ ও পরিপার্শ্ব অবস্থায় স্বাস্থ্যকর চাহিদা মেটাবে।

সুস্থ সামাজিক পরিবেশ→

সামাজিক দায়িত্ব। শিল্পাঞ্চল থেকে আবাসিক অঞ্চলে স্থানান্তর। পরিচ্ছন্ন ও সুষম বসতি। পাড়ায় পাড়ায় মাঠ, সাঁতার কাটার পুল, পার্ক প্রভৃতি। বয়সোপযোগী চলচ্চিত্র। জনসংখ্যা, স্থান অনুযায়ী পরিকল্পনা করে বিদ্যালয় স্থাপন। শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা ও বেতনদান সামাজিক দায়িত্ব। দারিদ্র্য দূরীকরণ।

দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে→

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে দৃষ্টি দেওয়া। শিক্ষা-নির্দেশনা। বিদ্যালয়ে শ্রেণীবিন্যাস। অহেতুক শাস্তি না দেওয়া। দুষ্ক্রিয় আচরণের কারণ নির্ণয়। পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আন্তরিক ভালবাসা ও সদাচারণ।

শিশু মনোবিকলনের সাম্প্রতিকতম শ্রেণীকরণ

শিশু মনোচিকিৎসায় এখন কিছু নূতন চিন্তাভাবনা সংযোজিত হয়েছে। একটি শিশুর মনোবিকলন হয়েছে তখনই বুঝতে হবে যখন তার আচরণ বা আবেগের অপ্রকৃতিস্থতা তার শিক্ষা ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের পথে অসুবিধার সৃষ্টি করে কিংবা শিশুটিকে বারবার অসুখী ও বিপর্যস্ত করে এবং যারা তাকে লালন-পালন করে তাদেরও অসুখী ও বিপর্যস্ত করে তোলে। আগের ধারণায় যাদের সমস্যামূলক আচরণকারী শিশু বা Problem Children বলা হ'ত, এখন সেই জাতীয় শিশুদেরই 'Psychiatrically disturbed Children' বা 'মনোবিকলনগ্রস্ত শিশু' বলা হয়।

এই সব শিশুদের আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(১) অসামাজিক শিশু যাদের আচরণ সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে বা যারা অন্যদের কাছে উদ্বেগের ও অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে (Disruptive Behaviour Disorder বা Conduct disorder)

(২) যেসব শিশু মাত্রাধিক ও নিয়ত বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা বা অন্যবিধ মানসিক অস্বস্তিতে ভোগে (Emotional disorders)

(৩) যে সব শিশুর বোধবুদ্ধিগত বিকাশ বা স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ স্বাভাবিকগতিতে হয় না (Cognitive or neuromotor developmental disorder)

অসামাজিক শিশুদের আচরণের মধ্যে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হ'ল অবাধ্যতা এবং অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের উপর আক্রমণ বা মারধর করা। মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা, বাড়ি থেকে পালানো, মাদকাসক্ত হওয়া এবং অকাল কামাসক্তি। আর এক ধরনের শিশু মনোবিকলন দেখা যায় যাকে বলা হয় Attention-deficit hyperactivity Disorder ADHD. (মনোযোগ বিঘ্নকারী অস্থির কর্মপ্রবণ শিশু)

এই সব মনোবিকলন যুক্ত শিশুদের প্রধান লক্ষণ হ'ল—এরা খুব অস্থির চিত্ত হয়—এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না—কোন কিছুতে এক নাগাড়ে বেশী সময় মনঃসংযোগ করতে পারে না। এদের আচরণ হয় বিচার-বিবেচনাহীন তাৎক্ষণিক আবেগের দ্বারা চালিত।

অসামাজিক আচরণের সঙ্গে এই প্রকারের শিশু মনোবিকলনের সম্পর্ক আছে।

যাদের কেবল অস্থিরতা আছে, কিন্তু অসামাজিক আচরণ নেই বা যাদের কেবল অসামাজিক আচরণ আছে কিন্তু অস্থিরতা নেই, এইরকম শিশুদের চিহ্নিত করা সহজ, কিন্তু যাদের মধ্যে এই দু'রকমের উপসর্গই রয়েছে তারা পরবর্তীকালে সারাজীবন ধরেই কোন না কোন রকমের অসামাজিক আচরণ করে চলে।

Hyperactive বা অস্থিরচিত্ত ও তার সঙ্গে অসামাজিক আচরণকারী শিশুরা প্রথমত সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না এবং পরে এর ফলে বয়ঃসন্ধিকালে এদের মধ্যে বিষণ্ণতা দেখা দেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়।

Autistic disorder— প্রতি তিনহাজার শিশুতে এই ধরনের মনোবিকলিত শিশু দেখা যায়। যে সব শিশুর বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে অনেক কম (retarded), তাদের মধ্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে এইরকম বিকলন দেখা যায়। সাধারণত দুই থেকে আড়াই বৎসর বয়সে প্রথমে এইসব শিশুদের মধ্যে কথা বলায় এক ধরনের অসুবিধা দেখা যায়। প্রয়োজনীয় কথা বলতে অক্ষমতা, কোন কিছু বুঝতে পারার অক্ষমতা এবং সামাজিক কোন সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা—এইসব লক্ষণগুলি এই ধরনের বিকলনে দেখা যায়।

জৈবিক কারণে এই বিকলন হয়ে থাকে। জন্মাবার পূর্বে মাতৃগর্ভে যদি কোন সংক্রমণ হয় এবং তাতে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনে ও কাজে বাধা সৃষ্টি করে বা জন্মগত বিকৃত জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া শরীরে কাজ করে (Phenylketonuria), তা হলেও এই রকম বিকলন দেখা দিতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

মানসিক রোগের প্রকার

[Types of Mental Diseases]

দেহের রোগের মত মনেরও যে রোগ হতে পারে, এ সম্পর্কে এখন পর্যন্তও আমাদের ধারণা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষীণ। দেহের রোগের যেরূপ কতকগুলি সংলক্ষণ (*Symptoms*) আছে, মানসিক রোগেরও তেমনি কতকগুলি রোগ-লক্ষণ দেখা যায়। দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক থেকে বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, গা বমি বমি করা, শরীরে কোন অংশে ব্যথা, ক্ষুধার অভাব, অজীর্ণতা প্রভৃতি এইরকম অনেক সংলক্ষণ দেহের রোগের বেলায় দেখা যায়। মানসিক রোগের বেলায়ও এরূপ অনেক রোগ-সংলক্ষণ দেখা যায়—যেমন, একা একা কথা বলা, অহেতুক হাসাকাঁদা, মাত্রাধিক অস্থির উত্তেজনা, কখনো বা অকারণে পথচারী বা প্রতিবেশীকে মারধর করতে যাওয়া, গালমন্দ করা, জিনিষপত্র ভাঙ্গাচোরা অথবা একান্তে সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ভীষণভাবে নীরব হয়ে যাওয়া। এইরকম আচার-আচরণ, বিকৃত চিন্তাধারা ও চলাফেরা থেকেই বোঝা যায় যে, ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ।

দেহের বিভিন্ন অংশের সুষম নিয়মতান্ত্রিক কার্যকারিতার অভাব হেতু দেহের রোগ ঘটে এবং ফলে ভৌতিক জগতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা সম্ভব হয় না। মনের সুষম ও সংহত ক্রিয়াপথে যদি অন্তরায় সৃষ্টি হয় তাহলে মনের রোগ দেখা দেয় ও মনের রোগের জন্য সামাজিক সম্পর্ক ঠিক ভাবে রক্ষা করে চলা সম্ভব হয় না, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কর্তব্যকর্ম ও সঙ্গতিসাধন নানাভাবে বিঘ্নিত ও বিকৃত হতে দেখা যায়।

শরীরের রোগের মত মনেরও যে রোগ হতে পারে, এটা আমাদের কাছে কিছুটা অবোধ্য। দেহের কোন রোগ নেই, মস্তিষ্কের কোন বিকলতা নেই, অথচ মনের রোগ হয়েছে, এও কি সম্ভব? মন মানেই আমরা ধরে নিই মস্তিষ্ক এবং এই কারণে কোন ব্যক্তির আচার-আচরণে কোন প্রকার বৈকল্য দেখলেই আমরা ধরে নিই ব্যক্তির মস্তিষ্কে কোন প্রকার বৈকল্য ঘটেছে; আমরা চলতি ভাষায় বলে থাকি 'ওর মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে'—অর্থাৎ মস্তিষ্কের কোন বিকলতা না হলে যেন মনে কোন রোগ ঘটতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে বহু গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, দেহস্থিত মস্তিষ্কের কোন প্রকার গ্রাঠনিক (*structural*) পরিবর্তন ছাড়াই মনের বিকৃতি ও রোগ হতে পারে।

মনে যার রোগ, দেহ তার সুঠাম ও নিখুঁত থাকতে পারে। দেহজ কোন কারণ ছাড়াই মনের অসুখ হতে পারে। মানসিক রোগের নিরঙ্কুশ ভাবে, দেহজ রোগ ব্যতীতও একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। যদিও মনের রোগের জন্য দেহ বা দেহের রোগহেতু মনের বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

দেহের রোগের যেরূপ প্রকারভেদ আছে, যেমন, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি, মানসিক রোগেরও প্রকারভেদ আছে। সাধারণভাবে মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদিগকে আমরা পাগল বলে থাকি, তাদের আচার ব্যবহার সমাজসঙ্গতিহীন। এই সকল 'পাগল' আখ্যায়িত ব্যক্তিদের মধ্যে যে একটা অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ আছে যে যন্ত্রণা দেহের রোগযন্ত্রণা অপেক্ষা এতটুকু কম নয়, এ বিষয়ে সাধারণভাবে আমরা অনবহিত থাকি। দেহ রোগের সংলক্ষণ অনুযায়ী যেরূপ আমরা দেহের রোগের শ্রেণীকরণ করতে পারি, মানসিক রোগেরও সংলক্ষণ বিশেষে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। প্রধানতঃ মানসিক রোগ দুই প্রকারের ঃ

(ক) উৎকেন্দ্রিক বা উদ্বায়ু (Neuroses)

(খ) উন্মাদ রোগ বা বাতুলতা (Psychoses)

উৎকেন্দ্রিক ও উন্মাদদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উৎকেন্দ্রিকদের সমাজবোধ ও চেতনা প্রায় অটুট থাকে, সমাজের সাথে মোটামুটি স্বাভাবিক সঙ্গতি রেখে এরা চলতে পারে এবং এরা যে মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, এ বোধও এদের মধ্যে বর্তমান থাকে; রোগ নিরাময়ের জন্য স্বপ্রয়াস এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উন্মাদ বা বদ্ধ পাগলদের সমাজ ও বাস্তববোধ প্রায় লোপ পায়, আচার আচরণের মধ্যে কোন প্রকার সঙ্গতি থাকে না, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না, এরা যে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ এ বিষয়েও তারা অজ্ঞান থাকে—রোগ নিরাময়ের সামান্যতম প্রয়াসও পরিদৃষ্ট হয় না।

উৎকেন্দ্রিকতাকে (*Neuroses*) রোগ-সংলক্ষণ অনুযায়ী প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (ক) **হিস্টিরিয়া (Hysteria)**, (খ) **নিউরাসথেনিয়া (Neurasthenia)**, (গ) **এ্যাংজাইটি স্টেট্ (Anxiety state)** এবং (ঘ) **সাইকাসথেনিয়া (Psychasthenia)**।

॥ (ক) হিস্টিরিয়া ॥

নিউরোসিসের যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে; তার মধ্যে হিস্টিরিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রোগের নামের সাথে আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। মেয়েদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক, এইটেই আমাদের ধারণা। 'হিস্টিরিয়াতে

ফিট' এর কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি, কেউ কেউ দেখেছি, কিন্তু এ রোগটি যে একটি মানসিক রোগ, সে বিষয়ে আমাদের ঠিক ধারণা নেই। এ রোগের কারণ সম্পূর্ণ-ভাবে মানসিক, দেহগত নয়। হিষ্টিরিয়া বলতে আমরা কেবল মূর্ছা যাওয়া বুঝে থাকি। কোন কোন ক্ষেত্রে হিষ্টিরিয়া রোগে মূর্ছা যায় বটে, কিন্তু প্রত্যেক হিষ্টিরিয়া রোগীই যে মূর্ছা যাবে, এমন কোন কথা নেই। মূর্ছা ভিন্ন ও আরও নানাপ্রকারের রোগ-সংলক্ষণ হিষ্টিরিয়াতে দেখা যায়। এর মধ্যে কতকগুলি মানসিক।

হিষ্টিরিয়া তিন প্রকারের হতে পারে :

(ক) কনভারসন্ (*Conversion*)

(খ) ফিক্সেসন্ (*Fixation*)

(গ) এ্যাংজাইটি (*Anxiety*)

(ক) **কনভারসন হিস্টিরিয়ার** উদাহরণ : দেহের কোন অংশ যেমন হাত, পা অসাড় হয়ে পড়া (*Paralysis*), কখনো কখনো হাতে পায়ে ভীষণ রকমের ব্যথা, পেপ্‌টিক আলসার (*Peptic Ulcer*), রোগীর দেহের কোন অংশের সংবেদন ক্ষমতা লুপ্ত হওয়া, হঠাৎ অন্ধ বা বধির হয়ে যাওয়া। তোতলামি, এমন কি, বাক্‌শক্তি রহিত অবস্থাও হতে পারে। দৈহিক এ সকল উপসর্গগুলো যে সম্পূর্ণরূপে মানসিক কারণেই ঘটে থাকে, তা বহুভাবে প্রমাণসিদ্ধ। দেখা গেছে যে, যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল তার বস্তুত চোখের কোন অঙ্গগত ও গঠনগত বিচ্যুতি নেই, যার সংবেদনক্ষমতা রহিত হল তার দেহের কোষ ও সেখানকার স্নায়ুকোষের কোন বিকৃতি ঘটেনি—এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, "প্রবল প্রক্ষোভ সংযুক্ত বাসনা দমিত (*repressed*) হলে সেই প্রক্ষোভ সেই বাসনাটিকে পরিত্যাগ করে অন্য উপায়ে মুক্তি পেতে চায় এবং মানসিক জগৎ ত্যাগ করে শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রক্ষোভ মস্তিষ্কের উচ্চ কেন্দ্রের (*Cerebrum*) ওপর বাধা সৃষ্টি করে বলে রোগীর সংজ্ঞা-লুপ্তি হয় এবং সংবেদনের অভাব দেখা দেয়।" (ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : নির্জ্ঞান মন)

(খ) **ফিক্সেসন হিস্টিরিয়া :** এতে দেহের যে অংশ পূর্বে কোন দৈহিক রোগে অসুস্থ ও জীর্ণ হয়ে পড়েছিল সেই অঙ্গ বা দেহের অংশ সম্পর্কে রোগী অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই অংশ কখনও কখনও অসাড় ও অকর্মণ্য হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রেও দমিত প্রক্ষোভ জীর্ণ দেহাংশের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভের প্রয়াস করে। দৈহিক রোগের একটা ইতিহাস পূর্ব থেকেই এ সব ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে।

(গ) **এ্যাংজাইটি হিস্টিরিয়া :** অহেতুক ভয় ও দুশ্চিন্তা এই প্রকার হিষ্টিরিয়ার

প্রধান লক্ষণ। এই দুশ্চিন্তা এমন প্রকট ও তীক্ষ্ণ হতে পারে যে, রোগীর স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ (*dissociation*) দেখা দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে রোগীর আপন স্বরূপ ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা নষ্ট হয়। এমনও হতে পারে যে, রোগী তার নাম ঠিকানা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং অতীত জীবনের কথা স্মৃতিপথে আনতে পারে না। পূর্বস্মৃতি এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না; সম্পর্ক ও চলাফেরা প্রায় স্বাভাবিকই থাকে অর্থাৎ হিস্টিরিয়াতে যে স্মৃতিবিভ্রম দেখা যায় প্রায়শঃই তার জন্য অব্যবহিত কোন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। কখনও কখনও রোগী ঘুমের কাজ করে। কখনও কখনও রোগী ঘুমের ঘোরে চলতে থাকে (***Somnumbu-lism***)—এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়. ব্যক্তিত্বের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ ঘুমের ঘোরে নানাপ্রকার কাজে ব্যাপৃত হয়। লেডী ম্যাকবেথের মধ্যে এরকম একটা অবস্থা আমরা দেখতে পাই। রাজাকে হত্যা করার ফলে তার মনের মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও সুতীব্র দুশ্চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাজাকে হত্যা করার দৃশ্য তিনি মনে মনে পুনরাবৃত্তি করছেন ও মন থেকে রক্তাক্ত দৃশ্যপট মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টা করছেন। মোটের উপর এ্যাংজাইটি হিস্টিরিয়াতে কার্যকারণ সম্পর্কহীন অত্যধিক দুশ্চিন্তা ও ভয় প্রকট থাকে। এই ভয় নানাপ্রকারের হতে পারে—যেমন নির্জন জায়গার ভয়, রোগের ভয়, উচ্চস্থান থেকে পতনের ভয় প্রভৃতি।

॥ (খ) নিউরাসথেনিয়া (স্নায়বিক অবসাদ) ॥

নিউরাসথেনিয়ার প্রধান সংলক্ষণ হল আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে অত্যধিক মানসিক ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা-জর্জরতা। বর্তমানে **নিউরাসথেনিয়া ও এ্যাংজাইটি স্টেট-এ দুটি রোগকে একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।** সর্বদাই একটা ক্লান্তির ছাপ (দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি৷ রোগীর চোখে মুখে দেখা দেয়। একটা নিরুৎসাহ ভাব, অমনোযোগিতা এদের মধ্যে সুস্পষ্ট থাকে। যেহেতু এদের ক্লান্তির কারণ মানসিক, সেহেতু অনেক বিশ্রামের ফলেও এ ক্লান্তি দূরীভূত হয় না। আবার এ ক্লান্তি সব বিষয়েই দেখা যায় না - দেখা যাবে কোন ব্যক্তি কাজের বিষয়ে পাঁচমিনিট কথা বললে ক্লান্তি বোধ করে, কিন্তু নিজের অসুস্থতার কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলেও ক্লান্তি বোধ করে না।

শারীরিক দিক থেকে কতকগুলো লক্ষণ দেখা দেয়—যেমন, ঘাড়ে, মাথায় ও পিঠে সব সময় একটা ব্যথার ভাব। অজীর্ণতা ও অনিদ্রাও খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের রোগ সম্বন্ধে সর্বদা অত্যধিক সজাগ থাকে, রোগ নিরাময়ের জন্য এক চিকিৎসকের কাছ থেকে অন্য চিকিৎসকের কাছে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। শারীরিক কোন রোগ না থাকলেও মনে মনে সর্বদা সে নিজেকে কোন-না-কোন

ভাবে অসুস্থ বোধ করে। একটা বিষণ্ণ ভাব সদা মনকে ক্লিষ্ট করে। ফ্রয়েডের মতে অত্যধিক স্বমেহন অথবা কল্পনায় অস্বাভাবিক যৌন ব্যাপৃতিহেতু যে অপরাধবোধ ও দ্বন্দ্ব, চিত্তবিক্ষেপ, বিষণ্ণতা ও অবসাদ দেখা দেয়, তাকেই বলা হয় নিউরাসথেনিয়া।

॥ (গ) এ্যাংজাইটি স্টেট (উৎকণ্ঠাবস্থা) ॥

এই অবস্থায় রোগী সর্বদাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ কিছু নির্দিষ্ট থাকবে না এবং এই দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সম্পর্ক বর্জিত হবে। যেমন—দূরদেশে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠতে ভয় কোন প্রকারে ট্রেনে যদিও বা ওঠে, ওঠার পর নানা-প্রকারের ভয়, ভয় অর্থাৎ দুশ্চিন্তার বিষয়বস্তুটি সর্বদাই পট পরিবর্তন করে। এ ভয় ও দুশ্চিন্তা গন্তব্যস্থান সম্পর্কে কোন বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে নিবদ্ধ থাকে না। রোগীর মনোযোগ আকর্ষণকারী শেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভয় ও দুশ্চিন্তা ঘোরাফেরা করতে থাকে। এ্যাংজাইটি হিস্টিরিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে এই যে, **এ্যাংজাইটি হিস্টিরিয়ায় ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার একটি অবান্তর অথচ নির্দিষ্ট কারণ থাকে, কিন্তু এ্যাংজাইটি স্টেটে দুশ্চিন্তা অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে অর্থাৎ এইরূপ ভয় ও দুশ্চিন্তা ভাসমান অবস্থায় থাকে** (*free floating anxiety*)।

ফ্রয়েডের মতে এরূপ ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ যৌনজীবনের মধ্যে নিহিত থাকে ; যেমন, যদি কোন নারী ও পুরুষের মধ্যে মিলিত হওয়ার কথাবার্তা বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে, অথচ সেই মিলন-প্রস্তাব কার্যতঃ ফলপ্রসূ না হয়, তাহলে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের মধ্যেই দুশ্চিন্তা জর্জরতা দেখা দেয় ; এ ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে বৈধব্য, বিবাহিত জীবনের নানাবিধ অসংগতি যৌন ইচ্ছা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, তা থেকেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা দেখা দিতে পারে। অত্যধিক পুঞ্জীভূত মানসিক উত্তেজনা স্নায়বিক ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে অবসন্নতা, দুশ্চিন্তা ও ভয় দেখা দেয়। এর সঙ্গে শারীরিক দিক্ থেকে কতকগুলো লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন, বুক কাঁপা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অনিয়মতা, মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট হওয়া, হাতের তালু ঘেমে ওঠা, রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে অত্যধিক ভাবে ঘর্মাক্ত হওয়া, মুখ শুকিয়ে আসা, ক্ষুধার ভাব না থাকা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও কোলাইটিস (*colitis*) প্রভৃতি উপসর্গ ও রোগের উদ্ভব ঘটতে পারে।

॥ (ঘ) সাইকাসথেনিয়া (মনদৌর্বল্য) ॥

সাইকাসথেনিয়ার অন্তর্গত দুই প্রকার মনোবিকার—(ক) আবেশিক ও অনুকর্ষী বায়ু (*obsessive compulsive reactions*) এবং (খ) ভয় (*phobias*)। এই দুই

প্রকার বিকৃতির যে লক্ষণ তার উৎস-কারণ সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এই জন্য বর্তমানে সাইকাসথেনিয়া নামটির ব্যবহার প্রায় অপ্রচলিত।

(ক) **আবেশিক বায়ুর** প্রধান সংলক্ষণ হল অপ্রতিহত ও নিয়ত উদ্যত কতকগুলি ইচ্ছা, যা কোন বিষয়ে কিছু বলতে, করতে বা চিন্তা করতে ব্যক্তিকে সতত তাড়া করে। কোন বস্তুকে বার বার ধরার ইচ্ছা, কোন শব্দকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবার উচ্চারণ করা, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ি গোনা বা শরীরের কোন অংশ যেমন চোখের পাতা, ঘাড়, হাত বা পা বারবার সঞ্চালন করা। মোটের উপর, আবেশিক বায়ু বলতে আমরা বুঝি কতকগুলো ধারণা ও চিন্তা, যে ধারণা ও চিন্তার উপর ব্যক্তি বিশেষের কোন প্রকার ঐচ্ছিক অনুশাসন কাজ করতে পারে না। এই সব চিন্তার উপস্থিতি ব্যক্তির পক্ষে যদিও অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক, তবু এইসব চিন্তা তার মধ্যে বার বার আনাগোনা করতে থাকে ও একটা বিরক্তিকর চিন্তার পরগাছা যেন মনকে আঁকড়ে থাকে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, আবেশিক রোগ প্রধানতঃ দুই প্রকারের। এক শ্রেণীর রোগলক্ষণ কেবল মনোজগতে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন কোন ব্যক্তির মধ্যে একটি বিরক্তিকর চিন্তা বারবার ব্যক্তিকে বিতাড়িত করছে। ব্যক্তিটির ভগবানে হয়ত অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু তার মধ্যে ভগবানের কোন মূর্তি সম্বন্ধে এমন সব কুৎসিত চিন্তা আসতে থাকে যে, সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। একজন সওদাগরী অফিসকর্মীর সর্বদাই মনে হত, এই বুঝি তার সব ভুল হয়ে গেল, যোগ করতে ভুল হয়ে গেল, সেজন্য যেটা একবার যোগ করলেই চলে সেটা সে দশবার না ক'রে, কিছুতেই থাকতে পারে না। এতেও মনে হয়, "বোধ হয় ভুল কিছু রয়ে গেল", এইসব ব্যক্তির কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় প্রকারের আবেশিক রোগে দেখা যায় যে, ব্যক্তি কোন একটা বিশেষ কাজে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবার নিযুক্ত হয়। যেমন, শুচিবায়ুগ্রস্ত কোন ব্যক্তি দেহের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য দিনে ছয়-সাত বার স্নান করছে; বারবার স্নান করেও তার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না। শরীরের কোথাও ময়লা লেগে আছে, এই আশঙ্কায় সে সর্বদা শশব্যস্ত। এই পরিচ্ছন্নতার উদ্‌বায়ু কখনও কখনও ঘরদোর বারবার লেপা-পোছা করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। কেউ কেউ পথ দিয়ে যেতে যেতে সামনে যত মন্দির, মস্‌জিদ্, গির্জা পড়বে তার প্রত্যেকটিতে বারবার প্রণাম করবে, কিংবা বিশেষ একটা অঙ্গভঙ্গী বারবার করতে থাকবে। কেউ কেউ আবার ঘরে তালা দিয়ে, তালা দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা দেখার জন্য রাস্তা থেকে বারবার ফিরে এসে তালাটা টেনে টেনে পরীক্ষা করবে।

(খ) ভয় (**phobias**)—ভয়রূপ আবেগ সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। স্বাভাবিক ভয়ে সর্বদাই একটি বাস্তব কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে ভয়ই প্রাণীকে সন্ত্রস্ত, সতর্ক করে তোলে ও অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে, জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু অস্বাভাবিক ভয় (*phobia*) সর্বদাই অকারণ ; কখনও কখনও এমন অবাস্তব কারণ বর্তমান থাকে যা স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রকারেই ভয়ের উদ্রেক করতে পারে না। এরূপ ভয়ে যারা বিপর্যস্ত তারা প্রায়শঃই ভয়ের কারণ সম্বন্ধে অবহিত থাকে না। অথচ, এই অদৃশ্য কারণটিই তাদের সর্বদা বিব্রত ও সন্ত্রস্ত করে রাখে, শারীরিক দিক থেকেও স্বাভাবিক ভয়ে যে সব পরিবর্তন ঘটে, যেমন হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া, দম বন্ধ হয়ে আসা, হাত পা ঘেমে ওঠা, এমন কি মূর্ছা যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ অবাস্তব ভয়ের (*phobia*) ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

আবেশিক ভয়ের (phobia) ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভয়ের আপাতত কোন নির্দিষ্ট অবাস্তব কারণ থাকবে যেটা আমরা এ্যাংজাইটি স্টেটের যে ভয় তাতে দেখতে পাই না। অর্থাৎ এ্যাংজাইটি স্টেটের ভয়ও অবাস্তব, কিন্তু এ ভয়ের কারণের কোন নির্দিষ্ট প্রকৃতি থাকে না। একে আমরা ভাসমান ভয়ও (*free floating anxiety*) বলতে পারি—যেমন ট্রেন ধরতে ভয়, ছেলে রাস্তায় গেলে ভয়, নতুন কোন লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে ভয়, পথ চলতে ভয় ইত্যাদি।

আবেশিক ভয় বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে ; যেমন, (ক) **উন্মুক্ত স্থানের ভয় (Agorophobia)**, (খ) **অন্ধকারের ভয় (Nictophobia)**, **(গ) রোগের ভয় (Patho phobia)**, (ঘ) **একাকীত্বের ভয় (Mono phobia)**, (ঙ) **কোন বিশেষ জন্তু-জানোয়ার বা আরশোলা জাতীয় পোকামাকড়ের ভয় (Zoo-phobia) প্রভৃতি।**

"ভয় ও উৎকণ্ঠা রোগের ক্রমবিকাশের একটি ধারা আছে। এ রোগের প্রারম্ভে রোগীর মনে উৎকণ্ঠা ভেসে বেড়ায়, দিনরাত সর্বক্ষণ তুষের আগুন যেন ধূমায়িত হতে থাকে। তার মন এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খোঁজে এবং সে পথ আসে দুদিক থেকে। প্রথমতঃ, ভাসমান ভয়ের ব্যাপ্তি সংকুচিত হয়ে বস্তু বিশেষের উপর ভর করে (*phobia*)। এই প্রক্রিয়াটিকে একটি বিশাল স্ফীতির ছোট স্ফোটকে পরিণত হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভাসমান ভয় যখন বস্তুবিশেষের ভয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন মানসিক কষ্টের লাঘব হয়। দ্বিতীয়তঃ, **শারীরিক রোগলক্ষণের আবির্ভাব।** দৈহিক রোগের আবির্ভাবে ভয়ের তীব্রতা বেশ কিছুটা কমে আসে ; এমন কি

অনেক ক্ষেত্রে একেবারে তিরোহিত হয় (*Anxiety hysteria & Conversion hysteria*)"।

॥ সাইকোসেস (Psychoses) বা উন্মাদ রোগ ॥

সাইকোসেস সাধারণতঃ দুই প্রকারের :—(ক) মানসিক কারণগত (*functional*), (খ) দৈহিক কারণগত (*organic*)। নিউরোসিস্ বা উৎকেন্দ্রিকতা সর্বতোভাবে মানসিক কারণে হয়, কিন্তু সাইকোসিসের বেলায় দেখা যায় যে, এর কতকগুলি রোগ দেহসঞ্জাত। মানসিক কারণে যে উন্মাদ রোগ (*psychosis*) তাতে রোগীদের রোগ-লক্ষণের জন্য তাদের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে কোনপ্রকার বিচ্যুতি বা অসুস্থতা নির্ণয় করা যায় না। অথচ এদের ব্যক্তিত্ব সুস্থভাবে কাজ করে না—এদের সমস্ত চিন্তা, চলাফেরা, কথন বাস্তব সম্পর্ক বিবর্জিত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নিতে অক্ষম ; ভ্রান্ত বিশ্বাস (*delusion*), অলীকবীক্ষণ (*hallucination*), আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি সংলক্ষনগুলি এদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।

মনোবিদ্‌গণের মতে, মনের কার্যকলাপের বিকৃতিজনিত যে উন্মাদরোগ (*Functional Psychoses*) ঘটে, তার সমস্যা অনেকটা উদ্বায়ু (*Neurosis*) রোগের মত, উন্মাদ রোগেও রোগীরা তাদের প্রবল বিকৃত দুশ্চিন্তার হাত থেকে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে মুক্তির প্রয়াস করে। উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগীরা যে উপায়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে, সে সব উপায়ে উন্মাদ বা সাইকোটিক্‌রা নিজেদের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন না—কেননা তাঁদের মানসিক জটিলতা এত প্রবল ও প্রকট যে উদ্বায়ুগ্রস্ত রোগীদের ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করার যে কৌশল-প্রয়াস, তা এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ বলে প্রতীত হয়। উন্মাদদের আচরণকে আমরা মানসিক আঘাতজনিত যে প্রবল দ্বন্দ্ব ও দুশ্চিন্তা, তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার শেষ প্রয়াস বলতে পারি। যদিও উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের চেয়ে উন্মাদদের পরিবর্তন অনেক বেশী গুরুতর এবং গভীর, তথাপি উভয় শ্রেণীর রোগের কারণ একই, অর্থাৎ 'কামজ বাসনার' সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব।

উন্মাদ রোগে সংলক্ষণমূলক আচরণের পিছনে যে কারণ কাজ করে, তাকে সহজেই আবিষ্কার করা যায় না। উন্মাদ রোগী চিকিৎসকের সঙ্গে কোন ভাবেই সহযোগিতা করতে চায় না। তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, উৎকেন্দ্রিক রোগের সংলক্ষণের ও আচরণের মধ্যে যে অস্বাভাবিক ভয়ের ভাব থাকে, উন্মাদ রোগের সংলক্ষণের মধ্য দিয়েও সেইরূপ অস্বাভাবিক ভয়ই প্রকাশ পায়। সর্বদাই একটা ধ্বংসের ভয় প্রচ্ছন্নভাবে উন্মাদদের দৃষ্টিগোচরে ভাসে, কোন বাস্তব সমস্যাকে যথার্থভাবে পরীক্ষা করে দেখা ও তার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা তাদের মধ্যে একেবারে লোপ পায়। এদের

ব্যক্তিত্বের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে, দেখলে মনে হয় যেন এরা আর আগের লোক নেই—চিন্তা. ভাবনা, চোখের চাহনি সব যেন বিশৃঙ্খল ও ভয়াচ্ছন্ন। উন্মাদদের ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এই সকল উন্মাদদের আচরণ এক প্রকারের নয়। আচরণের তথা রোগ-সংলক্ষণের বিভিন্নতা অনুযায়ী মানসিক কারণগত উন্মাদ রোগগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) ম্যানিয়া (*Mania*), (২) মেলানকোলিয়া (*Melancholia*), ম্যানিক ডিপ্রেসিভ-সাইকোসিস্ (*Manic depressive-Psychosis*), (৪) প্যারানইয়া (*Paranoia*), (৫) সিজোফ্রেনিয়া (*Schizophrenia*)।

॥ ১ ॥ ম্যানিয়া ॥
(Mania)

এ রোগের প্রধান লক্ষণ অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা, একা একা অনর্গল রোগী অসংলগ্ন কথা বলে যায়, পূর্বের ভুলে-যাওয়া অনেক কথা তার স্মৃতিপথে উঁকি দিতে থাকে। 'মনের সব বাঁধ যেন তার ভেঙ্গে যায়।' অহেতুক ও অস্থিরভাবে হাত-পা ছোঁড়া অত্যধিক অপ্রাসঙ্গিক কর্মচাঞ্চল্য, মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মারধর করতে যাওয়া, ম্যানিয়া রোগের লক্ষণ।

রোগ-লক্ষণের তারতম্য অনুসারে ম্যানিয়াকে আবার চারভাগে বিভক্ত করা যায়—

(ক) **হাইপো ম্যানিয়া (Hypo mania)**
(খ) **এ্যাকুট ম্যানিয়া (Acute mania)**
(গ) **ডিলিরিয়াস ম্যানিয়া (Delirious mania)**
(ঘ) **ক্রনিক ম্যানিয়া (Chronic mania)**

ম্যানিয়া যে প্রকারেরই হোক না কেন, তিনটি সংলক্ষণ সকল প্রকার ম্যানিয়াতেই বর্তমান থাকে; যেমন, (১) অস্থিরতা, (২) ভাবনা বিষয়ের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন, (৩) পুনঃ পুনঃ অঙ্গ সঞ্চালন।

(ক) হাইপো ম্যানিয়াতে এই সংলক্ষণগুলো কম মাত্রায় থাকে—রোগীকে আপাতঃদৃষ্টিতে খুব চঞ্চল ও প্রাণবন্ত মনে হয়। কিন্তু এ রোগ যত বেড়ে যায়, রোগীর উত্তেজনা তত বাড়তে থাকে, অন্যের কাজে বিনা কারণে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য নানাপ্রকার অপকৌশল অবলম্বন করে এবং একবারে অনেক কাজ করার অবাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে থাকে।

(খ) **এ্যাকুট ম্যানিয়া**—হাইপোম্যানিয়া থেকে ধীরে ধীরে এ্যাকুট ম্যানিয়া দেখা দেয়। এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অস্থিরতার সঙ্গে থাকে নিদ্রাহীনতা; অস্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে দেখা দেয় প্রবল ভাবাবেগ যা বিচারবুদ্ধি ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নিজেকে সর্বাপেক্ষা বড় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়, কথাবার্তা চলাফেরা অসংলগ্ন হয়ে যায়, এর সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী অলীকবীক্ষণও (*hallucinations*) দেখা দেয়। মোটের উপর, এ অবস্থায় রোগী এমন একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, তাকে মানসিক কোন চিকিৎসাগারে সত্বর না দিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(গ) **ডিলিরিয়াস ম্যানিয়া**—এ্যাকুট ম্যানিয়ার মতই এর মধ্যে অস্থিরতা, অনিদ্রা দেখা দেয়। এতে তীব্রতা যেন আরও বেশী ক'রে দেখা দেয়। স্থান কালের বোধ লুপ্ত হয়, কথাবার্তা একেবারে অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। চিৎকার করা, সবকিছু ভেঙ্গে চৌচির করার একটা নেশা যেন পেয়ে বসে, অলীকবীক্ষণ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে রোগী চলতে থাকে। রোগী এ অবস্থায় আহার ও কারও পরিচর্যা প্রত্যাখ্যান করে। দুই-তিন সপ্তাহ এ রকম একটানা চলতে থাকে।

(ঘ) **ক্রনিক ম্যানিয়া**—১৯০৪ সালে স্কুট (*Schoot*) প্রথম এরকম রোগাবস্থার একটা বিবরণ দেন। তিনি এমন কয়েকটি এ প্রকার রোগের সংলক্ষণের কথা বলেন যা পঁচিশ থেকে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত রোগীর জীবনে প্রলম্বিত ছিল। এরা সকলেই অত্যন্ত অস্থির, ঝগড়াটে ও দুষ্টবুদ্ধির লোক ছিল। সর্বদাই এরা **হুল্লোড়ের** মধ্যে থাকতে চায়—যদি এতে কোন বাধা আসে, তাহ'লে এরা ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অলীক-বীক্ষণ এ অবস্থায় থাকে না বটে, পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী ভ্রান্তবিশ্বাস কখনো কখনো থাকতে পারে।

শারীরিক তীব্র অসুস্থতায় যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, সে রকম শারীরিক রোগ-লক্ষণ এ অবস্থায় দেখা দিতে পারে।

॥ ২ ॥ মেলানকোলিয়া
(Melancholia)

মেলানকোলিয়াতে ম্যানিয়া রোগের ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। একটা গভীর বিষণ্ণতা, কর্মবিমুখতা এই রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোগী নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারে না এবং একটা অসহ্য পাপবোধে যন্ত্রণাকাতর থাকে। হাজার রকমের অপরাধের জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করে, এবং এই সব অপরাধের

প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তার উপযুক্ত শাস্তি হোক, এইরূপ প্রত্যাশা করে। রোগের আধিক্য যদি খুব বেশী হয়, রোগী সমস্ত প্রকার মেলামেশা ছেড়ে দিয়ে একা এক কোণে থাকতে চায়। কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া রোগীর পক্ষে খুব শক্ত হয়—স্মৃতিভ্রংশতাও দেখা দিতে পারে। অলীকবীক্ষণ কখনও কখনও দেখা যায়—প্রায়শঃই রোগী শোনে যে তার (কল্পিত) পাপকার্যের জন্য কে যেন তাকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছে। আত্মহত্যার প্রবণতা এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। অনিদ্রা ও অগ্নিমান্দ্য প্রকট হয়।

ম্যানিয়ার মত মেলানকোলিয়া রোগকেও আচরণভেদে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

(ক) সিম্পল্ (Simple) মেলানকোলিয়া ঃ কোন প্রত্যক্ষ কিছুতে ব্যর্থতার জন্য যে অস্বাভাবিক হতাশা ও বিষণ্নতা আসে, এ তারই ফলশ্রুতি। এক্ষেত্রে অপরাধবোধ তেমন প্রকট থাকে না, কিন্তু উৎসাহহীনতা ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক কার্যকলাপে প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।

(খ) অ্যাজিটেটেড (Agitated) মেলানকোলিয়া ঃ এক্ষেত্রে রোগী সর্বদাই কাজে অকাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে—অহেতুক চলাফেরার মধ্য দিয়ে নিজের বিষণ্নতা জনিত যে পুঞ্জীভূত আবেগ, তার মুক্তির জন্য প্রয়াসী হয়। সে হয়ত সারাদিন ধরে একটা বিশেষ শব্দ আওড়াতে থাকে বা অকারণে পথ চলতে থাকে।

(গ) রেজিসটিভ (Registive) মেলানকোলিয়া ঃ রোগী খেতে পরতে অস্বীকার করে এবং যখন জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, রোগী প্রবলভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। একটা নেতিবাচক মনোভাব তাকে পেয়ে বসে।

(ঘ) মেলানকোলিয়া অ্যাটোনিটা (Attonita) ঃ এর বৈশিষ্ট্য হল এতে রোগীর বাক্শক্তি রহিত হয়ে যায়। কোন স্থানে দাঁড়ালো তো দাঁড়িয়েই থাকে, আবার কোন জায়গায় বসলো তো বসেই রইল।

(ঙ) ডিল্যুসনাল (Delusional) মেলানকোলিয়া ঃ এতে মেলানকোলিয়ার আর সব লক্ষণের সঙ্গে ভ্রান্তবিশ্বাস প্রবলভাবে থাকে। অন্যান্য লক্ষণগুলো চলে গেলেও এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাস সহজে যেতে চায় না। এই ভ্রান্তবিশ্বাস নানা বিষয় দিয়ে হতে পারে। তবে প্রায়ই যেটা দেখা যায়, সেটা হলো নিজের শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে একটা অবাস্তব ধারণা (*hypochondrical*)।

(চ) ইনভল্যুসনাল (Iuvolutional) মেলানকোলিয়া : বার্ধক্যের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয় হতে আরম্ভ করে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা চল্লিশের পর এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশের পর আরম্ভ হয়। এ সময়ে একটা বিষণ্নতা ও হতাশার ভাব আসে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। এই অবস্থা যদি মাত্রাধিক হয়ে যায়, তাহলে এই বয়সে মেলানকোলিয়া রোগের লক্ষণগুলি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

॥ ৩ ॥ ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস ॥
(Manic Depressive Psychois)

ম্যানিয়া ও মেলানকোলিয়া রোগ দুটি অনেক সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না। ম্যানিয়ার সঙ্গে মেলানকোলিয়া বা মেলানকোলিয়া হলে সঙ্গে ম্যানিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। প্রায়শঃই দেখা যায়, ম্যানিয়ারোগীর উত্তেজনা কমে গেলে ক্রমশ: সে মেলান-কোলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। একটি অবস্থার অবসান হওয়ার পর আর একটি অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে পারে বা দুটি অবস্থার মধ্যকালে কিছুকালের জন্য বা কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করতে পারে। ক্রেপলিন (*Kraeplin*) ম্যানিয়া ও মেলানকোলিয়া রোগ দুটিকে একই রোগের দুটি ক্রমপর্যায় হিসাবে মনে করতেন। কেউ কেউ আবার ম্যানিয়া ও মেলানকোলিয়াকে আলাদা রোগ হিসাবে দেখেছেন।

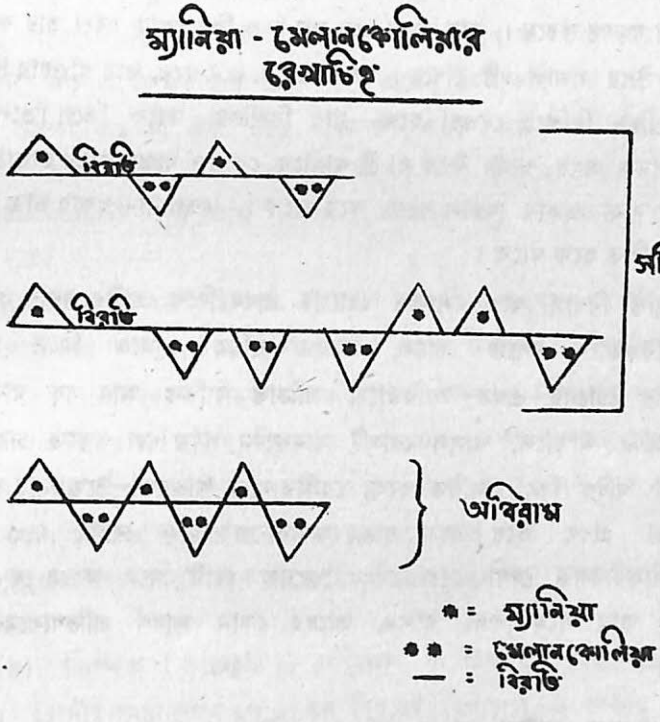
অনেক সময় ম্যানিয়া বা মেলানকোলিয়ার যে কোন একটি, রোগীর মধ্যে তীব্র হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ক্রেপলিনের মতে অনেকদিন ধ র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একটি অবস্থা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি বিপরীত অবস্থা ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস্ রোগাক্রমণের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন সবিরাম (intermittent) ও অবিরাম (Continuous)। পর পৃষ্ঠায় চিত্রের মাধ্যমে এদের প্রকারভেদ পরিস্ফুট করা যায়।

॥ ৪ ॥ প্যারানইয়া
(Paranoia)

এ রোগের প্রধান লক্ষণ হল ভ্রান্ত বিশ্বাস (*delusion*)। সাধারণতঃ একটু বেশী বয়সে (পঁয়ত্রিশের পর) যৌন ও কর্মজীবনের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'য়ে যখন ব্যক্তি পরাজিত হয়, তখনই এ পরাজয়কে অস্বীকার করার উপায় হিসাবে অন্যেরা তার বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করছে, এইরূপ ধারণায় ব্যক্তি চলতে আরম্ভ করতে থাকে। কতকগুলো দৃঢ় চিরস্থায়ী ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের দ্বারা নির্মিত একটা নিজস্ব জগতে রোগী বিচরণ করে। তার চিন্তা ও কাজ:কে এইসব অবাস্তব ধারণাগুলি প্রচ্ছন্নভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। রোগী যখন এই সব ধারণার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস করে, তখন আপাতঃদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত যুক্তি-নিবদ্ধ মনে হয়। বাইরে থেকে রোগীর বাক্য-বিন্যাসের মধ্যে বেশ একটা যুক্তিযুক্ততা আছে বলে মনে হবে, কিন্তু যে ধারণাটিকে কেন্দ্র করে সব কিছুর অবতারণা, তাকে খুব ভাল করে খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেটা অসত্য ও অবাস্তব। এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস নানা



প্রকারের হতে পারে—এর মধ্যে প্রায়ই দুটি ধারণা প্রকট হয়ে ওঠে, (১) হয় রোগী নিজেকে খুব বড় মনে করে (**delusion of grandeur**) অথবা (২) রোগীর ধারণা হয় সকলেই তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত চলছে (**delusion of persecusion**)।

ডিল্যুসন্ অব গ্র্যাণ্ডেয়রে রোগী নিজেকে একটা ভীষণ রকমের প্রয়োজনীয়

ব্যক্তি মনে করে—তাকে ছাড়া সমস্ত দেশ অচল হয়ে যাবে, সে একটা 'কেষ্ট বিষ্টু', তার মনে ভাবটা হচ্ছে *"I am the monarch of all I survey."*—সে সব কিছুর অধীশ্বর। তাকে ছাড়া দেশের শাসনযন্ত্র অচল হয়ে যেতে বাধ্য—যাঁদের আমরা দেশের কর্ণধার মনে করি, তাঁদের সকলেই তার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ চালান—এই রকমের ধারণা রোগীর মধ্যে কাজ করে।

ডিল্যুসন্ অব পারসিকিউসন্ (**Delusion of persecusion**)—এ ক্ষেত্রে রোগী মনে করে, তাকে হত্যা করার জন্য বা তাকে পথে বসাবার জন্য, তার সব কেড়ে নেওয়ার জন্য বাড়ীর লোক, প্রতিবেশী, সহকর্মী সকলে এক হয়ে আলাদা আলাদাভাবে ষড়যন্ত্র করছে। তার ধারণা, এর জন্য কিছু কিছু লোক সর্বদা তার কাজকর্ম চলা-ফেরার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছে। কখনও বা মনে করে, তার খাওয়ার জিনিসে বিষজাতীয় কিছু মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে—যার বিষক্রিয়া তাকে তিলে তিলে হত্যা করছে। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে কোনও বাস্তব কারণ ছাড়াই যৌন জীবন নিয়ে নানা প্রকার অশ্লীল সন্দেহ করে থাকে। এরূপ নানাপ্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা রোগী চালিত হতে থাকে।

এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও রোগের প্রথম দিকে রোগীর অন্যান্য কাজকর্ম প্রায় স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে, নিজের দায়িত্বও নিজে নিতে পারে; মোটের উপর রোগের প্রথম আবির্ভাবে, আক্রান্ত ব্যক্তির আর সব স্বাভাবিক আচার-আচরণের আড়ালে, আসল রোগটি অনেকদিন পর্যন্ত ধরা পড়তে চায় না; কিন্তু এ রোগ অধিক দিন প্রলম্বিত হলে, রোগীর মধ্যে অস্থিরতা, উত্তেজনার ভাব ও আক্রমণধর্মিতা প্রবল হয়ে ওঠে, হত্যা করার প্রবণতাও রোগীর মধ্যে উঁকি মারে। অলীকবীক্ষণও দেখা দেয়—যেমন অনেক রোগী মনে করেন যে, কোন ঠাকুর-দেবতা তার সঙ্গে কথা বলেন, তাদের কোন আদর্শ প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ দেন।

প্যারানোইয়াতে রোগীরা তাদের অধিকাংশ বুদ্ধি ও শক্তিই কোন ভ্রান্ত ধারণা সৃজনে ও যুক্তিবদ্ধভাবে তাকে পরিপুষ্ট করতে প্রয়োগ করে—বাস্তব সত্যতার দিকে তাদের কোন নজর থাকে না—রোগীর কাছে তা সত্য বলে মনে হলেই হ'ল।

এ্যাডোলফ্ হিটলার (*Adolf Hitler*), আইভান (*Ivan*) প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অল্পবিস্তর প্যারানইয়া রোগে ভুগেছিলেন বলে মনশ্চিকিৎসক মনে করেন।

॥ সিজোফ্রেনিয়া ॥
(Schizophrenia)

'সিজোফ্রেনিয়া' শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। *Schizo* শব্দের অর্থ ভেঙ্গে যাওয়া, '*phrenia*' কথাটির অর্থ ব্যক্তিত্ব—এতে সমগ্র ব্যক্তিত্ব যেন একেবারে চৌচির হয়ে যায়। এ রোগের প্রধান সংলক্ষণ হল যে, রোগীর বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না, আবেগের ক্রিয়াকর্ম অত্যন্ত স্তিমিত হয়ে আসে। চিন্তার মধ্যে স্থবিরতা ও অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে কোন উত্তাপ থাকে না, রোগী নিজেকে সকলের নিকট থেকে ধীরে ধীরে একেবারে গুটিয়ে নেয়, বাইরের সব কিছুতেই যেন একটা অনীহা আকর্ষণ-হীনতার ভাব প্রকট হয়ে উঠে। নিজের খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কেও কোন প্রকার আকর্ষণ বা ইচ্ছা থাকে না—রোগী একেবারে জড়পদার্থের মত হয়ে পড়ে—সহস্র প্রশ্নেও তখন তার কাছ থেকে আর কোন উত্তর পাওয়া যায় না এবং তার জীবন রক্ষা করবার জন্য তাকে অস্বাভাবিক উপায়ে খাওয়াতে হয়। রোগী একই অবস্থায় অনেক কাল কাটিয়ে দেয়। অলীক বীক্ষণ (*Hallucinations*) ও ভ্রান্ত বিশ্বাস (*delusions*) প্রভৃতিও রোগীর মধ্যে দেখা যায়।

পূর্বে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, এই রোগ বয়ঃসন্ধিকাল থেকে আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে রোগাক্রান্ত কিশোরের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। এ ধারণা থেকে পূর্বে এ রোগের নামকরণ হয়েছিল ডিমেন্সিয়া প্রিককস (*Dementia praecox*)। *Dementia* শব্দের অর্থ মানসিক অবনতি, *praecox*-এর অর্থ হল অল্পবয়সে। ব্লুইউলার (*Bleuler*) প্রমুখ মনোশ্চিকিৎসকরা এ ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেন—তাঁরা দেখলেন যে, এ রোগ বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বে ও পরে যে কোন সময়ে হতে পারে।

রোগ-সংলক্ষণের প্রকারভেদে সিজোফ্রেনিয়া চার প্রকারের হতে পারে ঃ

(ক) **সিম্পল (Simple)**—নবযুবকাল বা ঠিক এর পরে পরে এ রোগ দেখা যায়। রোগীর প্রধান লক্ষণ হল সে সব বিষয়েই বিস্বাদপর ও অত্যন্ত নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। সর্বদা একা একা থাকতে চায়। স্নান-খাওয়া পর্যন্ত রোগী করতে চায় না। আত্মীয়-স্বজন কেউ এসে খুব জোর না করলে রোগী যে অবস্থায় থাকে, সে অবস্থা থেকে নড়তে চায় না। ক্রমে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ অসংলগ্ন ও এলোমেলো হতে থাকে। নিজেদের খাওয়া পরা ও দায়দায়িত্বের ভার আর নিজেরা নিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অলীকবীক্ষণ ও ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রায়শঃই থাকে না।

(খ) **হেবিফ্রেনিয়া** (**Habephrenia**)—পুরুষদের মধ্যেই এ রোগটির প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। প্রথম দিকে আক্রান্ত ব্যক্তি মাথাধরা, জর জর প্রভৃতি উপসর্গের কথা বলে—স্বাস্থ্যও খারাপ চলতে থাকে। সর্ববিষয়ে অনীহা, সকলের সংসর্গ ত্যাগ রোগীর মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে, সামান্য সমালোচনা ও আঘাতে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরিপার্শ্ব অবস্থা সম্বন্ধে কিছুদিন পর্যন্ত কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি থাকে, রোগী অনুভব করতে পারে যে, তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে যদিও এই পরিবর্তনের কারণ বাইরের কোন কিছুর উপর সে আরোপ করতে চায়। এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা একা কথা বলে হেসে কাটিয়ে দেয় কখনও কখনও কল্পিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন চালাতে থাকে। অলীকবীক্ষণ এ ক্ষেত্রে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়—স্বর্গের কোন দেবদেবী রোগীর সঙ্গে কথা বলতে থাকে—কখনও কখনও নানাপ্রকারের অদ্ভুত গন্ধ তাদের নাকে এসে পৌছয়, এরূপ তারা বিশ্বাস করে। আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা যায়। ধীরে ধীরে রোগীর মধ্যে শিশুর মত কতকগুলো অসংলগ্ন আচরণ দেখা দেয় এবং রোগীর মধ্যে যে স্তব্ধ হতাশা, সেটা হঠাৎ যেন উচ্চ হাসির মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে—ম্যালাংকোলিয়ার সঙ্গে হেবিফ্রেনিয়ার এখানেই পার্থক্য—ম্যালাংকোলিয়াতে যে বিষণ্ণতা ও হতাশা দেখা যায়, তাতে যেন ছেদ নেই। কোন প্রকার চকিত প্রতিক্রিয়াও নেই। কিন্তু হেবিফ্রেনিয়াতে এর ব্যতিক্রম আছে।

নানা প্রকারের উদ্ভট ভ্রান্তবিশ্বাসও রোগীর মধ্যে কাজ করে; যেমন সে মনে করে যে, কোন প্রেতাত্মা নিদ্রাকালে তার সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে—আবার কোন রোগীর মনে হবে চারিদিকের বাতাসে সে প্রেতাত্মা বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ ভাবছে তার পেটের মধ্যে একটা মৌমাছি ঢুকে গেছে এবং সেটা সেখানে ভন্‌ভন্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ধীরে ধীরে তাদের চিন্তায়, বুদ্ধিতে, চলাফেরায় প্রথম একটা অসংলগ্নতা, ও শ্লথ ভাব, পরে জড়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—রোগীর কোন প্রকার ভাবের আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়, রোগী ধীরে ধীরে একটা অপরিচ্ছন্ন স্থবিরে পরিণত হয়।

(গ) **ক্যাটাটোনিয়া** (**Katatonia**)—এতে অনীহা, হতাশা ও বিষাদের সঙ্গে আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়—অনিদ্রা (*insomnia*) বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে দেখা যায়। তার ক্ষতি করার জন্য চক্রান্ত চলছে, এই রকম ভ্রান্ত বিশ্বাস (*delusion of* (*persecution*) রোগীর মধ্যে কাজ করে—বা নিজে কোন ভীষণ রকমের অপরাধ

করেছে—এই রকম একটা বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হতে থাকে ; অলীকবীক্ষণও এ ক্ষেত্রে দেখা যায়।

এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, রোগীর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের কাঠিন্য দেখা দেয়—এই বিষয়ে লক্ষণটি ম্যালংকোলিয়া থেকে এ রোগটিকে পৃথক করতে সাহায্য করে। বস্তুতঃ এ প্রকার রোগীদের মুখে চোখে ম্যালাংকোলিয়া রোগীদের মত বিষণ্ণতার ছাপের পরিবর্তে মুখে-চোখে একটা স্পষ্ট বিরক্তি ও কাঠিন্যের ছাপ থাকে—বিশেষ করে ঠোঁট দুটো মনে হবে যেন ঝুলে পড়ছে।

নেতিবাচক (*Negativism*) মনোভাব সিজোফ্রেনিয়ার আর একটি প্রধান সংলক্ষণ। কথা না বলা, কোন বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া, খাবার দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা প্রভৃতি লক্ষণ আচরণের মধ্য দিয়ে এই নেতিবাচক মনোভাব খুব প্রকটভাবে দেখা যায়। বিশেষ কোন শব্দকে বার-বার উচ্চারণ করা এর একটা লক্ষণ। রোগী এতে কাঠের মত নিশ্চল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কোন একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকলো তো রোগী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে—এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগী বিছানার পাশে সারারাত একভাবে দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিল। কখনও কখনও দেখা যায় যে, এর একেবারে চেতন-শক্তি রহিত হয়ে গেছে—একটা কিছু যদি তার হাতে বা পায়ে ফুটিয়ে দেওয়া হয়, রোগী কোন রকম সাড়া দেয় না, এ অবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টা করে না, বেদনায় তার মুখমণ্ডল একটু লাল হয়ে ওঠে মাত্র। পরানুকরণ এ সময়ে প্রবলভাবে দেখা যায়।

একটা অস্থির উত্তেজনার ভাবও কখনও এতে দেখা যায়। এর উত্তেজনা আর ম্যানিয়ার উত্তেজনা এক প্রকারের নয়। ম্যানিয়ার উত্তেজনা একটা আপাতঃ উদ্দেশ্যমূলক কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু ক্যাটাটোনিয়ার উত্তেজনা অবাস্তব, একঘেয়ে ও উদ্দেশ্যবিহীন। এ উত্তেজনা প্রায়ই প্রবল আক্রমণাত্মক এলোমেলো কাজকর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ম্যানিয়াতে কোন প্রকার অলীকবীক্ষণ থাকে না থাকলেও খুব সামান্য। ক্যাটাটোনিয়াতে অলীকবীক্ষণ থাকে। ম্যানিয়াতে কথাবার্তায় ভাবান্তর খুব ঘন ঘন হতে থাকে। ক্যাটাটোনিয়াতে ভাবনা বিষয়ের মধ্যে কোন প্রকার সংগতি থাকে না, কথাবার্তাও একেবারে অসঙ্গতিপূর্ণ থাকে। নেতিবাচক মনোভাব ক্যাটাটোনিয়াতে অত্যন্ত প্রকট থাকে, ম্যানিয়াতে নেতিবাচক মনোভাব সম্পূর্ণ অবর্তমান থাকে। এইসব পার্থক্য থেকে ম্যানিয়ার অস্থির উত্তেজনাকে ক্যাটাটেনিয়ার উত্তেজনা থেকে আলাদা ভাবে চেনা যায়।

॥ প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া ॥
(Paranoid Schizophrenia)

সিজোফ্রেনিয়ার অন্য সমস্ত লক্ষণের সঙ্গে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অলীকৃবীক্ষণ রোগীর মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়। প্রথম দিকে হতাশার মধ্যেও রোগী মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রায়ই নিজের সম্পর্কে নানা প্রকারের অবাস্তব বড় রকমের ধারণা (*delusion of grundeur*), কিংবা ব্যক্তির অনিষ্টকারী নানা প্রকারের ষড়যন্ত্রমূলক চিন্তাও হতে পারে (*delusion of pesecution*)। প্যারানইয়ার ভ্রান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এখানকার ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি খুব যুক্তিনিবদ্ধ নয়। এদের চিন্তা-ভাবনা অন্য ব্যক্তিরা সব বুঝে ফেলছে এবং এদের চিন্তা-ভাবনাকে অন্যেরা নিয়ন্ত্রিত করছে, এই রকম ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বারা এরা চালিত হয়ে থাকে।

যদিও সেজোফ্রেনিয়াকে রোগলক্ষণ অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করা যায়, তবুও প্রায়ই একই রোগীর মধ্যে চার প্রকার সিজোফ্রেনিয়ার রোগলক্ষণগুলি কিছু-না-কিছু পরিমাণে দেখা যায়। এমন কি, একই রোগী এ চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ক্রমে যাচ্ছে, এরূপ দেখা যায়।

॥ জৈবিক কারণ জনিত উন্মাদ রোগ ॥
(Organic Psychoses)

আমরা মানসিক কারণজনিত উন্মাদ রোগকে যেমন রোগলক্ষণ অনুযায়ী কতকগুলি ভাগে ভাগ করতে পারি, সেইরূপভাবে জৈবিক কারণজনিত উন্মাদ রোগকে (*Organic Psychosis*) ভাগ করতে পারি না। এক্ষেত্রে দেহজ রোগ-কারণের স্বরূপভেদে জৈবিক উন্মাদ রোগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—(ক) জেনারেল প্যারেসিস (*General Paresis*), (খ) মাদক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া (*Alcoholic reactions*), (গ) সেনাইল ডিমেন্সিয়া (*Senile Dementia*)।

(ক) **জেনারেল প্যারেসিস (General Paresis**)—দীর্ঘস্থায়ী সিফিলিস রোগের দ্বারা যখন মস্তিষ্কের কোষ আক্রান্ত হয় (*Brain Cell*), তখনই এই উন্মাদ রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। সিফিলিস রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দুই থেকে তিন বৎসরের মধ্যে মস্তিষ্ককোষে এর সংক্রমণ ঘটে এবং ধীরে ধীরে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় ; যেমন, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উদাসীনতা, সময়-জ্ঞানহীনতা, পূর্বের আগ্রহের বিষয় সম্বন্ধে উদাসীনতা, অস্থিরচিত্ততা ও অত্যধিক ভাব-

প্রবণতা, স্মৃতিভ্রংশতা, বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি রহিত হওয়া, বাচন-ক্ষমতা শিথিল হওয়া প্রভৃতি।

(খ) **মাদক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়াজনিত মানসিক রোগ (Alcoholic reaction)**—দুশ্চিন্তা ও অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অনেক ব্যক্তি সুরাপান ও এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধ সেবন করে থাকে।

মাদকদ্রব্য স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে এবং অত্যধিক পানে ধীরে ধীরে গুরু-মস্তিষ্ককে (*Cerebrum*) নিস্তেজ করে ফেলে, যার ফলে বিচার-বিবেচনা শক্তি ব্যক্তির লোপ পায় এবং সর্বপ্রকার পশ্চাদ্‌বর্তী (*regressive*) আচরণ অর্থাৎ শৈশবকালের অর্বাচীন ও চপল আচরণ ব্যক্তি করে থাকে।

বহুদিন পর্যন্ত মাদকদ্রব্য সেবনে যদি কোন ব্যক্তি রত থাকে, তাহলে তিন প্রকারের বিকৃতি দেখা দিতে পারে— (ক) আচ্ছন্ন চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া। (খ) দর্শনেন্দ্রিয়ের অলীকবীক্ষণ, (গ) হাত-পা কাঁপা। এইরকম অনেকদিন চলতে থাকলে ব্যক্তির স্মৃতিও আক্রান্ত হয়। আফিং, গাঁজা, কোকেন প্রভৃতি অধিক সেবনে শরীরের মধ্যে ও মস্তিষ্ককোষে যে পরিবর্তন আসে, তা থেকেও নানাপ্রকারের মানসিক বিকৃতি দেখা দিতে পারে।

(গ) **সেনাইল ডিমেন্সিয়া (Senile Dementia)**—অধিক বয়সে স্বাভাবিক-ভাবে দৈহিক শক্তি ও মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা স্তিমিত হয়ে আসে এবং মানসিক শক্তি অনেক পরিমাণে কমে যায়। এই কমে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক মাত্রা আছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা এমনভাবে হ্রাস পায়, মনে হয় যেন স্বাভাবিক মানসিক ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে ; স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাচ্ছে, অস্থিরচিত্ততা, অত্যধিক বিষণ্ণতা, অসংলগ্ন কথাবার্তা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে।

॥ সংক্ষিপ্তসার ॥

ভূমিকা—দেহের রোগ সংলক্ষণ ও মানসিক রোগ সংলক্ষণ
—দেহের রোগ ও মনের রোগ
—দেহের রোগ ছাড়াও মনের রোগ হতে পারে।

মানসিক রোগ

- উৎকেন্দ্রিক বা উদ্বায়ু (Neuroses)
  - উদ্বায়ু রোগীদের সমাজচেতনা থাকে
  - রোগ-লক্ষণ অনুসারে
    - হিষ্টিরিয়া
    - নিরাসথেনিয়া
    - এ্যাংজাইটিস্টেট্
    - সাইকাসথেনিয়া
- উন্মাদ রোগ বা বাতুলতা (psychoses)
  - সমাজচেতনা থাকে না

হিষ্টিরিয়া সম্পূর্ণরূপে মানসিক রোগ—মূর্ছা

- কনভারসন্ হিষ্টিরিয়া (হাত পা অসাড় হয়ে যাওয়া, পেটে ulcer, অন্ধ বধির হয়ে যাওয়া)
- ফিক্সেসান্ হিষ্টিরিয়া (অবদমিত প্রক্ষোভ জীর্ণ দেহাংশের মধ্য দিয়ে মুক্তি প্রয়াসী হয়)
- এ্যাংজাইটি হিষ্টিরিয়া (স্মৃতিশক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে হ্রাস পায়, কখনও ঘুমের ঘোরে চলতে থাকে, দুশ্চিন্তার নির্দিষ্ট অবাস্তব কারণ থাকে)

নিউরাসথেনিয়া : অত্যধিক দুশ্চিন্তা ও মানসিক ক্লান্তি, অজীর্ণতা, অনিদ্রা

এ্যাংজাইটি স্টেট্ : দুশ্চিন্তার নির্দিষ্ট কোন কারণ থাকে না : দৈহিক উপসর্গ—Colitis, মাথাধরা, নিশ্বাস প্রশ্বাসের অনিয়মতা, মুখ শুকিয়ে আসা, ভাসমান ভয় (free floating anxiety)

সাইকাসথেনিয়া (মন দৌর্বল্য)

- আবেশিক বায়ু (absessive compulsive reaction) (অনিচ্ছাকৃত কাজ ও চিন্তা)
- ভয় (Phobias) (অকারণে ভয়, অবাস্তব কারণে ভয়)
  - উন্মুক্ত স্থানের ভয়
  - অন্ধকারের ভয়
  - রোগের ভয়
  - একাকীত্বের ভয়
  - আরশোলা জাতিয় পোকা মাকড়ের ভয়

মনের চিন্তাতেই সীমাবদ্ধ
বার বার কোন কাজে নিযুক্ত হওয়া।

সাইকোসেস বা উন্মাদ রোগ

- **মানসিক কারণে** (functional Psychoses)
  রোগ লক্ষণের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে কোনপ্রকার বিচ্যুতি বা অসুস্থতা নির্ণয় করা যায় না)
  - মানসিক কারণে যে উন্মাদ রোগ তা প্রকৃতির দিক থেকে উদ্বায়ু রোগের মত, কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নিউরোসিস বা উৎকেন্দ্রিক রোগ সংলক্ষণ ও উন্মাদ রোগ সংলক্ষণে অস্বাভাবিক ভয়ের ভাব প্রকাশ পায়
- **দৈহিক কারণে** (organic psychoses)
  রোগ লক্ষণ অনুযায়ী জৈবিক কারণজনিত উন্মাদ—রোগকেও নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়
  - জেনারেল প্যারেসিস (General Paresis) সিফলিস রোগের দ্বারা মস্তিষ্ক কোষ আক্রান্ত হয়
  - মাদক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়াজনিত মানসিক রোগ (Alcoholic reaction) অত্যধিক পানে গুরু মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে যায়
  - সেনাইল ডিমেন্সিয়া (Senile Dementia) অধিক বয়সে মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা কমে যায়

রোগ সংলক্ষণের ভিন্নতা অনুযায়ী মানসিক কারণগত উন্মাদ রোগগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়

- **ম্যানিয়া** — অস্থির ভাব ও উত্তেজনা
  - হাইপোম্যানিয়া (সংলক্ষণ কম মাত্রায় থাকে)
  - এ্যাকুট ম্যানিয়া অস্বাভাবিক অস্থিরতা, কর্মচাঞ্চল্য নিদ্রাহীনতা
  - ডিলিরিয়াস ম্যানিয়া অস্থিরতা অনিদ্রা অলীকবীক্ষণ
  - ক্রনিক ম্যানিয়া ঝগড়াটে অস্থিরভাব ক্ষণস্থায়ী ভ্রান্তবিশ্বাস
- **মেলানকোলিয়া** — বিষন্নতা পাপবোধ কর্মবিমুখতা কখনও কখনও অলোক বীক্ষণ, অনিদ্রা *শ্রেণীকরণ
  - মেলনেকোলিয়া
    - সিম্পল (ব্যর্থতা হতাশা)
    - এ্যাজিটেটেড (অকারণে কাজে ব্যাপৃত থাকা, পথ চলা)
    - রেজিসটিভ (খেতে পরতে অস্বীকার করা)
    - এট্টানিটা (বাকশক্তি রহিত, স্থানুভাব)
    - ডিলুসনাল (ভ্রান্তবিশ্বাস)
    - ইনলুসনাল (বার্ধক্যের ক্ষয়জনিত হতাশা)
- **ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস্** — ক্রেপলিনের মতে ম্যানিয়া ও মেলানকোলিয়া একই রোগের দুটি ক্রমপর্যায় মাত্র
  - সবিরাম
  - অবিরাম
- **প্যারানইয়া** — ভ্রান্তবিশ্বাস সমস্ত চিন্তা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে
  - রোগী নিজেকে খুব বড় মনে করে (delusion of grandeur)
  - রোগী মনে করে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে (delusion of persecusion) *শ্রেণীকরণ
- **সিজোফ্রেনিয়া** — বাস্তব জগৎ থেকে গুটিয়ে নেয় অলাকবীক্ষণ (Ha lucinations) ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusion) যে কোন বয়সে এ রোগ হতে পারে

*(শ্রেণীকরণ)

সিজোফ্রেনিয়া

- সিম্পল (Simple) (নবযুবকাল বা ঠিক এর পরে এ রোগ দেখা দেয়, নিস্পৃহ ভাব)
- হেবিফ্রেনিয়া (Hebiphrenia (অনীহা, একা একা কথা বলা, অলীকবাক্ষণ, আত্মহত্যার প্রবণতা, ভ্রান্ত বিশ্বাস)
- কেটাটানিয়া (Katatonia (অনিদ্রা, ষড়যন্ত্রের ভয়) মুখে চোখে বিরক্তির ছাপ, নেতিবাচক মনোভাব, অলীকবীক্ষণ, কাঠের মত নিশ্চলভাব কখনও কখনও চেতন-শক্তি রহিত হওয়া, উত্তেজনার ভাব)
- প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া (ভ্রান্তবিশ্বাস-অলীকবীক্ষণ ভ্রান্ত বিশ্বাস যুক্তিনিবদ্ধ নয়)

॥ অনুশীলনী ॥

1. Discuss, with suitable illustrations, the different types of mental diseases.
2. Disitinguish between psychoneunosis and Psychosis.
3. Differential between functional and organic mental disorders.
4. What are some of the undesirable outcomes of neurasthenia, psychasthenia and hysteria ?
5. Describe any case known to you that shows any of the following symptoms : delusion, compulsion, obsession, halluchination, phobia, hyper activity or delirium.
6. Give an outline of modern classification of the different types of mental diseases.

মানসিক বিকার ও মানসিক রোগের সাম্প্রতিকতম শ্রেণীকরণ

মানসিক বিকার ও রোগের শ্রেণীকরণ নূতন ভাবে হচ্ছে। WHO–International Classification of Diseases and Health Problems, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে হয়। তারপর ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). আরও নূতন সংযোজন ও সংগঠনে বিন্যস্ত হয়। এই বিন্যাস অনুসারে প্রত্যেকটি মানসিক বিকার ও রোগের আরম্ভ ও প্রকোপের বয়স, রোগের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগ ও কারণ, এর প্রাদুর্ভাব, রোগারম্ভের প্রাক নিহিত অবস্থা, পারিবারিক অবস্থান এবং প্রতিটি রোগ নির্ণয়ের জন্য যে সংলক্ষণ (symptom) তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই শ্রেণীবিন্যাসে প্রথমে আসে

মানসিক বা বৌদ্ধিক মন্থরতা (Mental Retardation), এই শ্রেণীবিন্যাসে পাঁচটি ভাগ আছে

(ক) মৃদু বৌদ্ধিক মন্থরতা (Mild Mental Retardation)
(খ) মধ্য গতি বৌদ্ধিক মন্থরতা (Moderate Mental Retardation)
(গ) প্রকট বৌদ্ধিক মন্থরতা (Severe Mental Retardation)
(ঘ) গভীর বৌদ্ধিক মন্থরতা (Profound Mental Retardation)
(ঙ) নির্দ্ধারণ সীমা ঊর্দ্ধ-গভীর বৌদ্ধিক মন্থরতা (Mental retardation, Severity unspecified)

এরপরে **শিক্ষণে সমস্যা বা শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা** (Learning Disorders) নিয়ে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

(ক) পড়ায় অসুবিধা (Readings Disorders)
(খ) অঙ্ক কষায় অসুবিধা বা সমস্যা (Mathematics Disorder)
(গ) লিখতে গিয়ে অসুবিধা (Disorder of Writing Expression)
(ঘ) শিক্ষণ সমস্যা অনির্দ্ধারিত (Learning Disorder not specified)

অভ্যাস গঠনের জন্য স্নায়ু সঞ্চলনের বিকার (Motor Skills Disorder)
সঞ্চালনী স্নায়ু বিকাশ ও প্রক্রিয়ার বিকার

ভাবপ্রকাশে সমস্যা ও বিকার (Communication Disorder)
ভাষা প্রকাশে বাধা
ভাষা বোঝা ও প্রকাশে সমস্যা
শোনার সমস্যা
ভাবপ্রকাশে বা বোঝার অনির্দ্ধারিত সমস্যা

সামগ্রিক বিকাশজনিত সমস্যা ও বিকার (Developmental Disorders)

এই বিকৃতির মধ্যে পাঁচরকমের বিকৃতি দেখা যায়

(ক) অটিসটিক সমস্যা (Autistic Disorder)
(খ) রেট সমস্যা (Rett's Disorder)
(গ) শৈশবকালীন বিচ্ছিন্নতামুখী সমস্যা (Childhood Disintegrative Disorder)
(ঘ) এসপার্জারের সমস্যা (Asperger's Disorder)
(ঙ) অনির্দিষ্ট সামগ্রিক বিকাশজনিত (Pervasive Developmental Disorder NOS)

মনোযোগ-হ্রাসজনিত ও ধ্বংসাত্মক আচরণজনিত সমস্যা (Attention-Deficit and Disruptive Behaviour Disorders)

(ক) মনোযোগহ্রাস বা অতিমাত্রায় কর্মচঞ্চলতাজনিত সমস্যা (Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder)

(খ) মনোযোগ হ্রাস ও একই সঙ্গে অতিমাত্রায় কর্মচঞ্চলতাজনিত সমস্যা (Combined Type)

(গ) প্রধানত অমনোযোগজনিত সমস্যা (Predominantly Inattentive Type)

(ঘ) প্রধানত অতিকর্মচঞ্চল বা ভাবাবেগের সমস্যা ((Predominantly Hyperactive Impulsive Type)

(ঙ) অনির্ণীত অতিকর্মচঞ্চল বা ভাবাবেগের সমস্যা (Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder Nos)

(চ) বিকৃত আচরণজনিত সমস্যা (Conduct Disorders)

(ছ) অবাধ্যতাজনিত সমস্যা (Oppositional Defiant Disorders)

(জ) অনির্ণীত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী আচরণজনিত সমস্যা (Disruptive Behaviour Disorder Nos)

খাওয়ানো এবং খাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা (Feeding and Eating Disorders of Infancy or Early Childhood)

মুদ্রাদোষজনিত সমস্যা (TIC Disorders)

শারীরিক আবর্জনা নিষ্ক্রমণ জনিত সমস্যা

(Elimination Disorders)

পায়খানা পরিষ্কার না হওয়া (Constipation and overflow Incontinence

ঘন ঘন পায়খানা হওয়া (Without Constipation and overflow Incontinence)

বিছানায় প্রস্রাব করে দেওয়া (Enuresis)

শিশুদের অন্যান্য আচরণজনিত সমস্যা

(Other Disorders of Infancy, Childhood or Adolescence)

শৈশবে পিতামাতা বা প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুশ্চিন্তাজনিত সমস্যা

(Separation Anxiety Disorders)

নির্বাচিত কোন বিষয়ে বাকশক্তি রহিত অবস্থাজনিত সমস্যা

(Selective Mutism)

মাতাপিতার সঙ্গে সম্পর্কবন্ধনজনিত সমস্যা

(Reactive Attachment Disorders of Infancy or Early childhood)

বেশী চুপচাপ হওয়া অস্থিরতাজনিত সমস্যা

(Inhibited type/Disinhibited type)

একধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ার সমস্যা

(Stereotypic Movement Disorders)

অসংলগ্ন কথাবলা, বুদ্ধিভ্রংশতা, স্মৃতিভ্রংশতা এবং অন্যান্য ধরনের বোধবুদ্ধিজনিত সমস্যা

(Delirium, Dementia and Amnestic and other Cognitive Disorders)

বুদ্ধিভ্রংশতা

(Dementia)

এ্যালজাইমার রোগজনিত বুদ্ধিভ্রংশতা

(Dementia of the Alzheimer's Type)

এইচ আই ভি রোগজনিত বুদ্ধিভ্রংশতা

(Dementia due to HIV Disease)

মস্তিষ্কে আঘাতজনিত বুদ্ধিভ্রংশতা
(Dementia due to Head trauma)
পারকিনসন রোগের জন্য বুদ্ধিভ্রংশতা
(Dementia due to Parkinson's Disease)
মাদক দ্রব্য ব্যবহারজনিত বুদ্ধিভ্রংশতা
(Substance-Induced Persisting Dementia)
মদ ব্যবহার জনিত মানসিক সমস্যা
(Alcohol use Disorders)
এমফিটেমাইন ব্যবহার জনিত সমস্যা
(Amphetamine Related Disorders)
ক্যাফিন ব্যবহার জনিত সমস্যা
(Caffeine-Related Disorders)
গাঁজা ব্যবহারজনিত আচরণগত সমস্যা
(Cannabis Related Disorders)
কোকেন ব্যবহারজনিত আচরণের সমস্যা
(Cocaine-related Disorders)
অলীকবীক্ষণ ঘটায় এমন মাদক দ্রব্য ব্যবহারজনিত সমস্যা
(Hallucinogen-Related Disorders)
নিকোটিন গ্রহণজনিত সমস্যা
(Nicotine Related Disorders)
আফিম ও আফিমজাত দ্রব্য সেবনজনিত সমস্যা
(Opioid-induced Disorders)
ঘুম আনে এমন ওষুধ নিয়ত ব্যবহারজনিত সমস্যা
(Sedative Related Disorder)
মানসিক অবস্থা পরিবর্তনকারী অনেক রকমের ওষুধ ব্যবহারজনিত সমস্যা
(Poly substance Related Disorders)
সিজোফ্রেনিক ও অন্যবিধ উন্মাদরোগজনিত মানসিক বিকার
(Schizophrenia and other Psychotic Disorders)
ভাবপরিবর্তনজনিত সমস্যা
(Mood Disorders)
অবসাদ ও বিষণ্ণতাজনিতসমস্যা
(Depressive Disorders)
উত্তালভাব ও বিষণ্ণতাজনিত সমস্যা
(Bipolar Disorders)
দুশ্চিন্তা ও ভয়জনিত সমস্যা
(Anxiety Disorders with Phobias)
মানসিক রোগের দৈহিক রোগে রূপান্তরণের বিকার
(Somatoform Disorder)

ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্নতাজনিত বিকার
(Dissociate Disorders)
যৌনবিকারজনিত মানসিক সমস্যা
(Sexual Dysfunction)
যৌন ইচ্ছার বিকৃতি
(Sexual Desire Disorders)
যৌন উন্মেষের বিকার
(Sexual Arousal Disorders)
যৌনতৃপ্তির অভাবজনিত বিকার
(Organismic Disorders)
যৌনক্রিয়ায় ব্যথার উদ্রেকজনিত বিকার
(Sexual Pain Disorders)
যৌন বিকৃতি
(Perversions)
খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত বিকার
(Eating Disorders)
নিদ্রার ব্যাঘাতজনিত সমস্যা
(Sleep Disorders)
নিশ্বাসের ব্যাঘাতজনিত ঘুমের সমস্যা
(Breathing-related Sleep Disorders)
ঘুমের মধ্যে ভয়জনিত সমস্যা
(Sleep terror Disorders)
ঘুমের ঘোরে হেঁটে চলা
(Sleep walking Disorders)
আপন ইচ্ছা ও ক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকা জনিত সমস্যা
(Impulse control Disorders)
অন্যের দ্রব্য না বলে নিয়ে ফেলার প্রবণতা
(Kleptomania)
সঙ্গতি সাধনজনিত সমস্যা
(Adjustment Disorders)
বিষণ্ণতা জনিত
(With depressed Mood)
দুশ্চিন্তা জনিত
(With anxiety)
আচরণ জনিত
(With Disturbance of Conduct)
ব্যক্তিত্বের সংকলনের গণ্ডগোল ও বিকার
(Personality Disorders)

দ্বাদশ অধ্যায়

সমস্যামূলক আচরণের প্রকার, এদের বিশদ কারণ ও প্রতিকার

[Specific Types of Problem Behaviour, their Specific Causes and Remedies]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শিশু ও কিশোরদের সেই সব আচরণকেই সমস্যামূলক আচরন বলা হবে যা সমাজে, বিদ্যালয়ে, গৃহে, প্রতিবেশী, শিক্ষক ও পিতামাতার নিকট শান্তি ও শৃঙ্খলা ঘটিত সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। সমস্যামূলক আচরণের মধ্যে যেগুলি বিদ্যালয়ে খুব প্রকটভাবে দেখা দেয় ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ ও অস্বস্তির কারন ঘটায়, তাদের মধ্যে আছে গৃহ ও বিদ্যালয় থেকে পলায়ন (*Truancy*), ঝগড়া-বিবাদ (*quarrelling*), মারামারি (*fighting*), চুরি করা (*Stealing*), মিথ্যাকথা বলা (*lying*), অবাধ্য হওয়া (*disobediency*), একগুঁয়েমি (*obstinacy*), নেতিবাচক মনোভাব (*negativism*) এবং ছোটখাটো যৌন অপরাধ (*minor sex problem*)। এ ছাড়া, অবদমিত শঙ্কাপরায়ণ সমস্যামূলক আচরণও আছে, যা প্রত্যক্ষ-ভাবে না হয়েও পরোক্ষভাবে গৃহে ও বিদ্যালয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে। এর মধ্যে আছে শয্যামূত্র (*enuresis*), ভয়াকুলতা (*Nervousness*), নখ কামড়ানো (*Nailbiting*), আঙ্গুল চোষা (*Thumb Sucking*), অত্যধিক বশংবদভাব (*over submissiveness*)।

একে একে এবার উপরি-উক্ত সমস্যামূলক আচরণগুলির প্রকৃতি, কারণ ও তাদের দূর করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

(১) পলায়নপরতা (Truancy) :

পলায়নপরতা বলতে আমরা বুঝি গৃহ থেকে না বলে কয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া ; বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ও কাজচলাকালে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া।

॥ বিদ্যালয়-ঘটিত কারণ ॥

॥ **ক** ॥ বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা এমন নিষ্প্রাণ ও অবিন্যস্ত হতে পারে যে, শিক্ষার্থীরা এতে কোন উৎসাহ বোধ করে না। এরকম নিষ্প্রাণ শিক্ষা-ধারার নিষ্পেষণ থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী পালিয়ে যায়।

॥ খ ॥ সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় কোন প্রকার আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না—শিক্ষকরা যদি গতানুগতিক ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয়, ছাত্র-শিক্ষকের পরস্পরের সম্পর্ক যদি মধুর ও সুস্থ না হয় তা হলে বিদ্যালয়ের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রাণ সঞ্চার হয় না---শিক্ষার্থী রা কোন রূপ আকর্ষণ অনুভব করে না।

॥ গ ॥ নিয়মশৃঙ্খলার দোষদুষ্টতা—যেমন, শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলার জন্য উপর থেকে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি, সব সময় নিয়মমাফিক চলার জন্য রক্ত চক্ষু দেখানো—অথচ বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্য-সূচীর কোন ব্যবস্থা নেই—খোলা-মেলা পরিবেশের অভাব—লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড। ছাত্রদের সবকিছুতেই কর্তৃপক্ষের সমালোচনা ও বাধা-দান, শিক্ষকের পক্ষপাতদুষ্টতা প্রভৃতি অবস্থা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়বিমুখ করে তোলে—এ পরিবেশে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় পলায়নপর হয়ে উঠে।

॥ ঘ ॥ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে যদি অধিক সংখ্যক অপরাধপরায়ণ (গৃহ ও গৃহ-স্থানের প্রভাবে) ছাত্র থাকে, তাহলে এদের প্রভাবে, ভাল হতে পারে এমন ছেলেরাও, বিপথগামী হয়ে ওঠে এবং বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে খারাপ সিনেমা দেখা, দল করে চুরি করা ও অন্য নানা প্রকারের অসামাজিক আচরণ এদের মধ্যে দেখা দেয়।

॥ গৃহঘটিত কারণ ॥

পিতামাতা সন্তান সম্বন্ধে কোন প্রকার মনোযোগ দেন না—তাদের পড়াশুনা সম্বন্ধে কোনপ্রকার মনোযোগ বা যত্ন নেন না। বাড়ীতে পিতামাতার মধ্যে সর্বদা মতান্তর মনান্তর চলতে থাকে। পিতামাতা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত নির্মম আচরণ করে থাকে—গৃহ-পরিবেশের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ও স্বতঃস্ফূর্ততার বিন্দুমাত্র আভাস থাকে না। সন্তান নিজেকে প্রত্যাখ্যাত (*rejected*) মনে করে।[1] এরূপ গৃহপরিবেশের মধ্যে সন্তানের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ববিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়—পিতামাতার কলহ ও বিচ্ছেদের জন্য গৃহের মধ্যে যে চাপা অস্থিরতা ও উত্তেজনার ভাব থাকে—তা

১। Jenkins views the unsocialised aggressive reaction and the run away reaction as apposite sides of the same coin. In both instances. the child feels rejected by his parents and an oversive life situation. However while one child acts out his frustrations through aggressive anti-social behaviour, the other runs away.

(Jenkins, R. L. The run away reaction. Amer. J. Psychiat, 1971, 128(2) ; 168-173).

সন্তানের মধ্যে তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটি দুশ্চিন্তা-জর্জরতা, উদ্বেগ ও ভয়ের ভাব নিয়ে আসে। সে কোন বিষয়ে উৎসাহ পায় না, কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারে না। এ হেন মানসিকতা নিয়ে কোন ছেলে যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও, সে তাকে গ্রহণ করতে পারে না— ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার ভাব সর্বদা তার মনের গভীরে অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলে। পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না, বিদ্যালয়ের কোন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে ভয় পায়, পিতামাতার পরিবর্তস্বরূপ শিক্ষকদের সম্পর্কে একটা ভয়-ভয় ভাব তাকে সর্বদা ঘিরে থাকে, ফলে শিক্ষকদের সর্বদা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে— সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধেই একটা অনীহা তার মধ্যে দেখা দেয়—বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।

শিক্ষার্থীদের কারু মধ্যে যদি স্বাভাবিক বুদ্ধি না থাকে, তা হলেও সে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন অনুধাবন করতে পারে না—সহপাঠীদের সঙ্গে ভালভাবে মিশতে পারে না—বিদ্যালয় তার কাছে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে সে বাঁচে। বুদ্ধির স্বল্পতাও পলায়নপরতার একটা কারণ হতে পারে।

ক্লাসে কোন ছেলের বুদ্ধি যদি স্বাভাবিক থেকে অনেক বেশী হয় এবং প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীর জন্য যদি বিজ্ঞানসম্মত পঠন-পাঠন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ক্লাসে যা পড়ানো হবে, তা অল্প সময়ের মধ্যেই এরা শিখে ফেলবে এবং বাকী সময়টা (বিদ্যালয়ে যদি সহপাঠক্রমিক কোন কিছুর ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সে সেটা) নষ্ট করে—বিদ্যালয় এদের কাছে নিরর্থক মনে হয় ও বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্যভাবে সময় কাটানো শ্রেয়ঃ মনে করে।

॥ প্রতিকার ॥

(Remedies)

(১) একদিকে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন-ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত ও হৃদয়গ্রাহী হতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক সকলের কাছ থেকে শিক্ষার্থী অকৃত্রিম স্নেহ প্রযত্ন পাবে—প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, বুদ্ধি, মেজাজ, বিশেষ শক্তি ও তার বিভিন্ন সমস্যা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন—এবং ছাত্রকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে যাতে তার মধ্যে 'আত্মশ্রদ্ধা' জাগে—নিজের সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বিদ্যালয়ের

শৃঙ্খলা সঙ্গতিপূর্ণ সুদৃঢ় হতে হবে। খেলাধুলা, সাহিত্য ও শিল্পচর্চা, বক্তৃতা, শিক্ষা-মূলক ভ্রমণ, যৌথ সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা, হাতেনাতে পাঠ্য বিষয়বস্তু থেকে কোন কোন জিনিস তৈরি করা, প্রাচীর-পত্র প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ সহ-পাঠক্রমিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় পরিবেশকে শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদা পরিপূরণের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

(২) গৃহ-পরিবেশে পিতামাতাকে শিশুর মৌলিক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তির সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পড়াশুনা সম্বন্ধে যত্নশীল ও মনোযোগী হতে হবে, তার অগ্রগতি কতটা হচ্ছে, না হচ্ছে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুকে যথাযথ স্নেহপ্রীতি, উৎসাহ, প্রশংসা সময়বিশেষে দিতে হবে। গৃহে পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি উদাসীন হন বা নির্মম হন যাতে সন্তান নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করতে পারে, এরকম অবস্থাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব সমধিক ও গভীর। এরকম শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ আরও বেশী দৃষ্টি দেবেন, আরও বেশী যত্নবান হবেন, যাতে প্রত্যাখ্যাতজনিত যে উদ্বেগ, ক্ষোভ ও নিরাপত্তাবোধের অভাব, তা থেকে শিশু ও কিশোর মন শিক্ষক-শিক্ষিকার স্নেহবারিতে অভিসিঞ্চিত হতে পারে, যাতে শিশু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, তার বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষকও আছেন, অন্ততঃ এমন একজনও আছেন, যিনি তার সুখ-দুঃখের অংশীদার, যিনি তার জন্য সদা উদ্গ্রীব ও উৎসাহী এবং যাঁর উপর সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপহাস করা, লজ্জা দেওয়া ও পারিবারিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্রূপ করা যতদূর সম্ভব বন্ধ করতে হবে। গৃহে প্রত্যাঘাত শিশু ও কিশোরদের মন্দীভূত আবেগ-মুক্তির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা দরকার। খেলাধুলা সঙ্গীতচর্চা, চিত্রাঙ্কন, ছোট ছোট জিনিষ-পত্র নিয়ে কাজ করা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে পুঞ্জীভূত আবেগ-মুক্তি কিছুটা ঘটতে পারে। এছাড়া, শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্র যদি তার অসুবিধা ও সমস্যার কথা খোলাখুলিভাবে বলতে পারে, তার জীবনের আবেগ-পুঞ্জীভূত ঘটনার কথা শিক্ষককে বন্ধুর মত বলতে পারে এবং এ বিষয়ে শিক্ষকের কাছে থেকে যথার্থ অনুবেদন ছাত্র অনুভব করে, তাহলে তার অবচেতন মনের যে সমস্যা ও দ্বন্দ্ব, যা পরোক্ষভাবে তাকে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যেতে উদ্বেলিত করে, তার সুরাহা হতে পারে।

ঝগড়া ও মারামারি করা
(Quarrelling & fighting)

বিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্র দেখা যায় যারা সর্বদা মারামারি, ঝগড়া বিবাদে রত থাকে—সামান্য সূত্র পেলেই কারও-না-কারও সঙ্গে ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করে দেয়। কেউ কেউ আছে, যারা কথা কাটাকাটি থেকে কোন রকম দ্বিধা না করে সরাসরি প্রচণ্ড মারধোরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা শ্রেণীকক্ষের, সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করে। গৃহ-পরিবেশেও এরা ভাই-বোনদের সঙ্গে অনবরত ঝগড়া-বিবাদ করে, প্রতিবেশী খেলার সঙ্গীদের সঙ্গেও ঝগড়া-মারামারি করে থাকে।

॥ কারণ ॥

নিরাপত্তাবোধের অভাব।[১] শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যদি ভাল না হয়, প্রায়ই যদি সে অসুখ-বিসুখে ভোগে, তা'হলে মানসিক দিক্ থেকে আবেগগত ভারসাম্যহীনতা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হতে পারে - এরূপ অবস্থা তিন ভাবে আসতে পারে। প্রথমতঃ, অন্যান্যদের তুলনায় সে নিজেকে হীন মনে করে—অন্যরা সাবলীলভাবে যে কাজ করতে পারে, সে তা করতে পারে না বলে তার মধ্যে একটা হীনমন্যতা দেখা দেয়।

১। The fundamental cause of aggression lies in feelings of insecurity, and specialists agree that redirection of the behaviour is much better than any attempt to repress it."

—Norma E. Cutts and Nicholas Moseley, Practical School Disciplinc and Mental Hygiene, Boston : Houghton Maffni Company, 181, P. 143.

Aggression may actually be stimulated by repressive discipline. The insecurity generated by threats and fear of consequences manifests itself in fighting quarrelsomeness and destruction when the individual is not under the immediate supervision of the feared person. Since such outbursts seem to challenge the authority and prestige of the teacher, the natural response on his part is one of hostility. This, however, merely aggravates the situation. It becomes oblious, then, that the recommended attitude must be one of understanding, friendliness, and patience.

—Bernard, W. Harold : Mental Hygiene for Class Room Teachers.

তা ছাড়া, ব্যক্তি যদি বিকলাঙ্গ বা অতিমাত্রায় বেঁটে হয় বা শারীরিক কোন খুঁত থাকে, তা হলেও তার মধ্যে একটা হীনমন্যতার ভাব দেখা দেয়—সে নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অনুভব করে, সামান্য সমালোচনায় আহত হয় ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—নিয়ত সমালোচনা, নিরুৎসাহতা, সকলের অবজ্ঞা কখনো কখনো এসব ব্যক্তিদের মরিয়া করে তোলে। এদের সহ্যশক্তি অত্যন্ত কমে যায়—হঠাৎ রেগে যায় এবং ঝগড়া-বিবাদে, এমন কি, মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া, এমন অনেক ছোঁয়াচে রোগ আছে যা শিশুকে সকলের কাছ থেকে দূরে কোন চিকিৎসাগারে সরিয়ে রাখে। মা-বাবার সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত যোগাযোগ থাকে না—ফলে মনের গভীরে একটা দুঃখ-ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই অনিচ্ছাকৃত গৃহ-বিচ্যুতি ও দূরত্ব এবং তার অনুপস্থিতিতে যদি কোন নতুন ভাই-বোন পরিবারে এসে পড়ে, তা হলে সে যে প্রত্যাখ্যাত, এ ভাবটা তার মধ্যে আরও গভীর হয়ে ওঠে। এ থেকে তার মধ্যে একটা ভীষণ রকমের ক্ষোভ হয়—ভিতরে ভিতরে বাবা-মা'র প্রতি রাগ দেখা দেয়। সামান্য কারণে রেগে ওঠে, একটা আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী গড়ে ওঠে—প্রত্যাখ্যানজনিত যে ক্ষোভ, তার প্রতিশোধ নেয় বিদ্যালয়ে, সহপাঠীদের সঙ্গে মারামারি করে। সব কিছুকে একটা আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে দেখে।

গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে যদি খেলাধুলা ও অন্যান্য আনন্দপ্রদায়ী উপকরণ, যেমন বেতার, শিশুদের পাঠোপযোগী গল্পের বই প্রভৃতি না থাকে, গৃহপরিবেশ ও বিদ্যালয়-পরিবেশ যদি সুন্দর ও খোলামেলা না হয়, মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, শিশুর শক্তি-সামর্থ্য, কর্মপ্রয়াস যদি উৎসাহিত না হয়, যদি সে পরিবারে কোন স্বীকৃতি না পায়, তা হলেও তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়—তার এই মানসিক অতৃপ্তি তাকে পরিবার, বিদ্যালয় ও বৃহত্তরভাবে সমাজবিধি ও কর্তৃপক্ষের উপর বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলে; পুঞ্জীভূত ক্ষোভে, সামান্য কারণে ফেটে পড়ে। গৃহে ভাইবোন, পিতামাতা; বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদে এমন কি মারধরে এরা লিপ্ত হয়।

মোটের উপর বদ্ধ পরিবেশ, যে পরিবেশ শিশুর মধ্যে অত্যধিক দুশ্চিন্তার উদ্রেক ঘটায়, সেই পরিবেশই শিশুর মধ্যে অতিমাত্রায় ক্রোধের সঞ্চার করে এবং সেই ক্রোধেরই স্ফুরণ ঘটে ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে।[১]

১। Anxiety, to Horney, was a complex pattern suffused with fear, anger and

যে সব পিতামাতার নিজেদের মধ্যেই নিরাপত্তাবোধের অভাব রয়েছে, যে সব পিতামাতা অত্যন্ত আত্মসর্বস্ব ও স্বার্থপর, তাঁরা প্রায়শঃ তাঁদের সন্তানদের প্রতি তাঁদের দায়িত্বপালনে কোন দৃষ্টি দেন না। গভীর ভালবাসার উত্তাপও সন্তানরা এঁদের কাছ থেকে অনুভব করে না। যাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক ভাব (aggressive) বেশী [বংশগতিতে প্রাপ্ত নালীশূন্য গ্রন্থির (endocrene glands) কার্যকারিতার জন্য], তাদের জন্য পিতামাতার যত্ন-ভালবাসার আরও বেশী প্রয়োজন—এই সব শিশুরা বিকাশ-পর্যায়ে যদি পিতামাতার কাছ থেকে, অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তি ও শিক্ষকদের কাছ থেকে, স্নেহ-প্রযত্ন না পায়, তা হলে এরা আরও আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। পিতামাতা ও শিক্ষকগণ যদি শিশুদের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশপথে অনবরত প্রতিবন্ধের সৃষ্টি করে, তাদের প্রত্যেকটি কাজকে, যেমন বন্ধুচয়নে, কোনক্রীড়ায় যোগদানে, পাঠক্রম-নির্বাচনে বিরূপ সমালোচনা করেন, তাদের সময়োচিত স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে উদাসীন থাকেন, তা হলেও শিশুদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মানসিকতার উদ্ভব হয়। গৃহে পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভালবাসা ও আদর-আপ্যায়ন প্রদর্শনে যদি সমদর্শী না হন, তা হলে, যে সব সন্তানরা অপেক্ষাকৃত অনাদৃত ও অবহেলিত থাকে, তাদের মধ্যে

---

a characteristic series of thoughts, for example, 'I am helpless'.

...Situational events of various kinds can serve to elecit anxiety ; the behaviour of other people (Existentialists) : certain kinds of behaviour emitted by others such as rejection, hostility, punishment. (Adler, Horney, Sullivan.)

—Ford H. Donald & Urbon B. High : System of Psycho-therapy : A comparative study.

From the very beginning, Freud observed that negative affect ("painful affect") seemed to play a central role in behaviour disorder. Fear, anxiety, shame and psychic pain were specified (1895, P. 3). Later he included hate or aggression ; the currently popular terms among psychologists are anger, hostility, and guilt (1919). Through out his formulations, anxiety (the "affect of fright") played the most crucial role. Fear is simply anxiety directed toward an external event of which the person is aware. At first, anxiety was interpreted as a manifestation of behaviour disorder, but in his later reformations he considered it to be the primary antecedent, that is, the chief cause.

(২) খেলাধুলা, মুষ্টিযুদ্ধ, পর্বতারোহণ, গ্রামোন্নয়ন ও সমাজকল্যাণকর কর্ম ও শিল্প-কর্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গীকে আনন্দকর সৃজনধর্মী কর্মধারায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(৩) প্রতিযোগিতামূলক সৃষ্টিধর্মী কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আক্রমণধর্মিতার উদ্গতি সাধন করতে হবে—এর মধ্য দিয়ে শিশু নিজের শক্তি দিয়ে কিছু সৃষ্টি করতে পারছে ভেবে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবে—সমাজ-স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা সুস্থ হয়ে উঠবে—আত্মবিশ্বাসহীনতা ও হীনমন্যতাজনিত যে আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী, তা দূর হবে।

(৪) কোন শিশুর মধ্যে সে পিতামাতা বা শিক্ষক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, এ বোধ যেন না আসে—এ দিক্ থেকে পিতামাতার আন্তরিক স্নেহ-প্রযত্ন, শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও যত্ন অপরিহার্য।

(৫) শিক্ষার্থী ঝগড়া মারামারি কেন করে, তার কারণ যথাযথভাবে খুঁজে দেখবার জন্য প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীকে মনশ্চিকিৎসকের নিকট নিয়ে যেতে হবে ও মনঃস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা দিয়ে, তার বিকাশ-পর্যায়ের ইতিহাস, গৃহ-পরিবেশের ও বিদ্যালয়-পরিবেশের খুঁটিনাটি তথ্য প্রভৃতি জেনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) গঠনমূলক কাজের নেতৃত্ব দিতে হবে—পরীক্ষামূলকভাবে শ্রেণীকক্ষের নেতৃত্ব দিয়ে, খেলাধুলার জিনিসপত্রের দায়িত্ব দিয়ে দেখতে হবে। যখনই সে সামান্যতম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য তার আচরণে রাখবে, তখনই তাকে উৎসাহিত করতে হবে।

॥ চুরি করা ॥

(Stealing)

বিদ্যালয়ে আমরা এমন অনেক ছাত্র দেখি যাদের অভ্যাস সহপাঠীদের কলম, বই, পেন্সিল, ছাতা, টিফিন বাক্স প্রভৃতি চুরি করা। অনেক সময় এ চুরি করা কেবল বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধথাকে না, পাড়া-প্রতিবেশীর জিনিসপত্র, সরকারী সম্পত্তি যেমন রাস্তায় লাইটপোস্ট থেকে বাল্‌ব্ ও তার চুরি করা, বিদ্যুৎ-তার প্রভৃতি নিয়ে নেওয়া, রেল-গাড়ীর কামরা থেকে বাল্‌ব্ ও তার চুরি করা প্রভৃতির মধ্যেও প্রসারিত হয়। বাড়ীতে বাবার পকেট থেকে টাকা নিয়ে নেওয়া কলম, ঘড়ি রিচু করে বাইরে বিক্রি করে

দেওয়া, কখনও কখনও মা-বোনদের অলঙ্কারও চুরি করে বাইরে বিক্রয় করা প্রভৃতিও দেখা যায়।

এর মধ্যে অপরাধের লঘুত্ব-গুরুত্ব আছে। যেমন, বিদ্যালয় থেকে সহপাঠীর বই না বলে নিয়ে নেওয়া, বাড়ি থেকে দুটি-চারটি পয়সা না বলে নিয়ে নেওয়া, আর রেল কামরা থেকে বাল্‌ব চুরি করা, বাড়ি থেকে সোনার অলংকারাদি নিয়ে নেওয়া এক প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ নয়—ছেলের সমস্যার দিক্ থেকে, মানসিক স্বাস্থ্যের দিক্ থেকেও এর গুরুত্বের হেরফের আছে।

॥ কারণ ॥

কারণ বিশ্লেষণও বাইরের বা উপর স্তর থেকে আরম্ভ করে ভিতরের ও গভীর স্তরের কারণ খুঁজে দেখা যেতে পারে। প্রথমতঃ, আমরা বাইরের কারণ খুঁজে দেখবো।

বাহ্যিক কারণঃ (ক) মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যে আর্থিক সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন, তা যদি গৃহে না থাকে, এবং এর সঙ্গে গৃহ-পরিবেশে পিতামাতার আত্মিক অনুশাসন যদি যথার্থ ও সুদৃঢ় না থাকে—তাদের আচার-আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পরদ্রব্যহরণ দোষদুষ্ট বলে বিবেচিত না হয়, তাহলে সেই পরিবারে যে সব শিশু বড় হয়ে ওঠে তাদের কারও কারও মধ্যে চুরি করার অনেক নজির দেখতে পাওয়া যায়।

(খ) অসৎ সংসর্গ—বন্ধুবান্ধব যদি চুরি করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে অনেক সময় সংসর্গদোষে কেউ কেউ চুরি করায় প্রবৃত্ত হতে পারে।

(গ) অসুস্থ গৃহ-পরিবেশ—(১) বাড়িতে যদি সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ বর্তমান (মানসিক কারণ) থাকে, মাতাপিতার মধ্যে সর্বদা মতান্তর ও মনান্তর, বিবাদ-বিসংবাদ, উত্তেজনা ও অশান্তি চলতে থাকে, তাহলে এরূপ পরিবেশে শিশুরা নিজেদিগকে নিরাশ্রয় বোধ করে—নিরাপত্তাবোধের অভাব (*sense of insecurity*) দেখা দেয়। অবচেতন মনের এই নিরাপত্তাবোধের অভাবের প্রকাশ অনেক সময় অপহরণের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে।

(২) কোন শিশু যদি জন্মকাল থেকে বাধা-বন্ধনহীনভাবে যা চায় তাই পায়, তা হলে ব্যক্তি পরবর্তী কালে চুরি করে হলেও, নিজের সাধ মেটাতে চেষ্টা করে।

(৩) গৃহে যে শিশু অত্যন্ত কঠোরকর্কশ নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে প্রায় বিধ্বস্ত, নিয়ত সমালোচনা ও উপহাসে সদা বিব্রত বা যে শিশু বাড়িতে পিতামাতার আচার-আচরণ ও হাবভাব থেকে অনুভব করে যে, সে বাড়িতে ঠিক স্বাগত নয়, সে তার এই অসহনীয় অপমান ও মানসিক যন্ত্রণার জন্য দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিনিসপত্র চুরি করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে। এরূপ আচরণ শিশু কিন্তু মনের গভীর ইচ্ছার দ্বারা তাড়া খেয়ে করে। এরূপ ক'রে সে ভিতরের যে যন্ত্রণা, তা থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও মুক্তি পায়। কেবল সজ্ঞানে চেতন মনের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে ছেলের এই আচরণকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং সেইজন্য কেবল 'চুরি করা পাপ' এমন উপদেশ দিয়েও এমন ছেলেকে চুরি করা থেকে বিরত করা যাবে না।

যে সব বস্তু ব্যক্তি অপহরণ করে থাকে তার সঙ্গে তার অবচেতন মনের একটা যোগ থাকে। বস্তুগুলি হচ্ছে তার অতৃপ্ত বাসনার প্রতীক—সেই বস্তুগুলিকে যে কোন উপায়ে পেয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সে অবচেতন বাসনাকে রূপকের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করার প্রয়াস করে।

তাছাড়া, গৃহ-পরিবেশের অসুস্থতার জন্য, যে সব ছেলের অহং সত্তা (*Ego*) ঠিক ভাবে গড়ে ওঠে না—তারা খুব সহজেই সুখের ও আরামের তাড়নায় অত্যন্ত কম আয়াসে সুখদায়ক কিছু পেয়ে যাবার জন্য প্রয়াসী হয়ে ওঠে—কোন কিছু অর্জন করার ধৈর্য এদের মানসিকতায় গড়ে ওঠে না। ফলে, এরা কোন মূল্য না দিয়ে আরাম আর আয়াসের পিছনে ছুটতে থাকে।[১]

সুস্থ-ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য মা'র প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করে, কেননা শৈশবে শিশু

১। "The ego of the problem child is still under the dominance of the pleasure principle and that for this reason impulses are acted out more easily than with a personality whose ego is governed by the reality principle." (Aichhorn, 1925). A problem child is the outcome of interacting environmental factors that lead to a disturbance in early instinct modification and object relationships. Owing to the child's absolute dependence on the mother, any factor which interferes with the establishment of a firm mother-child relationship and with consistent handling of a firm mother-child relationship and with consistent handing of primitive instinctive drives will hinder the process of ego development. Separations for any length of time before the age of three, lack of interest or lack of time on the mother's side, personality defects in the mother which make her inconsistent during the periods of feeding, weaning and the training for cleanliness, all may lead to a disturbance in ego development.

—Friedlander, 1945.

মা'র উপর একান্তভাবে নির্ভর করে, মা'র সঙ্গে যদি শিশুর সুস্থ ও সুদৃঢ় সম্বন্ধ গড়ে না ওঠে, তাহলে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুস্থ ধারায় গড়ে উঠতে পারে না, তার অহং সত্তা যথাযথ রূপে সৃষ্ট হয় না।

পিতামাতা ও গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর যে অবদমিত ক্রোধ আছে, যে ক্রোধের জন্ম হয় পিতামাতার নিষেধে কোন কাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপ্রাপনে, সে ক্রোধেরই বাইরে প্রকাশ ঘটে যা কিছু নিষিদ্ধ তার অনুষ্ঠান করে। যেমন, যেখানে লেখা থাকবে 'ধুমপান করা নিষিদ্ধ', সেখানে বেশী করে ধুমপান করা। প্রায়শঃই যে কাজটা এ রকম তাড়না থেকে অনুষ্ঠিত হয়, তা পিতা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিকৃত কোন কাজের (যৌন ইচ্ছাপ্রসূত) প্রতীক। কাজেই ঐরূপ কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, দুটি অবরুদ্ধ ইচ্ছার মুক্তি ঘটে—একটি হল অবদমিত অতৃপ্ত কাঙ্ক্ষিত বাসনাকে (যাকে চরিতার্থ করার পথে পিতার ধিক্কার ও নিষেধ প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছিল) **পরিতৃপ্ত করার অপপ্রয়াস,** অপরটি হল যে পিতার জন্য তার বাসনা অপরিতৃপ্ত রয়েছে, তাকে অগ্রাহ্য করা। স্টেকেল প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকদের মতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুরি করার (Kleptomania) এটাই হল গভীর কারণ।[১] যে বস্তুটি চুরি করা হয়, তা হল অবচেতনভাবে কাঙ্ক্ষিত যৌন বস্তুরই প্রতীক এবং এই প্রতীকের মধ্য দিয়ে শৈশবে যে যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ হওয়ার পথে পিতামাতার নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাও প্রতিফলিত হচ্ছে। ফ্রয়েড্ ও ফ্রয়েডের অনুগামীরা যদিও এই অবদমিত ইচ্ছাকে যৌন ইচ্ছা বলে অভিহিত করেছেন, McDougall প্রমুখ মনোবিদ্গণের মতে আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ও চাহিদাই এতে কাজ করে। ফ্রয়েড ও তার অনুগামীগণ যে পরিস্থিতিতে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়, তার

১। The mania for doing things forbidden which so generally attacks boys or young men when they first go away form home to school or college, is really a breaking through of the impulses to rebellion against the father which hitherto had been better repressed, but now begin to find outlet by displacing themselves to almost anything that is prohibited. After the thing done represents in a symbolic way, some specific act forbidden or condemned by their father (usually a sexual one) and thus two sorts of impulses find a common outlet. According to Stekel and others, kleptomania has this origin. The thing stolen is usually symbolic of some sexual thing unconsciously wished for, and which in childhood the authority or one of the parents stood in the way of attaining. The stealing thus simultaneously expresses through displacement, the desire for the thing or experience in question and the rebellion against the the parent whose influence or authority originally interferred with its fulfilment". —Stekel.

নাম দিয়েছেন ঈডিপাস গূঢ়ৈষা (Œdipus Complex); অর্থাৎ এ পরিস্থিতিতে ছেলের মাকে পাওয়ার ইচ্ছা পিতার দ্বারা প্রতিহত হয় ; ছেলে মা'কে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। (Dr. Frink is a good Freudian and therefore, when he writes of rebellion against the father, he has in mind the Œdipus Complex and implies that the son's rebellion against the father's authority is an expression of the repressed hatred and jealousy towards his father which are supposed by all good Freudians to be present in all men in the form of Œdipus Complex. Frink is, then, following the Freudian rule or prejudice in suggesting a sexual root to the neurotic symptom. But, if we recognise, as we must, that the impulse to self assertion is rooted in an instinct entirely distinct from the sexual, then the compulsion is entirely intelligible on the "principles of any sexual implication".

—McDougall W. : An Outline of Abnormal Psychology.

॥ প্রতিকার ॥

চুরি করার অভ্যাস প্রথম দিকেই নজর দেওয়া উচিত। এ চুরি করা কারও কারও ক্ষেত্রে একটা সাময়িক বিচ্যুতি, এর পেছনে গভীর কোন মানসিক তাৎপর্য নেই। কারও হয়ত বয়স কম থাকায় ও বুদ্ধির অপরিণতির জন্য, কারও কিছু না বলে নেওয়াটা যে একটা অপরাধ, এ বোধই হয় না। কেউ কেউ হয়ত সহপাঠীদের সঙ্গে কৌতুক করার জন্য তার প্রিয় কোন বস্তু সাময়িকভাবে অপহরণ করল। পিতামার আর্থিক দৈন্য থাকায় পড়ার বই কিনে দিতে পারছে না, সামনে পরীক্ষা, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য, কারও বই হয়ত না বলেই কেউ হয়ত নিয়ে নিল, বা অন্য মূল্যবান কোন বস্তু সাময়িক লোভের বশে চুরি করল। এ ধরনের অপরাধ মারাত্মক কিছু নয়, অর্থাৎ ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা বা জটিলতা এর জন্য দায়ী নয়, বা বলা যায়, এ ধরনের আচরণের জন্য গভীর কোন মানসিক কারণ নেই।

যথাযথ ভালবাসা, সহানুভূতি দিয়ে এবং দারিদ্র্যক্লিষ্ট শিশুকে তার মৌলিক চাহিদাপূরণের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে এ ধরনের অপহরণ তথা অপরাধপ্রবণতা দূর করা

যায়। তবে গোড়া থেকেই এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন—অনেক দিন পর্যন্ত এরূপ চলতে থাকলে অবশেষে এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে এবং দণ্ডনীয় দুষ্ক্রিয়তার রূপ নিতে পারে।

কিন্তু গভীর মানসিক কারণে যে অপহরণ-অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তা থেকে শিশুকে মুক্তি দিতে হলে, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে সুস্থধারায় হয়, সেদিকে নজর রেখে আমাদের গৃহ ও বিদ্যালয়-পরিবেশ রচনা করতে হবে।

(১) শিশুর মৌলিক চাহিদার পূরণ।

(২) শিশুর অহংসত্তা যাতে যথার্থভাবে বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করে তার জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকগণ শিশুকে যথাযথভাবে স্নেহপ্রীতিতে সিঞ্চিত করবেন—তার আত্মস্বীকৃতির চাহিদাকে যথাযথভাবে মেটাবেন।

(৩) আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদাকে সৃজনধর্মী প্রতিযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে সাহায্য করতে হবে। পাঠে ও অন্যান্য বিষয়ে যার যার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী যাতে পারদর্শিতা লাভ করতে পারে ও স্বীকৃতি পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ জন্য গৃহে ও বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি শিশুর দিকে মনযোগ দিতে হবে, তাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্যকে পর্যবেক্ষণ ও অভীক্ষা-প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্যকরূপে জানতে হবে এবং প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা অনুযায়ী তার জন্য যথার্থ নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়ে তাকে চালিত করতে হবে—বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, বিতর্কসভা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা ভিন্নও তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে ও তাদের সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়।

(৪) গৃহ-পরিবেশে পিতামাতার সম্পর্ক সুস্থ হতে হবে, গৃহে যথাযথ শৃঙ্খলা থাকবে। বিদ্যালয়-জীবনেও নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করতে হবে। ছন্নছাড়া ও উচ্ছৃঙ্খল পরিবারের শিশুরা সৎ আচরণাদর্শ খুঁজে পায় না—কিভাবে চলবে, এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

(৫) পিতামাতার ও শিক্ষকদের জীবন ও আচরণাদর্শে নির্লোভ ও নিঃস্বার্থপরতা থাকবে, তাদের ব্যক্তিত্ব সংহত হওয়া সমীচীন।

(৬) Kleptomania-র লক্ষণ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চিকিৎসকের নিকট গিয়ে ব্যক্তির অবচেতন মনের ইচ্ছা ও দ্বন্দ্বের স্বরূপকে যথাযথভাবে জেনে তার প্রতিকার করতে হবে।

॥ মিথ্যাকথন ॥

(Lying) ঃ

নীতিবোধ মিথ্যাকথনকে কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেয় না। একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মিথ্যাকথনে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সংহতি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জাগে। সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি মিথ্যাকথনকে প্রশ্রয় দেয় না। মোটের উপর মিথ্যা কথা বলা ব্যক্তিত্বের সংহতির অভাবেরই একটা লক্ষণ। কিন্তু সর্বাবস্থাতেই কি মিথ্যা কথা বলা দোষযুক্ত ? ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময় তথাকথিত মিথ্যা কথা বলে থাকে। কিন্তু তাই বলে তারা একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করছে, এমন মনে করার কোন হেতু নেই। কল্পনার পাখা মেলে তারা যখন নভোচারী হয়ে ওঠে, তখন কত কল্পনাকেই না তারা রঙীন ভাষায় প্রকাশ করে—সত্য-মিথ্যার সীমারেখা তখন তার কাছে অজ্ঞাত।

কোন কোন ছেলেমেয়েকে দেখা যাবে, ভয়ে মিথ্যা কথা বলছে, শাস্তির ভয়ে, আশ্রয়হীনতার ভয়ে, অনবরত, কারণে-অকারণে মিথ্যাকথা বলে যাচ্ছে। কেউ-বা আবার নিজের হীনমন্যতাকে (inferiority) ঢাকার জন্য, অহেতুক বাহাদুরি নেওয়ার লোভে নিজের সম্বন্ধে নানারূপ বানানো গল্প ফেঁদে বসে। এমনও দেখা যায় যে, নিজে নানারূপ অন্যায় কাজ করছে, কিন্তু তার সমস্ত দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছে এবং তা করতে গিয়ে বেশ বুদ্ধি খরচ করে ঘটনাগুলোকে নিজের মত সাজিয়ে গুছিয়ে বলে যাচ্ছে। এর বিপরীত অবস্থাও হতে দেখা যায়—যেমন, কোন ব্যক্তি নিজে কোন অন্যায় করেনি, অপরের দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে শাস্তি পাওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলছে। এ সব মিথ্যাকথনই কিন্তু ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতার দিক্ থেকে সমানভাবে আশঙ্কাজনক নয়। ছোট ছেলেদের কল্পনাবিলাসী মিথ্যাকথন আর নিজের হীনতাবোধকে ঢাকার জন্য মিথ্যাকথা বলা মানসিক স্বাস্থ্যের দিক্ থেকে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। **হীনমন্যতাবোধ, নিরাপত্তার অভাব, ভয়, অত্যধিক অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যে মিথ্যাকথন, তা অসুস্থ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ**। কাজেই এরূপ মিথ্যাকথন বিদ্যালয়ে বা গৃহে কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে দেখা গেলে কেবল শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা 'মিথ্যা কথা বলা অন্যায়' এরূপ নীতিবাক্য শুনিয়ে এদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনা যাবে না। পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে সংস্কার ক'রে প্রয়োজন হলে, মানসিক চিকিৎসা করে এদের ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতিকে সারিয়ে না তোলা পর্যন্ত এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যাকথন বন্ধ করা যায় না।

॥ কারণ ॥

॥ **প্রথমতঃ** ॥ **মৌলিক চাহিদার অপূরণ** ঃ আমরা পূর্বেই বলেছি, মিথ্যা কথা বললেই যে শিশুর মানসিক অসুস্থতা হয়েছে বা মানসিক কোন বিকৃতি আছে. এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। অনেক শিশু খেলার ছলে মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা ভান করে, যা হতে চায় অথচ হওয়ার সামর্থ্য নেই, তা মনে মনে বলে যেন সে তাই হয়ে যায়। এ রকম মিথ্যাকথনের একটা মাত্রা আছে, কিন্তু এ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বুঝতে হবে শিশু বাস্তব জীবনে তার কাঙ্ক্ষিত অনেক কিছু পাচ্ছে না—তার মৌলিক চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে। বাস্তব জীবনে কিছুই নেই, ভেবে ভেবে মিথ্যা অলীক জগতের আশ্রয় নেয়—সে 'সোনার হরিণে'র কথা বলে আর তাই ভেবে নিজের না পাওয়ার দুঃখকে মোচন করার প্রয়াস করে। এরূপ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া সমীচীন। বাস্তব জীবনে তার কোন আকাঙ্ক্ষাটি অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে, সে জীবনে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা দরকার।

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ **ভয়** ঃ গৃহে বা বিদ্যালয়ে 'লঘু পাপে গুরুদণ্ডে'র[১] যদি প্রচলন থাকে, তাহলে সে সব বাড়ীর ছেলেমেয়েরা নিজেকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে ফেলে। প্রতি কাজে সমালোচনা, পদে পদে বাধা, নিষ্ঠুর শাস্তির ভয়—এমন গৃহ-পরিবেশে শিশুরা ভয়ে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ **প্রত্যাখ্যান, পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চনা** ঃ গৃহে প্রত্যাখ্যাত শিশুরা যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে, তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নিজেকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার নানরূপ অপপ্রয়াস করতে থাকে—অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য মিথ্যা কথা বলে। সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা ও নিজেকে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস সকল শিশুর মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখা যায়, কিন্তু এরূপ প্রয়াস যদি অস্বাভাবিক উপায়েও মাত্রাধিক হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, শিশুর মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে।

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ **অতৃপ্ত ইচ্ছার পূরণ** ঃ অনেক ইচ্ছাই শিশুরা বাস্তব জীবনে পূরণ করতে পারে না। সে সব ইচ্ছা পূরণে এরা এমন সব গালগল্প তৈরি করে বন্ধুবান্ধবকে

১। Punishment that is unjust or used too frequently arouses fear in the child, which expresses itself in different ways according to temperament. Fear develops lying and decit and these show in a number of ways, both in normal and in problem children and delinquents.

—Binjamin, Z.: The Young Child & his Parents.

বলে যেন সব সত্য কথা বলছে। যেমন, একটি ছেলে বাবাকে একটা ঘুড়ি কিনে দিতে বলল। বাবা তাকে ঘুড়ি কিনে কিছুতেই দিল না। ঘুড়ি উড়াবার ইচ্ছা তার অপূর্ণ রয়ে গেল। সে ঘরে বসে, পাড়ার ছেলেদের ঘুড়ি উড়ানো দেখে আর সে যদি একটা ঘুড়ি পেত তাহলে তাকে কিভাবে উড়াতো—এমনি কতকথা তার মনে আসে। স্কুলে গিয়ে সে তার বন্ধুদের একটা গল্প ফেঁদে বসে। সে কতকগুলো ঘুড়ি কিনল, কেমন রঙ্গীন স্থতো দিয়ে রং-বেরঙের ঘুড়ি উড়ালো—কটা ঘুড়ি কেটে দিল ইত্যাদি। ফ্রয়েড-এর মতে অবদমিত ইচ্ছারা প্রায়শঃই যৌনজ। মিথ্যাকথনের পিছনে থাকে অপূর্ণ যৌন ইচ্ছা।

শার্‌মান্ মিথ্যাকথনের কারণ সর্বদাই যে যৌনজ অবদমিত ইচ্ছার পূরণ-প্রয়াস, এ কথা মেনে নেন নি, তবে এটা স্বীকার করেছেন যে, অপহরণ ও মিথ্যাকথন এ দুই-এর কারণ এক। এই দুই উপায়েই অবদমিত ইচ্ছাজনিত যে দ্বন্দ্ব, তার সমাধানের অপপ্রয়াস ঘটে থাকে।

॥ **পঞ্চমতঃ** ॥ **হীনতাবোধ**ঃ পিতামাতার ভালবাসা ও যত্ন থেকে বঞ্চনা, তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এমন অনুভূতি শিশুর মধ্যে যদি আসে তাহলে তারা নিজেদের হীন বোধ করে। এছাড়া, দেহগত কোন কারণে বা সামাজিক বা আর্থিক কারণে কোন শিশু যদি নিম্নস্তরীয় প্রতিপন্ন হয়, তাহলেও শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা আসে। এ হীনমন্যতা থেকে মুক্তিলাভের অপপ্রয়াস মিথ্যাকথনের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে।

॥ **ষষ্ঠতঃ** ॥ **অস্বাভাবিক পাপবোধ (Guilt sense)**ঃ নির্জ্ঞান মনে যদি কোন পাপবোধ প্রবল থাকে, তাহলে সে পাপস্খালনের জন্য ব্যক্তি সর্বদাই পথ খোঁজে। সে যে অপরাধ করেনি, তার জন্যও শাস্তি পেতে চায়। অন্য ব্যক্তি যে অপরাধ করেছে, সেটা সে করেছে বলে মিথ্যাভাবে প্রচার করে ও তার জন্য শাস্তি পেতে চায়।

॥ **সপ্তমতঃ** ॥ **অনুকরণ**ঃ গৃহে ও বিদ্যালয়ে যখন শিশুরা দেখে যে, পিতামাতা বা শিক্ষকগণ যে সব কথা বলেন বা যে সব প্রতিজ্ঞা করেন, তার কোনটাই মানেন না; পিতামাতা ছেলেমেয়েদের এটা দেবেন সেটা দেবেন বলে অনেক কথা বলেন, কিন্তু তার একটাও রক্ষা করেন না—এরূপ উদাহরণ যদি ছেলেমেয়েদের সামনে রাখা হয়, তাহলে ছেলেমেয়েরাও তার অনুকরণ করে। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের পুলিশের ভয়, জুজুর ভয় ও নানাবিষয়ে ভয় দেখিয়ে কোন কিছু থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পরে ছেলেমেয়েরা দেখে যে, যে সব বিষয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল,

তার সবগুলিই মিথ্যা ভয় দেখানো। কার্য-হাসিলের জন্য বাবা-মা মিথ্যাকথা বলেন, এটা ছেলেমেয়েরা যদি দেখে ও বোঝে তাহলে তারা এর অনুকরণ করতে পারে।

॥ প্রতিকার ॥

॥ ১ ॥ গৃহে ও বিদ্যালয়ে মৌলিক চাহিদা-পূরণের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন। পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান যথাযথ স্নেহ প্রীতি পাবে, তাদের সঙ্গে শিশু খোলাখুলি মেলামেশা করতে যাতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে ও গৃহ-পরিবেশে এমন কোন ভাব থাকবে না, যাতে শিশু সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে। তাদের নিরাপত্তা-বোধ যেন কোন ভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়। পিতামাতাকে সহৃদয় ও সুবিবেচক হতে হবে — লঘু পাপে গুরু দণ্ড যাতে কোন সময় না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ ২ ॥ ছেলেমেয়েদের কল্পনাবিলাসকে গল্প বলে ও তাঁদের কাছ থেকে গল্প শুনে কাজে লাগাতে হবে।

॥ ৩ ॥ পিতামাতা ও শিক্ষকদের সর্বদা সত্য কথা বলে গৃহে ও বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

॥ ৪ ॥ মিথ্যাকথনের কারণ যদি নির্জ্ঞান মনে নিহিত থাকে, তাহলে পরিবেশ পরিবর্তন ও মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

॥ ৫ ॥ গৃহে ও বিদ্যালয়ে আনন্দকর পরিবেশ রচনা করতে হবে, প্রত্যেকটি শিশুকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করে তাদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে—খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক বিষয়ের অবতারণা করতে হবে। শিশুর মধ্যে যাতে অহেতুক হীনমন্যতা না আসে, সেদিকে পিতামাতা ও শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি ও নেতিবাচক মনোভাব ॥
(Disobedience, Obstinacy and Negativism)

অনেক ছেলেমেয়ে গৃহে পিতামাতা, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবাধ্য হয়ে চলে, এটা নিত্য ঘটনা। এরকম অবস্থা কদাচিৎ কোন কারণে হল, এমন নয়। ভালমন্দ বিচার না ক'রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত এরা নিয়ে নেয়। তাদের সিদ্ধান্ত সর্বদাই পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও কোন অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তির নির্দেশের বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তি যতই অনুরোধ

উপরোধ করুন না কেন, যতই ভয় দেখান, কিছুতেই এদের 'না' থেকে নড়ানো যায় না।[১] পিতামাতা ও শিক্ষকদের কোন নির্দেশই এরা মানবে না এরকম একটা পণ করে যেন এরা চলে। যেখানে যত বিধি-নিষেধ, যত আইন-কানুন সব ভেঙ্গে ফেলতে এরা যেন মুখিয়ে থাকে। যদি বা কাজে তা প্রকাশ নাও করতে পারে, মুখে, হাবভাবে তা নিয়ত প্রকাশ করতে থাকে। প্রথম যে ছেলে অবাধ্য থাকে, পরে সে-ই একগুঁয়ে হয়ে উঠে। অবাধ্যতা ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠে—নেতিবাচক মনোভাবের মধ্যে কিছুটা সক্রিয়তা কাজ করে। কেবল অবাধ্যতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার ভাগই বেশী, একগুঁয়েমিতে নিষ্ক্রিয়তা অনেক কমে যায়, এতে সক্রিয় মনোভাব কিছুটা আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, নেতিবাচকতায় ব্যক্তির মধ্যে সক্রিয় ও প্রকাশমান অবাধ্যতা দেখা দেয়। অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমি যখন একত্রিত হয় তখনই তা নেতিবাচকতায় পর্যবসিত হয়।

কোন ব্যক্তি বা অবস্থাকে যদি কোন ছেলের পছন্দ না হয় তা হলে সে স্থান থেকে সে নীরবে সরে যেতে পারে। আবার কোন কোন ছেলের মধ্যে দেখা যায় একটা বিদ্রোহের মনোভাব—যাকে তার ভাল লাগল না, তার কাছ থেকে কেবল নীরবে সরে যাওয়া নয়, তাকে যে তার ভাল লাগছে না, সেটা তার আচরণের ভঙ্গিমা দিয়ে বুঝিয়ে দেবে। বাইরের দাবীদাওয়াকে, ব্যক্তি যখন বিদ্রোহাত্মক মনোভাব নিয়ে প্রত্যাখ্যান করে এবং সক্রিয়ভাবে বিপরীতমুখী কর্মকাণ্ডের অবতারণা করে, তখনই আমরা তাকে নেতিবাচক মনোভাব বলে চিহ্নিত করি।

॥ কারণ ॥

॥ এক ॥ গৃহে ও বিদ্যালয়ে অতিশাসন, আরোপিত শৃঙ্খলা ও নির্মম শাস্তির প্রকোপ।

॥ **দুই** ॥ শিশুর স্বতঃপ্রণোদিত প্রতিটি কাজে বাধাদান ও অহেতুক সমালোচনা।

॥ **তিন** ॥ পিতামাতার নির্দয় আচরণ, সন্তান সম্পর্কে একটা প্রত্যাখ্যানের মনোভাব, গৃহে বিমাতার অবস্থান ও সন্তান প্রতিপালনে চরম উদাসীনতা।

॥ **চার** ॥ কখনো কখনো অতি আদরে সন্তানের অহংবোধকে ফাঁপিয়ে তোলা—'ধরাকে সরা জ্ঞান' করার মনোভাবের সৃষ্টি—এ থেকে যে যা বলছে সব তুড়ি দিয়ে অগ্রাহ্য করা। 'আমার চেয়ে বেশী আর কেউ বোঝে না' এ রকম একটা মনোভাব নিয়ে সব কিছু বিচার করা ও চলা।

॥ **পাঁচ** ॥ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব—প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করা—শিক্ষা-নির্দেশনার ব্যবস্থা না থাকা।

১। When withdrawing is shown as active refusal, stubbornness, contradictory attitudes, and rebellion against external demands it is negativism.
(Shaffer Sheben : The Psychology of Adjustment, P 198)

॥ ছয় ॥ বিদ্যালয়ে কুশাসন—অত্যধিক শৃঙ্খলা জর্জরতা—স্বতঃস্ফূর্তভাবের অভাব।

॥ সাত ॥ খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা না থাকা। আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদার পরিমিত পরিতৃপ্তি শিক্ষার্থীদের না হলে—অন্য বিকৃত উপায়ে এ চাহিদার পরিতৃপ্তির পথ এরা খোঁজে—অপরকে অগ্রাহ্য করে, নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস করে।

নেতিবাচক মনোভাব সব অবস্থাতেই সমস্যামূলক আচরণের পর্যায়ে পড়ে না, বিপথগামিতাও সূচিত করে না। শিশুর বিকাশ পর্যায়ের কোন কোন সময়ে এটা একটি স্বাভাবিক ঘটনা, যেমন, দেড় বৎসর বয়স থেকে এ রকম আরম্ভ হয়, তিন বৎসর বয়সে এ রকম অবস্থার একটা চরম পর্যায় আসে এবং চার বৎসর বয়স থেকে নেতি মনোভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এ সময়ে শিশুর জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা তীক্ষ্ণভাবে কাজ করে—সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলতা থেকে ধীরে ধীরে আত্ম-নির্ভর হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হলেও চলতে থাকে। কোন কিছুর সবটাই এরা এক বাক্যে মেনে নিতে চায় না—আবার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপ্রতুলতার জন্য না মেনেও পারে না।

নবযুবকালেও এরকমটা দেখা যায়। নবযুবকযুবতীরা (*adolescents*) কারও অনুজ্ঞা বা অনুরোধ এক বাক্যে গ্রহণ করতে নারাজ—সব মতকেই নিজেদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়, বিদ্যালয়ে ও গৃহে দিন-লিপির প্রতিটি পর্বের যথার্থতা মূল্যায়ন করার প্রয়াস করে। এ রকম অবস্থা নবযুবকালে কিছুটা স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক নবযুবকযুবতীর মধ্যে এরূপ মনোভাব মাত্রাধিক্য দেখা যায়—এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিপথগামিতার লক্ষণ সূচিত করে। যে কোন অবস্থাতেই নেতিবাচক মনোভাব পরিবেশের প্রতি একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া যখন বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে চলে না (অর্থাৎ মাত্রাধিক্য নেতিবাচক মনোভাব ও অবাধ্যতা কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়), তখন সেটা অপসঙ্গতিমূলক আচরণের একটা প্রকার মাত্র। শৈশব-কালে ও নবযুবকালে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা যদি নির্মমভাবে পদদলিত হয়, তাহলে এ থেকে ঘোরতর অবাধ্যতা ও নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ রুদ্ধ হয়। এ সব ক্ষেত্রে প্রতিকারের ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজন।

॥ প্রতিকার ॥

॥ এক ॥ পিতামাতার আচার-আচরণে ও মনোভঙ্গীতে এমন একটা পরিমিতি বোধ ও সংযম থাকবে যে, তাঁরা শিশুকে অতিশাসন, নিয়ত বাঁধনেও রাখবেন না, আবার 'যা চাই তাই পাই', এরকম একটা পরিবেশেরও সৃষ্টি করবেন না।

॥ দুই ॥ পিতামাতা গৃহকাজে ছেলেমেয়েদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করবেন—ছোট ছোট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদের টেনে আনবেন—গৃহে দিন-লিপির প্রণয়নে ছেলে-মেয়েদের মতামত চাইবেন। কখনও কখনও কোন গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয়েও তাদের মতামত নিতে পারেন। নিরর্থক অফলপ্রসূ সমালোচনায় পিতামাতা ছেলে-

মেয়েদের জর্জরিত করবেন না। গৃহের ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যেন পারম্পর্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

॥ তিন ॥ পিতামাতার সম্পর্ক স্নিগ্ধ ও আশ্রয়দায়ী হবে, সন্তান নিরাপদ বোধ করবে। গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যথোচিত মনোযোগ দেবেন—তাদের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে সদা সজাগ থাকবেন।

॥ চার ॥ সন্তানের বয়স অনুযায়ী পিতামাতা তার কাজে সাফল্য প্রত্যাশা করবেন —যে বয়সে যা হবার নয় বা যার যা হবার নয় তাকে তাই জোর করে করার প্রয়াস যেন কোন প্রকারে না করা হয়। (এতে শিশুর মধ্যে পিতামাতা সম্পর্কে গভীর অনীহা ও বিদ্রোহের মনোভাব গড়ে উঠে।) বিদ্যালয়ে শিক্ষকদেরও এ বিষয়ে সাবধান হতে হবে —এর জন্য শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র সম্বন্ধে মনোযোগী হবেন—ক্রমযোগী সর্বাত্মক-লিপি (*Cumulative Record Card*) বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রাখা হবে। শিক্ষা-নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ পাঁচ ॥ পিতামাতার প্রত্যাখ্যানজনিত, দৈহিক অস্বাস্থ্য বা শারীরিক কোন বিকৃতির জন্য যদি ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতার ভাব দেখা দেয় (যার প্রকাশ অন্যকে অমান্য করে প্রকাশ পেতে পারে), তা হ'লে, কালক্ষেপ না করে মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া সমীচীন হবে।

যৌন-দুষ্কৃতি (Sex-offences) :

নবযুবকালে যৌন-চেতনার উন্মেষ হয়—শারীরিক নানা পরিবর্তন, বিশেষ করে যৌন ও অন্যান্য নালীবিহীন গ্রন্থির কার্য-কারণের ফলে ব্যক্তির শরীরে ও মনে যৌনতার আন্দোলন ও আলোড়ন ঘটে। নতুন উন্মাদনা জীবনে বাঁধভাঙ্গা চঞ্চলতা নিয়ে আসে। এরূপ পরিবর্তন নবযুবকালে স্বাভাবিক। সংযম ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতা নিয়ে, নব যুবক যুবতী পরস্পর পরস্পরের প্রতি শালীনতা ও মর্যাদার সাথে যদি চলে, যদি নব যুবক যুবতীরা খেলাধুলা, শিল্পচর্চা, সংগঠনমূলক কাজ, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনে তৎপর হয় ও সেই সঙ্গে গৃহে ও বিদ্যালয়ে আনন্দকর ও পবিত্র পরিবেশ বিরাজ করে, তা হলে যৌন-বিকৃতি আসার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমে যায়।

যৌন-বিকৃতি নানা রূপ নিতে পারে। অত্যধিক স্বমেহন, বলাৎকার, শ্লীলতাহানির চেষ্টা, অশ্লীল ছবি গোপনে সংগ্রহ করা, বারবণিতার সংসর্গ করা, নারীত্বের অবমাননা, স্ত্রী পুরুষকে আবার পুরুষ স্ত্রীকে লাঞ্ছিত ক'রে, আঘাত ক'রে কামার্ততা চরিতার্থ করা—এ রকম নানাবিধ যৌন-দুষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে।

॥ কারণ ॥

যৌন-দুষ্ক্রিয়তার কারণ কেবল ব্যক্তির যৌন-জীবনের মধ্যেই সীমায়িত থাকে না। সমগ্র জীবনাচরণ, সমগ্রভাবে ব্যক্তির পরিবেশ এতে কাজ করে—যৌন-জীবন সমগ্র জীবনধারণ ও ধারণারই একটা দিক্। কাজেই, নবযুবকালে যৌন-দুষ্ক্রিয়তার কারণ

শৈশব বা কৈশোরে থাকতে পারে। মোটের উপর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে যদি কোন বিকৃত প্রভাব কাজ করে তাহলে ব্যক্তিত্বে যে বিকৃতি আসে তারই প্রকাশ যৌন-বিকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে।

॥ ১ ॥ **গৃহ পরিবেশে শৃঙ্খলার ও আত্মিক অনুশাসনের অভাব।**

॥ ২ ॥ **পিতামাতার জীবনাদর্শে সংযম ও শুচিতার অভাব।**

॥ ৩ ॥ **পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চনা।**

॥ ৪ ॥ **বৈজ্ঞানিক যৌন-শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা না থাকা।**

॥ ৫ ॥ **গৃহে ও বিদ্যালয়ে নির্মল আনন্দের কোন সুযোগ না থাকা।**

॥ ৬ ॥ **নিয়ত দৈহিক অসুস্থতার জন্য** বিকাশ বৃদ্ধি রুদ্ধ হলে ব্যক্তি যদি তার শক্তি-সামর্থ্যকে গঠনাত্মক কাজে নিয়োগ করতে না পারে, সামাজিক মেলামেশায় কোন স্ফূর্তি না থাকে, তাহলেও ব্যক্তির মধ্যে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এ থেকে নানাপ্রকার যৌন বিকৃতি আসতে পারে।

॥ ৭ ॥ বাল্যকালে ও কৈশোরে ছেলেমেয়েরা যদি **বাবা-মা'র সাথে** স্থানাভাবের **জন্য একই ঘরে থাকে ও একই শয্যায় শয়ন করে** এবং স্পর্শকাতর মনের উপর যদি কখনো **বাবা মা'র যৌন-ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা আঘাত করে,** তা হলে ব্যক্তির মধ্যে **যৌন-কৌতূহল বহুগুণিত হয়, বাবা মা'র সম্বন্ধে ধারণায় চিড় খায়।** যৌন বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে বাবা মা'র উপদেশনামা সম্বন্ধে বিশ্বাস পূর্বের মত আর কার্যকর থাকতে চায় না। এ ছাড়া, শৈশবে বা কৈশোরে এরূপ অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী কালে নানাপ্রকার উদ্বায়ু (*Neuroses*) রোগও হতে পারে।

॥ ৮ ॥ অনেক মৃদু সমরতির (***Homo-sexuality***) কারণ হল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুস্থভাবে মেলামেশার কোনপ্রকার সুযোগ না থাকা। এ সব ক্ষেত্রে ছেলেরা ছেলেদের ও মেয়েরা মেয়েদের সম্বন্ধে পরস্পর অত্যন্ত আকর্ষণ বোধ করে—কথোপকথন, এক সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরার মধ্যে কামজ উত্তেজনাও প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। এরূপ উত্তেজনা বাহ্যিক কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ না পেলেও নিয়ত সমলিঙ্গ মেলামেশার ফলে ক্রমে এরূপ যৌন-তাড়ন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কোন প্রকারে যদি সমরতি চরিতার্থ হবার মত অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তা হলে পরে এরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকতে পারে; এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে ইতর-কামে (***hterosexuality***) অনীহা প্রকট হতে দেখা যায়।

॥ ৯ ॥ পারিবারিক অসুস্থ পরিবেশ, যেখানে নিয়ত দ্বন্দ্ব, চিৎকার, মারধর ও হুল্লোড় চলতে থাকে, যেখানে পিতামাতার কোন স্থির আচরণাদর্শ নেই, সে সব পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্ব সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারে না—বিবেক সত্তা (যা মূলতঃ শৈশবকালে পিতামাতার মানস অবয়ব (***introjection of parent's image***) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে গ্রথিত হয়ে সৃষ্ট হয়) অপুষ্ট থাকে, পরিণামে ব্যক্তি সুখান্বেষণে ছুটতে থাকে। বিশেষ করে নবযুবকালে যৌন-চেতনার স্ফুরণ ঘটে, তখন তা বাঁধ 'স্থা উদ্বেলতায় ব্যক্তিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, বিকৃত পথে যৌন সুখ প্রাপণে

তাড়িত করে। তাছাড়া, এ সময়ে যৌন কৌতূহলও বহুগুণিত হয়। নবযুবক-যুবতীর যৌন কৌতূহল (১) যদি পিতামাতা, শিক্ষক বা অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা সুস্থ পথে নিয়ন্ত্রিতও না হয়, (২) যদি যৌন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা না থাকে (৩) যৌন-জীবনের সাথে সুস্থ পারিবারিক জীবন ও সংস্কৃত মহত্তর জীবনের সন্নিবেশ কোথায়, এ বিষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তির কোন ব্যবস্থা করা না হ'লে যৌন-অপরাধ নানাপথে এ বয়সে ঘটতে পারে। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে, "মানুষের কাম কয়েকটি স্তরের ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ ক'রে যৌবন সমাগমে যৌনস্তরে উপস্থিত হয়। ইডিপাস ভালবাসা মানুষের জীবনে এইরূপ একটি স্তর। এই স্তরে পুরুষ-শিশু মাতাকে এবং মেয়ে-শিশু পিতাকে অবলম্বন করে আপনার ভালবাসা চরিতার্থ করে। **ইডিপাস ভালবাসার গুরুত্ব মানুষের জীবনে অত্যন্ত বেশী। এই স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষকে একদিন যেতে হয় কিন্তু যৌবন সমাগমের পূর্বে এর সম্পূর্ণ তিরোধান প্রয়োজন, নতুবা আমাদের মানসিক জগতে একটা বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা।** ইডিপাস ভালবাসা পরিত্যক্ত হওয়ার পূর্বে কতকগুলি ধাপের মধ্য দিয়ে যায়। প্রথম দশায় মাতার উপরের ভালবাসা মাতৃ-স্থানীয়া অন্যান্য স্ত্রীলোক, যথা—কাকী, মামী, পিসী প্রভৃতির উপর বিন্যস্ত হয়ে পড়ে; দ্বিতীয় দশায় আপনার ভগ্নী অথবা ভগ্নীস্থানীয়া অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হয়। সর্বশেষে আপনার পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে মানুষ অনাত্মীয়া স্ত্রীলোককে ভালবাসতে সমর্থ হয়। এই ধাপগুলির প্রভাব যদি মানুষ যৌবন-সমাগমের পূর্বে অতিক্রম করতে না পারে, তাহলে **অজাচার** (*incest*) সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"[১] (এ সম্বন্ধে বিশদভাবে নির্জ্ঞান মন ও 'লিবিডো'র ক্রমবিকাশ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।) ইডিপাস স্তরের সুস্থ অতিক্রমণ নির্ভর করে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সুস্থ সম্পর্কের উপর। **পিতামাতার সম্পর্ক যদি অসুস্থ হয় তাহলে তার প্রতিফলন শিশুর যৌনবিকাশে পড়ে, বিশেষ করে ইডিপাস স্তরে এর সবিশেষ প্রভাব কাজ করে। কাজেই ফ্রয়েডীয় মতে যৌন-শক্তির বিকাশ পর্যায়ের সুস্থতা অসুস্থতার উপর যৌন-জীবনের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে।** যৌন বিকৃতির কারণও শৈশবকালীন ও কৈশোরকালীন যৌন-মানস শক্তির (*libido*) স্বাভাবিক প্রবাহের উপর নির্ভর করে। কোন পর্যায়ে এর সংবন্ধন (*fixation*) ব্যক্তিত্বকে বিপর্যস্ত করে—যৌন জীবনে ও যৌন মানসিকতার মধ্যে নানারূপ বিকৃতি আসে। এ ছাড়া পরিবার-সম্পর্কের অসুস্থতার জন্য যদি ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তা, দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ প্রভৃতি অসুস্থ আবেগের প্রকোপ হয়, তা হলে ব্যক্তি বিকৃত উপায়ে যৌন পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে এ সকল আবেগ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে।

১। ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : নির্জ্ঞান মন

॥ প্রতিকার ॥

॥ **প্রথমতঃ** ॥ যৌন-বিকৃতির প্রতিকার করতে হলে প্রথম কাজ হবে শিশুর ব্যক্তিত্বকে সুস্থভাবে গড়ে তোলার সকল প্রকার উপাদান পরিবেশে সন্নিবেশিত করা। **হীনমন্যতা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি অসুস্থ মানসিকতার হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতির জন্য শিশু যৌন-তৃপ্তির পথ খোঁজে।** কাজেই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এ সব অস্বাস্থ্যকর মানসিকতার যাতে উদ্ভব না হয়, সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য শিশুর সকল মৌলিক চাহিদা যাতে পরিতৃপ্ত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—পিতামাতার সম্বন্ধ যাতে মধুর ও স্বচ্ছন্দ হয়, পিতামাতা যাতে শিশুর প্রতি, নবযুবকালে যুবক-যুবতীদের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দেন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন—গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের যৌন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দান করবেন। এতে একদিকে যৌন বিষয়ের শরীরবৃত্তগত (*physiological*) জ্ঞান, অন্যদিকে যৌন-মানস শক্তির সার্থক উদ্‌গতির মধ্য দিয়ে কিভাবে সফল ও সংস্কৃত জীবনের প্রস্ফুটন হতে পারে সে বিষয়ে ছেলেমেয়েরা সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারে। বিকৃত পথে যৌন কৌতূহল যাতে ছেলেমেয়েরা মেটাতে উদ্যত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এর জন্য যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন আরও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরীর শিশুদের মধ্যে যৌন বিষয়ে কৌতূহল আরম্ভ হয়। ছেলে ও মেয়েরা জৈবিক অভ্যাসের মধ্যে ছেলেমেয়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে—বিশেষ করে মূত্রত্যাগ করার সময়ে ; এছাড়া শিশুরা অনেক সময় নিজেদের যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করে ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করতে পারে—আঙুল চুষেও একরকমের সুখ তারা পেয়ে থাকে। এ সকল কৌতূহল ও ক্রিয়াকাণ্ড শিশুর আত্ম-অবগতির চাহিদা থেকে আসে—তার দেহের, দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে তার যে স্বাভাবিক কৌতূহল, সেই কৌতূহলই যৌন বিষয়ে অবগতির জন্য তাকে প্রলুব্ধ করে। এরূপ স্বাভাবিক আত্ম-অবগতির কৌতূহল ও সংশ্লিষ্ট যৌন কৌতূহল অস্বাভাবিক ও খারাপ কিছু নয়—লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন এ বয়সে একাকী না থাকে—বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের মধ্যে রেখে শিশুকে যৌন বিষয়ে অত্যধিক ভাবিত ও স্বমেহন প্রভৃতি রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে। নিরস একাকীত্ব প্রায়শই স্বমেহন প্রভৃতি ক্রিয়ায় প্ররোচিত করে।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ গৃহ ও বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, যৌথ-ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্প-চর্চা, সঙ্গীত-চর্চা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক বিষয়ের অবতারণা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর মন আনন্দে ভরপুর থাকে—সার্থকভাবে যৌন-শক্তির উদ্‌গমন হতে পারে।

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ কোন বয়সে যৌনাচরণের কতটুকু স্বাভাবিক, কোন্ পর্যায় অতিক্রম করলে বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা আসে সে সম্বন্ধে নবযুবকযুবতীদের অবহিত করে তুলতে হবে, যাতে অহেতুক লজ্জা, পাপবোধ ও এ থেকে হীনমন্যতা এদের মধ্যে দেখা না দেয়। এই লজ্জা ও পাপবোধ জনিত যে যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, ব্যক্তি

আরও বিকৃতি যৌনাচারণে নিজেকে নিয়োগ করতে পারে—যা করে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে কঠোরভাবে ধিক্কার দিতে থাকে—এ যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে হাল্কা করার জন্য পুনরায় অবৈধ যৌনাচরণে নিজেকে লিপ্ত করে—এরকমভাবে আচরণের একটা চক্রগতি চলতে থাকে। কাজেই স্বাভাবিক যৌনবিষয়ে অহেতুক ভয়, ঘৃণা ও পাপবোধ যাতে ব্যক্তির মানস-ভূমিতে রোপিত ও গ্রথিত না হয়, সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটের উপর যৌন শক্তির অবদমন নয়—এর উদ্গামন (*sublimation*) যৌন সুস্থতা আনয়নের প্রকৃষ্টতম ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়।

॥ **পঞ্চমতঃ** ॥ পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদের (যাঁদের তরুণরা আদর্শ হিসাবে অনুকরণ করে থাকে) জীবন যেন মিতাচারে পূত থাকে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে যেন ব্যভিচারিতা, অশালীনতা ও কপটতা না থাকে।

॥ **ষষ্ঠতঃ** ॥ গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ যেন উজ্জলকান্তি কল্যাণময় হয়—যৌন সুখ থেকেও জীবনে আরও গভীর ও মহত্তর সুখ ও আনন্দ আছে, সে জ্ঞানে ও অনুভূতিতে প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে উদ্দীপ্ত হয় সেরকম পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে।

॥ **সপ্তমতঃ** ॥ দৈহিক অস্বাস্থ্য ও বিকৃতি থেকে বা মানসিক কোন দ্বন্দ্ব জর্জরতা থেকে যে বিকৃত যৌনাচরণ দেখা যায় তা নিরসনের জন্য যথাসময়ে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র বা মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দৈহিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে—কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে যে মানস-জটের (*Complex*) উদ্ভব হয়েছে তাকে নিরসন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে পরিবেশান্তর ঘটিয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিকে অসুস্থ পরিবেশ থেকে সুস্থ পরিবেশে (*Correctional home*) আনয়ন করে উদ্গতি সহায়ক নূতন আচরণ ছাঁদ সৃষ্টি ক'রে তার পূর্বতন বিকৃত যৌনাচরণের ছাঁদ (*bond*) ভেঙে ফেলতে হবে।

॥ **অষ্টমতঃ** ॥ পিতামাতা ও তার ছেলেমেয়েরা একটা বয়সের পর যাতে একই ঘরে ও একই শয্যায় শয়ন না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

চাপা ও শঙ্কাপরায়ণ সমস্যামূলক (Repressed problem behaviour) আচরণের প্রকার

বিশদভাবে এর কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা—

॥ শয্যামূত্র (Enuresis) ॥

শিশু জন্মাবার পর তার মলমূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে কোন সংযমবোধ থাকে না, স্থানকাল বিষয়ে তার কোন চৈতন্য থাকে না। ধীরে ধীরে শিশুর পরিপাক (*maturation*) ক্রিয়ার প্রভাবে শরীরের অন্যান্য অংশের সাথে তার স্নায়ুতন্ত্র পরিণতির দিকে যেতে থাকে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ক্রিয়াকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মলমূত্র পরিত্যাগ বিষয়েও স্বাভাবিকভাবে তার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে যেখানে সেখানে যখন তখন সে আর মলমূত্র পরিত্যাগ করে না। কেবল পরিপাক

ক্রিয়াই নয়, এ বিষয়ে পিতামাতার শিক্ষাও (*Toilet Training*) শিশুকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে। সাধারণতঃ তিন থেকে সাড়ে তিন বৎসর পর ছেলেমেয়েরা আর বিছানায় প্রস্রাব করে না। এ বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কালেভদ্রে যদি ছেলে-মেয়েরা দু-একবার বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে, তাহলে সেটাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে করার নেই। শারীরিক কোন কারণে যেমন পাইলিটিস্ (*Pyelitis*) মূত্রাশয়ে (*Kidney*) কোন প্রকার দূষিত বস্তুর সংক্রামণের জন্য, সুষুম্নাকাণ্ডের (*Spinal Cord*) কোন রোগ বা বিকৃতির (*Spinalbifida*) জন্য, **মূত্রাশয়ের ক্রিয়াতে যে বিকৃতি ঘটে, তার ফলে যদি এরূপ কোন ছেলে বিছানায় প্রস্রাব করে তাহলে আমরা তাকে শয্যামূত্র (Enuresis) রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে করবো না।** প্রকৃত পক্ষে **শয্যামূত্র রোগে আক্রান্ত ছেলে বা মেয়ের শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে অটুট থাকে**—তাদের মূত্রাশয়ের কোন প্রকার গাঠনিক বিকৃতি বা বিচ্যুতি দেখা যায় না। অধিকাংশ শয্যামূত্র রোগীর ক্ষেত্রে দৈহিক কোন বিকলতা থাকে না।

কারণ ঃ (ক) অধিকাংশ পরিবারেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিছানায় প্রস্রাব করার জন্য ছেলেমেয়েদের শাসন করা হয় ; শিশুরা যখন রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করে দেয় তখন মা'রা স্বভাবতঃই বিরক্তি প্রকাশ করে, কখনও কখনও স্পষ্টভাবে, কখনও অস্পষ্ট-ভাবে এ বিরক্তি মা প্রকাশ করে, শিশু তার তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা দিয়ে যত অস্পষ্টভাবেই হোক, এর তাৎপর্য বুঝতে পারে ; শিশু অলসভাবে তা রোধের প্রয়াসও হয়ত করে, কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা তখনও এমন নয় যে, সে এ বিষয়ে সফল হবে। মা'রা ঘড়ি ধরে ছেলে-মেয়েদের প্রস্রাব করান। এ থেকে তাদের মধ্যে একটা অভ্যাস তৈরী হয়ে যায়। সময়-মত নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্রাবাদি না করলে কেবল মা-ই নয়, বাড়ির সকলে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং এর জন্য শাসন তর্জনও হয় ; ফলে ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরে সময়মত প্রস্রাব করার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

মা যদি শারীরিক দিক্ থেকে অসুস্থ থাকেন বা নিজের ব্যক্তিত্বের অসুস্থতার জন্য নিজের মানসিক সমস্যা নিয়ে জর্জরিত থাকেন, তাহলে এই অবস্থা সন্তানদের সম্বন্ধে মাকে উদাসীন করে তোলে। কখনো কখনো বা সন্তান সম্পর্কে একটা ক্রোধ ও অপব্যাখ্যানের ভাব মা'র মনে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে, এরকম অবস্থায় সন্তানরা মলমূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে কোন শিক্ষালাভ করে না ; এ শিক্ষার অভাবে বয়স অনেকটা বেড়ে গেলেও (ছয় সাত বৎসর কখনও বারো তেরো, কখনও তারও পরে) তারা বিছানায় প্রস্রাব করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মা'র নিজেরই এ বদ অভ্যাস রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমরা যে এ দোষ দেখতে পাই, তার কারণ ছেলেমেয়েরা নিজেরা নয়—পারিবেশিক কারণ বিশেষ করে মা'ই এর জন্য প্রায় সম্পূর্ণ দায়ী।

(খ) **পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান**—কোন শিশু যদি অনুভব করে যে, সে বাবা মা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, বিশেষ করে মা কর্তৃক, তাহলে এর প্রতিশোধ হিসাবে শিশু অচেতনভাবে এ পথ অবলম্বন করতে পারে। ঘুম থেকে উঠেই রাত্রে বিছানায় যাওয়া অবধি কোন ছেলে যদি অনবরত বাড়িতে বাবা মা কর্তৃক সমালোচনা কষাঘাতে জর্জরিত

হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলতে গিয়ে প্রতিপদে বাধা পায়, তা হলে শিশু আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, শারীরিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তার লোপ পায়। এমনি অবস্থায় ছেলে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে—বিছানায় প্রস্রাব করার জন্য মা তাকে আবার চতুর্দিক থেকে লাঞ্ছিত করে, ফলে সে আরও খেই হারিয়ে ফেলে। বাবা এসব বিষয়ে মা'র পক্ষ নিয়ে ছেলেকে আক্রমণ করে বা নীরব থাকে। এর ফলে বাবা মা সম্বন্ধে ছেলের একটা ক্ষোভ জন্মে। এর প্রতিবাদ করার পথও সে খোঁজে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিধিবদ্ধ নিয়ম চূর্ণ করা প্রভৃতি অশালীন আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বিছানায় প্রস্রাব করা এ রকম আচরণেরই একটা প্রকার, কেননা এ রকম আচরণ করলে ছেলে জানে যে, মাকে কষ্ট করতে হবে এবং তার বিরক্তির উদ্রেক করতে পারবে।

(গ) পিতামাতা যদি সন্তানকে স্নেহ-ভালবাসা সুষমভাবে না দেন, সন্তান যদি নিজেকে স্নেহ-পিপাসিত মনে করে ; যদি পরিবারে সৎমা থাকে, নতুন কোন ভাই বা বোন জন্মালে মা'র মনোযোগ যদি অন্যত্র সরে যায়, তাহলে, শিশু স্নেহ-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ওঠে। এমনি অবস্থায় মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, মা'র মনকে তার দিকে ফেরাবার জন্য সে বিকৃত আচরণ করে থাকে—বিছানায় প্রস্রাব করা এমনিতর আচরণেরই একটি। এক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি অবচেতনভাবে কাজ করে। মা'র পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, তাঁর উদাসীনতা ও প্রত্যাখ্যানের জন্য মাকে সে তেমন করে পাচ্ছে না। মাকে আরও গভীরভাবে পেতে চাই এমন সব ইচ্ছাকে সে ধীরে ধীরে অবদমিত করে। এ অনুভূতিকে সে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে পারে না, পাছে মা তাকে শাস্তি দেয়। সেই সব কারণে সে অন্য উপায়ে মা'র মনোযোগ আকর্ষণ করতে নানারূপ পরোক্ষ ও বিকৃত কৌশল অবলম্বন করে। এর মধ্যে শৈশবকালীন পশ্চাৎগামিতা (*regression*) কাজ করে।[১]

(ঘ) শয্যায় প্রস্রাব করা এংজাইটি হিস্টিরিয়ারও একটা সংলক্ষণ হতে পারে। গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে শয্যামূত্র রোগ দেখা দিতে পারে।

১। (From a case study)

The enuresis, was a deliberate conscious act and was done to take revenge on the parents, particularly on the mother, for their unkind treatment of him. This type of enuresis can be classified as revenge enuresis.

(Pearson, G. H. J., Emotional disorders of children, PP. 44)

In some cases the child knows that his wetting is done consciously as a spiteful action against the parents. He expresses his revenge in this way because he is either afraid or unable to express it otherwise. In others, the child may be unconscious of the fact that he feels spiteful toward his parents and that his enuresis is a spiteful reaction. Here there has been regression to the anal sadistic stage of development, the clinical syndrome being one of obsessional neruosis with enuresis as the presenting symptom.

(Pearson, G. H. J. Emotional disorders of children, P. 44)

॥ প্রতিকার ॥

(১) সন্তান যাতে পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ-প্রযত্ন পায়, সে দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(২) সন্তান যাতে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ পথে অহেতুক বাধা ও সমালোচনার সম্মুখীন না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৩) মলমূত্র ত্যাগ বিষয়ে মা সন্তানদের যথাযথরূপে শিক্ষিত করে তুলবেন।

(৪) গৃহ পরিবেশে নিয়মশৃঙ্খলা সকলে মেনে চলবে।

(৫) ভয়, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি উদ্রেককারী পরিবেশ থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে।

(৬) বাবা মা সম্বন্ধে যদি অবচেতন মানসে ভয় ঘৃণা সম্পৃক্ত 'জটে'র (*Complex*) সৃষ্টি হয় তাহলে তা দূর করার জন্য মনঃসমীক্ষকের প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে হবে, দরকার হলে পরিবেশান্তরও করতে হতে পারে।

॥ সহজে আকুল বা ভীত হওয়া (Nervousness) ॥

একটি ভীরু ছেলের মধ্যে নিম্নলিখিত সংরক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়—

(ক) আবেগের অস্থিরতা (*Emotional instability*)

(খ) সবকিছু অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করা।

(গ) অবিন্যস্ত ও এলোমেলো চলাফেরা।

(ঘ) অনিদ্রা ; দুঃস্বপ্নের জন্য প্রায়ই ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া ও এর জন্য হজমের গণ্ডগোল হওয়া।

(ঙ) সামান্য গণ্ডগোলে, জন-সমাগমে, তীক্ষ্ণ আলোতে ভীত চকিত হয়ে পড়া।

(চ) অমনোযোগিতা।

(ছ) এরা স্থির হয়ে বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, শান্ত স্থির পরিবেশেও অস্থিরতা দেখায়। নিয়ত দাঁতে নখ কাটা, হাত ঘসা, আঙ্গুল চোষা প্রভৃতি নানাপ্রকারের অঙ্গ-ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

॥ কারণ ॥

(ক) পিতামাতা কর্তৃক সন্তানের মৌলিক চাহিদা বিষয়ে উদাসীন থাকা এবং এর জন্য সন্তানের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও দুশ্চিন্তা।

(খ) পিতামাতার দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা ; তাঁদের সবকিছু আঁকড়ে রাখার চেষ্টা, সন্তানদের সব বিষয়ে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখার ইচ্ছা এবং সামান্য বিষয়ে অতি সাবধানতা বা অতি যত্নবান হওয়া—পিতামাতার এরূপ মনোভঙ্গী ও আচরণ সন্তানের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে ব্যাহত করে, তাদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ নিয়ে আসে, এরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে—এরা অতি ভীরু, অতি লাজুক, অতি বশংবদ অকেজো ছেলেতে পর্যবসিত হয়।

(গ) বংশধারা প্রাপ্ত শারীরিক গঠন—ক্ষীণ ও দুর্বল দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মালে

অনেক সময় ভীরুতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুশ্চিন্তা ও ভয়াকুল হওয়ার কারণ মানসিক।[১]

(ঘ) মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব—

(১) অতি শৈশবে রৌদ্র ও মুক্ত বায়ুর অভাব পরবর্তী কালে নানারূপ দৈহিক বিকৃতি নিয়ে আসে—এ থেকে মানসিক স্বাস্থ্যেরও হানি হয়।

(২) সুষম খাদ্য, প্রশান্ত প্রলম্বিত নিদ্রার অভাব।

(৩) কর্মকাল ও কর্মবিরতির মধ্যে সমতার অভাব।

(৪) চোখ, কান প্রভৃতি অঙ্গের কোন অসুস্থতা।

(৫) নালীবিহীন গ্রন্থির বিশেষ করে থাইরয়েড্ গ্রন্থির অপ্রতুল কার্যকারিতা (*Hypofunction*)।

(৬) ভীরু প্রকৃতির পিতামাতাকে অনুকরণ করে অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ভীরু প্রকৃতির হয়ে যায়—দুশ্চিন্তাপরায়ণ ভীরু প্রকৃতির পিতামাতার উপস্থিতি অনুচ্চারিত ভাবে সন্তানের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সন্তানদেরও ভীরু করে ফেলতে পারে।[২]

(চ) পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ, পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়,—অত্যন্ত দুশ্চিন্তাপরায়ণ মা, মাত্রাধিক কর্তৃত্বাভিলাষী পিতামাতা, পিতামাতার বিবাহিত জীবনে অসঙ্গতি ও তজ্জনিত পরিবারে অশান্তি ও অস্থিরতা প্রভৃতি অবস্থা সন্তানের প্রাক্ক্ষোভিক জীবনে নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে—এ অবস্থায় লালিত হয়ে ছেলেমেয়েরা সবকাজে ব্যর্থতার ভয়ে, অতিমাত্রিক বিবেকের কড়া নির্দেশনায় সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে—খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত অনীহা দেখা দেয়।

।। প্রতিকার ।।

।। ১ ।। পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক সুস্থ ও মধুর হওয়া সমীচীন।

।। ২ ।। পারিবারিক পরিবেশ এমন শান্ত ও সুবিন্যস্ত হবে যে, কোন সময়েই অহেতুক ভয় উদ্রেককারী কোন ঘটনা কোন স্থান থেকে ঘটবে না।

।। ৩ ।। জন্মগত দৈহিক গঠনের জন্য যদি স্নায়বিক অবসাদ দেখা দেয়, তাহলে

১। It is a non-adjustive reaction to unsolved personal conflicts. The conflicts of a nervous person arouse persistent visceral tensions. Lacking any definite outlets, either in direct action or in defense mechanisms he continues to be stirred up by his emotional tension and hence to make diffused responses.

(Shaffer L. F., Shoben, E. J. The Psychology of Adjustment.) pp. 301,

২। The 'modelling' effect of an overanxious and protective parent who sensitizes the child to the dangers and threats of his world. Often the parent's overprotectiveness communicates a lack of confidence in the child's ability to cape, thus reinforcing his feelings of inadequacy.

(Coleman. J. C. & Boren, W. E., Abnormal Psychology & Modern life, 1975., p. 599)

গোড়া থেকেই দৈহিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সবিশেষ সচেষ্ট হতে হবে এবং এদেরকে উৎসাহ ও ভরসা দিয়ে সর্বদা চাঙ্গা রাখতে হবে।

॥ ৪ ॥ যে সব পরিবারে দুশ্চিন্তাজর্জর ভয়াকুল পিতামাতা আছে, তাদের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়ে প্রতিপালিত হলে, স্বভাবতঃ ছেলেমেয়েরাও দুশ্চিন্তাজর্জর ভয়াকুল হয়ে ওঠে—সেইজন্য এ সব ছেলেমেয়েকে সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য ভিন্ন সুস্থ পরিবেশে (*Home*) স্থানান্তর করা সমীচীন।

॥ দিবাস্বপ্নচারিতা (Day Dreaming) ॥

দিবাস্বপ্নচারিতা মাত্রই অপসঙ্গতির লক্ষণ নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছু না কিছু স্বপ্নচারিতা আছে। বাস্তব যা দিতে পারে না তা স্বপ্নে পেয়ে কে না ক্ষণিকের তরেও জীবনের না পাওয়াকে ভরে তুলতে চায়! কিন্তু কেউ যদি কেবল স্বপনচারীই হয়—বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে কেবল স্বপ্নাবিষ্ট হয়েই যদি কেউ কালাতিপাত করে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই অপসঙ্গতির একটা সংলক্ষণ। বাস্তবের সাথে সার্থক সঙ্গতি সাধনে অপারগ হলেই কোন ব্যক্তি স্বপ্ন-জগতে আশ্রয় নেয়।

অধিক দিবাস্বপ্নচারিতা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ। ব্যক্তি নিজেকে ধীরে ধীরে সমস্ত কর্মপ্রয়াস থেকে গুটিয়ে নেয়; সব কাজেই একটা অমনোযোগিতা দেখা দেয়; সামান্য কারণে বিব্রত বোধ করে। বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা ও হতাশা যত প্রবল হয়, তত স্বপ্নচারিতা প্রকট হতে থাকে। স্বপ্নচারিতায় ব্যক্তি যত মশগুল হয়ে থাকে, তার মধ্যে তত অপসঙ্গতির সংলক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি এরূপ স্বপ্নচারিতা দেখা যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এর সম্বন্ধে শিক্ষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, কেননা কেবল অত্যধিক স্বপ্নচারিতা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে ব্যক্তির মধ্যে গভীর কোন মানসিক বিকৃতি বাসা বাঁধছে।

॥ কারণ ॥

(ক) মৌলিক চাহিদার অপূরণ।

(খ) পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চনা।

(গ) প্রত্যাখ্যান—বিশেষ করে পরিবারে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা।

(ঘ) নবযুবকালে প্রেম-ভালবাসা বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা।

(ঙ) প্রতিযোগিতামূলক কাজে বার বার পরাজিত হওয়া।

(চ) অতি উচ্চাভিলাষী পিতামাতা যদি ছেলের মেধা ও রুচি প্রবণতার দিকে কোন লক্ষ্য না রেখে, ছেলেকে তাঁদের মত করে জোর করে গড়ে তুলতে চান, তাহ'লে ছেলের মধ্যে স্বভাবতঃ ব্যর্থতা ও হতাশা আসে। এতে সে আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে সব কিছু থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে স্বপ্নচারিতায় ভর করে।

॥ প্রতিকার ॥

*(১) মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ।

(২) গৃহে ও বিদ্যালয়ে আত্মস্বীকৃতির চাহিদা যাতে যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হয় সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিদান।

(৩) গৃহে ও বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের অস্তিত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এরূপ একটা বোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়—সেরূপভাবে গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশকে নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(৪) বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী আপন শক্তি-সামর্থ্য ও রুচির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে।

(৫) কল্পনা ও স্বপ্নচারিতা এক নয়। গঠনাত্মক চিন্তা ও কল্পনা, মানস-সীমার ব্যাপ্তিতে সাহায্য করে। শিশুর কল্পনা শক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে এবং এর জন্য সৃজনধর্মী কর্ম-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাকে নিয়ে যেতে হবে যাতে শিশু আপন ছন্দে নতুন কিছু সৃষ্টি করে আনন্দ লাভ করে।

(৬) খেলাধুলা ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন যৌথ কর্মকাণ্ডে যাতে শিক্ষার্থী যোগদান করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ আত্ম-সঙ্কোচন (Withdrawal) ॥

দিবাস্বপ্নচারিতা রূপ সংলক্ষণ প্রায়শঃই আত্ম-সঙ্কোচনের একটা প্রকাশ। অপসঙ্গতির এটা একটা অগোচর পদ্ধতি—পরিবেশের সাথে সঙ্গতি-সাধনের অক্ষমতা নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে, এ সব লক্ষণ যত স্পষ্ট হয় তত ব্যক্তির অপসঙ্গতির প্রকার, এর কারণ নির্ণয় সহজ হয়, ও ব্যক্তিত্বের সমস্যামুক্তির (*Problem Personality*) সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আত্ম-সঙ্কোচন রূপ সংলক্ষণ যেখানে থাকে, সেখানে ভিতরে ভিতরে ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক ক্ষতিকারক সমস্যা থাকলেও বাইরে থেকে তা সচরাচর ধরা যায় না।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে অমনোযোগিতা, অবাধ্যতা, মিথ্যাকথন, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতি সংলক্ষণপূর্ণ (*symptomatic*) আচরণ সহজেই শিক্ষকদের দৃষ্টি পথে আসে, কেননা এ সকল আচরণ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এ সকল সমস্যামূলক আচরণ থেকেও আত্ম-সঙ্কোচনমূলক আচরণ অধিক ক্ষতিকারক। দৃষ্টিগোচর সংলক্ষণপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়ে বিকৃত উপায়ে হলেও মানসিক দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণাজর্জ্জরিত যে উদ্বায়ু শক্তি, তার প্রকাশ ঘটে ; কিন্তু আত্ম-সঙ্কোচনমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে পুঞ্জীভূত যে আবেগ-জর্জরতা তার মুক্তির কোন অবকাশ থাকে না। ফলে এ থেকে ব্যক্তিত্বের ভাঙ্গন আরও ঘনীভূত হয় ও হঠাৎ একদিন সমূহ বিপদ নিয়ে এর বিস্ফোরণ ঘটে। তাছাড়া দৃষ্টিগোচর সংলক্ষণমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তবুও বা পরিবেশের সাথে কোন প্রকারে সঙ্গতি রেখে চলার চেষ্টা করে, ব্যর্থতা ও হতাশার বিরুদ্ধে

যথার্থ না হলেও, সংগ্রাম করে। এরূপ অবস্থায় পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট থেকে যদি বন্ধুত্ব ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ শিশু পায় ও যথাযথ নির্দেশনা পায়, তা হলে বিপথ-গামী শিশু ভাল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যে শিশু নিজেকে কেবল সবকিছু থেকে গুটিয়ে নিতে চায়, যার মধ্যে একটা পরাজিতের মনোভাব সর্বদা কাজ করে, তার মধ্যে ভাল বা মন্দ হওয়ার কোন প্রয়াসই থাকে না—সার্থক ভাবেই হোক বা বিকৃত ভাবেই হোক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে চলার কোন প্রকার চেষ্টাই থাকে না।

॥ কারণ ॥

(ক) পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান বা শিশু যদি পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত বোধ করে।

(খ) নিষ্ঠুর আচরণ—প্রতিপদে ছেলেমেয়েদের চলা ফেরায় বাধা দেওয়া ও সমালোচনা।

(গ) বিমাতার নির্দয় আচরণ।

(ঘ) দৈহিক কোন খুঁতের জন্য হীনমন্যতা বোধ।

॥ প্রতিকার ॥

*স্বপ্নচারিতা নিরোধে যে সব প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

কতকগুলি সমস্যামূলক আচরণ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ ও অস্বস্তির কারণ ঘটায়। যেমন→	গৃহ ও বিদ্যালয় থেকে পলায়ন (Truancy)। ঝগড়া বিবাদ (quarrelling)। মারামারি (fighting)। চুরিকরা (stealing)। মিথ্যা কথা বলা (Lying)। অবাধ্য হওয়া (disobediency)। একগুঁয়েমি (obstinacy)। নেতিবাচক মনোভাব (Negativism)। ছোটখাট যৌন অপরাধ (Minor sex problems)।
অবদমিত শঙ্কাপরায়ণ সমস্যা-মূলক আচরণ→	শয্যামূত্র (enuresis)। ভয়াকুলতা (Nervousness) ও নখকামরানো (Nail biting)। আঙ্গুল চোষা (Thumb sucking)। অত্যধিক বশংবদ হওয়া (Over submissiveness)।

পলায়ন→ গৃহ থেকে বা বিদ্যালয় থেকে না বলে হঠাৎ চলে যাওয়া।

কারণ→ বিদ্যালয়ের কারণ—

পঠন-পাঠন দোষযুক্ত। শিক্ষকদের দোষদুষ্ট ব্যক্তিত্ব। বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলায় ত্রুটি। অপরাধপরায়ণ ছাত্রের আধিক্য।

পিতামাতার অসুস্থ ব্যক্তিত্ব ও তাদের অসুস্থ সম্পর্ক। পিতামাতার সন্তানের প্রতি আচরণ ও মনোভাব। অসুস্থ গৃহ পরিবেশের জন্য ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। বাড়ীর ভয়-ভয় পরিবেশের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও ভয় পাওয়া। বুদ্ধি কম থাকার জন্য পড়াশুনায় অনীহা—বিদ্যালয় থেকে পলায়ন। বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে বেশী থাকায় অল্প সময়ে শ্রেণীর পড়া শেষ করে নিতে পারে—বাকী সময় বিদ্যালয়ে অন্য কোনরূপ সহপাঠক্রমের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয় বিরক্তিকর হয়ে পড়ে—বিদ্যালয় থেকে পালায়।

প্রতিকার→ বিদ্যালয়ে সুবিন্যস্ত পঠন-পাঠন। শিক্ষার্থীকে ভালবাসা। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও খেলাধুলা। গৃহে পিতামাতার যথাযথ কর্তব্য পালন। সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যায় এমন শিক্ষক।

ঝগড়া ও মারামারি করা (Quarrelling & fighting)→ বিদ্যালয়ে সহপাঠী, গৃহে ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া।

কারণ→ শারীরিক কারণে নিরাপত্তাবোধের অভাব—হীনমন্যতা। ছোঁয়াচে রোগ, পরিবারের সাথে যোগ না থাকা। পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মনোভাব। গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে আনন্দ উপকরণের অভাব। বদ্ধ পরিবেশ। পিতা-মাতার স্বার্থপরতা—সন্তানদের প্রতি অসম আচরণ। পিতামাতার অতি আদর।

প্রতিকার→ নিয়মশৃঙ্খলা—শারীরিক সুস্থতা। খেলাধুলা—সৃজনধর্মী কর্মধারা। প্রতিযোগিতামূলক কাজ। পিতামাতা ও শিক্ষকের অকৃত্রিম

ভালবাসা। প্রয়োজনে মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য। গঠনমূলক কাজে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব দেওয়া।

চুরিকরা (Stealing)→ বিদ্যালয় ও বাড়ী থেকে চুরি।

কারণ→ শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য আর্থিক সঙ্গতির অভাব। পিতামাতার দুর্বল চারিত্রিক অনুশাসন। অসৎ সংসর্গ। নিরাপত্তা-বোধের অভাব। শৈশবে যা চাই, তাই পাই এমন, অবস্থা। কর্কশ নির্যাতনমুখী নিয়মশৃঙ্খলা, শিশুর অপমানবোধ, অপমানকারীদের বিরুদ্ধে তাড়িত করে। অপহৃত বস্তুর সাথে অবচেতন মনের যোগ থাকে। অহংসত্বারও অপুষ্টি ও বিকৃতি। মা'র ব্যক্তিত্বের প্রভাব। অবদমিত বাসনা পরিতৃপ্তির অপপ্রয়াস। অপহৃত বস্তু যৌন বস্তুর প্রতীক।

প্রতিকার→ সহানুভূতি, ভালবাসা, দারিদ্র্য মোচন। মৌলিক চাহিদা পূরণ। অহংসত্বার বিকাশ। সৃজনধর্মী প্রতিযোগিতামূলক কাজ। গৃহে শৃঙ্খলা। পিতামাতা ও শিক্ষকের নিস্বার্থপরতা ও নির্লোভ ভাব। মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ।

মিথ্যাকথন (Lying)→ মিথ্যাবলা-ব্যক্তিত্বের সংহতির অভাব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মিথ্যাকথন। ভয়ে মিথ্যা বলা।

কারণ→ বাস্তব জীবনের আকাঙ্ক্ষার অপূরণ—মৌলিক চাহিদার অপূরণ। ভয়ের পরিবেশ গৃহে বা বিদ্যালয়ে মাতাপিতা ও শিক্ষকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মিথ্যা-কথন। অতৃপ্ত ইচ্ছাকে মিথ্যাকথনের মধ্য দিয়ে পূরণ। যৌনজ অবদমিত ইচ্ছার পূরণ। পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চনা—হীনমন্যতা। অস্বাভাবিক পাপবোধ—মিথ্যা শাস্তি পেতে চাওয়া—অন্যের দোষকে মিথ্যা ভাবে নিজের মধ্যে নিয়ে নেওয়া। পিতামাতা ও শিক্ষকরা

যদি প্রতিজ্ঞা করে বা কথা দিয়ে কথা না রাখেন তাহলে সেটা অনুকরণ করে ছেলে মেয়েরা মিথ্যা কথা বলতে পারে।

প্রতিকার→ মৌলিক চাহিদা পূরণ। পরিবেশ থেকে ভয় ভাব দূর করা। গল্প বলা। পিতামাতা ও শিক্ষকদের সত্যকথন। পরিবেশ পরিবর্তন ও মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া। আনন্দকর পরিবেশ।

অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি ও নেতিবাচক মনোভাব (Disodedience, Obstinacy and Negativism)→ পিতামাতা ও অভিভাবকদের বিপরীতমুখী হওয়া। একগুঁয়েমিতে সক্রিয়ভাব বেশী কাজ করে অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমি এক হয়ে নেতিবাচক মনোভাব।

কারণ→ নির্মম শাস্তি। অহেতুক সমালোচনা। নির্দয় আচরণ। অতি আদর। ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করা। অত্যাধিক শৃঙ্খলা। খেলাধুলার অভাব। নেতিবাচক মনোভাব কোন কোন সময় স্বাভাবিক। নবযুবকালে যাচাই করা স্বাভাবিক—কোন কোন ক্ষেত্রে এটা মাত্রাধিক হয়।

প্রতিকার→ আচরণে পরিমিতি। ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব দেওয়া। ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতামাতা ও শিক্ষকদের যথার্থ মনোযোগ। বয়স অনুযায়ী সাফল্য আশা করা। বিদ্যালয়ে Cumulative Record Card রাখা। মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য।

যৌন-দুষ্কৃতি→ নবযুবকালের স্বাভাবিক যৌন পরিবর্তন—সুস্থ পরিবেশ। যৌন বিকৃতির প্রকার।

কারণ→ যৌন-দুক্রিয়তার কারণ শৈশব বা কৈশোরে থাকতে পারে। বড় হয়েও বাবা মা'র সাথে একই ঘরে শয়ন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুস্থভাবে মেলামেশার সুযোগ না থাকা। অসুস্থ পরিবেশ—বিবেক সত্তার অপুষ্টি। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে যৌন-অপরাধ

ইডিপাস স্তর সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করতে না পারলে নানাপ্রকার মানসিক সমস্যা দেখা দেয়—যৌন দুষ্ক্রিয়তা তার মধ্যে একটি। ইডিপাস স্তর সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করা নির্ভর করে পিতামাতা ও সন্তানের সুস্থ সম্পর্কের উপর। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে অসুস্থতাও যৌন দুষ্কৃতির কারণ।

প্রতিকার→ সুস্থ পরিবেশে ব্যক্তিত্ব বিকাশ। যৌন-শিক্ষা। বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যাপৃত রাখা। সহ-পাঠক্রম। যৌন বিষয়ে যাতে অহেতুক লজ্জা, পাপবোধ, হীনমন্যতা না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যৌন-শক্তির উদ্গমন। পিতামাতা শিক্ষকের মিতাচার। কল্যাণকর পরিবেশ। শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র। পরিবেশান্তর। পিতামাতা ও ছেলেমেয়েদের শয়নকক্ষ ভিন্ন হবে।

শয্যামূত্র (Enuresis)→ স্নায়ুতন্ত্রের পরিপাক ক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। পিতামাতার শিক্ষা। শারীরিক কারণে মূত্রাশয়ের গণ্ডগোল। প্রায়শই দেখা যায় শয্যামূত্র রোগীর দৈহিক কারণ থাকে না।

কারণ→ মা ও বাড়ীর লোকের শিক্ষা। মা'র অসুস্থ ব্যক্তিত্ব ও সন্তানের উপর তার প্রতিক্রিয়া। পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। পিতামাতার প্রতি ক্ষোভ। শয্যামূত্রের মধ্য দিয়ে অবচেতনভাবে মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা।

প্রতিকার→ পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ। মলমূত্র ত্যাগ বিষয়ে মা সন্তানদের যথাযথ শিক্ষিত করে তুলবেন। গৃহে যথার্থ নিয়মশৃঙ্খলা। ভয়ের পরিবেশ থেকে দূরে রাখা।

ভয়ে আকুল হওয়া (Nervousness→ আবেগের অস্থিরতা। এলোমেলো চলাফেরা।

কারণ→ মৌলিক চাহিদার অপূরণ। পিতামাতার

	অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তা। শারীরিক দুর্বল গঠন। মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ভৌতিক পরিবেশের প্রভাব। সুষম খাদ্যের অভাব। আলো-হাওয়ার অভাব। চোখ কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অসুস্থতা থাইরয়েড গ্রন্থির অপ্রতুল কার্য-কারিতা—পিতামাতার সম্বন্ধ ও তাদের ব্যক্তিত্ব।
প্রতিকার→	পিতামাতার সম্পর্কের উন্নয়ন, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন। সুস্থ পরিবেশ রচনা, প্রয়োজনে পরিবেশান্তর।
দিবাস্বপ্নচারিতা (Day Dreaming)→	অত্যধিক স্বপ্নচারিতা—মানসিক বিকৃতির লক্ষণ।
কারণ→	মৌলিক চাহিদার অপূরণ, পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চনা, নবযুবকালে প্রেম বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা প্রভৃতি।
প্রতিকার→	মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ। গৃহে ও বিদ্যালয়ে আত্মস্বীকৃতির চাহিদার পরিতৃপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনা। সৃজন-ধর্মী কর্ম-প্রকল্প। খেলাধুলা।
আত্ম-সঙ্কোচন (Withdrawal)→	দিবাস্বপ্নচারিতার আত্ম-সঙ্কোচনের প্রকাশ। আত্ম-সঙ্কোচনে পুঞ্জীভূত আবেগ মুক্তির অবকাশ কম থাকে। আত্ম-সংকোচনে কোন প্রয়াস থাকে না।
কারণ→	পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। নিষ্ঠুর আচরণ—প্রতিপদে ছেলেমেয়েদের চলাফেরায় বাধা দেওয়া ও সমালোচনা। বিমাতার নির্দয় আচরণ। হীনমন্যতা।
প্রতিকার→	দিবাস্বপ্নচারিতার সমস্ত প্রতিকার ব্যবস্থা।

॥ অনুশীলনী ॥

1. What is a problem behaviour? Give examples of a few problem behaviours and suggest their remedies.
2. Whom do you call problem children? Briefly discuss the procedure you would follow for guiding such children.

3. How do problem children create problem? How should a teacher guide problem children.
4. Elucidate the main causes of problem behaviour. Suggest a few remedial measures.
5. Show how the school may be a cause of maladjustment among its pupils. Illustrate your answer.
6. Indicate the chief factors that led to the retardation of the mental development of the child.
7. Elucidate the main causes of indiscipline in educational institutions. Mention a few remedial measures.
8. What are the causes of mental diseases and difficulties of the children.
9. Give a brief account of some problems of maladjustment of adolescent students to their academic and social surroundings.
10. What is maladjustment? Explain in this context the connotation of the term 'adjustment'. What are the common types of school maladjustment?
11. Write notes on:
    Negativism, Compensation, Truancy, Lying, Stealing. Enuresis, Day-dreaming.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিশুর অস্বাভাবিক ভয় ও তার প্রতিকার

[How to deal With Fear in children]

শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক ভয় বা ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায় ঝগড়াবিবাদ, বিছানায় প্রস্রাব করা, নখকামড়ানো, রাত্রে বিভীষিকা দেখা, ঘুমের ঘোরে পথ চলা, মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি সংলক্ষণমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে। ভয় দুপ্রকারের হতে পারে—একটা সম্পূর্ণ আত্মগত (*subjective*), অপরটি বস্তুগত (*objective*)। বস্তুগত ভয়ের জন্য সর্বদাই কোন-না-কোন গোচর কারণ বর্তমান থাকে। শিশুরা স্বভাবতই গভীর দূরত্ব, অন্ধকার বা সুউচ্চ পর্বতচূড়া দেখে ভয় পায়। এরূপ ভয়ের কারণ এই যে, এইসব কারণ বা অবস্থা কোন না কোন রূপে শিশুর অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে। সকল মানবশিশুর মধ্যেই এরূপ অবস্থায় আতঙ্কের উদ্রেক হয়—এরূপ অবস্থা অস্বাভাবিক কোন লক্ষণ নয়। ব্যক্তির অস্তিত্বরক্ষার জন্য এরূপ ভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে, কেননা এরূপ ভয় ব্যক্তিকে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করে। কিন্তু আত্মগত ভয়ের (*subjective fear*) বস্তুগত কোন কারণ থাকে না। ব্যক্তি যা থেকে ভয় পায়, তা থেকে স্বাভাবিকভাবে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, কিন্তু আপন মানসিক জটিলতা ও বিকৃতির জন্য ব্যক্তি অকারণে ভয় পেয়ে থাকে, যে কোন জিনিস দেখে বা কোন অবস্থা থেকে যে কোন সময়ে সে ভয় পেতে পারে। এ ভয় ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তাপরায়ণতা রোগের উদ্রেক করতে পারে।

এরূপ আত্মগত ভয়ের কারণ সাধারণত ব্যক্তির শৈশবকালীন কোন অবস্থা বা ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে, বিশেষ একটি কোন ঘটনাই যে এরূপ ভয়ের কারণ হবে, তার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ নাও থাকতে পারে।

॥ ভয় কি সহজাত না অর্জিত ? ॥

পলায়নী প্রবৃত্তি সহজাত। এর সঙ্গেই ভয়রূপ আবেগ জড়িত। কাজেই ভয়রূপ আবেগও সহজাত। কিন্তু কোন বস্তু দেখে ভয় পাব সেটা আমরা শিখি। **ওয়াট্‌সন্** (**Watson**) এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত আক্রমণধর্মী, যারা আত্মবিশ্বাসহীনতায় সর্বদা ভুগছে, যারা অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কোন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যারা ভয় পায়, তাদের প্রত্যেকেরই প্রায় শৈশবকালীন কোন বদ্ধমূল ভয় থাকে—এ ভয়ই পরবর্তী কালে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ওয়াট্‌সন্ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে, জন্মকালে শিশুদের দুটি অবস্থা থেকে ভয়ের উদ্রেক হয়। এদুটি অবস্থা হল (ক) হঠাৎ জোরে কোন শব্দ, (খ) আশ্রয়-

চ্যুতি। সর্পভয়, অন্ধকারের ভয়, অগ্নিভয় প্রভৃতি জন্মগত নয়—পরবর্তী কালে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে এরূপ বিষয়ে ভয় পাওয়াটা শিশু শেখে।

।। ভয়ের সংবন্ধন ।।

ভয়কে সংবন্ধন (***Conditioning***) বা অসংবন্ধন (***re-conditioning***) করা যায়। শিশুর অনেক বস্তু-ভয়ই বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভয়-উদ্রেককারী বস্তুর সঙ্গে পূর্বকালে কোন ভীতিকর অবস্থার সন্নিবেশ ঘটেছে। শিশুরা বিদ্যুৎ চমকানো দেখে ভয় পায় না, কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে বজ্রপাতের জন্য যে বিপুল শব্দ হয় তাকে তারা ভয় করে। সেইরকম অধিকাংশ শিশুই অন্ধকারকে ভয় পায় না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে অস্তিত্ববিপন্নকারী কোন অবস্থার যদি উদ্রেক হয় ও সেইরূপ কোন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যদি শিশু অতিক্রম করে, তাহলে পরে সে অন্ধকার মাত্রেই ভয় পায়।

এ বিষয়ে ওয়াটসন্ (*Watson J. B.*) একটি শিশুকে খরগোশ ও খরগোশ জাতীয় বস্তুকে ভয় পাওয়ার বিষয়ে সংবন্ধ করেছিলেন। শিশুটি প্রথম খরগোশটির সঙ্গে আপন মনে খেলা করত—এরকম বেশ কিছুদিন চলার পর সে যেই খরগোশটি নিয়ে খেলা করতে আরম্ভ করত, তখনই তার মাথার কাছে একটা প্রচণ্ড জোরে শব্দ করা হতে থাকল। এরকম কিছুদিন চলার পর, যে শিশু পূর্বে কেবল প্রচণ্ড শব্দকে ভয় পেত, সে এখন এককালীন খেলার সাথী ও আনন্দের খোরাক খরগোশটিকে দেখে ভয় পেতে আরম্ভ করল। পরে প্রচণ্ড শব্দের আর দরকার হল না, খরগোশটিকে দেখেই, এমন কি অবশেষে খরগোশজাতীয় কিছু দেখেই, সে ভয় পেতে আরম্ভ করল।

।। শৈশবকালের সাধারণ ভয় ।।

মেরী ছাড়রিক (*Mary Chadurik*) তাঁর *“Difficulties of Child Development”* বই-এ শিশুদের নিম্নলিখিত ভয়ের কথা বলেন :

(ক) একা একা থাকার ভয়
(খ) অন্ধকারের ভয়
(গ) অপরিচিত প্রাণীর ভয়
(ঘ) শহরে কুকুরের ভয়
(ঙ) গ্রামে গরু ও ষাঁড়ের ভয়
(চ) সর্পভয়
(ছ) জোরে শব্দ হ'লে ভয়
(জ) হঠাৎ কোন জিনিস ফেটে যাওয়ার ভয়
(ঝ) অগ্নিভয়
(ঞ) জলাশয়, যেখানে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেরূপ জলাশয়ে ভয়
(ট) বজ্রবিদ্যুৎকে ভয়

(ঠ) ইঁদুরকে ভয়
(ড) কোন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়
(ঢ) ভূতপ্রেতের ভয়

উপরি-উক্ত সকল ভয় বিষয়েই কোন প্রকার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন—কিছুটা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতানির্ভর। কিন্তু জোরে শব্দ করার জন্য যে ভয় সেটা জন্মগত। জোরে শব্দ, আশ্রয়চ্যুতি প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে যখন অন্যান্য অবস্থার অনুষঙ্গ ঘটে, তখন শেষোক্ত অবস্থা থেকেও ভয়ের উদ্রেক হয়।

॥ ভয় দেখানো ॥

শিশুদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ যে, তাদের বড়রা নানা বিষয়ে অহেতুক ভয় দেখান। অবিবেচক, ধৈর্যহীন ব্যক্তিরাই এ হেন উপায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বশে রাখার চেষ্টা করেন। 'এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়, না ঘুমুলে অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা দৈত্য এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে'—'তুমি এক্ষুণি পড়তে বস, নইলে পুলিশ এসে তোমাকে থানায় নিয়ে যাবে'—এমনি নানা প্রকারের ভয় দেখিয়ে শিশুদের কাজ করাবার বা বশে আনবার চেষ্টা করা হয়। কখনও কখনও অন্ধকার ঘরে শাস্তিস্বরূপ তালা দিয়ে আটকে রাখা হয়, আর বাইরে থেকে ছেলেকে শাসানো হয় বাঘ আসছে, সাপ আসছে ইত্যাদি বলে। শিশু বড়দের এসব কথা বিশ্বাস করে ও ভয়ে জর্জরিত হতে থাকে। পরবর্তী কালে সে যখন বিদ্যালয়ে বা অন্য কোন নতুন পরিবেশে যায়, তার সবকিছু সম্বন্ধেই একটা ভয়-ভয় ভাব থাকে।

এ রকম ভয়ের ভাব যদি শিশুর মনে গ্রথিত হয়ে যায়, তাহলে তার মধ্যে একটা নিরাপত্তাহীনতার ভাব দেখা যায়; সারাজীবন তার মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা ও শঙ্কার ভাব কাজ করে। পরবর্তী জীবনের বহু অহেতুক ভয়ের কারণ পিতামাতা ও অভিভাবকদের শৈশবকালীন ভয় দেখানোর মধ্যে নিহিত থাকে। বিছানায় প্রস্রাব করা, অল্প কারণে ভয়, শঙ্কিত দুশ্চিন্তার ভাব, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ শিশুকে ভয় দেখানোর জন্য হতে পারে।

অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে এমন কোন অবস্থায় ভয় হওয়া স্বাভাবিক। পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে যুঝতে হলে ও তার সঙ্গে যথাযথ সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার স্বল্পতা ব্যক্তি অনুভব করলেই, ব্যক্তির মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হয়। এই শক্তি-স্বল্পতা শৈশবে অধিক থাকে—কিন্তু শিশু যখনই এই স্বল্পতা সম্বন্ধে সজাগ হয় তখনই তার মধ্যে ভয় আসে। ভৌতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য যেরূপ ইন্দ্রিয় ও দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, সামাজিক সঙ্গতি রক্ষার জন্য মানসিক বোঝাপড়া প্রয়োজন। এই সঙ্গতি সাধনের অক্ষমতা বিষয়ে যখনই ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবগত হয়, তখনই তার মধ্যে ভয় আসে। পূর্বেই বলা হয়েছে এরূপ ভয় বাস্তব কারণের জন্য হতে পারে, আবার কাল্পনিক কারণের জন্যও হতে পারে।

প্রথম দিকে শিশুর ভয় বস্তুগতই থাকে, চার পাঁচ বৎসর বয়স থেকে কাল্পনিক ভয়

দেখা যায়। এই কাল্পনিক ভয়ের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তববিবর্জিত কোন মিথ্যা জ্ঞান। দশ বারো বৎসরে, শিশুদের বাস্তব অবস্থা থেকে কাল্পনিক অবস্থা বা বস্তুই বেশী করে ভয়ের উদ্রেক করে। দশমাথা বিশিষ্ট সাপ, কালো কুচ্‌কুচে পোনেরোটা হাতবিশিষ্ট একটা রাক্ষস—এই সব কাল্পনিক অদ্ভুত বস্তু থেকে এই বয়সে শিশুদের ভয় হয়। এ ছাড়া বজ্র-বিদ্যুৎ, সিনেমা ও গল্পে জানা কোন ভয়ের চরিত্র থেকেও এ বয়সের শিশুদের মধ্যে ভয় আসতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে ভয়ের কারণ কেবল মাত্র ভৌতিক পরিবেশে থাকে না, সামাজিক পরিবেশের উদ্দীপকও ভয়-উৎপাদনে সমানভাবে কাজ করে—নিন্দা, সমালোচনা, সকলের কাছে হেয় হয়ে যেতে পারে, এমন কোন কাজ তার ভয়ের কারণ হয়।

"পূর্বকালে মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা অস্বাভাবিক ভয়ের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অত্যধিক মানসিক বা শারীরিক ক্লেশের নজির দিতেন। অনেকে বিশ্বাস করতেন রোগেশোকে ক্লিষ্ট মনে অবসাদবশত ছেলেবেলার শাসনজনিত ভয় আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কারও বিশ্বাস, নানা প্রকার শারীরিক রোগ থেকে উৎকণ্ঠা রোগের সৃষ্টি হয়। একথা অবশ্য সত্য, অনেক সময় উৎকণ্ঠা রোগীর দেহে রোগও থাকে প্রচুর, কিন্তু তাই বলে শারীরিক রোগের জন্য উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়, এ কথা বলা চলে না।

উৎকণ্ঠা রোগীর উৎকণ্ঠার দৈহিক রোগ-রূপান্তরকে *Conversion symptom* বলে, অর্থাৎ মনের ভয় এইরূপ ক্ষেত্রে শারীরিক রোগে রূপান্তরিত হয়। এইরূপ রূপান্তরণ উৎকণ্ঠার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দাম প্রচেষ্টা।

নবজাত শিশুর বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে আচম্‌কা প্রবল উদ্দীপনা সহ্য করতে হয়, তার তুল্য কোন অভিজ্ঞতা মাতৃজঠরে থাকাকালে সে লাভ করে না। সর্বপ্রথম তাকে শ্বাস নিতে হয় এবং মাতৃদেহ থেকে ছিন্ন হওয়ার ফলে তার হৃৎপিণ্ডের কম্পন আরম্ভ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধমনীর মধ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত করার জন্য দ্রুত কাজ করতে হয়। তা ছাড়া, বাইরের বাতাসের স্পর্শে এসে তার চর্ম সর্বপ্রথম শৈত্য ও উষ্ণতার তারতম্য অনুভব করে। শিশুর এই অভিজ্ঞতাগুলি ভয়ের সহিত জড়িত হয়ে যায়, এজন্য ভয়ের সময় বুক ধুক্‌ধুক্ করে, শাসকষ্ট হয় এবং চর্মে কম্পন ও শৈত্যকম্পন উষ্ণতা অনুভূত হয়।"[১]

শৈশবকালে নানা প্রকারের ভয় থাকে। জন্মক্ষণ থেকেই ভয় আসে। কিন্তু সে ভয় নানাভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

॥ অন্ধকারকে ভয় ॥

শিশুর অন্ধকারকে ভয় পাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। (ক) রাত্রির অন্ধকারে অনেক চুরি খুন অপরাধ ঘটেছে, অনেক বীভৎসতা ঘটেছে, এরকম গল্প বড়দের কাছ থেকে সে হয়ত শুনেছে। (খ) তা ছাড়া, অন্ধকার সম্বন্ধে শিশুর সুপ্ত ভয় অনেকটা

১। ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়: নির্জ্ঞান মন।

বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত। মানুষ যখন রাত্রির অন্ধকারে আলোকবর্তিকা জ্বালাবার পথ জানত না, তখন সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অন্ধকারে কত আপদ-বিপদই না মানুষের উপর দিয়ে গিয়েছে—সেই অন্ধকারের মধ্যে অনাগত দিনের কত বিপদ-গহ্বরই না লুক্কায়িত থাকত—মানুষ তা আলোর অভাবে জানাতেও পারত না। সেই অন্ধকারের ভীতি আজও যেন মানুষের সংস্কারের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। সহস্র বৎসর রাত্রিতে নিরন্তন অন্ধকারে কাটাবার পর, মানুষ প্রথম রাত্রির অন্ধকারে আলো জ্বালাতে শিখেছিল। রাত্রির অন্ধকার সেইজন্যই যেন শিশুর মানস-ভূমিতে এখনও বিপদ-সংকেতের নিশানা। অনেক মনোবিদের মতে আমাদের অবচেতন মানসে রাত্রির অন্ধকার এখনও ভয়ের বিষয়।

(গ) কোন শিশু যদি রাত্রিতে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পায়—তার মধ্যে ভয়ের সমস্ত লক্ষণগুলো প্রকট হয়ে ওঠে—যেমন ঘেমে যাওয়া, বুক কাঁপা, গলা শুকিয়ে আসা প্রভৃতি, তা হলেও অন্ধকার ঘরে সে একা ঘুমুতে যেতে ভয় পাবে।

(ঘ) যদি কোন শিশুর শারীরিক অসুস্থতা যেমন অজীর্ণতা, টন্‌সিলের রোগ প্রভৃতি থাকে, তাহলে তার নিদ্রা ব্যাহত হয় এবং নানাপ্রকার দুঃস্বপ্ন সে দেখে থাকে। অবশ্য কেবল শারীরিক অসুস্থতার জন্যই যে এরূপ স্বপ্ন শিশু দেখে থাকে তা নয়, মানসিক কারণও এর সঙ্গে কাজ করে।

(ঙ) ঘুমুতে যাওয়ার আগে যদি শিশুদের ভয়ের গল্প শোনানো হয়, যদি তাদের বন্য জন্তু-জানোয়ারের, চুরি ডাকাতি খুন খারাপির গল্প বলা হয়, তা হলেও তাদের মধ্যে অন্ধকার সম্বন্ধে একটা ভয়-ভয় ভাব তৈরি হয়।

(চ) আর একটা কারণে শিশুদের অন্ধকার সম্বন্ধে ভয়ের উদ্রেক হয়। কোন শিশু যদি তার পিতামাতার সঙ্গে একই শয়ন কক্ষে শয়ন করে, এবং পিতামাতার ঘনিষ্ঠ শয়ন-সম্বন্ধ যদি রাত্রির অন্ধকারে শিশু প্রত্যক্ষ করে বা অনুমানও করে, তাহলে শিশুর মধ্যে পিতামাতা সম্বন্ধে একদিকে যেমন বিতৃষ্ণা ও ভয়ের উদ্রেক হয়, অন্যদিকে অন্ধকারকেও তারা ভয় পায়। শৈশবকালীন এরূপ অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে নানা প্রকার মানসিক রোগের উদ্রেক ঘটাতে পারে এবং বয়ঃপ্রাপ্তিকালে যৌন-জীবন সম্বন্ধে একটা অসুস্থ প্রতিন্যাসের (*attitude*) উদ্রেক করতে পারে।

।। অন্ধকারের ভয় দূর করার উপায় ।।

(ক) কোন্ বস্তু বা অবস্থা থেকে শিশুর মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হয়েছে, সেটা খুঁজে দেখতে হবে এবং সে অবস্থা শিশুর জীবনাভিজ্ঞতায় যাতে ফিরে না আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস করতে হবে।

(খ) শিশুকে নিয়ে অন্ধকার ঘরে এবং বাইরের অন্ধকারে যেতে হবে। 'ভয় পেয়ো না'—এ ধরনের কথা যতটা সম্ভব কম বলতে হবে। ভয়ের কথার অবতারণা না করাই শ্রেয়ঃ।

(গ) রাত্রির স্নিগ্ধতা, রাত্রির বিশ্রাম অবকাশ, নক্ষত্র খচিত রাত্রির আকাশ, রাত্রির ফুলের সৌরভ, রাত্রির চন্দ্রালোক, এই সুকুমার সৌন্দর্যের দিকে শিশুর মনকে ফিরিয়ে দেওয়া। রাত্রির অন্ধকারকে শিশু ভয় না পেয়ে যেন তার সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতা উপভোগ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঘ) শিশু যদি তার শয়নকক্ষে কোন মৃদু আলো পেলে খুশী হয়, তাহলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আলো দেওয়ার সঙ্গে ভয় দূর করার যে কোন সম্পর্ক আছে, তা যেন শিশু কোন প্রকারে বুঝতে না পারে।

(ঙ) শিশু যদি প্রত্যশা করে যে শয়নের পূর্বে তার বাবা মা কেউ তার শয্যাপাশে কিছুক্ষণের জন্য থাকুক, তাহলে সে ব্যবস্থা যেন কয়েক দিনের দিনের জন্য করা হয়।

॥ নিরাপত্তার অভাব থেকে ভয় ॥

(১) নিরাপত্তাবোধের অভাব শিশুর মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতা থেকে আসতে পারে। দৈহিক শক্তির স্বল্পতাই হোক আর মানসিক শক্তির স্বল্পতাই হোক, শক্তি-স্বল্পতার জন্য যদি শিশু পরিবারের অন্যান্য সমবয়সী শিশু ও খেলার সহচরদের সঙ্গে পড়াশুনা বা খেলা-ধুলায় পেরে না ওঠে, তাহলে তার মধ্যে একটা হীনমন্যতার ভাব আসে। এইসব শিশুর মধ্যে এ অবস্থায় অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তা দেখা দেয়, এ দুশ্চিন্তার বশে এরা এদের শক্তি সামর্থ্যের মাত্রার বাইরে কাজ করতে আরম্ভ করে, পরিণামে একটা অত্যন্ত অস্থির সভয় ক্লান্তি এদের মধ্যে দেখা দেয়। কোন কোন শিশুকে ব্যর্থতার ভয় এমনভাবে পেয়ে বসে যে, সে আর কোন প্রয়াসই কতে পারে না। কেউ বা আবার নিজের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে যখন প্রতিযোগিতায় অন্যকে পরাভূত করতে পারবে না বুঝতে পারে, তখন ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে বাজী মাৎ করার চেষ্টা করে।

(২) অত্যধিক সমালোচনা, কারণে অকারণে উপহাস, সর্বদা শিশুর চলা ফেরায় কেবল দোষ-ত্রুটি ধরার চেষ্টা, এ সকল অবস্থা শিশুকে প্রায়শই মিথ্যা কথা বলতে, অবাধ্য হতে, ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যেতে, দাঁতে নখ খুঁটতে লিপ্ত করে। এ সকল উপসর্গের মূল নিরাপত্তাহীনতাজনিত ভয়।

(৩) বাবা মা যদি নিয়ত শাস্তিস্বরূপ সন্তানকে পরিত্যাগ করার ভয় দেখায় তাহলে সন্তানের নিরাপত্তার অভাববোধ প্রকট হয়ে ওঠে এবং এ থেকে অস্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক হয়।

(৪) কঠোর ও ঘন ঘন শাস্তি শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে আসে, এ থেকেও শিশুর মধ্যে অস্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক হয়।

(৫) উপস্থচ্ছেদ গূঢ়ৈষা (*Castration Complex*) থেকে ভয় : যৌন-মানস শক্তি-প্রবাহ (*Psycho-sexual Energy of Libido*) ও বিকাশের কতকগুলি পর্যায় আছে। ফ্রএড্ (*Freud*) এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন। ব্যক্তিত্বগঠনের সঙ্গে যৌন-মানস শক্তি বিকাশের একটা বিশেষ সংযোগ আছে। ফ্রএডের মতে, অত্যধিক ভয়, নানা ধরনের মানসিক জটিলতা, যৌন-মানস শক্তির বিকাশ-বিকৃতি থেকে উদ্ভূত হয়।

যৌন-মানস শক্তির বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ের মধ্যে ইডিপস্ পর্যায় অস্বাভাবিক ভয় সৃষ্টির সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

যখন শিশুর যৌন-মানস শক্তি-প্রবাহ আত্ম-কাম পর্যায় অতিক্রম ক'রে বাইরের কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসতে আরম্ভ করে, তখন তার কাছে তার মা'ই একান্ত কাছে থাকে—মাকে সে একান্তভাবে আপনার করে ভালবাসতে চায়—পেতে চায়। মা'কে সে তখন ভালবাসার জন হিসেবে চয়ন করে। মা'ই হ'ল তার কাছে ভালবাসার প্রথম জন। শিশু মা'র উপর তার সম্পূর্ণ আধিপত্য রাখতে চায়। কিন্তু সে দেখে যে মা তার অধিকারে নেই—মা অপর একজনের অধিকারে। শিশুর বয়স এ পর্যায়ে যদিও মাত্র ছ'বছরের তবু অগোচরে তার মনে অনুরণিত হয় যে, মা বাবার অধিকারে আছেন। ফ্রএডের মতে মা'য়ের প্রতি শিশুর যে ভালবাসা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অথচ তীক্ষ্ণ যৌনাকাঙ্ক্ষা কাজ করে, মাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার ব্যাপারে পিতাকে বাধাস্বরূপ মনে করে, পিতাকে ঘৃণা করে, এমন কি তাকে হত্যা ক'রে দূরে ঠেলে দিতেও যেন কুণ্ঠা থাকে না। এইসব ইচ্ছা অনিচ্ছা শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে সঞ্চিত থাকে। শিশুর এই সব ইচ্ছার কথা তার মনের গভীরে অর্থাৎ নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়। যৌন-মানসশক্তির এরূপ বিকাশ স্ফূর্তিকে ইডিপস্ (*Oedipus*) পর্যায় বলা হয়। এর সম্পর্কে যে মানস জটের উদ্ভব হয় তাকেই বলা হয় ইডিপস্ গূঢ়ৈষা (*Oedipus complex*)।

বয়ঃপ্রাপ্তিকালে এ সকল ইচ্ছার মুখ আর দেখা যায় না, দেখলেও চেনা যায় না, শৈশবকালীন এ সকল ইচ্ছা-অভিজ্ঞতার স্মৃতি অবদমতি (*repressed*) হয়। শিশুদের মধ্যে ইডিপস্ জটের কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

সমাজে অজাচার (*incest*) কঠোর শাস্তির বিষয়। শাস্তির অবতারণা যখন আছে, তখন এটা মনে করা যেতে পারে যে, এরূপ ইচ্ছাও মানব-মনে আছে। অজাচার ইচ্ছার অস্তিত্ব যদি মানব মনে একেবারে নাই থাকত, তাহলে শাস্তির কথা আসত না।

শিশু বাবাকে সরিয়ে দিয়ে মাকে ভালবাসতে চায়, পেতে চায়। বাবা তার একান্ত করে পাওয়া মা'র উপর হাত বাড়াতে আসে বলে, বাবাকে শিশু ঘৃণা করে। এই অধিকারের লড়াই-এ শিশু যে বাবাকে ঘৃণা করে, এর জন্ম তার বাবা তাকে শাস্তি দিতে পারে। এ ভয় শিশুর মনে কাজ করে—শাস্তি হিসাবে বাবা তার উপস্থচ্ছেদ (*castration*) করতে পারেন। এ আশঙ্কা তাকে ভয়জর্জর করে তোলে। এ ভয় অনেকের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকরূপে প্রকট হয়ে ওঠে। **শিশুর জন্মাবার পরই শ্বাস-প্রশ্বাসের যে কষ্ট হয়, তা থেকে উৎকণ্ঠার জন্ম হয়। শিশুকে মাতৃস্তন থেকে বঞ্চিত করার সময় এ উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায় এবং ইডিপস্ পর্যায়ে উপস্থচ্ছেদ ভয়ের সময় এ উৎকণ্ঠা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।** এ ভয় পরবর্তী কালে যে কোন নতুন সমস্যা ও অবস্থার সম্মুখীন হওয়ায় প্রক্ষিপ্ত হতে পারে। *Castration complex* বা উপস্থচ্ছেদ গূঢ়ৈষার ফলে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের সম্বন্ধে ভয়, সংস্থার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভয়, সামগ্রিকভাবে গৃহ-পরিবেশ ও বিদ্যালয়কে ভয় প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

(৬) পিতামাতার অত্যধিক দুশ্চিন্তা থেকে ভয় : সন্তান সম্পর্কে অত্যধিক দুশ্চিন্তা সন্তানদেরও অত্যধিক দুশ্চিন্তাপরায়ণ ও ভয়াকুল করে তোলে। সন্তান সম্পর্কে অস্বাভাবিক ভয়াকুলতা, সামান্য কারণে সন্তান সম্পর্কে হৈ চৈ করা, শিশুর স্পর্শকাতর মনে উত্তেজনা ও আন্দোলনের সৃষ্টি করে। সব বিষয়ের মধ্যেই একটা অনিশ্চয়তা ও বিপদের ছায়া যেন শিশুরা দেখতে পায়।

॥ অমূলক ভয় দূর করার উপায় ॥

(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভয়ের উদ্রেক শিশুর মধ্যে ঘটতে পারে এমন অবস্থার অবতারণা যাতে কোন প্রকারে না ঘটে সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি কোন বিষয়ে শিশুর মধ্যে ভয়ের ভাব এসে পড়ে তা হলে কারণ বিশ্লেষণ করে, তা দূর করার সকল প্রকার প্রয়াস করতে হবে।

(২) শিশুর মধ্যে যাতে লজ্জা বা অহেতুক পাপবোধের স্ফুরণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, লজ্জা বা ভয় দেখিয়ে মূল উৎপাটন করা যায় না, এবং এতে বিপরীত ফল হয়।

(৩) শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে নজর দিতে হবে—পিতামাতার সঙ্গে তার সম্পর্ক যাতে শ্রদ্ধাপূর্ণ অথচ খোলামেলা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বাড়ীতে এমন কোন আলোচনা ও ইঙ্গিত থাকবে না যা অল্পতেই শিশুকে ভয়াকুল করে তোলে। শিশুর স্বাভাবিক গতিতে যেন নিয়ত বাধা দেওয়া না হয়, অতিশাসন, নির্মমতা বা শিশুর প্রতি উদাসীনতা এর কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়।

(৪) হঠাৎ যদি কোন শিশু অন্ধকারে যেতে ভয় পায়, বাড়ীতে বা বাগানে একা যেতে ভয় পায়, তাহলে বুঝতে হবে যে সে তার সঙ্গী-সাথী, বাবা-মা এদের কাছ থেকে ভীতিপ্রদ কোন কাহিনী শুনেছে। শিশুরা প্রায়শঃই বাবা-মাকে তাদের ভীতিপ্রদ কাহিনীর কথা বলে মনকে হাল্কা করতে চায়, ভয়ের কারণকে যথার্থভাবে যাচাই ক'রে নিতে চায়—এ সময় বাবা-মা যদি যথার্থরূপে সহৃদয় হন, যদি তাঁরা এ সময়ে শিশুকে সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে ভয়ের অমূলকতা সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেন, তা:লে শিশুদের অমূলক ভয় বহুল পরিমাণে তিরোহিত হতে পারে।

এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কোন শিশুর মধ্যে যদি ভয় দানা বাঁধে এবং তা নিত্যসহচর হয়, তা হলে তা শিশুর বিকাশ ও কর্মশক্তিকে পঙ্গু ক'রে ফেলে। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিঘ্নিত করে।

(৫) অনেক সময়ে শিশু ভয়ের সঠিক কারণ সম্বন্ধে অনবহিত থাকে, সে ঠিক বুঝতে পারে না, কী কারণে তার মধ্যে সর্বদা ভয়-ভয় ভাব থাকে। এসব ক্ষেত্রে মুক্ত-অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে শিশুকে দিয়ে যদি গভীর মনের কথা বলানো যায়, তাহলে ভয়ের সঠিক কারণটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং এ সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করলে শিশুর ভয় দূর হয়ে যেতে পারে।

(৬) সাপেক্ষ পুনঃ প্রত্যাবর্তক্রিয়ার ***(Reconditioning)*** অবতারণা ক'রে শিশুর

অমূলক ভয় দূর করা যেতে পারে। আবেগ যে প্রত্যাবর্ত ক্রিয়া সাপেক্ষ, তা ওয়াটসন্ (*Watson*) পরীক্ষা ক'রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পদ্ধতিতে যে অবস্থা শিশুর মধ্যে ভয় আনে, সেই অবস্থাকে তার কাছে যদি সুখদায়ক অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে তার ভয় কেটে যায়। কোন ছেলের অঙ্কশাস্ত্রে অনুরাগ আছে, ব্যুৎপত্তিলাভের ক্ষমতাও সাধারণ থেকে অনেক বেশী। কিন্তু তাকে যে শিক্ষক অঙ্ক শেখান, তিনি অত্যন্ত বদরাগী ও অসহিষ্ণু, সামান্য ভুল-ত্রুটিতেই ছেলেকে কঠোর শাস্তি দেন। এরূপ কিছুদিন চলার পর দেখা গেল ছেলেটির অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে একটা ভয়ের ভাব এসেছে। সে কোন অঙ্ক বই দেখলে, অঙ্ক বিষয়ের কোন কিছুর অবতারণা ঘটলেই ভয় পেতে থাকে। এখানে তার ভয়ের কারণ অঙ্ক-শিক্ষক। পরে শিক্ষক যদি অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে, অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে ছেলের সঙ্গে আচরণ করেন, সে শিক্ষক নিজে ছাত্রের সঙ্গে মিলেমিশে অঙ্ক কষেন, একবার না পারলেও বা সামান্য ভুল-ত্রুটি করলে বার বার তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন, তাহলে এরকম কিছুদিন চলতে থাকলে, ছেলেটির শিক্ষক সম্বন্ধে ভয় ধীরে ধীরে কেটে যায়। অঙ্ক বিষয়ে তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও শক্তি ফিরে আসবে—অঙ্ককে সে আর ভয় পাবে না।

(৭) কোন বিশেষ পরিবেশ যদি ভয়ের কারণ হয় তা হলে পরিবেশান্তর, অর্থাৎ যে পরিবেশ পূর্বের ভয়ের কারণ থাকবে না, এরকম পরিবেশে শিশুকে স্থানান্তর ক'রে কিছুদিন রাখলে, তার ভয়ের সংবন্ধন ঘুচে যেতে পারে। বেশ কিছুদিন নতুন পরিবেশে থেকে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসের অবতারণা হলে পুরানো অবস্থা আর ভয়ের সঞ্চার করতে পারে না।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

ভয় কি সহজাত ?→	ভয় দুই প্রকার—আত্মগত ও বস্তুগত মানসিক জটিলতা ও বিকৃতির জন্য আত্মগত ভয় হয়। ভয় এক প্রকারের আবেগ—এটা সহজাত। শৈশবকালীন কোন বদ্ধমূল ভয়। দুটি অবস্থা থেকে শিশুদের ভয়—হঠাৎ জোরে কোন শব্দ, আশ্রয় চ্যুতি।
ভয়ের সংবন্ধন→	অন্ধকারকে ভয়। ওয়াট্সনের পরীক্ষা।
শৈশবকালের সাধারণ ভয়→	এ সব ভয় অভিজ্ঞতানির্ভর। ভয় অনুষঙ্গ।
ভয় দেখানো→	বড়রা শিশুদের ভয় দেখায়। ভয় দেখানো অবস্থা থেকে অন্য বিষয়ে ভয়। অহেতুক ভয়ের কারণ। শিশু তার শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হলেই ভয় পায়—তার শক্তি স্বল্পতা ভয় আনে। চার পাঁচ বৎসর থেকে কাল্পনিক ভয় দেখা যায়। বয়ঃসন্ধিকালে সামাজিক পরিবেশ থেকে ভয়।

	উৎকণ্ঠ' রোগী। নবজাত শিশুর প্রথম অভিজ্ঞতায় ভয় থাকে।
অন্ধকারকে ভয়→	বড়দের ভয়ের গল্প। অন্ধকার সম্বন্ধে সংস্কার। দুঃস্বপ্ন। শারীরিক অসুস্থতা। ঘুমুতে যাওয়ার আগে খুন, চুরি ডাকাতির গল্প। বাবা মার সঙ্গে একই ঘরে নিদ্রা।
অন্ধকারের ভয় দূর করার উপায়→	অবস্থার পরিবর্তন। অন্ধকারে নিয়ে দেখানো যে অন্ধকার হলেই ভয়ের কারণ থাকে না। রাত্রির ভয়ঙ্করতা নয়, তার স্নিগ্ধতা সম্বন্ধে সজাগ করতে হবে। শয়ন ঘরে মৃদু আলো। শয্যাপার্শ্বে বাবা মা থাকবে।
নিরাপত্তার অভাব থেকে ভয়→	দৈহিক শক্তির ও মানসিক শক্তির স্বল্পতা। হীনমন্যতা। অহেতুক সমালোচনা। পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়।
উপস্থচ্ছেদ গূঢ়ৈষা (Castration Complex) থেকে ভয়→	ঈডিপস পর্যায়ে ভয়। অজাচার (Incest)। অজাচার জনিত শাস্তির ভয়।
পিতামাতার অত্যধিক দুশ্চিন্তা থেকে ভয়→	পিতামাতার দুশ্চিন্তা শিশুকে ভয়াকুল করে তোলে।
অমূলক ভয় দূর করার উপায়→	ভীতিকর পরিবেশ দূর করা। ভয়ের মূল কারণ উৎপাটন। দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি। বাবা মা'র সহৃদয়তা। মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে চিকিৎসা। পুনঃ প্রত্যাবর্ত ক্রিয়া (Reconditioning)। পরিবেশান্তর।

॥ অনুশীলনী ॥

1. Describe some abnormal forms of fear. Suggest probable causes and remedial measures.
2. Describe some undesirable fears in school children. Suggest a few remedial measures.
3. What are the origins of fear in the child ? Discuss the uses of fear in the social and mental life of the child.
4. Write notes on :

   Castration fear. Phodia. Reconditioning of fear. Jealousy. Fear and Anxiety.

চতুর্দশ অধ্যায়

শিশুদের ক্রোধ ও তার নিয়ন্ত্রণ

[How to deal with Anger in children]

নবজাতক শিশুর মধ্যে তিনটি প্রধান প্রক্ষোভ দেখা যায়। এ তিনটি প্রক্ষোভ হল : (১) ভালবাসা, (২) ভয় ও (৩) ক্রোধ। শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণে যদি কেউ বাধার সৃষ্টি করে তা হলে শিশুর ক্রোধের উদ্রেক হয়। তার স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় যদি ক্রমাগত বাধা দেওয়া হয়, যদি তার স্বাভাবিক ইচ্ছা অকারণে কেউ কেবল দাবিয়ে দিতে থাকে, তা হলে শিশুর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়—যে ব্যক্তি এরূপ বাধার সৃষ্টি করে বা যে অবস্থার জন্য তার আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি ঘটে, সেরূপ ব্যক্তি বা অবস্থার প্রতিও তার ক্রোধের সঞ্চার হয়।

পিতামাতার উদাসীনতা, তাঁদের অবিবেচনাপূর্ণ নিষ্ঠুর আচরণ, কথায় কথায় শাস্তি, তাঁদের স্বার্থপরতা, অনান্তরিকতা সন্তানের মধ্যে ক্ষোভ ও চাপা ক্রোধের সঞ্চার করে। পিতামাতা যদি মুখে খুব বড় বড় আদর্শের কথা বলে, কিন্তু জীবনাচরণে ঠিক বিপরীতমুখী হয়, তাহলেও শিশুদের পিতামাতা সম্বন্ধে খারাপ ধারণা হয়, তাদের সম্বন্ধে একটা চাপা রোগের উদ্রেক হয়। উড্‌ওয়ার্থ (*Woodworth*)-এর মতে রোগের কারণ হল শিশুর প্রতি কাজে নিয়ত বাধা সৃষ্টি করা ও তাকে বিরক্ত করা।

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য যদি স্বাভাবিক না হয়, যদি শিশু নিয়ত রোগে ভোগে, নিদ্রা ব্যবস্থা যদি অবিন্যস্ত হয়, অজীর্ণতায় যদি শিশু নিয়ত ভোগে, তাহলে তার খেলাধুলা বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সাফল্য সব কিছু ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকে। এর ফলে তার মধ্যে একদিকে হতাশা অন্যদিকে এর সঙ্গে একটা চাপা ক্রোধের সঞ্চার হয়। অল্পেতেই এরা রেগে যায়—শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ শিশুরা সর্বদাই মানসিক দিক থেকে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে।

কোন্ শিশু অধিক রাগী হবে এবং কোন্ শিশু হবে না শারীরিক গঠন দিয়েও তা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়—নালী-বিহীন গ্রন্থি (*Endocrine glands*) রস ব্যক্তির মেজাজগত গঠন অনেক পরিমাণে নির্ধারণ করে। এ্যাডরিনালিন্ গ্রন্থির রস নিঃসরণ যাদের মধ্যে বেশী তারা কিছুটা তেজস্বী হয়। মেজাজের দিক্ থেকে শান্ত ধীর স্থির প্রকৃতির হবে, না কিছুটা অস্থির ও উত্তেজিত প্রকৃতির হবে তা অনেক পরিমাণে এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির রস নিঃসরণের গতি-প্রকৃতির থেকে নির্ধারিত হয়ে যায়।

এ ছাড়া, শিশু যদি এমন গৃহ-পরিবেশে প্রতিপালিত হয় যেখানে ঝগড়া, বিবাদ মারধর একটা নিত্যকালের ঘটনা, যেখানে পিতামাতা নিজেরাই অত্যন্ত অসংযত

প্রকৃতির ও অল্পতেই অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে, সেখানে শিশুরাও পিতামাতার দেখাদেখি এরূপ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শিশু যদি গৃহে অত্যন্ত আদর পায় এবং সব কিছুতেই নিজের সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত ভ্রমমূলক উঁচু মানের ধারণা পিতামাতা করিয়ে দেয়, তাহলে বিদ্যালয়ে সামান্য সমালোচনার সম্মুখীন হলে সে রেগে যায়। পিতামাতা যদি সন্তানের নিকট তার সামর্থ্য অপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করে এবং পিতামাতার অভিপ্রেত মানে শিশু সর্থাকতা দেখাতে না পারলে কঠোর সমালোচনা করেন, তা হলে শিশুর মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয়।

পিতামাতার মধ্যে অহরহ কলহ পরিবারের শান্ত ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে, এরূপ পরিবেশে যদি কোন শিশু বড় হয় তা হলে তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশও বাধাপ্রাপ্ত হয়, উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপূর্ণ পরিবেশে আত্ম-সংযম শিক্ষার কোন অবকাশ থাকে না; ফলে শিশুর নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

পিতামাতা যদি সন্তানদের সম্পর্কে সমদৃষ্টিসম্পন্ন না হন, তাঁরা সকল সন্তানকেই যদি সমান স্নেহ-প্রীতি না দেন, তা হলে যাকে অবহেলা করা হচ্ছে, যাকে অন্যান্য ভাইবোনের তুলনায় সর্বদা বিরূপ সমালোচনা করা হচ্ছে, তার মধ্যে পিতামাতা সম্বন্ধে ক্রোধের সঞ্চার হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কেউ কথা বললে, যথাযথ ভালবাসা না পেলে, যেদিকে নবযুবকযুবতার শক্তি ও রুচি রয়েছে সেদিকে পরিচালিত না হলে, শক্তি স্ফুরণের কোন সুযোগ না পেলে, তাদের ক্রোধের উদ্রেক হয়। এ ছাড়া আত্মস্বীকৃতি, পারিবারে ও সমাজে যথাযথ স্থান, এ সকল চাহিদার সম্যক্ পারতৃপ্তি না ঘটলেও এ বয়সে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

আরও একটু বড় হলে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে আপন সামর্থ্য ও অভিলাষের মধ্যে যত ব্যবধান আবিষ্কৃত হতে থাকে, তত হতাশা ও তার সঙ্গে ক্রোধের উদ্রেক ঘটতে থাকে।

॥ শিশুদের রাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন নিরীক্ষা ॥

৭ মাস থেকে ৭ বৎসর দশমাস বয়সের পঁয়তাল্লিশটি শিশুর মা, তাদের শিশুদের উষ্মা প্রকাশের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রকার, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুডেনাফের (*Goodenough*) নির্দেশনায় পর্যবেক্ষণ করেন ও তার দিনলিপি রক্ষা করেন। তিন ভাগের দুভাগ মা'রাই একমাসের কোন কোন ক্ষেত্রে তারও বেশী সময়ের, কেউ কেউ বা চারমাস ধরে এর দিনলিপি রক্ষা করেন। শিশুদের সেই সব সময়েই রাগের অভিব্যক্তি ঘটে যখন তারা একাকী বা সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে খেলা করে, যখন বিছানায় শুতে যায়, যখন পোষাক-পরিচ্ছদ পরে বা ছাড়ে, বা খাবার সময়।

ব্রিজ (*Bridges*) শিশুদের মধ্যে ক্রোধের কারণ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, ঘুমুতে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময়, হাতমুখ ধোওয়া, স্নান করা, বিশেষ কোন খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে, চুল পরিপাটি করা, দাঁত মাজা, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন-তালিকার কর্মসূচীতে হঠাৎ

পরিবর্তন হওয়া বা শিশুর আকাঙ্ক্ষিত কোন ক্রিয়াকলাপে বাধা দেওয়ার ফলে শিশুর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়। শিশু কোন কাজে যখন অযাচিতভাবে কারও কাছ থেকে, বিশেষ ক'রে পিতামাতার কাছ থেকে, কোন সাহায্য না পায়, আপন ইচ্ছার কথা আপনজনের কাছে বলতে না পারে, অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, খেলার সাথীদের সঙ্গে মতবিরোধ হয়, শারীরিক অসুস্থতায় ক্রমাগত ভোগে, তখন শিশুদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয়ে থাকে।

বাঁধাধরা ছকে চলাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে ক্রোধের কারণ ঘটে শৈশবাবস্থা থেকে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত। **সামাজিক সম্পর্ক, বাঁধাধরা ছকে চলা, শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে এক বৎসরের কমবয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে চারভাগের তিন ভাগ রাগের কারণ ঘটে। সামাজিক মেলামেশা, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্ব, বাঁধাধরা ছকে চলা, এক, দুই এবং তিন বৎসরের শিশুদের ক্ষেত্রে চারভাগের তিন ভাগ রাগের কারণ** ঘটায়। মোটামুটি চার থেকে সাত বৎসরের শিশুদের মধ্যে তিন ভাগের দুভাগ রাগের জন্য পূর্বোক্ত কারণগুলি দায়ী।

।। শিশুদের বয়ঃক্রম অনুসারে রাগের বহিঃপ্রকাশের পার্থক্য ।।

শিশুদের বয়ঃক্রম অনুসারে, গৃহের ও বিদ্যালয়ের আচরণ ও শিক্ষাধারা অনুসারে রাগের প্রকাশের তারতম্য ঘটে। রাগের প্রকাশ-পর্যায় রয়েছে। একেবারে শৈশবে শিশুর রাগ যে ভাবে প্রকাশ পায়, বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই রাগের অভিব্যক্তিই ভিন্নভাবে এবং কিঞ্চিৎ সংযতভাবে ঘটতে দেখা যায়। শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের পরিপক্বতার (*Maturation*) সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুকে ক্রোধপ্রকাশে সংযত হতে শেখানো হয়। তার জীবনের অনুরাগের বস্তুনিচয় ধীরে ধীরে বেড়ে যায়, বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে, নানা বিষয়ে তার আবেগ-সংযোগ ঘটে, ক্রোধের প্রকাশও শৈশবকালীন প্রকাশ-পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্নতর ও সংস্কৃত হয়। বিভিন্ন দিকে মনোযোগ্ দেওয়ায় ও তা থেকে রস-গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, একটি বিশেষ অভিপ্রেত বিষয়ে বাধার সম্মুখীন হলেও, বিষয়ান্তরে গিয়ে আনন্দগ্রহণে সক্ষম হওয়ার পূর্বে একটি বিষয়ে বাধা পাওয়ায় যেরূপ রাগ হত, এখন আর সেরূপ হয় না।

প্রথম দুই-তিন বৎসর শিশুর ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে, হাত পা ছোঁড়া, কান্নাকাটি, মেঝেতে গড়াগড়ি খাওয়া, খেতে বসে না খাওয়া, কামড়ানো, লাফালাফি করা, কখনও বা মুখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকা, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা, এই রকম সব ব্যবহার ও অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমে তা মৌখিক নেতিবাচকতা অর্থাৎ কোন নির্দেশকে সরাসরি অমান্য করা, ভীতি-প্রদর্শন, মুখে মুখে তর্ক করা প্রভৃতির

মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হতে থাকে। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটলে ক্রোধের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দৈহিক প্রকাশ ক্রমে মৌখিক প্রকাশে রূপান্তরিত হতে থাকে।

গুডেনাফ (*Goodenough*) বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ক্রোধের প্রকাশেরও তারতম্য ঘটে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখেছিলেন, এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের, শতকরা ৯০ জনের ক্রোধের প্রকাশ সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত ও শক্তির প্রকাশ একেবারে এলোমেলো। মুখে ও হাত-পা দিয়ে বাধা দেওয়া, এক বৎসরের শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু চার ও তার পরবর্তী বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রোধ-প্রকাশের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ আচরণই মৌখিক বা হাত-পা দিয়ে বাধা দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। প্রতিশোধমূলক ক্রোধ-প্রকাশ, চার বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ আচরণে প্রকাশ পায়।

রাগ-প্রকাশের পৌনঃপুনিকতাও বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এ বিষয়েও গুডেনাফ (*Goodenough*) পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর নিরীক্ষা মতে, দুই বৎসর বয়সে রাগের প্রকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী ঘটে, অর্থাৎ ১ বৎসর থেকে আরম্ভ করে দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত ঘন ঘন শিশু রাগের প্রকাশ ক'রে থাকে।

॥ বদমেজাজ (Temper Tantrums) ॥

রাগের ভয়ঙ্কর প্রকাশকেই বদমেজাজ বা *Temper Tantrums* বলে। দুই থেকে তিন বৎসরের মধ্যে এর সর্বাধিক প্রকাশ দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৪-১৫ মাসের শিশুর মধ্যেও এর প্রকাশ দেখা যায়। লাথি মারা, আঁচড়ে দেওয়া, কামড়ানো, যার উপর রাগ তাকে মারধর করা, মেঝেতে গড়াগড়ি যাওয়া বদমেজাজের বহিঃপ্রকাশ। প্রায়শঃ শিশুর মুখ এ সময়ে রাগে লাল হয়ে যায়। কখনো কখনো সে জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলে, ছুঁড়ে মারে, আসবাবপত্রে ঢিল ছুঁড়তে থাকে।

শিশুরা এ সব বয়সে, বাবা-মা'র কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করার জন্য এইরকম পথ নিয়ে থাকে। তারা যদি দেখে এ রকম করলে 'যা চাই তা পাই' হচ্ছে, তা হলে রাগের এ রকম প্রকাশ একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। মা-বাবা যদি সন্তান সম্পর্কে অধিক মনোযোগী হন, বা সন্তানকে অত্যধিক আদর দেন, তাহলে শিশুর বদমেজাজী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। ক্রোধপ্রকাশে এরূপভাবে ব্যক্তি অভ্যস্ত হলে তার প্রক্ষোভের স্বাভাবিক ও সুস্থ গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৈশবকালীন ক্রোধের প্রকাশ পরিবর্তিত হওয়া সমীচীন। যে অবস্থা তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাণপণে বাধা সৃষ্টি করে, সে অবস্থা দূর করার জন্য গঠনমূলক কাজে যাতে সে প্রয়াসী হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সহিষ্ণুতার শিক্ষা শিশু যেন প্রাপ্ত হয়। পিতামাতার সুস্থ আচরণ, তাঁদের সুস্থ মেজাজ, গৃহে নিয়ম-শৃঙ্খলা, স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ ও আনন্দ-উপকরণ, শিশুর আবেগ-জীবনকে সুস্থ ও সুঠাম ক'রে তোলে। শিশুর রাগের উদ্দীপকটি অহেতুক কাছে রাখা সমীচীন নয়। শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে, শিশু সৃজনমূলক কাজে নিযুক্ত হয়, এমন উদ্দীপক তার সামনে আনতে হবে।

গঠনমূলক প্রতিযোগিতা কর্মে শিশুকে নিয়োগ করা যেতে পারে। পড়াশুনা, খেলাধুলা প্রভৃতিতে শিশুর মনোযোগ যাতে যথার্থভাবে আকৃষ্ট হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। আত্ম-স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে শিশুকে ক্রমাগত গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে। এর মধ্য দিয়েই শিশুর সুস্থ আবেগ-জীবন গড়ে উঠতে পারে এবং এর মধ্য দিয়েই শিশু রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

ক্রোধের কারণ→

নবজাত শিশুর তিনটি প্রধান প্রক্ষোভ: ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ। ক্রোধের উৎপত্তি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করলে হয়। বাবা মা'র নিষ্ঠুর আচরণ, শাস্তি, স্বার্থপরতা, সন্তানের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার করে। পিতামাতার আদর্শ ও জীবনাচরণে পার্থক্য শিশুর দৈহিক অস্বাস্থ্য—নিয়ত রোগভোগ—রাগের কারণ হয়। নালীবিহীন গ্রন্থিরস ব্যক্তির মেজাজগত গঠন নির্ধারণ করে। অসুস্থ গৃহ-পরিবেশ, যেখানে নিয়ত মারধর, ঝগড়া-বিবাদ চলে—শিশুও পিতামাতার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশুর নিজের সম্বন্ধে অমূলক উচ্চমানের ধারণা, পিতামাতা কর্তৃক সন্তানের সামর্থ্য—অধিক অতি-প্রত্যাশা—ব্যর্থতায় সমালোচনা—ক্রোধের উদ্রেক। পিতামাতার মধ্যে নিয়ত কলহ। পিতামাতার অসমদৃষ্টি—সন্তানদের মধ্যে কাউকে বেশী আদর, কাউকে কম আদর করা। বয়ঃসন্ধি-কালে আত্ম-সম্মানে আঘাত পেলে, শক্তি-বিকাশের সুযোগ না পেলে নবযুবক-যুবতীদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয়।

শিশুদের রাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন নিরীক্ষা→

Goodenough-এর নির্দেশনায় পরীক্ষা। শিশুর রাগের বিশেষ বিশেষ সময়। Bridges (ব্রিজ) শিশুদের ক্রোধের কারণ নিয়ে গবেষণা করেন। —নির্দিষ্ট দিন-তালিকার কর্মসূচীতে হঠাৎ পরিবর্তন হলে বা শিশুর আকাঙ্ক্ষিত কোন ক্রিয়া-কলাপে বাধা দিলে শিশুর রাগ হয়। বাঁধা-ধরা ছকে চলাকে কেন্দ্র করে

শৈশবাবস্থা থেকে ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত ক্রোধের কারণ ঘটে।

শিশুদের বয়ঃক্রম অনুসারে রাগের বহিঃপ্রকাশের পার্থক্য :→

রাগের প্রকাশ-পর্যায় আছে। স্নায়ুতন্ত্রের পরিপক্কতার (Maturation) সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের অভিব্যক্তি ভিন্ন হয়। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়—কোন একটি বিশেষ বিষয়ে বাধা পেলেও আর ততটা রাগ হয় না, যতটা রাগ শৈশবকালে হত। প্রথম দুই/তিন বৎসর শিশুর ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে—হাত-পা ছোঁড়া. কান্নাকাটি, মেঝেতে গড়াগড়ি খাওয়া, কামড়ানো প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটলে, ক্রোধের অভিব্যক্তির দৈহিক প্রকাশ থেকে ক্রমে মৌখিক প্রকাশে রূপান্তরিত হতে থাকে। Goodenough দেখিয়েছেন, বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের প্রকাশেরও তারতম্য ঘটে।

বদ্‌মেজাজ (Temper Tantrums)→

রাগের ভয়ঙ্কর প্রকাশকেই বদমেজাজ বলে। মা-বাবার অত্যধিক আদর, 'যা চাই তাই পাই' এই রকম ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য, সন্তানের বদ্‌মেজাজী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ক্রোধের প্রকাশ পরিবর্তিত হওয়া সমীচীন। সহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। পিতা-মাতার সুস্থ আচরণ, তাঁদের সুস্থ মেজাজ, গৃহে নিয়মশৃঙ্খলা, স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ ও আনন্দ-উপকরণ, শিশুর আবেগ-জীবনকে সুস্থ ও সুঠাম করে তোলে। সৃজনমূলক উদ্দীপক শিশুর সামনে রাখতে হবে। গঠনমূলক প্রতি-যোগিতা কর্ম, পড়াশুনা, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে—সৃজনধর্মী গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত রেখেই শিশুকে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখানো যেতে পারে।

॥ অনুশীলনী ॥

1. Discuss the role of anger in the child's mental life. How will you control anger in children ?
2. Discuss the importance of anger in the child's life. How does anger help and inhibit the proper adjustment of the child ?
3. Write notes on : Temper Tantrum.

পঞ্চদশ অধ্যায়

মনঃসমীক্ষণঃ নির্জ্ঞান মনঃ মানসিক স্বাস্থ্য

নির্জ্ঞান মন (*unconscious*), নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, তার গতিপ্রকৃতি, দ্বন্দ্ব (*conflict*), অবদমন (*Repression*), প্রক্ষেপণ (*Projection*), অন্যান্য আত্মরক্ষা-মূলক মানস-প্রক্রিয়া, মনের বিকাশ-পর্ব, সংবন্ধন (*Fixation*), পশ্চাদ্‌গমন (*Regression*) প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক্‌রূপে জানতে হলে ফ্রয়েড্‌-প্রবর্তিত মনঃ-সমীক্ষণ ভাবধারা, মনস্তত্ত্বে সে ভাবধারায় প্রবর্তনা, প্রসার ও ফলশ্রুতি, এ সকল বিষয়ে আমাদের জানতে হবে।

মনঃসমীক্ষণ, ঐতিহাসিক পটভূমি ও ফ্রয়েড্‌ :—মনঃসমীক্ষণে ভাবধারা বস্তুতঃ মনোবিদ্যার চর্চা থেকে আসেনি ; চিকিৎসা-সম্পর্কিত, মানসিক রোগ চিকিৎসা ; মানসিক রোগ সম্পর্কে গবেষণাপ্রসূত মনঃসমীক্ষণের শর্তাদি—মনোবিদ্যার চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। মানুষেরও মনের গহনে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা, মানুষের নির্জ্ঞান মন কিভাবে অলক্ষ্যে মানব আচরণ ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, সে সম্পর্কে মনঃসমীক্ষণের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্বন্ধে জানা গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এদিক্‌ থেকে মনঃসমীক্ষণকে আচরণের মনোবিজ্ঞান বলা যেতে পারে, যদিও মনঃসমীক্ষণের চিন্তাধারার সঙ্গে আচরণবাদী (*Behaviourist*) মনোবিদ্যার কোন মৌলিক সাদৃশ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে মনঃসমীক্ষণ মতবাদকে কখনও কখনও গভীর মনোস্তরের মনোবিদ্যা *Depth Psychology* বলা হয়। কেননা, মনঃসমীক্ষণ সেই সমীক্ষণ, সেই মনের সমীক্ষণ, যে মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ব্যক্তি সাধারণভাবে অবহিত নয়। কখনও আবার একে অনুভূতির মনোবিদ্যাও (*feeling Psychology*) বলা হয়। কেননা, মনঃসমীক্ষণের মতাদর্শই প্রথম উনবিংশ শতাব্দীর বৌদ্ধিক (*cognitive*) মনোবিদ্যায় যে সংবেদন ও বৌদ্ধিক অবগতিকে অতিমাত্রায় জোর দেওয়া হয়েছিল, তার মূলে কার্যকরী আঘাত হানে। বস্তুতঃ, মনঃসমীক্ষণ মতধারা, মনোবিদ্যায় প্রচলিত পরীক্ষণ কেন্দ্রীভূত যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও পরীক্ষালব্ধ সত্যাদি তার সঙ্গে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা খুঁজে পায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর সংবেদনধর্মী ও বৌদ্ধিক মনোবিদ্যার মধ্য দিয়ে মনের গহনে প্রবেশ করা যায় না।

শারীরিক কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার জন্য মনের পরিবর্তন ঘটে, এরূপ ধারণার পরিবর্তে মানসিক কারণে মনের পরিবর্তন সাধিত হয়, এরূপ সত্য মনঃসমীক্ষণ প্রচার করে। এটি যখন থেকে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়েছে যে, মস্তিষ্কের আঘাত বা তার কোন প্রকার গাঠনিক বিকৃতি না থাকা সত্ত্বেও মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি দেখা যাচ্ছে, তখন থেকেই মানসিক বিকৃতির কারণ ব্যক্তির মনোজগতেই সন্ধান করা আরম্ভ হয়েছে। ব্যক্তির 'বিকৃত চিন্তা-অভ্যাস, ইচ্ছাশক্তির সংকীর্ণতা, আবেগ-জীবনের অস্থিরতা প্রভৃতি কারণেই মানসিক

বৈকল্যের উদ্ভব হয়। এ সব কারণেই যে মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব ঘটে, এ ধারণা যত দানা বেঁধেছে, ততই মনোবিদ্যায় মনঃসমীক্ষণ চিন্তাধারা গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু এর একটা ইতিহাস আছে। সম্মোহন-বিদ্যার ইতিহাসের সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র আছে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেসমার (*Mesmer*) সম্মোহন-বিদ্যাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়াস করেন। কিন্তু প্যারিসের সারকো (*Charcot*) ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞ। তিনি দেখলেন যে, যে সব ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে সংবিষ্ট করা যায়, তারা হিস্টিরিয়া মূর্ছারোগে প্রায়ই আক্রান্ত হয়। এ সত্য থেকে তিনি হিস্টিরিয়া রোগের কারণ ও নিরাময় সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে আলোকিত হন, সম্মোহন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও তিনি আলোকপাত করেন। সংবিষ্ট অবস্থা ব্যক্তির একটা বিকৃত রোগাক্রান্ত অবস্থার মত। **নান্সী** (*Nancy*) মতাবলম্বীরা এর বিরোধিতা করেন। এঁদের মতে স্বাভাবিক সকল ব্যক্তিকেই মৃদুভাবে সংবিষ্ট করা যায়। এটা একটা নিষ্ক্রিয় ও সংগ্রহণমুখী অবস্থা। অভিভাবনে (*Suggestion*) এর উদ্ভব ঘটে। এঁরা স্নায়বিক রোগীদের কখনও কখনও এ প্রথায় চিকিৎসা করতেন। সাঁরকো ও নান্সী এই দুই মতাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ খুব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

সাঁরকোর অনেক ছাত্র ছিল যারা স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে বোস্টনের **মর্টন** (১৮৫৪—১৯২৯), মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে সম্মোহন-জাতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকেন। তিনি চেতন-মনের সন্নিকটে আরও একটি মনোজগতের (*Co-conscious*) আভাস পান। প্যারী (*Paris*) নগরের **পিয়ারে জ্যানেও** (*Pierre Janet*) বলতেন, অচেতনাবস্থায় মানস ক্রিয়াকাণ্ড সম্ভব ; তাঁর মতে মানুষের চেতনা খণ্ডিত ও অসংলগ্ন হওয়া সম্ভব। তিনি পরবর্তী কালে স্নায়ুরোগ বিষয়ে, গবেষণা ও চিকিৎসায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন। তিনি সাঁরকোর সম্মোহন-প্রক্রিয়া হিস্টিরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। এ থেকে তিনি দেখলেন যে, সংবিষ্ট অবস্থায় হিস্টিরির রোগী তার এমন অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণে আনতে পারে, যে সব অভিজ্ঞতার কথা জাগ্রতাবস্থায় একেবারেই স্মরণে আসে না। কোন আবেগজনিত আঘাত অর্থাৎ কোন মর্মান্তিক ঘটনা যখন ব্যক্তিকে তীব্রভাবে আহত করে, সে অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তি যদিও ধীরে ধীরে ভুলে যায়, তবু সে ভুলে-যাওয়া ঘটনার কথা সংবিষ্ট অবস্থায় পুনরায় মনে করতে পারে এবং সংবিষ্ট অবস্থায় কোন অভিভাবনপূর্ণ (*Suggestion*) নির্দেশ দিলে (যেমন, "এ অভিজ্ঞতা অতীত অভিজ্ঞতা মাত্র, এখন এর আর কোন অস্তিত্ব নেই") প্রক্ষোভপুঞ্জীত হিস্টিরিয়া রোগের সংলক্ষণগুলো দূরীভূত হয়। জ্যানে (*Janet*) অন্যান্য প্রকারের মানসিক রোগ, যেমন অহেতুক ভয় বা আবেশিক বায়ু (*Obsessions*) নিরাময়ের জন্য "পুনর্শিক্ষণে"র পথ নিয়েছিলেন। জ্যানের মতে আবেগজর্জর অভিজ্ঞতার প্রধান অংশগুলি সংজ্ঞান মনের ধারার সঙ্গে মিলতে পারে না, ফলে রোগীর কোন বিশেষ ঘটনা মনে পড়লে সেই ঘটনার আনুষঙ্গিক প্রক্ষোভও সে অনুভব করে। জ্যানে মনে করতেন যে, মানসিক জটগুলি মানসিক যন্ত্রণার জন্য প্রধান চেতনা থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর মতে যন্ত্রণা-বিপর্যস্ততার জন্য মানসিক শক্তির স্বল্পতা দেখা দেয়, ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি কমে যায়, ফলে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হতে থাকে। এই মানস-শক্তির স্বল্পতাহেতু অহেতুক ভয়, আবেশিক বায়ু, অসাড়তা প্রভৃতি মানসিক রোগ-সংলক্ষণ দেখা দেয়।

জ্যানের প্রভাব মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে কাজ করে। ফ্রয়েড্ও এঁর দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ মনঃসমীক্ষণের ভাবধারার উৎসমূলে জ্যানে প্রমুখ মনশ্চিকিৎসকদের চিন্তাধারা কাজ করছে। মনঃসমীক্ষণ ভাবধারার পটভূমি এঁরাই তৈরি করেছিলেন বলে মনে হয়।

॥ ফ্রয়েড্-এর প্রয়াস পর্যায় ॥

ফ্রয়েড্ পরিচিতি :—চেকোশ্লোভকিয়ার ফ্রিবুর্গ শহরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (*Sigmund Freud*) জন্ম। শৈশবকাল থেকেই তিনি ভিয়েনাতে থেকেছেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি পড়াশুনা করেন, এখান থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্নাতক হওয়ার পূর্বে শারীরবৃত্ত বিষয়ের (*Physiology*) পরীক্ষাগারে আর্নস্ট ব্রুক (*Ernst Broucke*)-এর অধীনে তিনি ছয় বৎসর কাজ করেন। ব্রুক শারীরবৃত্তের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কাছে ফ্রয়েড্ অত্যন্ত নিপুণভাবে কাজ শেখেন। কিন্তু এতে জীবিকার কোন সংস্থান হবে না ভেবে তিনি চিকিৎসক হলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েড একটি সাধারণ হাসপাতালে সহকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শারীরবৃত্তগত পরীক্ষাগার থেকে হাসপাতালে এসে যোগ দেন, কিন্তু শারীরবৃত্তগত বিষয়ে বিশেষ ক'রে স্নায়ুতন্ত্র, এর গঠন ও কার্যকারিতা ও এর গাঠনিক ও কার্মিক বিকৃতি জনিত (যেমন, অসাড়তা বা মস্তিষ্কের আঘাত) যে সকল অসুস্থতা, সে বিষয়ে গবেষণা করতে থাকেন। এ সময়ে ভিয়েনাতে স্নায়ু ও আবেশিক রোগ সম্বন্ধে তেমন কারও জ্ঞান ছিল না; এবং রোগ-নিরাময়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও যথার্থ প্রয়োগ ছিল না।

(১) পারীর সাঁরকোর তখন এ বিষয়ে খুব নাম-ডাক। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েড্ পারী শহরে সাঁরকোর কাছে শিক্ষালাভের জন্য গেলেন। হিস্টিরিয়া রোগ নিরাময়ে তাঁর সম্মোহন কৌশল-প্রয়োগ ফ্রয়েডকে মুগ্ধ করে। (ক) সাঁরকোর আরও একটি আবিষ্কার একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সকল প্রকার আবেশিক রোগই ব্যক্তির যৌন-জীবনের কোন-না-কোন বিকৃতি থেকে আসে, এটা ফ্রয়েড়কে চমকিত করে। ফ্রয়েড ভাবতে থাকলেন এই আবিষ্কৃত সত্যকে সাঁরকো কেন তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতিতে ব্যবহার করছেন না। পরবর্তী কালে ফ্রয়েডের চিন্তাধারায় এ সত্য যথাযথভাবে স্থান পেয়েছিল।

(খ) সাঁরকোর সঙ্গে কাজ করার সময়ে ফ্রয়েড দেখলেন, সাঁরকো রোগীকে সংবিষ্ট করে হিস্টিরিয়া রোগলক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে পারেন। পূর্বে জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান দেশে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে, স্নায়ুমণ্ডলে কোন গাঠনিক গোলযোগ হেতুই হিস্টিরিয়া রোগ

হয়। লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্নায়ুচিকিৎসাগারেও এরূপ ধারণাই প্রচলিত ছিল এবং সেখানে এরূপ শিক্ষাই দেওয়া হত।

(২) ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েড ভিয়েনাতে ফিরে পুরোপুরি স্নায়ুরোগের, বিশেষ ক'রে হিস্টিরিয়া রোগের, চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। তিনি সম্মোহনকেই চিকিৎসার প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন, কিন্তু অচিরেই নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হন। একটি বাধা হ'ল (ক) অনেক রোগীকে সংবিষ্ট করা সম্ভব ছিল না। যদিও-বা তিনি কষ্টেসৃষ্টে কোন প্রকারে কোন রোগীকে সংবিষ্ট করতেন, তাদেরও সব সময় এ পদ্ধতিতে সারিয়ে তুলতে পারতেন না। এরূপ অভিজ্ঞতায় তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে পুনরায় পারীতে গেলেন—এবার গেলেন **নান্সী (Nancy) মতাবলম্বীদের** রোগনিরাময়-পদ্ধতি ভাল ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে। নান্সী মতাবলম্বীরা সকল রোগ নিরাময়েচ্ছু ব্যক্তিকেই সংবিষ্ট করতে পারতেন এবং সংবিষ্ট অবস্থায় নিরাময়মূলক অভিভাবন (*Suggestion*) দ্বারা রোগীদের সারিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু এঁদের একটা বিষয় জেনে ফ্রয়েড্ হতাশ ও মর্মাহত হলেন—যে সব রোগীরা দানের উপর নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রে নিরাময়-মূলক অভিভাবন যেভাবে কার্যকরী হত, সাধারণ চিকিৎসা খরচ বহনে সক্ষম রোগীদের ক্ষেত্রে অভিভাবন ততটা ফলপ্রসূ হত না। কেননা, তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অতি পোষাকী ছিল; এরা অভিভাবনকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারত না।

॥ জোসেফ্ ব্রুয়ারের (Josef Breuer) প্রভাব ॥

জোসেফ্ ব্রুয়ার ভিয়েনার একজন চিকিৎসক ছিলেন। ব্রুয়ারের প্রভাবই বোধ হয় ফ্রয়েডের উপর সর্বাধিক ছিল। শাঁরকো ও নান্সী মতাবলম্বীরাও ফ্রয়েডের উপর অতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। ব্রুয়ারও ফ্রয়েডের মত শারীরবিদ্ (*physiologist*) হিসাবে প্রথম কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে চিকিৎসা-কার্যে নিযুক্ত হন। ফ্রয়েড্ ও ব্রুয়ার দুই বন্ধু ছিলেন। এঁরা দুজনেই উদ্বায়ু রোগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন।

ব্রুয়ার মানসিক রোগ চিকিৎসায় একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ পদ্ধতি কেবল যে মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেই নতুন দিশারী তাই নয়, মনের গহন রাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির আবিষ্কারেও এ পদ্ধতির পরোক্ষ তাৎপর্য কম নয়। ব্রুয়ারের একজন রোগিনীই বস্তুতঃ এই নতুন পথের সন্ধান দেন। রোগিনীটি হিস্টিরিয়া রোগে ভুগছিলেন। ব্রুয়ার তাঁর উপর যথারীতি রোগ নিরাময় উদ্দেশ্যে সম্মোহন প্রয়োগ করেছেন। রোগিনীটি দেখলেন যে, তাঁকে যদি সংবিষ্ট অবস্থায় কেবল তাঁর প্রক্ষোভঘটিত অসুবিধার কথাগুলি খোলাখুলি বলতে দেওয়া হয়, তাহলেই তিনি অনেকটা ভাল বোধ করেন। সংবিষ্ট অবস্থায় অনেক বিস্মৃত ঘটনার (যার সঙ্গে তার আবেগগত জীবনের অনেক যোগ ছিল) কথা মনে আসতো এবং তা বলে তিনি নিজেকে অনেক হাল্কা বোধ করতেন, হিস্টিরিয়া রোগের সংলক্ষণও অনেক পরিমাণে প্রশমিত হত। এই অভিজ্ঞতা থেকে ব্রুয়ার তাঁর

নতুন নিরাময়-পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন। **রোগী বা রোগিনীকে কেবল তার মনের কথা মন খুলে বলতে দিলেই সে ভাল হয়ে যায়।** কাজেই রোগী বা রোগিনীকে সংবিষ্ট ক'রে যতটা সম্ভব তার মনের কথা বার করে আনা যায়। সে কথার আপাত-দৃষ্টিতে কোন অর্থ নাও থাকতে পারে, সে কথার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে রোগের কোন সম্বন্ধ খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে। সামাজিক অসামাজিক, শ্লীল অশ্লীল যে কোন প্রকার কথাই এ অবস্থায় রোগীর মনে আসতে পারে—এরূপ অকপট আত্ম-কথন যত ত্বরান্বিত ও স্বচ্ছন্দ করা যায়, রোগের তত নিরাময় ঘটে।

ব্রুয়ার ও ফ্রয়েড্ ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি হিস্টিরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে দুজনেই অনেক পরিমাণে সাফল্য লাভ করেন। ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করলেন। তাঁরা বললেন যে, বিগত স্মৃতি, যার সঙ্গে আবেগ (দুঃখ ভয়, ঘৃণা, অতৃপ্ত ভালবাসা) জড়িয়ে থাকে, যদি মানসপটে ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে এ সব পুঞ্জিত আবেগের বিরেচন (*Catharsis*) ঘটে। এ প্রক্ষোভ-বিদ্রবণ প্রক্রিয়াকেই অভিস্ফোট (*Abreaction*) বলে। জ্যানে সংবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি করে হারানো স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনে রোগের কারণটি খুঁজে নিয়ে তা দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফ্রয়েড ও ব্রুয়ার এর সঙ্গে দেখলেন যে, রোগী যদি আপন মনে তার সব কথা বলার সুযোগ পায়, তা হলেও অনেক পরিমাণে আরোগ্য লাভ করতে পারে। খুব খানিকটা কাঁন্নাকাটির পর মনের রুদ্ধ শোক যেমন প্রশমিত হয়, তেমনি চিকিৎসকের কাছে মনের গোপন কথা ব্যক্ত করার পর রোগীর মনেও শান্তি আসে, রোগও ধীরে ধীরে সেরে যায়। যে সব ঘটনা রোগীর লজ্জা ও দুঃখের কারণ, সেই সব ঘটনাকে রোগী অবমদিত করে রেখেছে। এদের মনের আর এক 'প্রান্তে' সরিয়ে দিয়েছে ; মনের অবচেতন গহ্বরে যেন নির্বাসিত করেছে। সংবিষ্ট অবস্থায় এদের কথা আবার চেতন-মনে ফিরিয়ে আনা যায়। তাঁরা দেখলেন, কতকগুলি দুঃখদায়ক ভাব মনে রুদ্ধ অবস্থায় থেকে রোগের সৃষ্টি করে, এবং সেগুলি কোন উপায়ে মন থেকে নিষ্কাশিত ক'রে দিতে পারলেই রোগের উপশম হয়।

।। বার্নহাইমের (Bernheim) প্রভাব ।।

এ উপায়ে চিকিৎসা করার পরে ফ্রয়েড দেখলেন যে, মনের অনেক গোপন কথা সংবিষ্ট অবস্থাতেও সহজে স্মৃতিপটে উদয় হয় না। তিনি আরও দেখলেন যে, সকল রোগীকে সংবিষ্ট করা যায় না। ফ্রয়েড পুনরায় ফ্রান্সে গেলেন, কিন্তু এবার গেলেন নান্সীতে বার্নহাইমের কাছে অধ্যয়ন করতে। বার্নহাইমের একটি পরীক্ষামূলক কার্য দেখে তিনি যেন নতুন আলোক পেলেন। বার্নহাইম একটি রোগীকে সংবিষ্ট ক'রে তাকে আবেশান্ত-অভিভাবন (*suggestion*) দিয়ে বলতেন, "যখন বারোটা বাজবে তখন তুমি জানালাটি খুলবে"। এরপর রোগীটিকে জাগিয়ে দেওয়া হত। ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রোগীটি সত্যি সত্যি জানালা খুলে দিত। এর কার্যকারণ সম্বন্ধ সে

খুঁজে পেত না। এ কাজ কেন সে করল, জিজ্ঞাস করলে তা সঠিক উত্তর দিতে পারত না। একবার বলত, 'আপনার নির্দেশের জন্য এ কাজ করেছি', আবার বলত, 'খুব গরম লাগছিল বলে জানালা খুলে দিয়েছি'।

বার্নহাইম এর সঠিক তাৎপর্য খুঁজে বার করতে চাইলেন। রোগীকে বস্তুতঃ এ কাজ সে কেন করেছে, তা বলবার জন্য বার বার তাগিদ দেওয়া হ'ল। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর, এ কাজ করার আসল কারণ তার স্মৃতিতে আসে। এইভাবে বার্নহাইম তার চেতন মনের সঙ্গে অবচেতন মনের (*Unconscious Mind*) সেতুবন্ধ স্থাপন করেন।

ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন যে, সংবিষ্ট অবস্থায় রোগী যা করে, জেগে ওঠার পর তার আর সে সব কিছু মনে থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় এরূপ লুপ্তস্মৃতি উদ্ধারের জন্য বার্নহাইম ব্যক্তির কপাল একটু চেপে ও তাতে হাত বুলিয়ে বলতেন যে, সংবিষ্ট অবস্থার সব ঘটনা তার মনে আসবে। দেখা যায়, বিস্মৃত ঘটনাই সত্যই রোগীর স্মৃতিতে ফিরে আসে।

ব্রুয়ার ও বার্নহাইম দুজনের কাছ থেকেই ফ্রয়েড্ তাঁর বৈপ্লবিক পথ-নির্দেশ পেলেন। এক দিকে নির্জ্ঞান মনের সন্ধান ও তার স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পেলেন, অন্য দিকে মানসিক রোগ চিকিৎসার কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করলেন ফ্রয়েড।

ফ্রয়েড দেখলেন, রোগীকে সংবিষ্ট না করে বার্নহাইমের মত রোগীকে শুইয়ে দিয়ে তার কপালে হাত রেখে আস্তে আস্তে স্পর্শ করে তার পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে তোলার পথই শ্রেয়ঃ। এতে রোগী প্রথম জানায় যে, তার কোন কথাই মনে আসে না। ফ্রয়েড রোগীকে তার মনে যে কথারই উদয় হোক, অকপটে তা বলার জন্য নির্দেশ দিলেন। এইরূপে রোগীর যে সব কথার সন্ধান পাওয়া গেল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার মধ্যে লুপ্ত স্মৃতির আভাস রয়েছে দেখা গেল।

ফ্রয়েড সংবেশন পদ্ধতি পরিত্যাগ করলেন। কেবল শরীর-মন এলিয়ে দিয়ে একান্তে কেবল যা মনে আসে বাধা-বন্ধহীনভাবে রোগীর তাই বলে যাওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। রোগীকে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকতে নির্দেশ দিতেন। দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে অল্প আলোতে রোগী এরূপ অবস্থায় থাকবে। রোগী বিশেষ কোন বিষয়ে মনকে নিবদ্ধ করবে না, মন আপনা আপনি বিহার করবে। এই ভাবে তার মনে যে সব কথা আসবে, সে সেগুলো ন্যায়, অন্যায়, শ্লীল, অশ্লীল, আবশ্যক, অনাবশ্যক নির্বিশেষে বলে যাবে। লজ্জা, সংকোচ ভয়, ভদ্রতা প্রভৃতির কোন বাধা না মেনে সে অবাধে সব মনের কথা প্রকাশ করবে। ফ্রয়েড্ এ পদ্ধতির নাম দিলেন অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি (*Free association method*)। এ পদ্ধতিকে অবাধ ভাবানুষঙ্গ বলাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কেননা ব্যক্তি তার ভাব-প্রকাশে ও নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিজের অসুবিধা সম্বন্ধে বা নিজের বিষয় সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে চলতে হবে। সংবেশন পদ্ধতির মধ্যে যে অভিভাবনের পদ্ধতি আছে, ফ্রয়েড্ তা পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু ব্যক্তিকে আবেশ-প্রবণ ক'রে তোলার মূল নীতিটি গ্রহণ করলেন।

সম্মোহনের আবেশপ্রবণতা ও অবাধ ভাবানুষঙ্গ মিলিয়েই ফ্রয়েডের চিকিৎসা-পদ্ধতি আরম্ভ হ'ল।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ—কিন্তু ফ্রয়েড্ দেখলেন যে, এরূপভাবে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগ-চিকিৎসা অনেক সময়সাপেক্ষ, ব্যক্তির অবচেতন মানস-গহনে প্রবেশ করাও এ পদ্ধতিতে অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। ফ্রয়েড তখন দেখলেন, রোগীর স্বপ্নবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নির্জ্ঞান মনের প্রবেশের পথ সুগম হতে পারে। রোগীর অব্যবহিত পূর্বের স্বপ্নের কথা রোগী বলে ; সামগ্রিকভাবে তাকে কেন্দ্র ক'রে এবং স্বপ্নের প্রতিটি অংশকে কেন্দ্র করে, রোগী অবাধ ভাবানুষঙ্গ (***Free association***) দিয়ে থাকে। স্বপ্নের প্রত্যেকটি অংশকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ব স্মৃতি উদ্রেকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। স্বপ্নকে কেন্দ্র করে বিগত বহু পুরানো অভিজ্ঞতার কথা, বিস্মৃত দেশের গোপন কথা স্মরণ-পথে ফিরিয়ে আনা যায়। এই সব স্মৃতিচারণ বস্তুতঃ ব্যক্তির শৈশবকালীন বহু অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে, ব্যক্তি কি-প্রকারের মানসিক জটের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বা কি প্রকারের গূঢ়েষা ব্যক্তির অবচেতন মানসে কাজ করছে, তা বার করা যায়। স্বপ্ন-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ফ্রয়েডই প্রথম আবিষ্কার করেন। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, ফ্রয়েড প্রথম সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের পরবর্তী পর্যায়েই ফ্রয়েড্ তাঁর *Psychopathology of Everyday Life* গ্রন্থে দেখান যে, মানুষের হঠাৎ ভুলে যাওয়া, কিছু বলতে বা উচ্চারণে ভুল করা, লিখতে গিয়ে কিছু মনে না আসা, বিকৃত ক'রে কোন কিছু লেখা বা উচ্চারণ করা প্রভৃতির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ক'রেও মনের নির্জ্ঞানস্তরস্থিত ব্যক্তির গূঢ়েষার বৃত্তান্ত জানা যায়। কাউকে বিদ্রূপ করা, তামাশা করে কিছু বলা বা ইঙ্গিত করার মধ্যেও যে ব্যক্তির নির্জ্ঞান মন প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে, সেটাও ফ্রয়েড তাঁর *Wit in Relation* ***to the Unconscious*** গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, মনঃসমীক্ষণ বস্তুতঃ আর কেবলমাত্র একটি মানসিক রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি রইল না, মনোবিদ্যায় একটি বৈজ্ঞানিক মতধারার বৈপ্লবিক সংযোজন হয়ে রইল।

ফ্রয়েড্ দেখলেন যে, **উদ্বায়ু (Neurotic) রোগের সংলক্ষণ, স্বপ্ন, তথাকথিত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি, বিদ্রূপ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে যে অবদমিত ইচ্ছা বা গূঢ়েষার প্রকাশ মেলে, তা মূলতঃ যৌন-ইচ্ছা সংক্রান্ত।** শাঁরকোও বলেছিলেন যে, যৌন জীবনে কোন প্রকার গোলযোগই সর্বপ্রকার উদ্বায়ু রোগের কারণ। ফ্রয়েড বললেন যে, অবদমিত কামেচ্ছাই উদ্বায়ু রোগের মূলে কাজ করে। তবে এ অবদমন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়—কেননা সকল কামোৎসারিত ইচ্ছাকেই সমাজে চরিতার্থ করা যায় না এবং এর জন্য মানসিক দ্বন্দ্বও সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর কাজ করে। এই দ্বন্দ্বের ও অবদমনের মাত্রা-ভেদেই মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব হয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে যৌন-ইচ্ছার সঙ্গে যে মানসিক বৈকল্যের কোন সম্বন্ধ আছে, এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় না।

ফ্রয়েডের মতবাদ মনোবিদ্যার জগতে আলোড়ন এনেছিল সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তা সর্বজনগ্রাহ্য বলে গৃহীত হয়নি। এর কারণ হিসাবে অনেকে অবশ্য অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

।। মনঃসমীক্ষণের আরও বিকাশ-ব্যাপ্তি ।।

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতাদর্শের সংহত বিবরণ দেওয়ার পূর্বে, মনশ্চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আরও বিকাশ-পর্বের কিছু বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। মনঃসমীক্ষণে এটা সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল যে, নির্দিষ্ট কতকগুলি বস্তু বিশেষ যৌন-ক্রিয়া ও যৌন-বস্তুর প্রতীক হিসাবে কাজ করে। যে ক্ষণে রোগী স্বপ্নে এই সব বস্তুপুঞ্জের যে কোন একটির দেখার কথা বলবে, তখনই চিকিৎসক এই প্রতীকী বস্তুটির অন্তরালে যে গূঢ়ৈষা, তার আভাস পেয়ে যেতে পারে। ফ্রয়েডের চিকিৎসা-পদ্ধতিতে রোগীকে কেবল জানানোই হবে না, কি ও কেন তার অসুস্থতা, রোগীকে নিজে নিজে রোগ-উৎপাদনকারী মূল অভিজ্ঞতাকে চেতন-মানসপটে পুনরুদ্রেক করতে হবে। ছকে-বাঁধা প্রতীক (*symbols*) দিয়ে সর্বদা রোগীর নির্জ্ঞান মনের গূঢ়ৈষাকে বোঝা যায় না।

ফ্রয়েড তাঁর অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও স্বপ্ন-বিশ্লেষণের পদ্ধতি অবলম্বন করে অনেক মানসিক রোগীকে সারিয়ে তুললেন। তিনি এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত অভিজ্ঞতাকে চেতন মনের কোণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং হিস্টিরিয়া, আবেশিক ভয় ও অন্যবিধ উদ্বায়ু রোগ সংলক্ষণ দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু একটা জিনিস কোন কোন সময়ে ঘটতে দেখা যেত। যে সব রোগী ভাল হয়ে গেছে বলে ছেড়ে দেওয়া হত, তারা কিছুদিন পর অন্য প্রকারের রোগ সংলক্ষণ নিয়ে আবার ফিরে আসত। কিন্তু ফ্রয়েড এতে বিহ্বল বা হতাশ হলেন না, তিনি তাঁর পূর্বতন নিরাময়পদ্ধতিতে এতটুকু আস্থা হারালেন না। তিনি ঘোষণা করলেন যে, উদ্বায়ু রোগের প্রথম স্তরকে মাত্র তিনি ভেদ করতে পেরেছেন—তাঁর মনঃসমীক্ষণকে আরও গভীর স্তরে প্রসারিত করতে হবে। তাহলেই মনঃসমীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে মানসিক রোগ নিরসনে যথার্থরূপে কার্যকর হয়ে উঠবে। তিনি বললেন, রোগীর জীবনাভিজ্ঞতার আরও গভীর স্তরে ও আরও শৈশবকালীন স্তরে প্রবেশ করতে হবে। এ স্তরীয় অভিজ্ঞতার মধ্যেই, ফ্রয়েডের মতে, মানসিক রোগের মূল কারণটি নিহিত থাকে। **প্রথম দিকে ফ্রয়েড বর্তমান কালের কোন গূঢ়ৈষা বা মানসিক জটিলতার আবিষ্কার করেই শেষ করতেন, কিন্তু পরে তিনি দেখলেন যে, বর্তমানের যে জটিলতা তা একটা ফল মাত্র, তা শৈশবকালের কোন** জটিলতারই পরিণতিস্বরূপ—এবং অতি শৈশবকালীন এ জটিলতা ব্যক্তির নির্জ্ঞান মানস স্তরে বর্তমান থাকে। নির্জ্ঞান মানসস্তরের অতি শৈশবকালীন জটিলতা যতদিন দূর না হয়, ততদিন বাইরের বর্তমান কালস্থিত জটিলতার উপশম ঘটিয়ে স্থায়ী আরোগ্য ঘটানো যায় না।

প্রথমে ফ্রয়েড ধরে নিয়েছিলেন যে, মূল গূঢ়ৈষা রোগীর জীবনে বিশেষ কোন

প্রক্ষোভজনিত আঘাতের ফল। ক্রয়ার ও সাঁরকোও এই সত্য বিশ্বাস করতেন। ফ্রয়েড সেইজন্য ব্যক্তির বহু পুরানো দিনের ভুলে-যাওয়া অভিজ্ঞতাগুলোকে স্মৃতিপথে টেনে আনতে সচেষ্ট হলেন, যাতে সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাকে খুঁজে পাওয়া যায়, যা থেকে মানসিক বৈকল্যের উদ্ভব ঘটেছে। বহু হিস্টিরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে ফ্রয়েড স্বপ্ন-বিশ্লেষণের মাধ্যমে শৈশবকালীন প্রক্ষোভে আঘাত-জনিত অভিজ্ঞতার সূত্রটি আবিষ্কার করতেন। এ হেন রোগী বা রোগিনীদের ক্ষেত্রে প্রায়শঃই দেখা যেত যে, এরা পিতা, কাকা বা বড় ভাইয়ের দ্বারা যৌনবিষয়ে বিচ্যুত হয়েছিল। ফ্রয়েড্ এ সব ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করতে গিয়ে দেখলেন যে, এ সব অভিজ্ঞতায় কথা প্রায়শঃই কাল্পনিক। স্বপ্নবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি যে যৌন অভিজ্ঞতার সূত্র খুঁজে পেতেন, তার সবটাই কল্পনা-সঞ্জাত দেখে ফ্রয়েড কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েড পরে সিদ্ধান্ত টানলেন যে, রোগী তার যে সব অভিজ্ঞতার কথা বলে, তার অধিকাংশই **শৈশবকালীন কল্পনা। যদিও এরা কল্পনা, তবু মানসিক জীবনে এদের অস্তিত্ব বাস্তব ঘটনা থেকে কোন অংশে কম নয়।** মনোজগতে বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করলেন যে, মানসিক ব্যাপারে বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনা উভয়ই সমান অনিষ্ট সাধন করতে পারে। প্রশ্ন উঠল, এ সকল যৌন লাঞ্ছনা বা বিলোভনের কল্পনা বাল্যাবস্থায় কি প্রকারেই বা রোগীর মনে জেগেছিল এবং পরে কেনই-বা সে স্মৃতি লুপ্ত হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত সাধারণ লোকের মত ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে, কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ বয়ঃসন্ধিকালেই হয়ে থাকে। শৈশবে কোন যৌন-বোধ থাকে না। তিনি দেখলেন যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের শৈশবকালে (*Later-childhood*) প্রথম পর্যায়ের শৈশবকালের অতৃপ্ত ইচ্ছা উঁকি মারে। দেখলেন যে, তিনি যদি প্রথম পর্যায়ের অবদমিত শৈশবকালীন ইচ্ছাগুলিকে মনঃসমীক্ষণের মধ্য দিয়ে ধরতে পারেন, তাহলেই বয়ঃপ্রাপ্তিকালের মনোবিকারের মূল কারণে পৌছানো যায়। রোগী যদি এই সব শৈশবকালীন অবদমিত ইচ্ছাকে মানসপটে পুনরুদ্রেক করতে পারে, তা হলে রোগ নিরাময় হতে পারে।

মনঃসমীক্ষণকে শৈশবকালীন পর্যায়ের সমীক্ষায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এটা কি সম্ভব? বাস্তব দিক্ থেকে এ কি কোন প্রকারে ঘটানো যায়? ব্যক্তির স্বপ্ন-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এটা বাস্তবায়িত করা যায়, এ ধারণা অবাস্তব—স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সঙ্গে অবাধ ভাবানুষঙ্গ মিলিয়ে শৈশবের অভিজ্ঞতার সীমানায় সম্পূর্ণরূপে পৌছানো যায়—এরূপ প্রায় অসম্ভব। ফ্রয়েড যদিও বলেছেন যে, যা কিছু ঘটে, যা কিছু আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে, তা বিস্মৃত হলেও মন থেকে তা একেবারে মুছে যায় না এবং এই সব পুঞ্জ পুঞ্জ বিস্মৃত নির্জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে ঠিকভাবে যুক্ত ক'রে পুনরায় চেতন-মনে ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রেও অতিশৈশবকালীন অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটা মাত্র চেতন-মনে তুলে আনা যায়। তাছাড়া, কেবল বুদ্ধি-প্রযুক্ত শৈশব স্মৃতিচারণই এক্ষেত্রে কার্যকর কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। বস্তুতঃ, ব্যক্তির শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে প্রক্ষোভ-সংযোগ রয়েছে, তার পুনরুদ্রেক ঘটাতে হবে।

ব্যক্তিকে শৈশবকালীন আবেগপ্রকম্পিত জীবনে যেন ফিরে যেতে হবে! শৈশবের আবেগ-উত্তপ্ত অভিজ্ঞতার কিছুও যদি স্মরণপথে ফিরিয়ে আনা যায় ও এর মধ্য দিয়ে পুঞ্জীভূত অবেগের বাষ্পীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের কিছু অভিজ্ঞতাও স্মরণপথে আনা যায়, তাহলে ব্যক্তির মানসিক বৈকল্য দূর হতে পারে।[১]

রোগী যখন তার শৈশবের আবেগাভিজ্ঞতা ও প্রতিন্যাস কিছু স্মরণপথে ফিরিয়ে আনে, তখন সংক্রমণ (*Transference*)-এর সম্ভাবনা বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। রোগী মনঃসমীক্ষকের মধ্যেই তার পূর্বতন সকল আবেগাভিজ্ঞতার সংক্রমণ ঘটাতে আরম্ভ করে। মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র ক'রেই ব্যক্তি যেন তার শৈশবের আবেগপুঞ্জীত অভিজ্ঞতাকে মুক্তি দিতে চায়। শৈশবে ব্যক্তির পিতার প্রতি যেরূপ ভালবাসা, বিদ্রোহ বা ঘৃনার ভাব ছিল, মনঃসমীক্ষকও সেইরূপ চিকিৎসাকালে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ব্যক্তি মনঃসমীক্ষককে কখনও অত্যন্ত ভালবাসে, কখনও তার আস্থাভরে মনপ্রাণ ভরে ওঠে, কখনও বা সমীক্ষককে অত্যন্ত ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করে। এরূপ সদর্থক সংক্রমণ বা নঞর্থক সংক্রমণ ব্যক্তির শৈশবকালে পিতার প্রতি মনোভাবকেই পরিস্ফুট করে। মনঃসমীক্ষক যখন ব্যক্তির সমীক্ষায় রত থাকেন, **প্রথম দিকে সদর্থক সংক্রমণ (positive transference) দেখা দেয়।** রোগী সেই সময় মনঃসমীক্ষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র ক'রে তার শৈশবকালের অবদমিত নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। এসব ইচ্ছা যাতে মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র ক'রে স্থায়ীভাবে আবর্তিত না হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সকল ইচ্ছা-মুক্তির পথও যাতে রোগী অন্যভাবে পায়, সে ব্যবস্থা করা দরকার। ধীরে ধীরে মনঃসমীক্ষক তার

১। In one of his writings Freud distinguishes three stages in his progress. At first the endeavours of the analytic physician were confined to divining the unconscious of which his patient was unaware, effecting a synthesis of its components and communicating it at the right time...

Since the therapeutic task was not thereby accomplished, the next aim was to compel the patient to confirm the reconstruction through his own memory. In this endeavour the chief emphasis was on the resistances of the patient; the art now lay in unveiling these as soon as possible, in calling the patient's attention to them, and...teaching him to abandon the resistances.

It becomes increasingly clear, however, that the aim in view, the bringing into consciousness of the unconscious, was not fully attainable by this method either. The patient cannot recall all of what lies repressed, perhaps not even the essential part of it—He is obliged rather to repeat as a current experience what is repressed...As a rule the physician cannot spare the patient this phase of the cure; he must let him live through a certain fragment of his forgotten life.

S. Freud: Beyond the Pleasure Principle, PP. 17–18.

ভূমিকাকে খর্ব করতে থাকেন এবং ব্যক্তি স্বচেষ্টায় নিজেই নিজের ভার নিতে ধীরে ধীরে সচেষ্ট ও সক্ষম হন।

অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও সংক্রমণ, এই দুটি অবস্থাকেই ফ্রয়েড তাঁর লক্ষ্য পথে পৌছবার কাজে লাগান। এই দুই অবস্থার মধ্যে যে বাধা আপাতদৃষ্টিতে দেখা গিয়েছিল, ফ্রয়েড্ সে বাধাগুলোকেই কাজে লাগালেন। ফ্রয়েড্ দেখলেন যে, অবাধ ভাবানুষঙ্গের মাধ্যমে শৈশবকালীন স্মৃতি যেটুকু প্রতিভাত হয়, তাকেই ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে ও তার সঙ্গে পুঞ্জীত আবেগের বিরেচন হলে, রোগ নিরাময়ের পথ বহুল পরিমাণে প্রশস্ত হয়। সংক্রমণকেও ফ্রয়েড কাজে লাগালেন। মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র ক'রেই সংক্রমণ ঘটে। শৈশবকালের সম্পর্কবিজড়িত যে আবেগাভিজ্ঞতা, রোগী তার স্বাভাবিক স্ফূর্তিপথকে মনঃসমীক্ষককে লক্ষ্য করে ত্বরান্বিত ও প্রশস্ত করেন। এ অবস্থার মধ্য দিয়েই রোগীর রোগ উপশম ত্বরান্বিত হয়।

এ পদ্ধতি অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, মনঃসমীক্ষক হওয়া হঠাৎ কিছু হয়ে যাওয়া নয়। সকলের পক্ষে হওয়াও সম্ভব নয়। মনঃসমীক্ষক হওয়ার জন্য অন্ততঃ দুই বৎসর একজন মনঃসমীক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রগাঢ় অধ্যবসায়, অনুশীলন প্রয়োজন। কেবল ভেষজবিদ্যায় পারদর্শী হলেই মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায় না, বস্তুতঃ মানসিক রোগের চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সময় যে সব বিষয় পড়তে হয়, তাতে মানব সভ্যতার ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মের মনস্তত্ত্ব, লোকগীতি, সাহিত্য বিষয়, যা কোন-না-কোন ভাবে ব্যক্তি ও সমাজ মানসের প্রতিফলন। মানসিক চিকিৎসার জন্য নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে অনুশীলন করা দরকার; কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে মনের দিকটা তেমন দেখার শিক্ষা দেওয়া হয় না। অসুস্থতায় দেহগত কার্য-কারণ সম্বন্ধ কেবল নির্ণয় করতে শেখানো হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সকল রোগ দেহগত কারণে হয় না। কেবল তথাকথিত চিকিৎসা-শাস্ত্র শিখে কেউ যদি মনঃসমীক্ষক হতে চান, তা হলে তাঁর পক্ষে মানসিক রোগ সারিয়ে তোলার প্রয়াস অপপ্রয়াসের নামান্তর মাত্র। ফ্রয়েড্ বলেছেন যে, যিনি মনঃসমীক্ষক হতে চান, তাঁর প্রথম কর্তব্য হবে নিজের মনঃসমীক্ষা যথাযথভাবে করে নেওয়া। সেই ব্যক্তিই কেবল একজন যথার্থ মনঃসমীক্ষক হতে পারেন, যিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে নিজের অবদমিত গূঢ়ৈষা (*Complex*) থেকে মনঃসমীক্ষণ দ্বারা মুক্ত হয়েছেন। অন্যথায় মনঃ-সমীক্ষকের নিজস্ব জটিলতা ও গূঢ়ৈষা অন্য ব্যক্তির মনঃসমীক্ষণের সময় নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। রোগীর চিকিৎসকের প্রতি সংক্রমণ তো হয়ই। অশিক্ষিত মনঃসমীক্ষকের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষকের নিজেরই রোগীর প্রতি সংক্রমণ হতে দেখা যায়, পরিণামে মনঃ-সমীক্ষণের জন্য যে নৈর্ব্যক্তিক (*Unbiased objective*) অবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, তার অভাব ঘটে। ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন যে, মনঃসমীক্ষণ তত ফলপ্রসূ হবে, যত শৈশব-কালের ও যৌবনের অপসঙ্গতি ও সমস্যা মনঃসমীক্ষকের মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করা হবে।

॥ ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক সত্যাদি ॥

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফ্রয়েডের উদ্বায়ু রোগে মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা পদ্ধতির ঐতিহাসিক পটভূমি ও তার বিকাশ-পর্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। মনঃসমীক্ষণ মনোবিদ্যার চিন্তাধারায় যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন, এ সম্বন্ধেও আলোকপাত করেছি। প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক নীতি ও সূত্রগুলি আড়ালে রয়ে গেছে। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গ করতে গিয়ে ফ্রয়েডের নীতিসূত্রগুলিও তার মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ঘটনাগুলোর অন্তরালেই নীতিসূত্রগুলি লুক্কায়িত থাকে।

সংক্রমণের ঘটনা ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ জগতে একটা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। সংক্রমণের ঘটনা, প্রকৃত পক্ষে মনঃসমীক্ষকের প্রতি রোগীর সদর্থক ও নঞর্থক প্রতিন্যাস (*Attitude*) যা মনঃসমীক্ষকের মনের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রতিন্যাস মনঃসমীক্ষকের উপর এসে বর্তায়। (ক) এই প্রতিন্যাস যে মূল অন্য কোন ব্যক্তি থেকে মনঃসমীক্ষকের প্রতি এসে ন্যস্ত হয়, এ ঘটনাটি অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ ; এর মধ্যেই একটা সূত্র সম্পাদন করা যেতে পারে। (খ) মুক্ত ভাবানুষঙ্গ দিতে গিয়ে ব্যক্তির যে একটা বাধো-বাধো ভাব—ব্যক্তি যে সব কিছু খুলে বলতে পারে না, এটাও একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ব্যক্তি অনেক ঘটনাকে বলতে গিয়ে তুচ্ছ ঘটনা ভেবে আর বলে না, আরও অনেক ঘটনা বলতে গিয়েও বলতে পারে না। এই বাধো-বাধো ভাব কেবল যে চেতন-মনে কাজ করে তা নয়। একটা ঘটনা হয়ত মনের কোণে ডাক দিচ্ছে, কিন্তু তাকে ভেতর থেকে মনেরই একটা অংশ যেন দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ঘটনার ঠিক ঠিক চেহারাটিও তার মনে যেন এসেও আসতে চায় না—বার বার মনের প্রান্তে আবছাভাবে এসে এসে ফিরে যায় ; অবশেষে যখন সে স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে ও পরিষ্কারভাবে মনের প্রান্তে ধরা দেয়, তখন বুঝতে হবে এ স্মৃতি মনের কোথাও লুকোনো ছিল। **এ ধরনের স্মৃতি সর্বদাই ব্যক্তির মনের কোন অংশে বর্তমান আছে।** এ থেকেও একটা সাধারণ সূত্রে আসা যায় **—নির্জ্ঞান কোন বাধা এসব অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে চেতন-মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।**

এ সব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফ্রয়েডের চিকিৎসা-সংক্রান্ত ঘটনাগুলির মধ্যেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক সূত্রগুলি বর্তমান রয়েছে। এ সব সূত্রগুলি মনঃসমীক্ষণের সময় ব্যক্তির যে আচার-আচরণ, তার যে চিন্তাস্রোত পরিলক্ষিত হয়, তার উপরেই ভিত্তি ক'রে আছে। ফ্রয়েড নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন।১—

সেইসব আচরণের বিচার-বিশ্লেষণও এমন ভাবে সাধিত হয়েছে, যা অত্যন্ত

১। The psycho-analytic theory endeavours to explain two experiences, which result in a striking unexpected manner during the attempt to trace back the

যুক্তিযুক্ত এবং মনঃসমীক্ষকও এ সকল আচরণের এরূপ ধারায় বিশ্লেষণে আপনা থেকেই এগিয়ে যান। মোটের উপর মনঃসমীক্ষণকালে যে আচার-আচরণ ব্যক্ত করে থাকে, তার অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ ফ্রয়েড করেছিলেন। তবু **এ আচরণ বিশ্লেষণ সর্বাংশে** সত্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। উদ্বায়ুরোগী এবং স্বাভাবিক **মনঃসমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তির আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েড মূল দুটি সত্যের উদ্ভাবন করেন।**

(ক) **অবদমন (Repression)**

(খ) **শৈশবকালীন যৌনতা (infantile sexuality)**

ফ্রয়েড নিজেই বলেছেন যে, অবদমনের সিদ্ধান্ত ও অবদমনবাদকে কেন্দ্র করেই মনঃসমীক্ষণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। বস্তুত এ সিদ্ধান্তটি মনঃসমীক্ষণের অপরিহার্য অঙ্গ। যখন কোন উদ্বায়ু রোগীকে সংবিষ্ট না করে মুক্ত ভাবানুষঙ্গের মাধ্যমে মনঃসমীক্ষণ করা হয়, তখন মনঃসমীক্ষক ও রোগী নীরবে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান সেই অভিজ্ঞতার আভিধানিক প্রকাশ 'অবদমন' শব্দের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। মনঃসমীক্ষণের সময় প্রত্যেকবারই এরূপ অভিজ্ঞতার উদ্ভব ঘটে। মনঃসমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে তখন একটা বাধা আসে, যে বাধা তাকে মন খুলে সব কথা বলতে দেয় না, যে বাধা স্মৃতি-উদ্ধারপথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ফ্রয়েড্ আরও একটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন—সিদ্ধান্তও বহু উদ্বায়ু রোগীর মনঃসমীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। এ সিদ্ধান্তে ফ্রয়েড্ অবশ্য কিছুদিন পরে আসেন। এ সিদ্ধান্তটি হ'ল শৈশবকালীন যৌনতা। মনঃসমীক্ষণের সময় ফ্রয়েড দেখলেন যে, অব্যবহিত অতীতের কথা বলতে বলতে শৈশবের ও অতি-শৈশবকালের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তি স্মৃতিপথে ফিরিয়ে আনতে পারে ; এ সময়ে শৈশব ও অতি-শৈশবকালীন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তির অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে ব্যক্তির কাল্পনিক অনেক অভিজ্ঞতার কথাও এসে পড়ে। মনেই যে আকাঙ্ক্ষার জন্ম, মনেই যার মৃত্যু, বাস্তব রূপায়ণের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই, এমন শৈশবকালীন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিজনিত অভিজ্ঞতাও ব্যক্তির মনে আসে। সকল আকাঙ্ক্ষার সাথে আত্মরতি সংক্রান্ত ইচ্ছার সম্পর্ক আছে। এ সব আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি এমন যে এর মধ্যে যৌনতার সম্পর্ক আছে।

---

moral symptoms of a neurotic to their source in his life history ; viz. the facts of transference and of resistance.

—Freud. S. The History of the Psycho-analytic Movement, 1917, p. 9.

পরবর্তী কালে ফ্রয়েড্-এর সত্যতা সম্বন্ধে আরও সুনিশ্চিত হন। অতি শৈশবে শিশুদের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করে ও তার যথাযথ বিশ্লেষণ করে তিনি শৈশবকালীন যৌনতা বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসেন।

অবদমন ও শৈশবকালীন যৌনতা সম্বন্ধে ফ্রয়েড্ যদিও মতবাদ এনেছেন, তবু তিনি একে বাস্তব বিবর্জিত কেবল অনুমাননির্ভর কোন সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেননি। বস্তুত এ দুটি সিদ্ধান্তই প্রত্যেক মনঃসমীক্ষকের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা গৃহীত। মনঃসমীক্ষণকালে রোগীর মুক্ত ভাবানুষঙ্গে শৈশবকালীন যৌন অভিজ্ঞতার (বাস্তব বা কাল্পনিক) প্রতিভাস মেলে। মোটামুটিভাবে এ দুটি সিদ্ধান্তকে এক করে আমরা যা পাই, তাই হ'ল ফ্রয়েড্ মনস্তত্ত্বের মূল কথা।[১]

অবদমিত শৈশবকালীন যৌনতা (Repressed Infantile sexuallty):

তিনটি শব্দ—'অবদমিত', 'শৈশবকালীন' ও 'যৌনতা—এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই তিনটি শব্দের কোনটি বাদ দিলে চলে না। **অবদমন, যৌন-ইচ্ছা'** এবং **শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা** এ তিনের তাৎপর্য সম্বন্ধেই ফ্রয়েড্ সমধিক জোর দিয়েছেন—বস্তুত ফ্রয়েডের মূল সিদ্ধান্ত এ তিনটিই।

এটা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ফ্রয়েড নিজেই বহুবার বলেছেন, তাঁর সিদ্ধান্তগুলি মানসিক জীবনের সব দিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেনি। মনোবিদ্যার অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি মনের যে দিকটাকে এড়িয়ে গিয়েছে ফ্রয়েডের

১। The theory of repression is the main pillar upon which rests the edifice of psycho-analysis. It is really the most essential part of it, and is itself nothing other than the theoretical expression of an experience which can be repeated at pleasure, whenever, one analyses a neurotic patient without the aid of hypnosis. One is then confronted with a resistance which opposes the analytic work by causing a failure of memory in order to block it...

Just such an acquisition...(a theoretical extract from very numerous experiences)...but of much later days, is the theory of the infantile sexuality...At first it was only noticed that the effect of actual impressions had to be traced back to the past...The tracks led still further back into childhood and into its earliest years...to imaginary traumas...This was soon followed by the conviction that these phantasies serve to hide the auto-erotic activities of the early years of childhood...and now the whole sexual life of the child made its appearance behind these phantasies.

Years later, my discoveries were successfully confirmed for the greater part by direct observation and analyses of children of very early years,

—Freud. Op. Cit, PP. 9-11

সিদ্ধান্ত মূলত মনের সেই দিকেই আলোকপাত করেছে। ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত প্রধানত স্বপ্ন, আপাত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি এবং বিশেষ করে উন্মায়ু রোগ সম্পর্কিত। **উন্মায়ু রোগ শৈশবকালীন যৌনেচ্ছার অবদমন থেকেই উদ্ভূত হয়। ফ্রয়েডের এটাই মূল বক্তব্য, যে বক্তব্য থেকে ফ্রয়েডের নতুন বৈপ্লবিক মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা এসেছে। শৈশবকালের অবদমিত যৌনেচ্ছা যে কেবল উন্মায়ু রোগীদের মধ্যেই থাকে তা নয়, এটা সকল ব্যক্তির মধ্যেই কম বেশী থাকে।**

ফ্রয়েড্ যে পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং যে মূল সূত্রগুলিকে তিনি সিদ্ধান্ত-করণে ব্যবহার করেছেন, সেগুলোকে পর্যালোচনা করলে নতুন মনস্তাত্ত্বিক সংব্যাখ্যান সঠিকভাবে বোঝা যেতে পারে।

মূলতঃ ফ্রয়েড্ সাঁরকোর সিদ্ধান্তকেই প্রায় মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই তিনি উন্মায়ু রোগীদের চিকিৎসা করেন ও নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। এতে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন, তাকেই ফ্রয়েড্ তাঁর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কতকগুলি নীতি-নির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত করেন ও মূল্যবান কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েড্ নতুন নতুন সিদ্ধান্ত বা অনুমানের অবতারণাতেই যেন বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন—অনুমানকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবিক জ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করায় যেন তাঁর তেমন প্রয়াস ছিল না।

ফ্রয়েড্ তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে কতকগুলি সূত্র অনুসরণ করেছেন—একটি সূত্র হল (ক) যা কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতিই মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে ধরে নিতে হবে। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ একটি বিশেষ কাজ করার স্বতঃপ্রণোদিত ইচ্ছা না থাকে, ততক্ষণ সে কাজ করা উচিত নয় বা সামাজিক দিক থেকে বিধিবহির্ভূত, এরূপ প্রশ্নই আসে না। যে দিকে যত বেশী বিধি-নিষেধ আরোপিত থাকে, সে দিকে ইচ্ছার তীক্ষ্নতা যেন তত বেশী হয়। পিতাকে হত্যা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং এ বিষয়ে দণ্ডবিধিও অত্যন্ত কঠোর। এ দণ্ডবিধির কঠোরতা থেকেই প্রতিপন্ন হয় যে, পিতাকে হত্যার এরূপ ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে মানবমনে প্রবলভাবে বিদ্যমান। অজাচার (*Incest*) অর্থাৎ নিকট আত্মীয়-আত্মীয়ার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছাও সামাজিক দিক থেকে একটা গর্হিত কাজ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। ফ্রয়েড্ মনে করেন যে, ব্যক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব তীক্ষ্নভাবে রয়েছে, এবং এইজন্যেই একে রোধ করার জন্য সমাজে শাস্তির ভয় ও নিয়ম-মানা। মনের কোণে আদিম লুক্কায়িত ইচ্ছার অস্তিত্ব এইভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে এবং এইভাবেই গভীর মনের মনস্তত্ত্বের সূচনা হয়।

ফ্রয়েডের আরও একটা নীতিসূত্র আছে, যা তাঁকে সিদ্ধান্ত-নিরূপণে অনুপ্রাণিত করেছে। এ নীতিসূত্রটি হ'ল এই যে, মানুষ যাকে ভয় করে, তাকে বোধ হয় প্রত্যাশাও করে। কাউকে ভয় পাওয়া যেন তাকে পেতে চাওয়ারই নামান্তর। দুঃখকে ও আঘাতকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ আছে, কিন্তু অনেক সময় সভ্যজীবনে মানুষের মধ্যে যে ধরনের ভয় দেখতে পাওয়া যায়, তা অদ্ভুত। বিশেষ করে উদ্বায়ু রোগীদের ক্ষেত্রে যে সব ভয় দেখা যায়, তারা আরও অদ্ভুত। আচরণবাদীরা এরূপ ভয়কে হয়তো বলবেন সাপেক্ষ প্রত্যাবর্ত ভয় (*Conditioned fear*)। কিন্তু ফ্রয়েড্ মনে করেন যে, এ ভয় আর কিছুই নয় সামাজিক ও আত্মিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়, এমন ইচ্ছাকে ঢেকে রাখার জন্যই ভয়ের অবতারণা। ঠিক সেইরকম কোন ব্যক্তির অত্যধিক কল্যাণ-কামনাতে, অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানোর মধ্যে নির্জ্ঞান মনে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ ও তার ক্ষতি করার ইচ্ছাই লুক্কায়িতভাবে কাজ করে।

ফ্রয়েডের মূল সিদ্ধান্তঃ প্রেষণা (Motivation) ও গূঢ়ৈষা (Complex)ঃ

মনঃসমীক্ষণ মতবাদের মূল ভিত্তিঃ

ফ্রয়েডের সমস্ত চিন্তাধারার পশ্চাতে মূল কয়েকটি সিদ্ধান্ত কাজ করেছে—এ সিদ্ধান্তগুলি থেকেই অন্যান্য ধারণাগুলো এসেছে। যদিও ফ্রয়েড্ নিজে 'অবদমনের' সিদ্ধান্তকেই এক জায়গায় মনঃসমীক্ষণের মূল চিন্তা-ভিত্তি বলেছিলেন, তবু তিনিই নির্জ্ঞান মনের ধারণাকে (যে নির্জ্ঞান মনের উৎপত্তি হয় অবদমন প্রক্রিয়া থেকে), মনঃসমীক্ষণ মতবাদ বা গহন মনে মনস্তত্ত্বের মূল ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন।

তাঁর প্রধান যে সিদ্ধান্ত তা হ'ল এই যে, প্রত্যেকটি চিন্তা, আচার-আচরণ, গতি, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার মানসেই সর্বদা আমাদের কর্মপ্রয়াস। সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কখনো-বা আমরা চেতন, কখনো-বা আমরা চেতন থাকি না। প্রত্যক্ষভাবে ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঐচ্ছিক (*Voluntary*) যে ক্রিয়াকর্ম সেগুলো যেরূপ ব্যক্তির কোন-না-কোন ইচ্ছার পূরণ ঘটাচ্ছে, ঠিক তেমনি অনৈচ্ছিক (*involuntary*), হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া কোন ক্রিয়া কর্ম (*Accident Psychology of error*), এমন কি ঐ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সব ক্রিয়াকর্ম ঘটে যায়, তার মধ্য দিয়েও কোন-না-কোন ইচ্ছা পূরণ হয়। উদ্বায়ু

রোগের কারণ বিশ্লেষণে ফ্রয়েড্ এইরূপ মতের অবতারণা করছেন। ম্যাকডুগালও (*McDougall*) বলছেন যে, পূর্বসূরীদের সাথে ফ্রয়েড উদ্বায়ু রোগের কারণ নির্ণয়ে একমত হতে পারেননি। ফ্রয়েড্ উদ্বায়ু রোগের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রেষণার (*Motivation*) কথা তুলেছেন। ফ্রয়েডের পূর্বসূরী, এমন কি জ্যানে (*Janet*) উদ্বায়ুরোগ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এ রোগের উৎপত্তির হয় ব্যক্তির মানসিক দুর্বলতা থেকে। কিন্তু ফ্রয়েড্ বললেন যে, উদ্বায়ু রোগের উৎপত্তি হয় যৌনজ বাসনা ও তার অবদমন থেকে। উদ্বায়ু রোগ সংলক্ষণ কেবল মানসিক দুর্বলতার প্রকাশ নয়, বরং সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণের ভঙ্গিমা। বস্তুত ফ্রয়েড্ বলেছেন যে, মানসিক দিক থেকে ব্যক্তি যদি ভয় (*Phobia*) বা অসাড়তা (*Paralysis*) সজ্ঞানে নাও চায়, নির্জ্ঞানভাবে নিশ্চয়ই সে এগুলো চায়। ফ্রয়েডের মতে সকল কর্মপ্রয়াসই হয় প্রত্যক্ষভাবে, নয় পরোক্ষভাবে আপন ইচ্ছা-পূরণের পথ মাত্র।

শারীরিক দিক থেকে কোন বিকৃতি বা বিচ্যুতি না থাকা সত্ত্বেও, কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি অন্ধতা, বধিরতা বা আর কোন অঙ্গের আড়ষ্টতা দেখা যায়, তা হলে তা মানসিক ক্রিয়া-বৈকল্যের জন্য হয়েছে বুঝতে হবে। ফ্রয়েডের মতে এরূপ দৈহিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার কোন ইচ্ছারই পূরণ করছে। এটা শুনতে কি রকম আশ্চর্য বোধ হয়। ইচ্ছা করেও কোন ব্যক্তি এমন আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে, অন্ধ হয়ে যেতে পারে, বধির হয়ে যেতে পারে। এ ইচ্ছা আবার কি রকমের ইচ্ছা। —এ ইচ্ছার দ্বারা কোন্ গভীর ইচ্ছারই বা পূরণ হয়? এরকম নানা প্রশ্নই মনে উদিত হতে পারে। জ্যানের মতে মানসিক শক্তি স্বল্পতার জন্যই এরকমটা হয়ে থাকে —চেতনার বিচ্ছিন্নতা (*Splitting of Consciousness*) থেকে এরকম হয়ে থাকে। চোখ বা পা'র সাথে যদি আবেগগত কোন দুঃসহ আঘাতের সংযোগ ঘটে ও ব্যক্তি যদি আপন অস্তিত্বের স্বাভাবিক মানসিক স্রোতোধারার সাথে এ আঘাতের সঙ্গতি রেখে চলতে না পারে, তাহলে এ অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির মূল-অভিজ্ঞতার স্রোত থেকে দূরে সরে যায়। ফ্রয়েড্ এ সব সংলক্ষণের ভিন্ন ধারায় ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর মতে, আড়ষ্টতা বা অন্ধতা ব্যক্তির কোন জটিল অবস্থাকে এড়িয়ে যাবার একটা প্রয়াস হতে পারে; 'একবার অক্ষম বা আড়ষ্ট হয়ে গেছি' প্রতিপন্ন করতে পারলে কোন দায় দায়িত্ব তাকে আর ধরতে পারে না। ফ্রয়েড অবশ্য অতটা সোজাসুজি ব্যাখ্যা দেননি। তিনি একটি যুবতীর পা'র আড়ষ্টতার প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরলেন। হিস্টিরিয়ার ফলে যুবতীর একটি পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির বাবা অনেকদিন ধরে অসুখে ভুগছিলেন। বছর দুই আগে মেয়েটি তার

বাবার অনেক দিন ধরে অত্যন্ত যত্নের সাথে শুশ্রূষা করেন। সে তার বাবাকে বিছানা থেকে তুলে নেওয়ার জন্য তার পা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করত। সেই সময়ে মেয়েটি কোন একজন যুবকের সাথে প্রেম-সূত্রে জড়িয়ে পড়েছিল এবং বিয়েরও প্রায় সব ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে বাবার অসুখে তার সব পণ্ড হয়ে গেল। মেয়েটি তার বাবার প্রতি একান্ত অনুগত হয়েও না ভেবে পারছিল না যে, এ রোগ কোন-না কোন ভাবে শেষ হবেই। চিন্তার মধ্যে পিতার মৃত্যু-কামনাও কি ছিল? এরকম ইচ্ছা মনে উঁকি মারার সাথে সাথেই সে ইচ্ছার চেহারা দেখে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে মন থেকে সজোরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। সে যেন এ ইচ্ছা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল—সে এ ইচ্ছার 'অবদমন' করল। কিন্তু নির্জ্ঞান মনে এ ইচ্ছা তার শক্তি নিয়ে কাজ করে যেতে থাকল। মন থেকে মুছে ফেললেও ইচ্ছা মন থেকে মুছে যায় না। মনের এক কোণ থেকে আর এক গহন কোণে গিয়ে বাসা বাঁধে, আর সেখান থেকেই সে ইচ্ছা তার সকল শক্তি দিয়ে চরিতার্থ হতে চায়। মেয়েটির ক্ষেত্রে তার অবদমিত ইচ্ছা চরিতার্থ হতে চাইল তার পা-এর আড়ষ্টতার মধ্য দিয়ে। ফ্রয়েড্ এ প্রতিক্রিয়ার নামকরণ করলেন বিপরিণাম (*Conversion*)। 'বিপরিণাম' নাম দিলেন এইজন্য যে, নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাই এখানে শারীরিক রোগ-লক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। এ নির্জ্ঞান ইচ্ছার মধ্যেও একটা শক্তি থাকে—অবদমিত হলে ইচ্ছার এ শক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যেহেতু এ ইচ্ছা সরাসরি চরিতার্থ হতে পারে না, বিকৃত উপায়ে অভিশান্ত হয়ে (*Displaced*) এ ইচ্ছা তার মুক্তির পথ খোঁজে। **ফ্রয়েড্ মানসিক রোগের কারণকে প্রেষণা, নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা ও ইচ্ছার অবদমন-প্রক্রিয়ার** মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড্ প্রেষণার অবতারণা করেছেন, অর্থাৎ মানসিক রোগে যে বিকৃতি আপাত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচার-আচরণ পরিলক্ষিত হয় তার পেছনেও ব্যক্তির গভীর মনে কোন ইচ্ছা কাজ করে। ব্যক্তির ইচ্ছা ভিন্ন কিছু সংঘটিত হয় না —ব্যক্তির ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটে। কখনো ব্যক্তি সে সম্বন্ধে অবহিত, কখনো-বা অনবহিত থাকে।

মানুষ যে ভুলভ্রান্তি করে, তার ব্যাখ্যাও ফ্রয়েড্ এ সিদ্ধান্ত দিয়েই করেছেন। কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে যে ভুল করে, সে মনে করে, অন্যান্য ব্যক্তিরাও মনে করেন যে, এটা হঠাৎ হয়ে গেল। এটা একটা আকস্মিক ঘটনা। এর কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। ফ্রয়েডের পূর্বে এরূপ ধারণা ছিল যে, "কাজের ভুল ভ্রান্তির" মত "কথার ভুল", "লেখার

ভুল" মনোবিদ্যার দিক থেকে মূল্যহীন। ফ্রয়েড্ প্রথম এদিক বিচার-বিশ্লেষণে মনোযোগ দিলেন—তিনি বললেন যে, এসব তথাকথিত ভুলভ্রান্তির পিছনে ব্যক্তির নির্জ্ঞান মন (*Unconscious mind*) কাজ করে। নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাতেই এ সব আপাত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তিগুলি হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে ফ্রয়েড্ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেন। এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বলেছেন—"আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ যদি মারা যাই, তা হলে আমি কিন্তু পারীশহরে গিয়ে বসবাস করব।" মন্তব্যটি একটু ভাল করে খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, ব্যক্তির স্ত্রী সম্বন্ধে প্রকৃত মনোভাবটি কি প্রকারের। ব্যক্তি তার স্ত্রীর মৃত্যুকামনা করছে—নির্জ্ঞান মনে তার এ ইচ্ছাটি কাজ করছে। হঠাৎ সে ইচ্ছার প্রকাশ হয়ে পড়ল তার এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একজন মহিলা বলেছেন, "আমার স্বামী যা ভাল লাগে তাই খেতে পারেন"। চিকিৎসক প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বলেছিলেন যে, তাঁর স্বামীর যা ভাল লাগে তাই খেতে পারেন। কিন্তু স্ত্রী ভুল করে তাঁর স্বামীর ওপর নিজের প্রভুত্বটিকে এই ভুলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে ফেললেন।

লেখার সময় যে সব ভুল-ভ্রান্তি ঘটে, তার ব্যাখ্যাও ফ্রয়েড অনুরূপ ভাবেই দিয়েছেন। যেখানে প্রক্ষোভের পটভূমি রয়েছে, সেখানেই এরূপ ভুলভ্রান্তি ঘটে যেতে পারে। এইসব ছোটখাট ভুলভ্রান্তির এমনি যে খুব একটা তাৎপর্য আছে তা নয়, কিন্তু ফ্রয়েড্ বলেছেন যে, এইসব ভুলভ্রান্তিতে নির্জ্ঞান মন যেভাবে কাজ করে, যে মানস প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়, মানসিক রোগ ও স্বপ্নেও একই প্রকারের মানস প্রক্রিয়া কাজ করে। এই এ ই প্রক্রিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপের ক্ষেত্রেও প্রকটিত হয়। নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যে যে কৌশলে প্রকাশিত হয়, সেই সেই কৌশলেই ব্যঙ্গবিদ্রূপের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। সংকোচন (*Condinsation*) হল সুপ্ত নির্জ্ঞান ইচ্ছাকে (*Latent content* প্রস্ফুটনের (*manifest content*) কৌশল প্রক্রিয়া। বিদ্রূপেও এর নজির দেখা যায়। স্বপ্নের মত, বিদ্রূপেও বিক্ষেপণের (*Displacement*) প্রক্রিয়া কাজ করে। বিক্ষেপণের ফলে আসল নকল, আর নকলটি আসল হয়ে যায়। যেমন এক ব্যক্তি একটা দুর্ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বললে, "গাড়ীর চালকটির ভাগ্য অত্যন্ত খারাপ ; দুর্ঘটনায় কেবল তার স্ত্রীপুত্রই মারা গেছে তা নয়, তার ঘড়িটি পর্যন্ত ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে।" এতে ঘড়িটির দাম স্ত্রীপুত্রের জীবন থেকে বেশী দাম পেয়ে গেছে—এতে ব্যক্তির নির্জ্ঞান ইচ্ছাই প্রকটিত হয়েছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপের সময় সর্বদাই নির্জ্ঞান মনের কোন ইচ্ছা চরিতার্থ হবার প্রয়াস করে। কিন্তু সে ইচ্ছা ঠিক তার রূপ নিয়ে আসে না—আসতে পারে না। নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাকে সজ্ঞান

(*conscious*) মনে আসতে দেওয়ার জন্য প্রতিবন্ধ (*Resistance*) কাজ করে। এ প্রতিবন্ধ নির্জ্ঞান মনের মধ্যে রয়েছে। এই প্রতিবন্ধকে এড়াবার কৌশলের জন্যই স্বপ্নে, ভুল-ভ্রান্তিতে, ব্যঙ্গবিদ্রূপে, মানসিক রোগ সংলক্ষণে, প্রকৃত নির্জ্ঞান অবদমিত ইচ্ছারা অন্য কৌশলে ও উপায়ে প্রকাশিত হয়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একবার মুসোলিনী তাঁর সমর-শক্তিকে আরও বলশালী করার জন্য একজন প্রখ্যাত রসায়নবিদ্‌কে ডেকে পাঠালেন। সে বৈজ্ঞানিকটি মুসোলিনীর গৃহে যাওয়ার সময় পথের দুদিকে মুসোলিনীর ছবি সারে সারে টাঙ্গানো রয়েছে দেখলেন। তিনি পথের সব লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে, মুসোলিনী তাদের কাছে খুব ভয়ের পাত্র। অবশেষে তিনি মুসোলিনী প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। প্রাসাদের অবসর-কক্ষে বসে তিনি মুসোলিনীর নানা ভঙ্গিমার প্রতিকৃতি সংবাদপত্রে দেখতে পেলেন। অবশেষে মুসোলিনীর ঘরে রসায়ন-বিদের ডাক পড়ল। প্রাসাদের এ-ঘর ও-ঘর পেরিয়ে তিনি মুসোলিনীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুসোলিনী তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একেবারে উদাসীন রইলেন। অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতিকে তিনি খেয়ালের মধ্যেই আনতে পারলেন না। রসায়নবিদ্‌কে দেখে হঠাৎ মুসোলিনী মুখ তুলে তাকালেন ; তারপর প্রশ্ন করলেন, "বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সবচেয়ে মারাত্মক গ্যাস কি?" রসায়নবিদ্ কিছুক্ষণ নীরব থেকে উত্তর দিলেন ***"Incense"*** (***Incense***-এর মানে সুগন্ধি-ধূপ ও রেগে আগুন হওয়া দুইই হয়)।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে যে, রসায়নবিদের মুসোলিনীর নিষেধ অমান্য করার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে। এতক্ষণ তাঁকে বসিয়ে রাখা, তাঁকে কোন প্রকার আমল না দিয়ে কথা বলার জন্য মুসোলিনী প্রতি তাঁর যে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, সেটি সরাসরি প্রকাশ করার ক্ষমতা রসায়নবিদের ছিল না—সেইজন্য তিনি তাঁর ইচ্ছাটিকে অন্যপথে প্রকাশ করলেন। *Incense* শব্দটি ব্যবহার করে একাধারে তিনি মুসোলিনীকে ভক্তি ও আনুগত্য দেখালেন, অন্যদিকে ভর্ৎসনা করলেন। রসায়নবিদের অবদমিত ইচ্ছাটি সামাজিক ও প্রকাশযোগ্য উপায়ে চরিতার্থ হল। এইসব ঠাট্টা-বিদ্রূপ যত মার্জিত হয়, তার কৌশল-প্রণালীও তত কঠিন হয়।

স্বপ্নই হোক, তথাকথিত ভুল-ভ্রান্তি, বিদ্রূপ, রোগ-লক্ষণ সবই ফ্রয়েডের মতে কার্য-কারণ সম্পর্কিত। হঠাৎ কিছু ঘটে না, বাস্তব জগতে যেমন সব-কিছুর মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, মনের জগতেও এই কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। ***Psycho-pathology of Everyday Life*** নামক গ্রন্থে ফ্রয়েড্ এ সম্পর্কে বিশদ

আলোচনা করেছেন। ভুলভ্রান্তি, বিদ্রূপ প্রভৃতির 'ইচ্ছাকৃত' কারণের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। পূর্বের মনোবিদ্‌রাও কথা ভুল করা, লেখায় ভুল করাকে 'হঠাৎ' ছেড়ে যাওয়া, একটা আর একটার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, এক কথার পরিবর্তে আর একটি কথায় চলে আসা এবং মস্তিষ্কে অনুষঙ্গ-বন্ধ (*Associative bond*) শিথিল হয়ে যাওয়া প্রভৃতির অবতারণা করে ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েড্ এখানে একটা প্রশ্ন রেখেছেন। এ সব ভুল-ভ্রান্তি সব সময় হয় না কেন? কেনই বা এরা বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঘটে থাকে? ফ্রয়েড্ বললেন যে, তাঁর পূর্বসূরীরা এ সব ভুল-ভ্রান্তিকে নিছকই দৈব বলে ধরে নিয়েছেন, ভেবে নিয়েছেন যে এর কোন কারণ নেই। কিন্তু ফ্রয়েড বললেন যে, মানসিক জগতেও বাহিরের জগতের মতই প্রত্যেকটি ঘটনার একটি কারণ আছে, প্রত্যেকটি আচরণের পিছনে একটি কারণ থাকে। তিনি বহু ঘটনা বিশ্লেষণ করে ভুল-ভ্রান্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, প্রত্যেকটি তথাকথিত ভুল, ভুলে যাওয়ার পিছনে ব্যক্তির কোন ইচ্ছা পূরণের প্রয়াস থাকে।

ফ্রয়েডের নিজের জীবনের একটি ঘটনা। মনঃসমীক্ষকের জীবনের প্রথম দিকে তার চিকিৎসাধীন বিশেষ কোন একজন রোগীর নাম তিনি ভুলে গিয়েছিলেন—বহু চেষ্টা করেও তিনি তার নাম মনে আনতে পারতেন না। সে রোগীটিকে কিন্তু ফ্রয়েড্ বহুকাল চিকিৎসা করছেন—এ সত্ত্বেও তিনি রোগীটির নাম ভুলে গিয়েছিলেন। এ রকম ভুলে-যাওয়াটা ফ্রয়েডের কাছে খুব আশ্চর্য ঠেকল। পরে তিনি দেখলেন যে, রোগীটির সম্বন্ধে একটা মস্ত ভুল তিনি করে ফেলেছিলেন। রোগীটি যখন সত্যি সত্যি পেটের ঘা'র অসুখে ভুগছিলেন, তখন তাঁকে উন্মায়ু রোগে ভুগছিলেন বলে ফ্রয়েড্ সাব্যস্ত করে বসেছিলেন। এ রকম মারাত্মক ভুল ফ্রয়েড্ তাঁর মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছেন এবং সেই জন্যই তিনি কি তার রোগীটির নাম ভুলে গিয়েছিলেন? ফ্রয়েড্ বলেছেন যে, এরকম ভুলে যাওয়ার পিছনে সর্বদাই একটা ইচ্ছা কাজ করে। ফ্রয়েড্ অবশ্য একথা বলেননি যে, আমাদের সব ভুলে-যাওয়ার পিছনেই কেবল এ রকম প্রক্রিয়াই কাজ করে। তবে তিনি বলেছেন যে, যা কিছু আমরা জানি, যা কিছু একবার আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে, তার সবটা কোনক্রমেই আমাদের মন থেকে একেবারে মুছে যায় না; এরা এমন ভাবে মনের গহনে নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত থাকে যে ইচ্ছা করলেও এদের আর মনের চেতন কোণে ফিরিয়ে আনা যায় না।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ঃ

ফ্রয়েড্ তাঁর "*The Interpretation of dreams*" গ্রন্থে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের পদ্ধতি

সম্বন্ধে, স্বপ্নের সাথে ব্যক্তির মানসিক যোগসূত্র কোথায়, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের গতি-প্রকৃতি কি ভাবে জানা যায় এ সকল বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পূর্বে স্বপ্ন সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, স্বপ্ন ভবিষ্যতের নিশানা দেয়। কিন্তু ফ্রয়েড্ বললেন, স্বপ্ন ব্যক্তির অতীতকে উন্মীলিত করে। পূর্বের মনোবিদ্‌রা স্বপ্নকে কতকগুলি ছিন্ন অনুষঙ্গের বিকৃত অনুলিপি বলে মনে করতেন। তাঁরা বস্তুত কোন ব্যক্তি বিশেষ ধরনের স্বপ্ন দেখে কেন, বা কোন ব্যক্তি 'ক' না দেখে 'খ' দেখল কেন, এ সব প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনাই করেননি, এ সব ব্যাপারকে তাঁরা আকস্মিকতার উপর ছেড়ে দিতেন। কিন্তু ফ্রয়েড এদের ব্যাখ্যা অন্য পটভূমি থেকে দিলেন। শিশুরা তাদের জাগ্রত অবস্থায় যা চেয়ে পায় না, সেইটিকেই স্বপ্নে দেখে। জাগ্রত অবস্থায় তাদের আকাঙ্ক্ষার রূপই স্বপ্নের মধ্যে ফুটে ওঠে। বড়দের ক্ষেত্রেও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অতৃপ্ত অবদমিত ইচ্ছার পরিপূরণ ঘটে ; কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে যেরকম অতৃপ্ত বাসনা স্পষ্ট ও সোজাসুজিভাবে স্বপ্নে প্রতীত হয়, বড়দের বেলায় আকাঙ্ক্ষাটি এমন আড়ালে আবডালে থাকে যে, স্বপ্ন থেকে সে বাসনাটিকে চেনা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রকার প্রতীকের মাধ্যমে অবদমিত ইচ্ছাটি স্বপ্নের মধ্যে চরিতার্থ হতে চায়। ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে তার ইচ্ছা-পূরণ ঘটায়। নানাপ্রকার অসামাজিক ইচ্ছা স্বপ্নে চরিতার্থ হওয়ার প্রয়াস করে। নিদ্রাকালে মনের প্রহরী (*Censor*) কিঞ্চিৎ অসতর্ক হয়ে পড়ে, সেই অবকাশে অবদমিত ইচ্ছা ছদ্মবেশে ও প্রতীকের সাহায্যে সজ্ঞানে এসে উপস্থিত হয়। **আমাদের যে সকল বাসনা পূর্ণ হয়নি বা যাদের পূর্ণ হবার পথে বাধা আছে, সেই সব ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ইচ্ছা বা চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকলে মনে যে অশান্তির উদয় হয়, স্বপ্নে কল্পনায় সাহায্যে তারই শান্তি হয়। মনের অশান্তি দূর করে বলে স্বপ্ন নিদ্রায় সহায়। ফ্রয়েড্ তাই স্বপ্নকে gua:dian of sle+p বা নিদ্রারক্ষক বলেছেন।** সাধারণের ধারণা, স্বপ্ন দেখলে নিদ্রায় ব্যাঘাত হয়, কিন্তু ফ্রয়েডের মত ঠিক বিপরীত। তিনি বলেন, "নিদ্রার বিঘ্ন হলে স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, আর এই স্বপ্ন দেখার ফলে নিদ্রা অনেক স্থলে সম্ভব হয় " স্বপ্নে ব্যক্তি যা দেখে, (*Manifest content* সেটা আসলে, ব্যক্তির যে অবদমিত নির্জ্ঞান বাসনা (*Latent content*), তার ই ছদ্মবেশী প্রতিফলন। স্বপ্নের স্ফুট অংশের (*Manifest content*) মুক্ত-ভাবানুষঙ্গের মধ্য দিয়ে অস্ফুট অতৃপ্ত ইচ্ছাটির স্বরূপ আবিষ্কার করা যায়। স্বপ্নের কোরকে যে অবদমিত ইচ্ছাটি থাকে তা যদি সরাসরি সজ্ঞানে আসে, তা হলে সেটা ব্যক্তির কাছে ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক করে। যে মুহূর্তে এ ইচ্ছা সজ্ঞানে আসার প্রয়াস করে, নির্জ্ঞান মনস্থিত প্রহরী

(*Censor*) একে প্রতিহত করে এবং পুনরায় নির্জ্ঞানে ফিরিয়ে দেয়। নিদ্রাকালে অস্ফুট বাসনার সজ্ঞানে আসার সুযোগ বেশী ঘটে, কেন না চেতন মন তখন ততটা সক্রিয় থাকে না। নির্জ্ঞান মন যতটা সক্রিয় থাকে (*Eudo psychic process*) ততটাই অস্ফুট বাসনার সজ্ঞানে আগমনকে বাধা দেয় এবং ছদ্মবেশে প্রহরীকে (*Censor*) ফাঁকি দিয়ে সজ্ঞানে আসে।

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব থেকেও দেখছি যে, ফ্রয়েড্ স্বপ্ন বিশ্লেষণে প্রেরণার কথা এনেছেন। স্বপ্নের সাথে ব্যক্তির ইচ্ছার (নির্জ্ঞান অবদমিত) সম্পর্ক রয়েছে। পরীক্ষণপদ্ধতি-ভিত্তিক মনস্তত্ত্বের দ্বারা মনোবিদ্‌রা যে ভাবে স্মৃতি, স্বপ্ন, চিন্তন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, ফ্রয়েডের নিকট তার তেমন বৈজ্ঞানিক মূল্য ছিল না। তিনি দেখলেন যে, এঁদের যা সিদ্ধান্ত তাতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, মানসিক ঘটনা যেন হঠাৎ খেয়ালখুশীমত যথানির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ঘটে যায়। ফ্রয়েডের এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, পরীক্ষণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী মনোবিদ্‌রাও মানসিক ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতেই চেয়েছিলেন। ফ্রয়েডের ক্ষেত্রে যেটা নতুন দিক সেটা হ'ল এই যে, তিনি কারণ বলতে মানসিক দিক থেকে সর্বদাই একটা 'ইচ্ছা'কে মনে করেছেন। তাঁর মতে, **মানসিক পর্যায়ে যা ঘটে, তার কারণ সর্বদাই মানসিক এবং মানসিক কারণ বলতে ফ্রয়েড্ সর্বদাই ইচ্ছা বা প্রেষণা বুঝিয়েছেন।** মস্তিষ্কের জৈবিক (*Physiological*) কার্যকারিতা দিয়ে কিংবা কেবল অনুবন্ধ অনুষঙ্গ (*Association*) দিয়ে সকল মানসিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসের মধ্যে যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক কারণটিকেই বাদ দেওয়া হয়। তাঁর মতে, স্বপ্ন বা ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে মানসিক ক্রিয়া। এর মধ্য দিয়েও নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছার চরিতার্থতা ঘটে, যেমনটি ঐচ্ছিক কার্যে (*Voluntary action*) ইচ্ছার চরিতার্থতা ঘটে।

অতএব, আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ফ্রয়েড্ যদিও বলেছেন যে, 'অবদমনই' তাঁর মৌল মতবাদ, যাকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্য মতামত শাখায়িত হয়েছে; তবু দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মানসিক কার্যেরই মানসিক একটি কারণ আছে। এই বক্তব্যের উপরই ফ্রয়েড্ জোর দিয়েছেন বেশী। প্রত্যেক মানসিক কার্যই প্রেষণা-প্রসূত কোন ইচ্ছার দ্বারা উৎসারিত—এই সিদ্ধান্তগুলি যেন ফ্রয়েডের কাছে আরও বেশী গুরুত্ব পেয়েছে।

অবদমন ঃ

মনঃসমীক্ষণের সময়, মনঃসমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে যে বাধো-বাধো ভাব কাজ

করে, মনের কথা খুলে বলতে গিয়ে সে যে ভিতরের বাধা ও ভয় অনুভব করে (*Resistance*), সেই ঘটনার প্রকাশই 'অবদমন' শব্দটির মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। ব্যক্তি অনেক কথা এই সময়ে বলতে গিয়ে বলতে পারে না, অতীতের অনেক কথা মনে করেও মনে করতে পারে না। অন্যান্য মনোবিদ্‌গণ একে মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ (*Associative*) প্রক্রিয়ায় কোন প্রতিবন্ধের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। ফ্রয়েড্‌ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন। ফ্রয়েডের মতে, অতীতের কিছু কিছু মনে করতে না পারাটা ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—প্রেষণাবদ্ধ। এরূপ মনে করতে না পারার ঘটনাই 'প্রতিবন্ধ' (*Resistance*), আর প্রতিবন্ধ থাকা মানেই পূর্বের কোন ইচ্ছার অবদমনের ইঙ্গিত।

অতীত অভিজ্ঞতা—শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার গুরুত্বঃ

ফ্রয়েডের আরও একটি মূল সিদ্ধান্ত এই যে, মানসিক রোগের কারণ অর্থাৎ 'ইচ্ছা'র সূত্রগুলি অতীতের ঘটনার মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে—এমন কি, স্বপ্ন, বিদ্রূপ বা কোন ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে যে **ইচ্ছার পূরণ প্রয়াস** ব্যক্ত হয়ে থাকে, সেটাও **অতীতের কোন ইচ্ছা**। এই সূত্রকে ধরেই ফ্রয়েড্‌ অব্যবহিত অতীত থেকে শৈশবজীবনের অভিজ্ঞতায় চলে যান। এতে ভাববার মত নতুন কি আছে? প্রত্যেকেই এটা জানেন যে, বর্তমান সর্বদাই অতীতের অভিজ্ঞতা ও কর্মের ফলশ্রুতি। ফ্রয়েডের এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ ও ভিন্নতর। তিনি বলছেন, যা অতীতে ঘটে তার একটা নিষ্ক্রিয় ছাপই যে কেবল মনের মধ্যে থাকে তা নয়, সে অভিজ্ঞতা সক্রিয় থাকে এবং স্বপ্নের অস্ফুট অংশের মধ্য দিয়ে ও অন্য উপায়ে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি এ থেকে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ইচ্ছার মৃত্যু হয় না। কোন ইচ্ছা যদি একবার সক্রিয় হয়, তা হলে পরবর্তী কালে সেই ইচ্ছা ব্যক্তির মনের মধ্যে অগোচরে কাজ করে যেতে থাকে।

মনঃসমীক্ষণে সংক্রমণের (*Transference*) ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, রোগীর মনঃসমীক্ষকের প্রতি সদর্থক (*Positive*) বা নঞর্থক (*Negative*) প্রক্ষোভগত প্রতিন্যাসই সংক্রমণ। ফ্রয়েডের কাছে এ সংক্রমণের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। অতীতের ইচ্ছা মরে যায় না। এ ইচ্ছার মধ্যে শৈশবকালের ইচ্ছাগুলিও থাকে। শৈশবকালীন ইচ্ছাগুলি, সংক্রমণের (*Transference*) সময় সক্রিয় হয়ে ওঠার একটা উপযুক্ত অবস্থা ফিরে পায়। মনঃসমীক্ষকের প্রতি ব্যক্তির যে প্রক্ষোভগত ভাব, তার মধ্যে একটা অসহায় নির্ভরশীলতার ভাব কাজ করে। বস্তুত

মনঃসমীক্ষকের মধ্যে সে তার শৈশবকালীন ইচ্ছা (যে ইচ্ছারা শৈশবকাল থেকে এখন পর্যন্ত ব্যক্তির মধ্যে ভিতরে ভিতরে অগোচরে সক্রিয় ছিল) চরিতার্থ করার একটা অবকাশ যেন পায়। মনঃসমীক্ষকের মধ্যে ব্যক্তি তার শৈশবকালের পিতাকে দেখতে চায়, দেখতে পায়। এ সময়ে 'পিতৃ-সম' মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করে তার অনেক শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে, শৈশবকালীন অনেক পুঞ্জীভূত আবেগের প্রকাশ ঘটে।

এ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, মনঃসমীক্ষণের সংক্রমণের ঘটনাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে এটা মেনে নিতে হয় যে, কতকগুলি ইচ্ছা ও অবস্থার কথা ব্যক্তির মনে সর্বদা সক্রিয় থাকে—সে ইচ্ছা যত অতীতেরই হোক, তা মরে যায় না। (*Psycho-Dynamics of the Unconscious*)।

ব্যক্তির সহজাত দ্বৈতভা (Assumption of the Inherent dualism of Individual)

'অবদমিত', 'শৈশবকালীন', 'যৌনতা'—এই শব্দ তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মূল তিনটি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয়েছে। অবদমনের ধারণার অন্তরালে সর্বজনীনভাবে ইচ্ছার নিয়ত অলক্ষ্য সক্রিয়তার ধারণা রয়েছে। ফ্রয়েড্ শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার কার্যকারিতার অবতারণা করে ইচ্ছার নিয়ত সক্রিয়তা, অবদমন ও তজ্জনিত গূঢ়ৈষা বা মানসিক জটের প্রসঙ্গ এনেছেন।

শৈশবকালীন যৌনতা বলতে বস্তুত ফ্রয়েড্ কি বলতে চেয়েছেন? আঙ্গুল চোষার মধ্য দিয়ে শিশু 'যৌন সুখ' আহরণ করে, এরূপ ফ্রয়েড্ বলেছেন। শিশু যে ভাবে মাতৃস্তন কামড়ায় এবং তাকে মুখের মধ্যে নিয়ে যায়, তার প্রত্যেকটি ক্রিয়ার মধ্যেই 'যৌন সুখ' আহরণের প্রয়াস রয়েছে। মলমূত্র পরিত্যাগ করা ও সারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত হওয়ার মধ্য দিয়েও শিশুর 'কাম-পিপাসা' পরিতৃপ্ত হয়। ফ্রয়েডের মতে, শিশুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা কিছু দেহগত সংবেদনিক (*Sensuous*) সুখ দেয়, তার মধ্যেই 'যৌন-সুখ' থাকে। পরবর্তী জীবন-অধ্যায়ে ব্যক্তির যে কোন ভালবাসা-বন্ধুত্ব, শিল্প ও সংগীতপ্রীতি সবকিছুর মধ্যেই ফ্রয়েডের মতে 'যৌন-সুখ' নিহিত থাকে। যা কিছু করতে আমরা ভালবাসি সব কিছুর মূলেই রয়েছে কামাবেগ (*Sex-impulse*)। বৃহত্তরভাবে ফ্রয়েড্ যৌনতাকে 'ভালবাসা'র সমার্থক বলে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েড্ বলেছেন যে, ভালবাসা যৌনতা-বিবর্জিত কিছু এরূপ ভাবা চলে না। স্নেহ-ভালবাসা বস্তুতই 'যৌনমূলক', সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আঙ্গুল চোষাও তাকে স্বল্প পরিসরে

যৌন সুখ দিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের যৌনতার ধারণা একদিকে ঘনিষ্ঠভাবে যৌনোৎসারিত অথচ বৃহত্তর তাৎপর্যমণ্ডিত—এর মধ্যে তিনি কোন স্ববিরোধিতা খুঁজে পাননি।

ফ্রয়েড্ দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির মানসিক জীবনে একটা দ্বৈততা আছে। মানুষের মনের তিনি দুটি স্তরের কথা বলেছেন—চেতন (*Conscious* ও নির্জ্ঞান (*Unconscious*)। তিনি মনের প্রাক্‌চেতন (*Freconscions*) অংশের কথাও বলেছেন। প্রাক্‌চেতন চেতন মনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাক্‌চেতন মনের অভিজ্ঞতাকে চেতন মনে ইচ্ছা করলেই ফিরিয়ে আনা যায়, যদিও প্রাক্‌চেতন মনের অভিজ্ঞতা ঠিক চেতন মনের অভিজ্ঞতার সাথে অব্যবহিতভাবে সন্নিহিত ও সংযুক্ত নয়। যে-সব অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছা অবদমিত হয়, সেগুলোই নির্জ্ঞান মনে থাকে। চেতন মন ও নির্জ্ঞান মন, মনের দুটি বিপরীতধর্মী দিক। মনের একটি দিক বাস্তবধর্মী, অপরটি সুখান্বেষী। শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও তাৎক্ষণিক সুখের জন্য যা করে সেটা মনের একটি দিক ; বাস্তব প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে চলতে চাওয়া, সেটি মনের আর একটি দিক ; বাস্তব প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে চলতে চাওয়া, সেটি মনের আর একটি দিক। মনের এই দুটি দিক, দুটি বিপরীতধর্মী এষণা দ্বারা চালিত হয় একদিকে থাকে তাৎক্ষণিক সুখান্বেষণ (***Pleasure Principle***) আর একদিকে থাকে বাস্তবধর্মিতা (***Reality Principle***)।

সহজভাবে মানুষ সুখান্বেষণের আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয় ; সে তাৎক্ষণিক সুখ বা আরাম চায়। কিন্তু সে বাস্তবের দ্বারা সামাজিক ভৌতিক ও পারিবেশিক প্রতিবন্ধের দ্বারা প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হয়—তার সকল ইচ্ছা পরিপূরণে বাধা আসে। যে সুখপ্রত্যাশা পরিণামে দুঃখ আনে, তাকে হয় সে পরিত্যাগ করার প্রয়াস করে, নয় বৃহত্তর ও সম্পূর্ণ সুখপ্রাপ্তির আশায় তাৎক্ষণিক সুখ-প্রাপ্তিকে সাময়িকভাবে ত্যাগ করে। এ দ্বৈততা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সাথে পরিবেশের। শিশু প্রথম কেবল সুখান্বেষণের প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তার মধ্যে বাস্তব জগতের বাধা-নিষেধের কোন জ্ঞান থাকে না। ধীরে ধীরে বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে সে অনেক কিছু শেখে—পরিবেশের নিয়ম, অনুশাসনকে নিজের মধ্যে ধারণ করার প্রয়াস করে। সামাজিক ও ভৌতিক নিয়ম ও অনুশাসনকে সে যেন নিজের মধ্যে ধীরে ধীরে গ্রথিত করে নেয়, ধীরে ধীরে তার মধ্যে একটা শক্তি বা মানস-প্রকৃতি গড়ে ওঠে, যা তাৎক্ষণিক সুখপ্রাপ্তির স্পৃহাকে সংযত করতে পারে।

সৃজন-এষণা ও মরণ-এষণার ধারণা (Concept of Eros and Thanatos):

ফ্রয়েড্ দিবাস্বপ্ন এবং নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে সুখান্বেষণের সূত্র (***Pleasure***

Principle) অনুসরণ করেন, কিন্তু ব্যক্তির জাগর জীবন বাস্তবতার সূত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দ্বৈততা ব্যক্তির সাথে পরিবেশের। কিন্তু পরিবেশের অনুশাসন ও বিধি-নিয়ম ব্যক্তি নিজের মধ্যে অনেক পরিমাণে যেন আত্মসাৎ (*Introjected*) করে নেয়। এই বাস্তব সত্তা, যেহেতু ব্যক্তির মধ্যে আত্মস্থ থাকে, সেই হেতু তার বাস্তব সত্তার প্রেষণা-গতিবেগ (*Motivation*), কামশক্তির (*libido*) সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী না হয়ে বরং অনেকটা কামশক্তির অধীন, কামশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এদিক থেকে ফ্রয়েডের দ্বৈততার নীতি এই সিদ্ধান্তটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

তাছাড়া, বহু ব্যক্তি আছে যারা নিজেকে অত্যন্ত ভালবাসে। এ অবস্থাকে বলা হয় স্বকাম (*Narcissism*)। শিশুদের মধ্যেও প্রাথমিক স্তরের স্বকাম পরিলক্ষিত হয়। পরিজন ও বাইরের ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসা ও এ থেকে যে সুখ পাওয়া যায়, সেই বোধের উন্মেষ যখন সঠিকভাবে শিশুর মধ্যে হয় না, তখন স্বকামের মধ্য দিয়েই সে তার সুখস্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করে। তাছাড়া, শিশু যখন তার অভিপ্রেত ভালবাসার জনদের কারও কাছ থেকে অনীহা ও আঘাত পায়, তখন সে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয় অর্থাৎ কামশক্তিকে (*Libido*) অহমে (*Ego*) আবদ্ধ করে রাখে। এ ভাবে নিজের অহমও (*Ego*) যদি প্রেম-পাত্র (*Love-object*) হতে পারে, তাহলে **অহমও** (*Ego*) **যে অংশত কামশক্তিরই অন্তর্ভুক্ত**, এ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।



আত্মরক্ষাকারী অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে পূর্বে কামশক্তির (*libido*) বিপরীতধর্মী বলে মনে করা হত। এরা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী না হলেও কামশক্তির কাছে এরা নিশ্চয়ই কিছুটা ভিন্নজাতীয়। কেননা, এরা ব্যক্তির একান্ত প্রিয় বস্তু অহম্‌কে রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলি ভিন্নজাতীয় হলেও এরা সমষ্টিগতভাবে কামশক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, এটা আর বলা চলে না। এইভাবে দেখা যায় যে অহম, কামশক্তি ও আত্মরক্ষাকারী অন্যান্য প্রবৃত্তি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলিও কিয়দংশে কামশক্তির অন্তর্ভুক্ত। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা পরিব্যাপ্ত কামশক্তিকে ফ্রয়েড্ বলেছেন জীবন-এষণা (*Eros* বা *Life-instinct*)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই জীবন-এষণার মধ্যেই

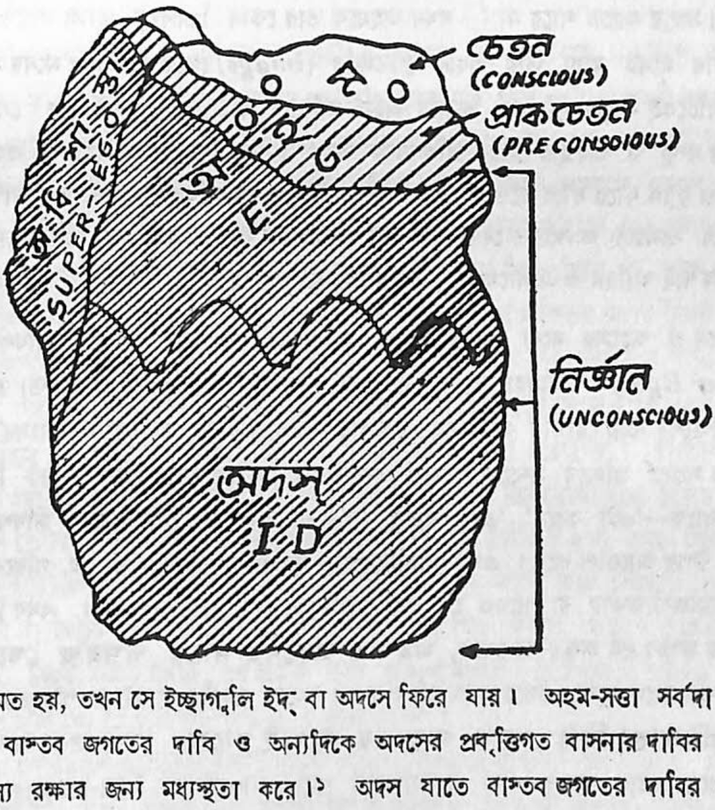
কি আর যা কিছু ব্যক্তির ইচ্ছা তা নিহিত থাকে না, এর বিপরীতমুখী আর কোন ইচ্ছা রয়েছে, যার দ্বারা ফ্রয়েডের দ্বৈততার ধারণা প্রমাণিত হতে পারে। ফ্রয়েড্ বললেন, জীবন-এষণার ঠিক বিপরীতমুখী আরও একটি ইচ্ছা আছে, তার নাম দিয়েছেন তিনি **মরণ-এষণা** (*Death instinct*)। মানুষের মধ্যে যে আত্মহত্যা, আত্মনিপীড়ন, ধ্বংসাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, এগুলিই মরণ-এষণার দ্যোতক। তাছাড়া, ফ্রয়েড্ দেখালেন, প্রত্যেকটি জীব-কোষের মধ্যেই যেন জীবন-মৃত্যু একসঙ্গে খেলা করছে। অবশ্য জনন-কোষের মৃত্যু নেই এটা যেন পরিপূর্ণরূপে জীবন-এষণার ধারক। একদিকে জীবন, আর অপরদিকে মৃত্যু। দুটি বিপরীতমুখী দিক। মরণ-এষণা যখন বহির্মুখী হয়ে ওঠে তখন তা সবকিছু চূর্ণ করে, অপরের প্রতি নির্মম আচরণ করে, অপরকে হত্যা করে ; আর তা যখন অন্তর্মুখী হয় তখন তা আত্মহনন, নিপীড়নের রূপ নেয়।

নির্জ্ঞান মনের স্বরূপ : ফ্রয়েডের মত (Development of Mind and Freud's account of Instincts and Libidinal development) :

ফ্রয়েড মনের চেতনা ও নির্জ্ঞানের দ্বৈততাকেও পুনর্বিবেচনা করেন। প্রথম দিকে ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে, অহম্ সত্তা (*Ego*) সম্পূর্ণরূপে চেতন এবং এই চেতন মনের কাছে যেসব ইচ্ছা অপ্রীতিকর ও অগ্রহণযোগ্য, অহম্ তাদের বাধা দিয়ে নির্জ্ঞানে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, যেসব রোগী মনঃসমীক্ষণ করাতে আসেন তাঁরা কেউ মনঃসমীক্ষণের সময় তাঁদের বাধা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন না। এই সব বাধা চেতন মনের বাধা নয়, চেতনভাবে এরা অতীত অভিজ্ঞতাকে মনে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কোন বাধা দেয় না। অতএব এ বাধা নির্জ্ঞান, এবং নিঃসন্দেহে এ বাধা থেকেই অবদমন ঘটে। মনের অহম্ অংশ অবদমন ও বাধাপ্রদান ক্রিয়াতে নির্জ্ঞানভাবে কাজ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অহমের কিয়দংশ চেতন এবং কিয়দংশ নির্জ্ঞান (ছবি দ্রষ্টব্য)। অহমের চেতন দিক পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট। অহম তার ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়ে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং অঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের দ্বারা তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে চেষ্টা করে, চেতন বেদনা বা সুখ প্রাণীর ভিতরের অঙ্গাদি (*Organs*) ও নির্জ্ঞান মনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও মনের বেশীর ভাগই নির্জ্ঞানস্তরীয়। নির্জ্ঞান মনে সদা সক্রিয় প্রবৃত্তিনিচয়, যন্ত্রণার উদ্রেককারী বিশেষ বিশেষ অবদমিত কামনা-বাসনা ও অভিজ্ঞতা বাস করে। এক্ষেত্রে দ্বৈততা হ'ল একদিকে মনের উপরের স্তর, যে স্তর পরিবেশের সাথে প্রত্যক্ষভাবে

সংশ্লিষ্ট, এবং অন্যদিকে মনের অন্তঃস্থিত স্তর, যার সাথে সরাসরি সৃষ্টপরিবেশের কোন সম্বন্ধই নেই। এই অন্তঃস্থিত মনের স্তরকে ফ্রয়েড্ নামকরণ করেছেন ইড (*Id*) বা অদস্। মনের অহম্ বা *Ego* অংশ পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বটে, কিন্তু এ স্তরের প্রাথমিক উদ্ভব হয়েছে মনের অদস্ (*Id*) অংশ থেকেই। অহমের কিছু অংশ সর্বদাই নির্জ্ঞান।

ইদ-এর মধ্যে আছে প্রাবৃত্তিক তাড়ন-শক্তি, যার মধ্যে জীবন-এষণা (*Life instincts*) ও মরণ-এষণা (*Death instincts*) দুইই বর্তমান রয়েছে। এই প্রাবৃত্তিক তাড়নশক্তি থেকেই ব্যক্তির ইচ্ছাগুলি রূপ নেয় এবং পরিবেশের দিকে প্রধাবিত হয়; চেতন মনকে আন্দোলিত করে। যখনই এ ইচ্ছাগুলির কোন একটি অহম্ (*Ego*) দ্বারা



অবদমিত হয়, তখন সে ইচ্ছাগুলি ইদ্ বা অদসে ফিরে যায়। অহম-সত্তা সর্বদা একদিকে বাস্তব জগতের দাবি ও অন্যদিকে অদসের প্রবৃত্তিগত বাসনার দাবির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য মধ্যস্থতা করে।[১] অদস যাতে বাস্তব জগতের দাবির সাথে

১। The ego tries to mediate between the world and the Id, to make the Id comply with the world's demands and by means of muscular activity, to accommodate the world to the Id's desires.

—Freud, S: The Ego and the Id, 1927, p. 83

মানিয়ে চলে, অহম তার প্রয়াস করে। অদস অন্ধভাবে কেবল সুখান্বেষণ করে (*Pleasure Principle*), কিন্তু জীবনে সর্বদা সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা যায় না। অদসকে অহমের মাধ্যমেই চলতে হয়। অহমকে বাস্তব জীবনের সাথে চলতে গিয়ে বাস্তব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় এবং বাস্তবাদর্শ (*reality Principle*) মেনে চলতে হয়।

অহম জীবনের প্রথম দিকে অত্যন্ত অপুষ্ট ও দুর্বল থাকে ; শিশু স্বভাবতই প্রথম দিকে অদসের নির্দেশে চলে। এ-ভাবে চলতে গিয়ে অহমকে নানারূপ বাধা-বিপত্তি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। অহম এ সময়ে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে যা বাস্তব পরিবেশ মঞ্জুর করতে পারে না। যখন অহমকে তার কোন প্রিয়বস্তু ত্যাগ করতে হয়, তখন তার মনের মধ্যে তার একটা প্রতিচ্ছবি (*Image*) থেকে যায় এবং মনের মধ্যে প্রতিচ্ছবিটিকেই বস্তুর পরিবর্ত হিসাবে অহম আঁকড়ে ধরে ; এবং এইভাবে সেইসব পরিত্যক্ত বস্তু ও অবস্থার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে অহম নিজের মধ্যে ধারণ করে। অহমের বিকাশ ও বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হতে থাকে। অহম যদি ঠিকভাবে বিকাশ লাভ করে, তা'হলে তার মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংহতি দেখা যায় এবং পরিবেশের সাথে এর যথার্থ সঙ্গতি থাকে। অদস সর্বদাই আদিম ও এলোমেলো ; এর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যই এই।

অদস ও অহমের মধ্যে তৃতীয় সত্তার আবির্ভাব হয়, একে বলা হয় অধিশাস্তা (*Super Ego*)। আমরা বিবেক বলতে যা বুঝি মোটামুটিভাবে অধিশাস্তা তাই। মনঃসমীক্ষণের সময় রোগীর মধ্যে যে পাপবোধ পরিলক্ষিত হয়, তা থেকেই মনঃসমীক্ষক মনের এ সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন। অধিশাস্তার মধ্যে অনেক বিধি-নিষেধ থাকে—'এটা করবে' 'এটা করবে না'—এ রকম সব বিধি-নিষেধ অধিশাস্তা অহমের উপর আরোপ করে। এসব বিধিনিষেধ যে সর্বদা বাস্তবানুগ তা নয়, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য-রক্ষার ব্যাপারেও যে এরা সর্বদা সাহায্য করে তাও নয়। এসব বিধি-নিষেধের উদ্ভব হয় অন্তর্জগৎ থেকে, **অহম ও অদসের সাথে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে**। পরিবেশের সাথে যুঝতে গিয়ে অহম যদিও সকল স্তরের প্রাণীর মধ্যেই অল্পবিস্তর গড়ে ওঠে, **অধিশাস্তা কিন্তু কেবল মানুষের মধ্যেই থাকে**। অধিশাস্তা মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠার কারণ—(ক) মানবশিশুর সমাজ-আরোপিত বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়ে শৈশবকাল যাপন এবং (খ) একমাত্র মানুষকেই জন্মকাল থেকে সামাজিক দিক থেকে রীতিসিদ্ধ যৌনজীবন আরম্ভ হওয়ার কালের মধ্যেই অনেকটা সময় অতিবাহিত করতে হয়। **অধিশাস্তা আদিমকালের মানুষের মধ্যেই সৃষ্ট হয় এবং এর**

আদিরূপের ক্ষুদ্রাংশ বংশানুক্রমে ব্যক্তির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু অধিশাস্তার বেশীর ভাগই প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে নতুনভাবে উদ্ভব হয়। **'যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রতিহত হওয়ার মধ্য দিয়েই 'অধিশাস্তা'র উদ্গম ঘটে। শিশুর প্রতিহত 'যৌনাবেগ' থেকে অধিশাস্তার অভ্যুদয় হয়।** ফ্রয়েডের মতে, শিশুর যৌনতা প্রকৃত পক্ষেই যৌনতা, কেননা শিশু সর্বদাই একটি ভালবাসার বস্তু খোঁজে, ছেলে হলে প্রথম ভালবাসার বস্তু মার মধ্যে পায়, মেয়ে হলে বাবার মধ্যে। এ থেকে আরম্ভ হয় 'ইডিপাস গূঢ়ৈষা'। অধিশাস্তা গঠনে **'ইডিপাস গূঢ়ৈষার'** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেজন্য এ পর্যায়টিকে ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন।

গ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই গূঢ়ৈষার নামকরণ হয়েছে। থিবসের রাজা ভবিষ্যৎ বাণী শুনলেন যে, তাঁর ছেলে বড় হয়ে তাঁকেই হত্যা করবে এবং ছেলে মাকে বিবাহ করবে। থিবসের রাজার ছেলে হ'ল ইডিপাস। ভাবী পিতৃহন্তা ছেলের পা'র মধ্যে একটা পেরেক ফুটিয়ে দিয়ে তাকে একটি পাহাড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল। ইডিপাসকে থিবসের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা রক্ষা করলেন এবং পোষ্যপুত্রের মত প্রতিপালন করে মানুষ করলেন—ইডিপাস তার আসল পিতৃপরিচয় ও তার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী কিছুই জানল না। একবার অবশ্য সে যখন ভবিষ্যৎ বক্তার নিকট গেল, তার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করা হ'ল যে, সে তার পিতাকে হত্যা করবে ও তার মাকে বিবাহ করবে। এ কথা শুনে সে তার প্রতিপালক পিতার বাড়ী থেকে দূরে চলে গেল, এবং পথে ঘুরতে ঘুরতে তার নিজের পিতার সাথে দেখা হয়ে গেল। পিতার সাথে ঝগড়া হল, তাকে হত্যা করল, ইডিপাস তখন একজন বড় যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। সে থিবসে পৌঁছল, থিবস জয় করল, সেখানকার রাজা বলে ঘোষিত হ'ল এবং সেখানকার বিধবা রাণীকে বিবাহ করল। এ সবই কিন্তু ইডিপাস করল তার পিতামাতার প্রকৃত পরিচয় না জেনে। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বেশ কিছুদিন কাটল, তাদের চারটি সন্তান হ'ল। চতুর্থ সন্তান হবার পর প্রকৃত সত্য প্রকাশ হ'ল। ইডিপাস এ ঘটনায় এতটা আহত হ'ল যে, সে দুঃখে নিজের চোখ তুলে ফেলল।

এ পৌরাণিক কাহিনীর ছকটি ফ্রয়েড গূঢ়ৈষা ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন। ইডিপাস তার বাবাকে হত্যা করল এবং মাকে বিবাহ করল। সে দুটি অপরাধ করল—একটি পিতাকে হত্যা, অপরটি মার সাথে যৌন সম্পর্ক। দুটিই অত্যন্ত গর্হিত কাজ। গর্হিত ও নিষিদ্ধ বলেই ফ্রয়েড্ বলেছেন, সকলের মধ্যেই এরকম ইচ্ছার অস্তিত্ব রয়েছে, সকলের মধ্যে এরূপ বাসনা রয়েছে। যা কিছু নিষিদ্ধ, তাই করার একটা প্রবল বাসনা

মানুষের মধ্যে আছে ; বাসনা আছে বলেই এরূপ প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে এবং এরূপ ঘটতে পারে বলেই সামাজিক নিষেধনামা জারি করা হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে নিষেধনামাই নিষিদ্ধ বাসনার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

ইডিপাস কমপ্লেক্স বা গূঢ়ৈষা বলতে বোঝায় মার সম্পর্কে ছেলের যৌনেচ্ছা। প্রত্যেকের মধ্যেই এরূপ ইচ্ছা আছে। ছেলের মার সম্পর্কে যৌনেচ্ছা এবং মার ভালবাসা পাওয়া নিয়ে বাবার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এ অবস্থাকেই ফ্রয়েড নামকরণ করেছেন ইডিপাস অবস্থা। মায়ের প্রতি তার যৌন আকর্ষণ যত বৃদ্ধি পায়, তত সে পিতাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত পিতার প্রতি বিদ্বেষ, তাঁর ক্ষতি, মৃত্যুকামনাও শিশুর চিন্তায় উঁকি মারে। এরূপ মানসিকতাকেই ফ্রয়েড বলেছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স। নির্জ্ঞান মনেই এ সকল চিন্তার, এ সকল ইচ্ছার আনাগোনা চলে।

ছেলে-শিশুর যৌন-মানসশক্তি মার প্রতি উদ্দিষ্ট হওয়া, মা'র প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার পরই অন্য কোন ভাইবোনের জন্ম-সম্ভাবনায় যখন মাতৃস্তন্যপান বন্ধ হয়ে যায়, মার শাসন-তর্জন আরম্ভ হয়। মার প্রতি আসক্তি—তার প্রথম অকৃত্রিম ভালবাসার পথ খুব সহজ সরল নয়। ইতিমধ্যে ছেলে তার পিতার প্রতি আসক্তি অনুভব করে, পিতাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ, সব কিছুতেই তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। পিতার সাথে একাত্মীকরণ (*Identification*) করে। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখে যে, সব বিষয়ে সে পিতাকে অনুসরণ করতে পারে না, অনুসরণ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে, সে মাকে তার বাবার মত ভালবাসতে পারে না, ভালবাসা সম্ভব হয় না। সে দেখে যে, মাকে একান্তভাবে ভালবাসার বিষয়ে তার বাবা একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে হস্তক্ষেপ করে। সে তার বাবার এই ভূমিকাকে অত্যন্ত অপছন্দ করে, ভিতরে ভিতরে বাবাকে পথের কাঁটা মনে করে এবং মাকে পাওয়ার পথে এ পথের কাঁটা দূর হয়ে যাক্, এমন কামনাও সে করে থাকে। যে পিতাকে আদর্শ হিসাবে দেখে ও ভালবাসে, সেই পিতাকেই আবার মার ভালবাসা পাওয়ার বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ও পথের কাঁটা ভেবে ঘৃণা করে। যে পিতাকে ভালবাসছে, তাঁকেই আবার ঘৃণা করতে হচ্ছে। ভালবাসা ও ঘৃণা এই দুই-এর দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। ফ্রয়েড মনে করেন, ছেলের যৌন-মানসশক্তি আত্ম-রতির (***Auto-erotic***) বিভিন্ন পর্যায়, যেমন মৌখিক (***Oral***) ও পায়ু (***Anal***) স্থান অতিক্রম করে যখন চার পাঁচ বৎসরে লিঙ্গে নিবদ্ধ হয়, তখনই এ দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ রূপ নেয়। এই সময় সে তার বাবা-মা উভয়ের কাছ থেকেই কঠোর বিরোধিতা পায়। আত্মকামের অভ্যাসগুলির পুনরাবৃত্তিকে শাসন করা হয়, ভয় দেখানো হয়। তখন শিশুটির এই

সব ইচ্ছা অবদমন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এসময়ে সে নিজে নিজে কতকগুলো আদর্শ আচরণ-মান নির্ধারণ করে নেয়। সে দুটি আদর্শ সামনে রেখে বাবার সাথে একাত্মীকরণ করে—(১) 'আমি আমার বাবার মতন হব।' (২) 'আমি আমার বাবাকে হত্যা করব না, অথবা 'তাঁর স্ত্রীকে' অধিকার করার কোন ইচ্ছা পোষণ করব না।' এই দুটি শর্তকে ছেলে মানবে বলে গ্রহণ করে এবং এই মূল দুটি আদর্শ প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই অধিশাস্তার মর্মমূল গঠিত হয়।

মোটামুটিভাবে এ অবস্থাকেই বলা হয় ইডিপাস কমপ্লেক্স বা ইডিপাস গূঢ়ৈষা এবং এ অবস্থায় যে সকল ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তার অবদমনও এরকম ভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু এ অধ্যায়টি শিশুর, সে ছেলে হোক আর মেয়েই হোক, উভকামিতা (*Bisexuality*) দ্বারা জটিল হয়ে যায়। ছেলের যৌনমানসিকতা বা 'ভালবাসা' মা'র সাথে সাথে বাবার প্রতিও ধাবিত হয় এবং মা'ও কিয়দংশে আদর্শ হয়ে যেতে পারে এবং যেহেতু ছেলের বাবার প্রতিও যথেষ্ট আকর্ষণ থাকে, মা সেখানে বাবার ভালবাসা পাওয়ার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন ছেলে মার ভাব-মূর্তিকে একাত্মীকরণের মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যে গ্রথিত করে নিতে পারে। এর দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে, ছেলের অধিশাস্তা-গঠনে মা'র ভূমিকাও অনেক পরিমাণে রয়েছে। ছেলের একাত্মীকরণ কখনো কখনো বাবার থেকে মার সঙ্গে বেশী হতে পারে। এর ফলে ছেলের একটা মেয়েলিপনাও দেখা দিতে পারে। মেয়ের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত অবস্থাগুলোর অবতারণা ঘটে।

পাঁচ বছর বয়সে ইডিপাস গূঢ়ৈষার যথার্থ ও সার্থক উত্তরণের পর শিশুর যৌন-বিকাশ বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত অত্যন্ত স্তিমিত থাকে। পরবর্তীকালে একজন যুবক বা যুবতী পরিণত ভালবাসার সুযোগ ও দাবি কি ভাবে গ্রহণ ও প্রতিপালন করবে, তা বহুলাংশে নির্ভর করে তারা শৈশবে ইডিপাস পর্যায়ে কতটা সার্থকতার সাথে সঙ্গতি-সাধন করতে পেরেছিল।

ফ্রয়েডের 'মানসিক প্রক্রিয়া' (Mental mechanisms), নির্জ্ঞানের সক্রিয়তা (Dynamics of the unconscious), 'আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া' (Defence Mechanism) বা সক্রিয়তা (Dynamism) প্রভৃতি ধারণার মধ্যে স্বকীয়তা আছে। ফ্রয়েডের এই সকল ধারণা ব্যক্তিত্ব-ব্যাখ্যায় ও ব্যক্তিত্বের কার্যকারিতা অনুধাবনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক। কোন গোপন ইচ্ছাকে, অন্য কোন বস্তু সম্বন্ধে ভয়ের আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা একপ্রকার সক্রিয়তা (*Dynamism*)। যে ইচ্ছা অসামাজিক ও অশ্লীল, সে ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার প্রয়াসে বিবেকের যে

কষাঘাত ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় আসে, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে ইচ্ছা চরিতার্থ করার প্রয়াসকে ব্যক্তি নানা ভাবে যুক্তিসিদ্ধ করার প্রয়াস (*Rationalisation*) করে। সমাজ যে ইচ্ছাকে সোজাসুজি অনুমোদন করে না বা যে ইচ্ছা সমাজে চরিতার্থ করা যায় না, সে ইচ্ছাকে সমাজ-অনুমোদিত পথে নিয়ন্ত্রিত করাও (*Sublimation*) একপ্রকার মানসিক সক্রিয়তা।

ফ্রয়েডের এই সকল সিদ্ধান্ত যদিও সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠভাবে (*objectively*) প্রমাণিত হয়নি, তবু এটা ঠিক যে, ফ্রয়েড ব্যক্তির নিগূঢ় ক্রিয়াকলাপ ও সমাজ-পরিবেশে মনের কর্ম-কৌশল সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। সকল তত্ত্ব ও সত্য নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে হয়ত আরও তাৎপর্যপূর্ণ সত্যাদি জানা যেতে পারে। মনঃসমীক্ষণ কেবলমাত্র এককভাবে ব্যক্তির মনোজগৎ নিয়েই এখন আর আলোচনা করে না, সমাজ-সমস্যা, সমাজ-জীবনের ধারায় ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিভাবে প্রভাবিত হয়, এ সকল বিষয়েও পর্যালোচনা করে। মনঃসমীক্ষণ এখন প্রায় একটা সমাজ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি বুঝতে হলে ফ্রয়েডের উদ্বায়ুরোগের চিকিৎসা ও তৎসংক্রান্ত যে সকল চিন্তাভাবনা, তাকে যথাযথভাবে অনুশীলন করতে হবে। উদ্বায়ুরোগ ও মানসিক বিকৃতি নিরাময়ে তাঁর যে প্রয়াস ও অবদান, তাকে কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না।

মনঃসমীক্ষণের মূল সূত্রগুলো কিভাবে এসেছে, এদের ক্রমবিবর্তনধারা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি, এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুত ফ্রয়েডের চিন্তার ধারাবাহিকতা না বুঝলে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তি-বিন্যাস না বুঝলে মনঃসমীক্ষণের মর্মমূলে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এই কারণেই ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারাকে ও মনঃসমীক্ষণের সিদ্ধান্তগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও যুক্তিধারাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এবার আমরা ফ্রয়েডের মূল সিদ্ধান্তগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করব।

মনঃসমীক্ষণ কি ?ঃ

'মনঃসমীক্ষণ' শব্দটির যথাযথ অর্থ প্রায়ই ঠিকভাবে বুঝে দেখার চেষ্টা করা হয় না, এবং এ শব্দটিকে অত্যন্ত অসাবধানতার সাথে ব্যবহার করা হয়। মনঃসমীক্ষণ

শব্দটি ফ্রয়েড্ (*Freud*), এ্যাড্লার (*Adler*) ও ইয়ুং (*Jung*)-এর নামের সাথে জড়িত, যদিও যথার্থভাবে মনঃসমীক্ষণ শব্দটি ফ্রয়েডের ও যাঁরা তাঁর মনঃসমীক্ষণ-পদ্ধতির অনুগামী তাঁদের সাথেই একান্তভাবে জড়িত হওয়া সমীচীন। ফ্রয়েড নিজেও বলেছেন যে, 'মনঃসমীক্ষণ' নামটি কেবল তাঁর উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তগুলির (*Theory*) এবং তাঁর উদ্ভাবিত চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

মনঃসমীক্ষণ বলতে বর্তমানে মনোবিদ্যায় একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ বোঝায়। মনোবিদ্যায় অন্য মতাদর্শের (*Schools of Psychology*) কোন পর্যায় বা পরিণতি হিসাবে মনঃসমীক্ষণের অভ্যুদয় ততটা হয়নি, যতটা হয়েছিল ফ্রয়েডের চিকিৎসাসংক্রান্ত অধ্যয়ন, গবেষণা ও চিকিৎসক হিসাবে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। বস্তুতঃ মনঃসমীক্ষণ-মতাদর্শ (*Psycho-analytic School*) মনোবিদ্যার অন্যান্য চিন্তাধারা বা মতাদর্শের বিরোধিতা করেছে ; বিশেষ করে কেতাবী মনোবিদ্যা যা বেশী করে জোর দিয়েছে শিক্ষণ, প্রত্যক্ষণ, চিন্তন প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপর। মনোবিদ্যার গঠনবাদ (*Structuralism*), অনুষঙ্গবাদ (*Associationism*) এবং গেস্টাল্টবাদ প্রত্যেকটি মতাদর্শের বিরুদ্ধেই মনঃসমীক্ষণবাদ কঠোর সমালোচনা করেছে। মনঃসমীক্ষণাবাদ এই সকল মতাদর্শকে এমনকি উদ্দেশ্যবাদ (*Purposivism* -এর বিরুদ্ধেও এই বলে অভিযোগ করেছে যে, এরা কেবল মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নিয়ে বিমূর্ত ও বুদ্ধিবাদী জ্ঞানের কচকচি করেছে ; কিন্তু মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার গভীর কারণ সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করেনি। মনের গভীরে প্রবেশ করার বৈপ্লবিক প্রয়াস প্রথম মনঃসমীক্ষণবাদীরাই করেছেন—এরূপ দাবি মনঃসমীক্ষণবাদীরা করে থাকেন। মানুষের আচার-আচরণও বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের অন্তরালে যে উৎসশক্তি কাজ করে, তার সন্ধান মনঃসমীক্ষণবাদীরাই প্রথম করেছেন বলে দাবি করেন। মানুষের গভীর গোপন মনের খবর তাঁরাই জানার চেষ্টা করেছেন। মানসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে মনঃসমীক্ষণবাদীরা প্রসারিত করেছেন। এ জ্ঞানালোকে অন্বিত হলে মানসিক বিকাশ ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিতও করা যেতে পারে।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড্ই (*Sigmund Freud*) মনঃসমীক্ষণবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ফ্রয়েডের চিন্তাধারা মানুষ সম্পর্কে ধারণা নবতর মূল্যায়নে প্রবুদ্ধ করেছে। গ্যালিলিও (*Galileo*), ডারুইন (*Darwin*) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা মানুষের নিজের সম্পর্কে যে ভুল ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রচলিত ছিল, তার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। গ্যালিলিও প্রথম বললেন যে, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য প্রদক্ষিণ করে না, সূর্যের চারিদিকেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। মানুষের অহংকার, তার বাসস্থান যে পৃথিবী,

তাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু। এই ধারণায় গ্যালিলিও প্রথম আঘাত করেন। ডারুইনও মানুষের নিজের সম্পর্কে যে ধারণা—তারা অন্য প্রাণীদের থেকে যেন একেবারে ভিন্নতর ও আলাদা কিছু—তাকে আঘাত করলেন। ডারুইন বললেন, মানুষ 'উচ্চস্তরের' প্রাণী মাত্র—আলাদা কিছু নয়। ফ্রয়েড্ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যে পশু-প্রকৃতি রয়েছে, তাকে স্বীকার করলেন ও মানুষের আচার-আচরণে, চিন্তায় তার যে প্রভাব, তার কথাও বললেন। আমাদের মনের গহনে ধ্বংসের ইচ্ছা রয়েছে, হত্যার ইচ্ছা রয়েছে। প্রবলভাবে সুখী হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। একদিকে রয়েছে জীবন-তৃষ্ণা, অন্যদিকে রয়েছে মরণ-এষণা। এ সব কথা বলে ফ্রয়েড মানুষের সংস্কারগত অহংকারে আঘাত করেছেন। মানুষের মধ্যে কেবল দেবত্ব রয়েছে, মানুষ কেবল অমৃতের সন্তান, এই সকল ধারণায় আঘাত করেছেন।

মনঃসমীক্ষণের দুই অর্থ :

'মনঃসমীক্ষণ' শব্দটির দুটি অর্থ আছে। **প্রথমত**, মনঃসমীক্ষণ বলতে ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বোঝায়, যে চিকিৎসা-পদ্ধতির দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয় এবং যে চিকিৎসা-পদ্ধতিতে মনের গভীর স্তরের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, 'মনঃসমীক্ষণ' মনোবিদ্যায় একটি বিশেষ মতাদর্শ (*School*)। 'মনঃসমীক্ষণ' পদ্ধতিতে মানসিক রোগীদের চিকিৎসাকালে ধীরে ধীরে এই মতাদর্শের অভ্যুদয় হয়েছে। এই মতবাদ কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও সুসংবদ্ধ সিন্ধান্তে নির্যাসিত।

এ ক্ষেত্রে আমরা 'মনঃসমীক্ষণ' শব্দটি মনোবিদ্যার একটি বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ হিসাবে ব্যবহার করব। চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে 'মনঃসমীক্ষণে'র যে তাৎপর্য ; সেটা আমরা এক্ষেত্রে আলোচনার মধ্যে আনব না। মনঃসমীক্ষণের মূল সিন্ধান্তগুলি সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

মনঃসমীক্ষণের মূল সিদ্ধান্তসকল[১] :

(ক) নির্জ্ঞান মন, প্রাক্-চেতন ও চেতন মন (The Unconscious) :

ফ্রয়েড অবস্থান-বিন্যাসে (*Topographical*) মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন—নির্জ্ঞান, প্রাক্-চেতন ও চেতন। তিনি এমন সকল মানস-ক্রিয়ার অস্তিত্বের সম্বন্ধে সিন্ধান্ত করেছেন, যার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনবহিত, অথচ যে সকল

১। The unconscious—the Psycho-dynamics of unconscious mental function—conflict, Repression and other defence mechanisms.

মানসক্রিয়া অগোচরে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়াকলাপকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েডই এরূপ অগোচর মানস-ক্রিয়ার কথা যে প্রথম বলেছেন বা নির্জ্ঞান মনের ধারণা দিয়েছেন তা নয়, ফ্রয়েডের বহুপূর্বে লেবনিজ্ (***Leibnitz***), হার্টম্যান্ (*Hartman*), সেফেনায়ার (*Schopenhaur*) এবং নিৎসে (***Nietzche***) প্রমুখ দার্শনিকগণ নির্জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেছেন।

মনের চেতন অংশ হ'ল সেই অংশ, যার সম্বন্ধে আমরা অব্যবহিতরূপে অবহিত। আমরা এই মুহূর্তে যে সব চিন্তা ও অনুভূতি সম্বন্ধে জ্ঞাত, সেইসব চিন্তা ও অনুভূতি নিয়েই চেতন মন গঠিত। প্রাক্-চেতন মনে সেই সব চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে যাকে বিশেষ চেষ্টায় ইচ্ছা করলেই আমরা চেতন মনে ফিরিয়ে আনতে পারি। প্রাক্-চেতন মন যেন চেতন মনের অতি সন্নিকটে অবস্থিত একটি ছোট ঘর। মনের এই অংশ থেকে, ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগে সামান্য কষ্ট করলে বা অনুষঙ্গের দ্বারা পূর্বস্মৃতি চেতন মনে ফিরিয়ে আনা যায়। মনের নির্জ্ঞান স্তরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, যাকে ইচ্ছা করলেও আমরা স্মৃতিপথে ফিরিয়ে আনতে পারি না। এতে সেই সব গভীর ইচ্ছা ও অনুভূতি আছে, যার সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে অবহিত হতে পারি। সাধারণভাবে আমরা এ সকল ইচ্ছার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকি না।

ফ্রয়েডের মতে মনের নির্জ্ঞান অংশই ব্যক্তির মানস-ক্রিয়ায় অধিক সক্রিয়। চেতন মন, নির্জ্ঞান মনের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পকায় ও ক্ষুদ্রাংশ। নির্জ্ঞান মনে বাসা বেঁধে থাকে অজস্র শৈশবকালীন কামনা, অতৃপ্ত বাসনা, উদগ্র সুখ-তৃষ্ণা। নির্জ্ঞানস্তরীয় অধিকাংশ ইচ্ছাই হ'ল শৈশবকালীন বাসনার ফল। কখনও কখনও এ সকল ইচ্ছা সুপ্ত থাকে, নিষ্ক্রিয় থাকে, কখনও কখনও অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। নির্জ্ঞান মনে যে সব অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত থাকে, তার প্রত্যেকটির সাথেই তীক্ষ্ম প্রক্ষোভগত অনুষঙ্গ থাকে, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সাথে যৌন মানসশক্তি (***Psycho-sexual energy***) সম্পৃক্ত থাকে—এ সকল অভিজ্ঞতার অধিকাংশই শৈশবকালে প্রক্ষোভিক (***Emotional***) আঘাতজনিত (***Traumatic***) অভিজ্ঞতা।

ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির অবতারণা করেছেন—

(১) এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমাদের মনের কোণে সঞ্চিত থাকে, যাকে আমরা ইচ্ছা করলেও মনের চেতন প্রান্তে ফিরিয়ে আনতে পারি না।

(২) ঘুমের ঘোরে চলা-ফেরা করা, পরে সে অভিজ্ঞতার কথা মনে একেবারে না থাকা বা স্বপ্নচারিতা (*Somnambulism*)।

(৩) সম্মোহনের পরে অভিভাবনজনিত যে পরিবর্তন।

(৪) স্বপ্ন (*Dreams*)।

(৫) কোন বিশেষ বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তিকে ভুলে যাওয়া।

(৬) লিখতে বা বলতে গিয়ে বিশেষ কোন ভুল করা।

(৭) বিদ্রূপ করা, কোন কিছুকে পরিহাস করা।

(৮) মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে মানসিক রোগীদের সারিয়ে তোলা যায়—এ সত্যও নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত তাকে দৃঢ়তর করে। নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মানবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে, এ সিদ্ধান্তের উপরই মনঃসমীক্ষণের চিকিৎসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

(খ) **অদস্ (Id), অহম্ (Ego) ও অধিশাস্তা (Super-Ego) :**

অবস্থান-বিন্যাসে মনের তিনটি স্তরের কথা ফ্রয়েড বলেছেন—চেতন, প্রাক্-চেতন ও নির্জ্ঞান স্তর। মনের সংগঠন বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা করতে গেলে মনের সদা-সক্রিয়তাকে (*Dynamics*) আমাদের গোচরে রাখতে হবে। **মনের সক্রিয়তার তিনটি ভিন্ন দিক আছে** এবং এদের পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চেতন, প্রাক্-চেতন ও নির্জ্ঞান স্তরে ঘটে থাকে।

॥ ১ ॥ অদস্ (**Id**—অদস্ সকল মানসিক শক্তির উৎস, মনের আদিম ও অবিন্যস্ত রূপ। জীবন-এষণা ও মরণ-এষণা (*life instincts, death instincts*) প্রবৃত্তিগুলির প্রধান আধার। এ সকল প্রবৃত্তির বাস সম্পূর্ণরূপে মনের নির্জ্ঞান স্তরে। অদস সর্বদা সুখ-সূত্রের দ্বারা চালিত হয়। এর কর্মপ্রয়াস সর্বদা সুখান্বেষণকে কেন্দ্র করে ঘটে—বাস্তব জীবন ও জগতের সাথে এর কর্মকাণ্ডের প্রথমাবস্থায় কোন সম্পর্ক থাকে না। নির্জ্ঞানস্থিত মনোবৃত্তি গতিবেগসম্পন্ন (*Dynamics*), অর্থাৎ মূলতঃ এর থেকেই কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। শৈশবের বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত সুখান্বেষী অসংলগ্ন কর্মপ্রয়াস ধীরে ধীরে সমাজ ও বাস্তব-সূত্রের (*Reality Principle*) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই সকল নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছাবেগ যদি বাস্তব ও সমাজবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হত, তাহলে মানুষ কেবল তাৎক্ষণিক সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা ছুটত। সভ্যতার আলোকে তারা কোনদিনই আলোকিত হত না। মানুষ হয়ে থাকত সময়জ্ঞানহীন—বাস্তবজ্ঞানহীন।

॥ ২ ॥ অহম (Ego)—অহম হ'ল বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ; ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংহতি-আনয়নকারী সত্তা। মনের এ অংশটি সর্বদা স্থান, কাল ও ভৌতিক জগতের সাথে যোগাযোগ রেখে চলে। অদসের ইচ্ছাগুলিকে অহম সর্বদা বিচার করে দেখে এবং

প্রয়োজনে এ ইচ্ছাবেগকে প্রতিরোধ করে। এর কাজ হ'ল ব্যক্তির সাথে বাইরের ভৌতিক জগৎ ও মানবিক জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। অহম আত্মকেন্দ্রিক। অদসের অন্ধ ইচ্ছাগুলিকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে যতটা চরিতার্থ করা যায়, তার উপযোগী আচার-আচরণ ব্যক্তির অহম (*Ego*) নিয়ন্ত্রিত করে। অহমও অদসের ইচ্ছাগুলির সর্বাধিক বাস্তবায়িত চরিতার্থতা চায়। অহম ব্যক্তির আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস করে যাতে একদিকে সামাজিক ও ভৌতিক বাস্তবের দাবি যতটা সম্ভব মানা যায়, অন্যদিকে অদসের ইচ্ছাগুলিরও সর্বাধিক সন্তুষ্টি ঘটে। বাস্তবের দাবি ও অদসের দাবির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটায় অহম। অহম যেহেতু বাস্তবের সাথে সম্পর্কান্বিত, সেই হেতু অহম্ সর্বদাই বাস্তব-সূত্রের (*Reality Principle*) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যুক্তি, বিচার-বিবেচনা দ্বারা অহম্ চলে।[১] অহমকে একদিকে অদসের ইচ্ছার সাথে ও অন্যদিকে ভৌতিক ও সামাজিক বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়; সঙ্গে সঙ্গে অহমকে অধিশাস্তার (*Super-ego*) দাবি ও নির্দেশ মেনেও চলতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অহমকে তিনটি ভিন্নমুখী শক্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

(১) বহির্জগৎ
(২) অদসের প্রবৃত্তিগত চাপ
(৩) অধিশাস্তার বাধা ও নিয়ন্ত্রণ-শক্তি

শিশু অদসের দ্বারা চালিত হয়ে অনেক কিছু পেতে চায়—যে-কোন বাসনার পরিতৃপ্তি চায়। কিন্তু বাস্তব জগতের সাথে পরিচয় হবার সাথে সাথেই শিশু দেখে যে তার সব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। সে দেখে অপরিণামদর্শী বাসনার সুখ থেকে দুঃখই আসে বেশী। এ সব অভিজ্ঞতার দ্বারা অদসের খানিকটা অংশ ধীরে ধীরে 'অহম'-এ রূপান্তরিত হয়। অহম তখন গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে মনকে অনেক কিছু মানিয়ে নিতে বলে—মনকে বুঝবার চেষ্টা করে ঃ এ কাজ করা ঠিক নয়, এ কাজ করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, এ দাবিটা অসঙ্গত—এই সব নিয়ে বিচার করে।

অধিশাস্তা (Super-Ego) ঃ অধিশাস্তার ইচ্ছা-শক্তিই প্রধানত ব্যক্তির সমাজীকরণের (***socialization***) জন্য কাজ করে; অদস (*Id*) মূলত জৈবিক ইচ্ছার দ্বারা অনুবর্তিত; অহম (*Ego*) মূলত বাস্তব জগতের দ্বারা আর অধিশাস্তা

১। **'Ego stands for reason and circumspection, prudence and discretion."**
—Mitchell : Problem of Psycho-pathology

সমাজ-সংস্কৃতির দ্বারা অনুবর্তিত।[১] এই অধিশাস্তা আমাদের বিবেকসত্তা। এর মধ্যে পাপবোধ ও অনুশোচনার অনুভূতির জন্ম হয়। একে অহমের 'আদর্শও' বলা যেতে পারে (*Ego-ideal*) ; কেননা, এর মধ্যেই সামাজিক আচরণাদর্শ নিহিত থাকে। অধিশাস্তা অহম্ ও অদসের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখে। অধিশাস্তা এমন ভাবে কাজ করে যেন একটি অতন্দ্র প্রহরী ; অদস-আগত অবদমিত ইচ্ছাকে গ্রহণ করার বিপদ সম্পর্কে অধিশাস্তা অহমকে সাবধান করে, শাসন করে।[২] অধিশাস্তার মধ্যেই অবদমনের শক্তি, আত্ম-সমালোচনার ক্ষমতা বর্তমান থাকে। অধিশাস্তার জন্ম হয় ইডিপাস স্তরের ইচ্ছা, অবদমন ও ইডিপাস গূঢ়ৈষাকে অতিক্রমণের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। ইডিপাস স্তরীয় ইচ্ছার চরিতার্থতায় পিতামাতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা দেয়। এই সময়ে শৈশবকালীন শক্তিহীন ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল অহম এ অবস্থা উত্তরণের জন্য তার শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াস করে। অহমের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তারা পিতামাতার সাথে একাত্মীকরণ করে। তাদের আদিষ্ট বিধি-নিষেধগুলোকে তারা নিজের অহমের মধ্যে গ্রথিত করে নেওয়ার চেষ্টা করে। পিতামাতার মনোভঙ্গী ও তাদের মতামত, শিশুর অহম্ গ্রহণ করে এবং এর ফলে অহমের কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফল এভাবে উদ্ভূত অহম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট প্রাথমিক অহমের সম্মুখে বিরাজ করে এই প্রাথমিক অহমের আদর্শ বা অধিশাস্তা রূপে।[৩] অধিশাস্তা প্রাথমিক পর্যায়ে এ ভাবে গঠিত হওয়ার পর পিতামাতা, পিতামাতার পরিবর্তস্বরূপ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও তাঁদের আদিষ্ট ও প্রতিপালিত নীতি-নির্দেশের দ্বারা অধিশাস্তা আরও শক্তিশালী ও পরিপুষ্ট হয়। অধিশাস্তার নির্দেশ ও দাবির সাথে যদি অহমের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলেই ব্যক্তির মধ্যে পাপবোধ ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয়।

১। 'The Id is primarily biologically conditioned, the Ego primarily conditioned by the physical environment, but the super-ego is primarily socio-logically and culturally conditioned.

—Brown, Psycho-dynamics of abnormal behaviour, 1940

২। 'Super-ego acts, as it were like a guard that warns the Ego of the danger of accepting any repressed impulses emanating from the Id'—Jones, Earnest : What is psycho-analysis ?—International Universities Press, Newyork, 1948

৩। "Their point of view, as it were, is adopted by the Ego, but the modification of the Ego thus arising, remains isolated and confronts the rest of the content of the Ego as the Ego-ideal or super Ego."

—Hart, Bernad : The Psychology of Insanity. 1949

কি করে প্রত্যেক সভ্যতায় প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-সংযমের শক্তি মানবিক আচরণকে মার্জিত ও সংস্কৃত করছে, সভ্যতার আলোকে পরিশীলিত করছে, অধিশাস্তার (*Super-ego*) অস্তিত্বই তা ব্যাখ্যা করে। অধিশাস্তা উৎসারিত এ শক্তি সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলারক্ষায় অপরিহার্যভাবে কাজ করছে। যদি আত্ম-শৃঙ্খলার বুনিয়াদ এই অধিশাস্তার জন্ম ও পুষ্টির মধ্যে দিয়ে না হত অর্থাৎ যদি বিবেক-সত্তা আমাদের মধ্যে না থাকত, তা হলে সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হত না।

ব্যক্তিত্বের[১] তিনটি গভীর দিকের গঠন ও সক্রিয়তা সম্বন্ধে মিচেল (*Mitchel*) বলেন যে, 'মন প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নির্জ্ঞান অদস (*Id*) থাকে। অহম (*Ego*) অদসের রূপান্তরণ থেকে উদ্ভূত হয়। অদস যখন ব্যক্তির বাইরের বাস্তবের সাথে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা পায়, তখনই অদস থেকে বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা-সম্পৃক্ত অহমের উৎপত্তি হয়। অদসের বাস্তবের দাবির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে গিয়ে এবং বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে অদসের যথাসম্ভব চরিতার্থতার জন্য অহমের উৎপত্তি। অদস বাস্তবের দাবিকে বোধের মধ্যে নিতে পারে না—সুখ-সূত্রের দ্বারা অদস চালিত হয়। পিতামাতার সাথে একাত্মীকরণের মধ্য দিয়ে অহমের 'অহম-আদর্শ' (***Ego-ideal***) সৃষ্টি হয়। অদসের যৌনতা সম্পর্কে পিতামাতার সমালোচনাভঙ্গী ও গ্রহণ-বর্জন ভঙ্গী গ্রথিত হয়ে অধিশাস্তা বিবেক হিসাবে ব্যক্তির মধ্যে কাজ করে এবং অবদমন-ক্রিয়ায় অহমকে উদ্দীপ্ত করে। অহমের 'চেতন অংশটি' বাস্তবের সাথে সংযোগ রেখে চলে, আর তার 'নির্জ্ঞান অংশটি' অদসের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে।

অহম (বাস্তব সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত), অদস (*Id*) সুখ-সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অধিশাস্তা হ'ল অহম-আদর্শ। এই তিন শক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলছে। অদস চায় তার কামজ ও আক্রমণাত্মক বাসনা চরিতার্থ করতে। অধিশাস্তা হ'ল

১। "The mind in its beginning is conceived as an unconscious Id. The Ego arises as a modification of the Id, produced by contact with the outside world through the perceptual system. It comes to existence in response to the claims of reality, and for the purpose of securing a real satisfaction of the impulses of the Id which disregards reality and is dominated by the pleasure principle By means of identification with the parents or one of the parents, an Ego-ideal is set up within the Ego, and as a super Ego, adopts the critical and condemnatory attitude of the parents towards the libidinal impulses of the Id. The Ego ideal functions as conscience and is the instigator of the repressions effected by the Ego."

—Mitchell : Problem of psycho-phthology

বিবেকসত্তা এবং অহম হ'ল বুদ্ধি-নির্ভর বাস্তব সত্তা। অহমকে অধিশাস্তার ইচ্ছা ও অদসের ইচ্ছার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলে তার বাস্তবভিত্তিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। সঙ্গতি-সাধনের প্রক্রিয়ামাত্রই দ্বন্দ্বের অবতারণা করে। এ থেকেই মনঃসমীক্ষণের একটি অত্যন্ত মূল্যবান সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হয়।

দ্বন্দ্ব (Conflict), অবদমন (Repression) এবং গূঢ়ৈষা (Com plexes) :

ফ্রয়েডের মতে প্রায় সকল ব্যবহারই অদস, অধিশাস্তা ও অহমের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণতি। এই সকল দ্বন্দ্ব মনের চেতন, প্রাক্-চেতন অথবা অবচেতন-স্তরে সংঘটিত হয়। এ দ্বন্দ্ব হয় কেন?

সাধারণভাবে আমরা দেখি, যখন দুটি বিপরীতমুখী ইচ্ছা সমানভাবে দুদিকে ব্যক্তিকে টানতে থাকে, তখন ব্যক্তি সেই মুহূর্তে কোন্‌টাকে ছেড়ে কোন্‌টাকে ধরবে, এ বিষয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হতে থাকে। এরূপ অবস্থার উদ্ভব আর এক ভাবেও হতে পারে, যেমন ব্যক্তির ইচ্ছা রূপায়ণে বাইরের শক্তির নিয়ত বাধাদান। ইচ্ছা ও ইচ্ছা-রূপায়ণে বাধাও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

এ দ্বন্দ্ব শৈশবকাল থেকেই আরম্ভ হয়। দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের যথার্থ সমাধান ব্যক্তিত্ব-বিকাশ পর্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ। আবার এ দ্বন্দ্ব যদি অস্বাভাবিক হয় এবং এর সমাধান করার শক্তি ব্যক্তির মধ্যে না থাকে, তাহলে মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয় —মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

যাদের বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতা বেশী তাদের মধ্যে এরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশী করে দেখা দিতে পারে। শুভ ও অশুভ ইচ্ছার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাল-মন্দের বিচার-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এ বিচার-ক্ষমতা বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতার একটি ধর্ম। যার বুদ্ধি যত বেশী, সে তত পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন, তার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও অধিক। আবার এদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার জন্য দ্বন্দ্বের সার্থক সমাধানও এরা করতে পারে। বুদ্ধিমান শিশুরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বেশী ভোগে। একটা পর্যায় পর্যন্ত এরূপ দ্বন্দ্ব শিশুকে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে, দ্বন্দ্ব-উত্তরণের জন্য সে নতুন সৃজনধর্মী কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বুদ্ধিমান শিশুদের দ্বন্দ্ব যেহেতু বেশী, দ্বন্দ্ব-উত্তরণের কর্মপ্রয়াসও সেই হেতু বেশী। ফলে, নতুন নতুন কর্মপ্রয়াস ও সার্থকতার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বও সঙ্গতিরক্ষায় অধিক সম্পন্ন হয়। পারিবেশিক চাপে ভেঙ্গে পড়ে না, মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে।

কিন্তু যাদের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বা শারীরিক কোন কারণে বিকৃতি দেখা যায়, তাদের মধ্যে সামর্থ্য ও অভিলাষের মধ্যে যে দূরত্ব, তা অনুধাবন করে শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচিত হ'ল, তা অনেকাংশে চেতন মনের দ্বন্দ্ব। ফ্রয়েড দ্বন্দ্বের আরও গভীরতর কারণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, অদসের ইচ্ছা (যা প্রধানতঃ যৌন-কামনাযুক্ত ও আক্রমণধর্মী) যখন চরিতার্থ হবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন বাস্তবের বাধা ও অধিশাস্তার শাসনে তা প্রতিহত হয়, এবং দুই বিপরীত-মুখী ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একদিকে আদিম ইচ্ছা ও অপরদিকে মানসিক ও আত্মিক বিধি-নিষেধ। এ দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তির মধ্যে অস্বস্তি ও যন্ত্রণার উদ্ভব হয়। এ অস্বস্তির নিরসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ব্যক্তি তা করতে চায়। শিক্ষাগত সংস্কার, ধর্মীয় সংস্কার, অদস্ ইচ্ছার নগ্ন পরিতৃপ্তির পথে বাধা দেয়। এ দ্বন্দ্বের সমাধান তিন ভাবে হতে পারে। অদস ইচ্ছা, বাস্তবকে ও অধিশাস্তার দাবিকে অগ্রাহ্য করে সরাসরি চরিতার্থ হতে পারে, কিংবা অদস ইচ্ছাকে অহম্ জোর করে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, অথবা এ সকল ইচ্ছাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, যাতে সমাজ-অনুশাসন ও অধিশাস্তার অনুশাসনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্ত উপায়ে এ সকল ইচ্ছার চরিতার্থ করা যায়। প্রথম পথ অর্থাৎ অদস ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিপূরণ সম্ভব নয়, কেননা বাস্তব সেখানে অত্যন্ত কঠোর বাধা দিয়ে থাকে, অন্য পথ হচ্ছে অদস-ইচ্ছাকে পরাস্ত করা, অদস-ইচ্ছার আকুতিকে একেবারে নিশ্চুপ করে দেওয়া। তৃতীয় পথটি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। তৃতীয় পথে অদস-ইচ্ছার পরিপূরণের জন্য শিক্ষা, পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ ও সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন। অদস-ইচ্ছার গতি এক দিকে, আত্মসম্মানবোধ, সামাজিক বিধি-নিষেধের গতি অন্যদিকে। এই বিপরীতমুখিতার জন্য দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। এ দ্বন্দ্ব নির্জ্ঞান স্তরেই চলতে থাকে। অহম একদিকে অধিশাস্তা ও অপরদিকে অদসের ইচ্ছার দ্বারা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত ও জর্জরিত হতে থাকে। একদিকে অধিশাস্তা ও অহমের সমাজধর্মী ইচ্ছা অর্থাৎ প্রতিবন্ধ (*Censor*) শক্তি, অপরদিকে অদসের অন্ধ ইচ্ছা—এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির দ্বন্দ্ব নির্জ্ঞান মনেই হতে থাকে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি-প্রয়াসেই অবদমন-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।

নির্জ্ঞান মনে যেন একটি ছোট ঘর আছে। এ ঘরের মধ্যে যেন অজস্র বাসনা, যেন একের পর এক অগণিত ব্যক্তির মত ভিড় করছে। ঠিক এর সঙ্গেই যেন রয়েছে আরও একটা ছোট ঘর, যেন অভ্যর্থনার ঘর। এ দুটি ঘরের মাঝা-

মাঝি জায়গায় যেন একজন প্রহরী রয়েছেন, যিনি সকল ইচ্ছাকে পরীক্ষা করে দেখেন, বিচার করেন এবং অনেক ইচ্ছার প্রবেশাধিকারে বাধা দেন। এর ফলে নির্জ্ঞান-স্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে—এ উত্তেজনা চেতন-স্তরে পেঁছিয় না। যখন এসব ইচ্ছা প্রহরী দ্বারা (*Censor*) প্রতিহত হয়ে নির্জ্ঞানেই ফিরে আসে—চেতন-স্তরে আর পেঁছিতে পারে না, তখন এইসব ইচ্ছার অবদমন ঘটে। এই প্রক্রিয়াকেই বলি আমরা **অবদমন** (**Repression**)। এদিক থেকে অবদমন সম্পূর্ণরূপে একটি নির্জ্ঞান-প্রক্রিয়া।

দ্বন্দ্বের পরিণামে অবদমন দেখা দেয়। দ্বন্দ্ব মাত্রই শক্তিক্ষয়কারী। **এ দ্বন্দ্ব অবসানের জন্য আমাদের মন নানাপ্রকার আত্মরক্ষাকারী কৌশল প্রয়াস (Defence mechanisms) অবলম্বন করে থাকে।**[১] সাময়িকভাবে হলেও একটা শান্তির প্রয়াস চলতে থাকে।

অবদমিত ইচ্ছা কিন্তু মরে যায় না। অবদমিত ইচ্ছারা প্রহরীর চোখে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, দিবা-স্বপ্ন, ভুল-ভ্রান্তি, উদ্বায়ুরোগের সংলক্ষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অবদমিত ইচ্ছাগুলিই চরিতার্থ হওয়ার প্রয়াস করে।[২]

যে-সব ক্ষেত্রে অবদমন সার্থকভাবে ঘটে থাকে, সেখানে কোন খারাপ ফল দেখা দেয় না। কিন্তু যেখানে অবদমন অসম্পূর্ণ, সেইখানেই যতপ্রকার মানসিক অসুস্থতা ও বৈকল্য দেখা দেয়। **এই সকল অতৃপ্ত অবদমিত ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞানে সক্রিয় থাকে। ধীরে ধীরে এইরূপ একটি সক্রিয় অবদমিত ইচ্ছা অন্য একটি সমধর্মী অবদমিত ইচ্ছার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। এমনি করে একই প্রকারের বহু অবদমিত ইচ্ছা একত্রিত হয়ে একটি জট বা গূঢ়ৈষার (Complex) সৃষ্টি করে।** এ সকল অবদমিত ইচ্ছা বা গূঢ়ৈষা সর্বদাই চেষ্টা করে চেতন-মনে হানা দেবার। এই সকল অবদমিত ইচ্ছার দল

১। Sometimes the conflict is resolved in an economical fashion in various manners through the so-called mechanism. These mechanisms are various unconscious or conscious processes whereby the inner conflict situation is eliminated or reduced in its severity.

—Brown : Psycho-dynamics of Abnormal behaviour

২ When they are more serious, however become the afflictions of the hysteric, the delusions of the psychotic, the fears and obsessions of the psychotic, and even the productions of the genius.

—Brown : Psychology and the Social order

যেন বিদ্রোহী। বিদ্রোহী বলা হ'ল এই জন্য যে, এ সকল ইচ্ছা সর্বদাই চেতনে যেতে চায়, কিন্তু নিয়তই নির্জ্ঞানের প্রহরীরা (*Censor*) এদের প্রতিহত করতে চায়। যে অন্তর্বন্দ্ব থেকে গূঢ়ৈষার জন্ম হয়, তার প্রথম সূচনা হয় চেতন মনেই, কিন্তু গূঢ়ৈষা সৃষ্ট হয়ে গেলে তা নির্জ্ঞানে চলে যায়।

কখনো কখনো প্রহরীকে (*Censor*) ফাঁকি দিয়ে, এই সকল অবদমিত ইচ্ছা নানা-ভাবে চেতন মনের স্তরে পেঁাছে যায়।

বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের মধ্যে বই খাতা ছিঁড়ে ফেলা, পেন্সিল কলম ভেঙে ফেলা, বাড়ীর কাজ নিয়ে আসতে ভুলে যাওয়া প্রভৃতি সংলক্ষণ ছাত্রের নির্জ্ঞানে বিদ্যালয় বা শিক্ষক সম্বন্ধে অনীহা থেকে দেখা দিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ছাত্রের মনের গভীরে কোন দ্বন্দ্ব চলতে থাকে।

বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া বা অন্যান্য দুষ্ক্রিয়তাও ছাত্রছাত্রীর অত্যধিক অবদমনের ফলস্বরূপ। অনেক সময় কোন কোন ছাত্রের মধ্যে সহপাঠীদের বইপত্র চুরি করতে দেখা যায়, এটাও অবদমিত কোন ইচ্ছা চরিতার্থ করার একটা উপায় মাত্র। পড়াশুনায় অমনোযোগিতা, অন্যমনস্কতা, অল্পতে রেগে যাওয়া, বিষণ্নতা প্রভৃতি সংলক্ষণও ছাত্রছাত্রীর অত্যধিক অবদমনের পরিণতি হিসাবে দেখা দেয়। অস্বাভাবিক বিস্মৃতি বা কোন কাজে অতিমাত্রিক উৎসাহ প্রভৃতি উপসর্গও অবদমনের জন্য দেখা যায়। মোটের উপর দ্বন্দ্ব ও অত্যধিক অবদমন যদি ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ থাকতে পারে না, যদিও এ অবস্থায় মনের আত্ম-রক্ষাকারী কৌশল (*Defence Mechanism*) ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার নানা প্রকার চেষ্টা করে থাকে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা ঃ

শিশু যা চায় তাই পায় না। বাস্তব অবস্থা তার আঘাত-প্রতিঘাতে শিশুর অনেক চাওয়াকে পঙ্গু করে ফেলে—প্রতিহত করে। অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। এ অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক সমাধান যদি না হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়—শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান নানাভাবে হতে পারে।

॥ ১ ॥ **সন্তোষ প্রদানকারী গঠনাত্মক প্রয়াস**—হীনমন্যতাবোধ থেকে যদি শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যেমন আপন শক্তি স্বল্পতার কথা মনে রেখে যদি সে অন্য কোন ভাল ছাত্রের সাথে তুলনা করতে আরম্ভ করে, তাহলে এরূপ

ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্বস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য সে হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনা আরম্ভ করবে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষ হয়ে ওঠার সর্বপ্রকার প্রয়াস করবে, নয়ত সেটা অসম্ভব প্রতীত হলে সে অন্যবিষয়ে পারদর্শী হওয়ায় যেমন খেলাধূলা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতি কোন না কোন ক্ষেত্রে নিপুণতা দেখিয়ে নিজের হীনতাবোধ দূর করার চেষ্টা করবে। এ দুই-এর কোনটিই যদি সে গ্রহণ করতে না পারে, তা হলে সে মরিয়া হয়ে সকলের মতামত, বিশেষ করে গুরুজনদের মনোভাবকে আহত ও অপমানিত করে দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ও অস্বস্তির ভার লাঘব করার চেষ্টা করবে। এ সব ক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিপূরক গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানই শ্রেয়—এ থেকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথার্থভাবে হতে পারে।

॥ ২ ॥ **অবস্থার পর্যালোচনা**—যে অবস্থা শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটায়, সে অবস্থার কোন্ অংশটি বিশেষভাবে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য দায়ী সেটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সে অবস্থার যাতে উদ্ভব না হয় তার দিকে পূর্ব থেকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হয় তাহলে শিশুকে অন্য সুস্থ পরিবেশে স্থানান্তরিত করতে হবে। শিশুকে যদি অবস্থার পর্যালোচনা করে সঠিকভাবে দেখিয়ে দেওয়া যায় কোন্ ঘটনা বা শক্তি তার ইচ্ছা-পরিতৃপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে—তার ইচ্ছার অবাস্তবতা কতটুকু, ইচ্ছার পরিণাম কি, তা হলে শিশুর দ্বন্দ্বের কারণ অনেকাংশে তিরোহিত হতে পারে, কেন না বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে সে নিজেই অবস্থাকে খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারে তার অপরিণামদর্শিতা কি ভাবে কাজ করছে, তার ইচ্ছার অবাস্তবতাও যে কতটা সেটাও উপলব্ধি করতে পারে। নিজের চিন্তাজালকে নিজেই অবলোকন করার শিক্ষা শিশু যেন পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট থেকে পায়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে যাতে নিজের দ্বন্দ্বের কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হয়, এরূপ শিক্ষায় শিশুকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়। কেন না অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যে প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি ও সমস্যা দেখা দেয় তা ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎসমূলে আঘাত না করে কেবল জোর করে অন্তর্দ্বন্দ্ব মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। ঠিক সময়ে দ্বন্দ্বের সমাধান না ঘটালে, শিশুর মধ্যে অবদমন, দিবাস্বপ্ন, পলায়নপরতা নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ দেখা দেবে। এরূপ অস্বাস্থ্যকর উপায়ে দ্বন্দ্বের সমাধান করার চেষ্টা শিশুর মানসিক জটিলতা ক্রমে বৃদ্ধি করে; ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে রুদ্ধ করে—মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হতে থাকে।

প্রবৃত্তি ও যৌন-মানস শক্তির সিদ্ধান্ত : লিবিডোর স্বরূপ (The Theory of Instincts and Libido) :

দ্বন্দ্ব অবদমন ও গূঢ়ৈষা সৃষ্টির কারণ নির্ণয়ে আমরা দেখেছি যে, একদিকে অদস্ ইচ্ছা ও অপর দিকে সামাজিক ও আত্মিক অনুশাসনের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তার পরিণতি হিসাবেই অবদমন আরম্ভ হয়। দ্বন্দ্ব সুখাশ্রয়ী অদস্ ইচ্ছা ও বাস্তবা-শ্রয়ী অহমের মধ্যে ঘটে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে নিশ্চতরূপে জন্মগত দুটি জৈব-মানসিক মৌল এষণা আমাদের মধ্যে রয়েছে—একটি হল জীবন-এষণা, অপরটি হল মরণ-এষণা। প্রথমটি হল ভালবাসা, জীবন সম্পর্কে গভীর অনুরাগ, দ্বিতীয়টি হল আক্রমণ, ধ্বংস, মৃত্যুর ইচ্ছা। ব্যক্তির এই সকল মৌল ইচ্ছাগুলি তার দেহ ও মনের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে পরিবেশের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় চরিতার্থ হয়। সকল কর্মপ্রয়াসের মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই জীবন-এষণা বা মরণ-এষণাই কাজ করে। এই প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্তির জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার দ্বারা বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

যে শক্তি আমাদের কোন কিছু গঠন করতে, কোন কিছু সৃষ্টি করতে আমাদের আত্মরক্ষায় ও বংশরক্ষায় প্রবৃত্ত করে, তার উৎস হল জীবন-এষণা বা ভালবাসার প্রবৃত্তি (*Eros or life instinct*)। এর উদ্দেশ্য হল একের সাথে অপরকে প্রেম বন্ধনে, ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করা ; এরকম করে ধীরে ধীরে বৃহত্তর গণ্ডীর সৃষ্টি করা। নিজেকে নিজে ভালবাসা, অপরকে ভালবাসা, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষার শক্তি ও ইচ্ছা উৎসারিত হয় জীবন-এষণা (*Eros*) থেকে। অপরপক্ষে যে ইচ্ছা ও শক্তি আত্মহনন, অপরকে হননে প্রবৃত্ত করে তা আসে মরণ-এষণা (*death instinct or thanatos*) থেকে। প্রত্যেকটি জীব-কোষের মধ্যেই জৈবিক দিক থেকেও এক দিকে যেমন বিকাশ বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা ও শক্তি আছে, আবার এর মধ্যেই রয়েছে ধ্বংস ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়তি ও গতি। জৈবিক দিক থেকে এই জীবন-ইচ্ছাই ব্যক্তির আত্মরক্ষার ও বিকাশের কারণ-শক্তি। মানসিক দিক থেকে এ থেকেই যৌনেচ্ছা ও অন্যান্য রক্ষণ কাজ, অথবা খাদ্য-অন্বেষণ, নীড়-রচনা, বসন-বয়ন ও নানাপ্রকার বুদ্ধিপ্রবুদ্ধ কাজ উৎসারিত হয়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মরণ-প্রবৃত্তি থেকেই আসে আক্রমণধর্মিতা, অপরকে পীড়ন, অপরকে বিদ্রূপ করা, আত্মপীড়ন ও আত্মহত্যা, অপরকে আক্রমণ করা ও হত্যা করার ইচ্ছা।

এ দুটি প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও পরস্পরনিরপেক্ষ শক্তি নয়। এ দুটি

প্রবৃত্তি পরস্পর মিলেমিশে কাজ করে। ভালবাসা ও ঘৃণা, ধ্বংস ও সৃষ্টি, জীবন ও মৃত্যু মিলেমিশে একের সাথে অপরে জড়িয়ে আছে। এ থেকেই ফ্রয়েডের দ্বৈততার (*ambivalence*) ধারণা এসেছে। ফ্রয়েডের মতে, কোন পুরুষের কোন নারীর প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালবাসা ও প্রণয়ের মধ্যেও কিছু পরিমাণ অনীহা ও আক্রমণের মনোভাব আড়ালে থেকে যায়। চেতনে ভালবাসা থাকলে নির্জ্ঞানে ঘৃণা থেকে যায়, অপর পক্ষে চেতনে ঘৃণা থাকলে নির্জ্ঞানে ভালবাসা থাকে।

লিবিডোর স্বরূপ :

ফ্রয়েডের প্রবৃত্তির সিদ্ধান্তের সঙ্গেই (*libido*) যৌন-মানস শক্তির সিদ্ধান্ত জড়িত। *Libido* হল সকল মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উৎস-শক্তি। ফ্রয়েড্ অবশ্য এ শক্তিকে বলেছেন যৌন-মানস শক্তি—জীবন-প্রবৃত্তি বা জীবন-এষণার সকল শক্তির উৎস-মূল। জীবন-প্রবৃত্তির শক্তির আধার হল এই লিবিডো, এ শক্তি অপরকে নিকটে আনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। সকল প্রকার ভালবাসার উৎসশক্তি হল লিবিডো। যৌন-প্রেম, আত্ম-প্রেম, পিতামাতার ভালবাসা, বন্ধুত্ব—সকল প্রকার ভালবাসার মূলেই আছে এ যৌন-মানস শক্তি বা লিবিডো। ফ্রয়েডের মতে যৌন-মানস শক্তিই শিশুর মধ্যে যৌন-জীবনের সূচনা করে; যৌন-মানস শক্তি যখন বাইরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে, তখনই অন্য ব্যক্তিকে সে ভালবাসতে আরম্ভ করে। যখন এ শক্তি নিজের দিকে প্রবাহিত হয়, তখন আরম্ভ হয় আত্ম-রতি। এর প্রবাহপথ যদি কোন কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই **লিবিডোর সংবন্ধন** (**fixation**) ঘটে। কখনও কখনও এ প্রবাহধারা সম্মুখবর্তী না হয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে থাকে (*Regression*)। এই যৌন-মানস শক্তির গতি-পথকে জৈবিক যৌন-পথ থেকে অন্য সামাজিক ও আত্মকল্যাণকারী পথে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় উদ্‌গতি (*Sublimation*)।

যৌন-মানস শক্তির গতিপ্রবাহের তিনটি দিক আছে। যখন শিশু নিজের শরীর থেকে, নিজেকে কেন্দ্র করেই তার যৌনতার চরিতার্থ ঘটায়, তখন তাকে বলা হয় স্বকাম (*auto-erotic*) পর্যায়। ধীরে ধীরে শিশুর জ্ঞান বাড়ার সাথে সাথে নিজের অস্তিত্বকে অন্যের সাথে তুলনা করে স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে ভাবতে শেখে। নিজেকেই সে ভালবেসে ফেলে। যৌন-মানস শক্তির সকল দাবি শিশু আপন সত্তাকে কেন্দ্র করেই এ স্তরে মিটিয়ে নেওয়ার প্রয়াস করে। একেই বলা হয় আত্মরতি বা আত্মপ্রেম (*Narcissistic stage*)। ক্রমে যৌন শক্তি নিজেকে

ছাড়িয়ে অন্য ব্যক্তিতে ধাবিত হয়, প্রায়শই এ ক্ষেত্রে মা'ই হল সেই ব্যক্তি যার মধ্য দিয়ে শিশু তার যৌন-মানস শক্তির দাবিগুলিকে চরিতার্থ করে থাকে। এই পর্যায়ে 'ঈডিপাস' অবস্থার উদ্ভব হয়।

এটা সত্য যে, লিবিডো বলতে যৌনেচ্ছা চরিতার্থ প্রয়াসের জন্য যে আকুতি এবং সকল প্রকার যৌনক্রিয়ার পিছনে যে শক্তি কাজ করে তাকে বোঝায়, তবু লিবিডো বলতে কেবল যৌন-ইচ্ছা বা আকুতি বোঝায় না। লিবিডো হল যৌন-মানস শক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার জীবনতৃষ্ণা ও উদ্যমের প্রেরণা ও শক্তি। লিবিডো সম্পূর্ণ রূপে মানসিক শক্তি—দেহাতিক্রান্ত শক্তি। দেহের বিকাশ-বৃদ্ধির সাথে একে এক মনে করলে ভুল করা হবে।[১]

সকল ব্যক্তির মধ্যেই এ শক্তি সমান পরিমাণে থাকে না। লিবিডোর যে বিকাশপর্ব তাও সকলের ক্ষেত্রে একভাবে সমাধা হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে লিবিডোর বিকাশ-বিন্যাস ভিন্নভাবে ঘটতে পারে। লিবিডোর বিকাশ ও পথ-পরিক্রমা যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে হয় তা হলেই ব্যক্তিত্ব সুস্থভাবে গড়ে ওঠে। **লিবিডোর** বিকাশ-পর্যায়ের কোন অধ্যায়ে যদি বিশৃঙ্খলা বা জটিলতার সৃষ্টি হয়, তা হলেই ব্যক্তিত্ব-বিকাশ রুদ্ধ হয়, ব্যক্তিত্বে নানা প্রকার বৈকল্যের উদ্ভব হয়। ফ্রয়েডের মতে, লিবিডোর বা যৌন-মানস শক্তির পরিমাণ, তার প্রবাহধারা এবং তার উপর পারিবেশিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়া—এসকল অবস্থার উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের প্রকার ও সংগঠন।

লিবিডোর বিকাশ-ধারা ঃ

ফ্রয়েডের মতে, যৌনেচ্ছা বা যৌনতৃষ্ণার পিছনে যে শক্তি, সে শক্তিই হল লিবিডো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফ্রয়েড্ 'যৌন' তৃষ্ণা বলতে সঙ্কীর্ণভাবে কেবল যৌন-জীবনকেই বোঝাননি, সকল প্রকার আসক্তি ও ভালবাসাকে (তার মধ্যে যৌন-জীবনও বাদ নয়) বুঝিয়েছেন। যৌনেচ্ছার অত্যধিক অবদমন থেকেই উদ্বায়ু রোগের উদ্ভব হয়। অবদমিত ইচ্ছারা গতিবেগসম্পন্ন (*dynamic*)। এ সকল ইচ্ছা সর্বদাই চরিতার্থ হবার প্রয়াস করে। উদ্বায়ু রোগের সংলক্ষণের মধ্যে এ

১। The Libido is prior to sex—it is a form of the primal life energy which is only later monopolised by the sex instincts. It continues to manifest itself in the individual life after the sexual functions have apparently ceased and is the motive force of various interests and pursuits.

—Mitchell : Problem of Psycho-Pathology.

সকল ইচ্ছার প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত প্রকাশ হয়ে থাকে। এ অবদমন থেকে সর্বদাই যে উন্মায়ু রোগ হবে এমন কোন কথা নেই, কখনও এ সকল অবদমিত ইচ্ছার উদ্গমনও হতে পারে। এর ফলে অনেক মহৎ শিল্প, সাহিত্য ও কল্যাণকর কাজ হতে পারে। ফ্রয়েড্ এসব থেকে প্রমাণ করার প্রয়াস করেছেন যে, মানুষের জীবনে যৌনেচ্ছার বিশেষ গতিপ্রকৃতি রয়েছে ও এর সবিশেষ ভূমিকা আছে।

ফ্রয়েড্ মনঃসমীক্ষণে যৌনতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান সিদ্ধান্ত করেছেন—

(ক) যৌন-জীবনের সূচনা বয়ঃসন্ধিকাল বা নবযুবকালে হয় না। এর প্রথম প্রকাশ জন্মের অব্যবহিত পরেই দেখা যায়।

(খ) কেবল যৌনলিঙ্গের ক্রিয়া-কারণের সাথেই যৌনতা বা যৌন-জীবন জড়িত, এরূপ ধারণা, ফ্রয়েডের মতে ভুল। অনেক ক্রিয়াকাণ্ড যৌনতার অন্তর্ভুক্ত, যার সাথে যৌনাঙ্গের (*genitals*) কোন সম্পর্ক নেই।

(গ) যৌনতার প্রধান কাজ হল শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে সুখ আহরণ করা ; যৌনতার বংশবৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক আছে সত্য, কিন্তু যৌনতা ও বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছা সর্বদা এক নয়। যৌনতা অর্থে কেবল সুখ-স্পৃহা বোঝায়।

ফ্রয়েড্ সেই আচরণকেই যৌনমূলক আচরণ বলে অভিহিত করেছেন, যে আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শারীরিক ঘনিষ্ঠতার প্রবণতা ও প্রয়াসও থাকে। ফ্রয়েডের মতে, যৌন-মানস শক্তির প্রবাহধারা ও বিকাশের কতকগুলি স্তর আছে। জন্মক্ষণ থেকেই এ যৌন-মানস শক্তি বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে একটা পরিণততর দিকে এগিয়ে চলে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ বা মনের ক্রমপরিণতি দুই-ই এ যৌন-মানস শক্তির সুস্থ-গতিপ্রবাহের উপর নির্ভর করে।

লিবিডোর ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর আছে।

(ক) শৈশবকাল (জন্মকাল থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত)

(খ) প্রসুপ্তি কাল (পাঁচ থেকে বার বছর)

(গ) নবযুবকাল (বার থেকে কুড়ি/একুশ বছর)

ফ্রয়েডের মতে, লিবিডো-বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল শৈশবকাল।

শৈশবকাল :

ফ্রয়েডের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য এই যে, শিশুরও যৌনতা আছে। যৌনতার

প্রকাশ নানাপ্রকারে হতে পারে। জন্মকাল থেকে পাঁচবছর পর্যন্ত শিশুর আচার-আচরণ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার গতি-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড্ সিদ্ধান্তে আসেন যে, এ পর্যায়েও যৌনতা বা যৌনেচ্ছার উদ্গম হয় ও তার চরিতার্থতার নানা প্রয়াস চলে। ফ্রয়েড্ উদ্বায়ু রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও দেখেছেন জীবনের প্রথম পাঁচ বছরের আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তিতে বাধা ও জটিলতা যে ব্যর্থতা ও হতাশাবোধ শিশুর জীবনে আনে, তা থেকেই পরবর্তীকালে তার মধ্যে নানাপ্রকারের মানসিক জটিলতা ও বিকৃতির উদ্ভব হয়। এ সকল হতাশা বা ব্যর্থতা মূলত জীবন-এষণার সাথে যে লিবিডো বা কামশক্তি সম্পৃক্ত তার চরিতার্থ প্রয়াসের ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত। এই কারণেই ফ্রয়েড্ মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে গেলে শৈশবকালীন যৌনতার যাথার্থ্য বোঝা সমীচীন। এ স্তরে যদিও শিশুর মধ্যে যৌনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তথাপি এ স্তরে নবযুবকালে যেরূপ স্পষ্ট যৌনতার লক্ষণ দেখা যায়, ততটা স্পষ্টভাবে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। নবযুবকালে যৌন-গ্রন্থির (*gonads, endocrine glands*) কার্যকারিতা আরম্ভ হয়, তার ফলে যৌন-আকৃতি ও যৌনতার প্রকাশ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। নবযুবকালে যৌনতার যেরূপ স্পষ্ট একটি উদ্দেশ্য প্রকট হয়, শৈশবকালে যৌনতার তেমন স্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য প্রতীত হয় না। বংশবৃদ্ধির উপযোগী দৈহিক পরিপক্কতা শিশুর মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু যৌনতার মধ্যে যে সুখপ্রাপ্তির উদগ্র ইচ্ছা থাকে, তা চরিতার্থ করার প্রয়াস শৈশবকালেও চলতে থাকে[১]।

দৈহিক সুখপ্রাপ্তিই এ স্তরে যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য। শরীরের বিশেষ বিশেষ আরামদায়ী অংশ ব্যবহার করে এ সুখ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করা হয়। এ সকল আরামদায়ী শরীর-অংশগুলিকে উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করে শিশু সুখ বা আরাম পেয়ে থাকে। আরাম বা সুখের জন্যই সে এ শরীরের অংশগুলিকে উদ্দীপ্ত করে। মুখ, হাত, চোখ ও যৌনাঙ্গ (*erogenous zones*), শরীরের এই সকল অংশ যখন উদ্দীপিত হয়, তখন যৌন-সুখানুভূতি হয়ে থাকে। এ অবস্থাকে **আত্ম-রতি (auto-erotic)** পর্যায় বলা হয়। লিবিডো বিকাশের এটা হল প্রথম পর্যায়। লিবিডো এখন পর্যন্তও কোন বাইরের ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হয় না। প্রিয়পাত্র হিসাবে সে

১। Although the child manifests sexuality, yet 'the sex drive has not the intensity that it will have in adolscence when the sex glands and hormones have matured, and it does not yet have the definite aim of the sexually exicted adult.

—Woodworth R. S.: Contemporary School of Psychology

অন্য কারও প্রতি আবিষ্ট বা আসক্ত হয় না। নিজের সম্পর্কেই নিজে আসক্ত থাকে। এ পর্যায়ে শিশুর যৌনতা পরিতৃপ্তিতে কোন লজ্জা বা ঘৃণাবোধ থাকে না, কোন প্রকার অপরাধবোধও দেখা দেয় না। ফলে, শিশু তার মন যা চায় তাই দেখতে, স্পর্শ করতে, শুনতে, স্বাদ ও ঘ্রাণ নিতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। যেমনি করে পারে শিশু সুখ পেতে চায়, আরাম নিংড়ে নিতে চায়। **এমন আচরণের জন্যই শিশুর যৌন-জীবনকে বলা হয় 'বহুমুখী-অজাচারী'** (**Polymorphoperverse**)। এ সময় তার এরূপ আচরণ অস্বাভাবিক ও অনৈতিক কিছু নয়।

এরূপ আত্ম-রতির পর্যায় তিন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়—(ক) মৌখিক অধ্যায় (*Oral phase*), (খ) পায়ু অধ্যায় (*Anal phase*) ও (গ) লিঙ্গগত অধ্যায় (*Phallic phase*)।

(ক) **মৌখিক অধ্যায়**—শিশু একেবারে প্রথমাবস্থায় মুখ দিয়ে মাতৃস্তন্য-পানের মধ্য দিয়ে তার জৈবিক ক্ষুধা ও লিবিডোর বা যৌনতার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করে থাকে। লিবিডোর বিকাশের অধ্যায়কেই বলা হয় মৌখিক অধ্যায় (*Oral erotic*)। এই সময় শিশু তার মুখের নানাবিধ সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে সুখ আহরণ করে থাকে। প্রথমদিকে চোষা এবং পরে কামড়ান, চিবানো প্রভৃতি কর্মকাণ্ড থেকেই শিশু তার যৌনতার পরিতৃপ্তি ঘটায়। ঐ অবস্থাকে বলা হয় মৌখিক-ধর্ষণমূলক (*Oral-Sadistic*) পর্যায়। এই সময়েই শিশুর মধ্যে ধ্বংসস্পৃহা স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে—আসবাবপত্র ভাঙ্গাচোরা করার মধ্য দিয়ে সে লিবিডোর তৃপ্তি খুঁজে পায়। এই সময় শিশু খুব প্রবল হয়ে ওঠে। শিশুর মাতৃস্তন্যপান জৈবিক ক্ষুধার দ্বারা উদ্দীপিত হয়, কিন্তু অনেক সময় ক্ষুধা ছাড়াও শিশু মাতৃস্তন চুষতে থাকে, এরূপ চোষণ-কার্যের মধ্য দিয়ে শিশু সুখ আহরণ করে এবং এই সুখ, ফ্রয়েডের মতে, যৌনতার সুখ।

(খ) **পায়ু অধ্যায়**—তিন-চার বৎসর বয়সে শিশু মল নিঃসরণ-প্রক্রিয়া থেকে যৌন-সুখ আহরণে প্রয়াসী হয়। কখনও কখনও শিশু অধিকতর সুখ পাওয়ার জন্য এ সময়ে মল ইচ্ছা করে আবদ্ধ করে রাখে এবং এর জন্য মলনালী ও পায়ুদেশে যে উত্তে-জনার সৃষ্টি হয় তা থেকে অধিক সুখলাভের চেষ্টা করে। এ স্তরকেই বলা হয় **পায়ু-স্তর**। এ সময়ে শিশুর মধ্যে আক্রমণধর্মী আচরণ, যেমন মায়ের স্তন কামড়ানো, খেতে দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। এজন্য এ অধ্যায়কে পায়ু-আক্রমণতার (*oral sadistic*) সময় বলেও অভিহিত করা হয়।

(গ) **লিঙ্গ অধ্যায়**—পায়ু পর্যায়ের পরেই দেখা যায় লৈঙ্গিক স্তর (*Phallic*

stage)। এ সময়ে প্রথম শিশু নির্দিষ্ট লিঙ্গস্থানের সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে সুখপ্রাপ্তির প্রয়াস করে। লিঙ্গস্থানের মধ্য দিয়ে যৌনতার তৃপ্তির আগে শিশু মুখ, পায়ু ও অন্যান্য স্থান থেকে যৌন তৃপ্তি লাভ করে থাকে। স্বতঃকাম (***auto-erotic***) স্তরে লিবিডোর আসক্তি প্রথম আপন দেহের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন সুখানুভূতিতে সীমাবদ্ধ থাকে। এখানেই স্বতঃরতি স্তরের আরম্ভ। পরে **ক্রমে শিশুর অহম বোধ তীক্ষ্ণ হতে থাকে, অহংসত্তার বিকাশ হতে থাকে।** স্বতঃকাম স্তরের এটিই হল পরিণত রূপ। এই স্তরকে স্বকাম বা আত্মরতি (*Narcissism*) বলা হয়।

নার্সিসাস কথাটির একটি বিশেষ পৌরাণিক তাৎপর্য আছে। এ কথাটি এসেছে গ্রীক পৌরাণিক নার্সিসাসের কাহিনী থেকে। নার্সিসাস জলে নিজের ছায়াকে ভালবেসে ফেলেছিল। এ থেকেই নিজেকে নিজের ভালবাসা বা আত্মরতির পর্যায়টিকে ***Nercissism*** বলা হয়।

স্বকামাবস্থা কিন্তু আবার অহংসত্তার বিকাশকে সাহায্য করে, ব্যক্তি সর্বদাই নিজেকে ভালবাসে। নিজেকে ভালবাসার পরিমাণ যদি অতিমাত্রিক হয় তাহলে ব্যক্তি আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়। নবযুবকালে স্বকামাবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়। নবযুবক-যুবতীরা এ সময়ে আবার নতুন করে যেন নিজের প্রেমে নিজেরা হাবুডুবু খেতে থাকে।

লিঙ্গ-স্তরেই ঈডিপাস গূঢ়ৈষার (*Oedipus com**plex***) উদ্ভব হয়। এই স্তরে লিবিডো অহংকে ছেড়ে বাইরের ব্যক্তির সাথে, বিশেষ করে অব্যবহিত সান্নিধ্যে যাঁরা আছেন, যেমন মা বাবা, তাঁদের সাথে আবদ্ধ হতে চায়। সাধারণত ছেলের লিবিডো মা'র সাথে ও মেয়ের লিবিডো বাবার প্রতি আবদ্ধ হয়। ছেলে নিজেকে বাবার সাথে একাত্ম হয়ে মাকে নিজের আসক্তির পাত্রী করে তোলে। আর মেয়ে মা'র সাথে একাত্মতা করে (***identification***) বাবাকে একান্তভাবে ভালবাসতে চায়। প্রথম ক্ষেত্রে, ছেলে মাকে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাবাকে একান্তভাবে পাওয়ার বিষয়ে মা'কে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ফ্রয়েড্, শিশুর এই মানসিকতার নাম দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স বা গূঢ়ৈষা। সুপ্তিকাল (***latent period***) আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর, মা-বাবার প্রতি যৌনাসক্তি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং এ আসক্তি ক্রমে যৌনতাবর্জিত ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। ঈডিপাস স্তরেই শিশুর অধিশাস্তার অভ্যুদয় ঘটে। মা বাবার আরোপিত বিধিনিষেধ ও তাঁদের ব্যক্তিসত্তার অনেকাংশ শিশুর নিজের

সত্তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত ও গ্রথিত হয়ে তার মধ্যে নৈতিকবোধ ও আচরণের একটি মূল্যমান সৃষ্টি করে।

সুপ্তিসময়—যৌন-মানস শক্তির বিকাশ পর্যায়ে শৈশবকালের পর আসে সুপ্তিসময়। **এই সময়টি পাঁচ থেকে বারো বছর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।** এ সময়ে মনের একটা স্থিরতা আসে ও ঈডিপাস গূঢ়ৈষার সময়ে যে মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা দেখা দেয়, তার উপশম হয়। যৌনতা ও স্বকামের বাহ্যিক অভিব্যক্তি এ সময়ে অনেক কমে যায়। বাবা মা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি এ সময়ে শিশুর যে আসক্তি দেখা যায় তার মধ্যে যৌনতার প্রকাশ অত্যন্ত কম থাকে। এই সময়ে অহংসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে, এবং অধিশাস্তাও সৃষ্ট হ'য়। ঈডিপাস স্তরে যৌনেচ্ছার অবদমনের ফলে, পিতামাতা ও শিক্ষকদের সাথে একাত্মতার ফলে অধিশাস্তার সৃষ্টি হয়।

নবযুবকাল—বারো বছর থেকে নবযুবকাল আরম্ভ হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে যৌন-জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, তা এ সময় থেকেই আরম্ভ হয়। শারীরিক দিক থেকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনগ্রন্থির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এর ফলে মানসিক দিকেও কতকগুলি সুস্পষ্ট পরিবর্তন আসে। যৌন চেতনার উন্মেষ হয় অর্থাৎ ছেলে মেয়ের প্রতি ও মেয়ে ছেলের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। শৈশবকালে যে যৌনতার উদ্বেল ক্রিয়াকাণ্ড চলে, যার প্রকাশ সুপ্তিসময়ে স্তিমিত থাকে, সেই শৈশবকালীন যৌনতা যেন নবযুবকালে আবার ফিরে আসে ; ফিরে আসে সে উদ্বেলতা ও চাঞ্চল্য। ফ্রয়েডের মতে নবযুবকাল (*adolescence*) শৈশবকালেরই পুনরাবৃত্তি। শৈশবকালীন পূর্ণাঙ্গ যৌনাভিজ্ঞতা নবযুবকালে নতুন করে ঘুরে আসে। উদ্দাম যৌনেচ্ছা ও ভালবাসা ভিন্নভাবে প্রকাশে ব্যক্তি উন্মুখ হয়ে ওঠে। অধিশাস্তার সাথে ও বাস্তব সত্তার সাথে যৌন ইচ্ছার নতুন করে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। এ স্তরটি সম্পূর্ণরূপে ইতররতি (*Hetero sexual*) পর্যায়ে পৌছবার আগে স্বকাম (*auto-erotic*) ও সমরতি (*Homosexual*) পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এ ইতররতি (*Heterosexual*) পর্যায়েও যৌনেচ্ছা আহত ও অবদমিত হতে পারে, কিন্তু শৈশবকালে এ অবদমন যত তীক্ষ্ণ ও প্রকট হয়, এ সময়ে ততটা প্রকট থাকে না।

শৈশবকাল সমাপনে যৌন-মানস শক্তি লিঙ্গস্তরে এসে পেঁছয় অর্থাৎ যৌনশক্তি-উদ্ভূত যে যৌনেচ্ছা তার পরিপূরণ-প্রয়াস মুখ, পায়ু ও অন্যান্য অস্বাভাবিক স্থান ত্যাগ ক'রে, যৌনাঙ্গের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। এই স্তরেই লিবিডোর

বিচিত্র পথ-পরিক্রমা শেষ হয় এবং শেষ ও স্বাভাবিক লক্ষ্য প্রজনন-প্রয়াসে পরিণতি লাভ করে।

মনঃসমীক্ষণের মূল তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(১) প্রত্যেকটি আচরণ কার্য-কারণ সম্পর্কান্বিত। প্রত্যেকটি আচরণের পিছনেই একটি ইচ্ছা কারণ হিসাবে সক্রিয় থাকে। সে ইচ্ছা নির্জ্ঞান মনের হতে পারে, চেতন বা প্রাক্ চেতন স্তরীয়ও হতে পারে। নির্জ্ঞান স্তরীয় প্রেষণার বিশ্লেষণ মানুষের আচরণ অনুধাবনে অধিক পরিমাণে সাহায্য করে।

(২) ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অদস্, অহম ও অধিশাস্তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তারই পরিণতি। মানুষের দ্বন্দ্ব চেতনে, প্রাক্ চেতন মনে বা মনের নির্জ্ঞান স্তরে ঘটতে পারে। নির্জ্ঞান স্তরীয় দ্বন্দ্বই অন্যান্য মনের স্তরের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা অধিক কার্যকরী ও প্রভাব বিস্তারকারী।

(৩) চেতন মনের দ্বন্দ্ব সাধারণত নির্জ্ঞান স্তরে অবদমনের মধ্য দিয়ে সমাহিত হয় এবং এরকম দ্বন্দ্ব অধিককাল চলতে থাকলে এবং এর সঙ্গে অবদমন অধিককাল চলতে থাকলে গূঢ়ৈষার (*Complex*) উদ্গম হয়। নির্জ্ঞানে এই সকল গূঢ়ৈষা মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতার উদ্রেক করে। এ যন্ত্রণা ও অস্থিরতা ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনযাপন বিঘ্নিত করে—এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির জন্য ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিক সঙ্গতি ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যক্তি নানা প্রকার প্রয়াস করে থাকে। ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য জোড়াতালি দিয়ে রাখার একটা চেষ্টা ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে। এ সকল প্রয়াসকেই বলা হয় আত্মরক্ষণ-কৌশল (*Defence Mechanism*)।

এই সকল গূঢ়ৈষা যখন অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে, তখনই এ থেকে উদ্বায়ু রোগ (*Psycho-neuroses*) বা উন্মাদ রোগের (*Psychoses*) প্রকোপ দেখা দেয়। অন্যাবিধ ব্যক্তিত্বের অসুস্থতা ও জটিলতাও এ থেকে হতে পারে।

(৪) অদসের সাথে, অহম ও অধিশাস্তার যে দ্বন্দ্ব তা মূলত প্রবৃত্তিগত তাড়নার সাথে অর্জিত সমাজ ও আত্মিক চেতনার দ্বন্দ্ব।

এই সকল মৌল তাড়নার মধ্যে জীবনতাড়না বা জীবন-এষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তাড়নার মধ্যে যে শক্তি কাজ করে তা যৌন-মানস শক্তি। যৌন প্রেষণা যদি প্রতিহত হয়, ব্যর্থ হয়, তা হলে দ্বন্দ্ব ও অবদমন প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয় এবং এ যৌন তাড়না নবযুবকালে আরম্ভ হয় না। জন্মক্ষণ থেকেই এ যৌন তাড়না নানাভাবে প্রকাশ পায়। এ তাড়নার প্রধান কাজ হল শরীরের বিভিন্ন অংশ (কাম-স্থান *erotic zones*) থেকে সুখ আহরণ করা।

শিক্ষাক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগ (The use of Psycho-Analysis in Education):

(ক) **মনঃসমীক্ষণ শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচীন ধারণাকে পরিবর্তিত করেছে** এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আরও ব্যাপক করেছে। এতকাল পর্যন্ত শিক্ষার কাজ ছিল প্রবৃত্তিকে সংযত করার নামে প্রবৃত্তিকে জোর করে চেপে দেওয়া বা দাবিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। এর পরিণাম অবশ্য কখনও ভাল হত না। অযথা অনেক শক্তির অপচয়ে, যে এইসব আপাত অসুবিধা সৃষ্টিকারী প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ সত্য কারো কাছে মনঃসমীক্ষণের সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে উন্মোচিত হয়নি। **শিক্ষার উদ্দেশ্য মৌল প্রবৃত্তিগুলির অবদমন নয়, এর উদ্‌গতিসাধন।** প্রবৃত্তির শক্তিকে বিনাশ করার অস্বাস্থ্যকর অপপ্রয়াস না করে তার গতিশক্তিকে কল্যাণকর পথে নিয়ন্ত্রিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা এখন আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কেবল বিধি-নিষেধের তালিকা নয়। কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। মনঃসমীক্ষণের জ্ঞানালোক শিক্ষার দিগন্তকে আরও প্রসারিত করেছে—সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। এর অর্থ হল এই যে, **আবেগগত জীবনের (emotional life) সুস্থতা, আবেগের সুষ্ঠু বিকাশধারাও শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।** এইখানেই আসে নির্জ্ঞান মনের কার্যকারিতা ও আবেগ-জীবনে তার প্রভাবের কথা। আবেগ-জীবনের গভীরে যেতে হলেই মনের নির্জ্ঞান স্তরের ক্রিয়া-কর্মের কার্যকারণ সম্পর্ক জানতে হবে। তাছাড়া কর্মপ্রেরণার উৎস শক্তিও নির্জ্ঞান মন থেকেই উৎসারিত।

সমাজ-জীবনের সাথে যাতে সুস্থ ও সক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ব্যক্তি চলতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের গতি-প্রকৃতি নির্ণীত হয়।

(খ) **মনঃসমীক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত** করতে পারে এমন কতকগুলি প্রেরণাদায়ী উদ্দীপক ও পদ্ধতির অবতারণা করেছে। মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কৃত সত্যকে আধুনিক প্রগতিবাদী সকল শিক্ষাবিজ্ঞানীই গ্রহণ করেছেন। মনঃসমীক্ষণ-প্রদর্শিত এ পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে শৈশবকালীন শিক্ষাপর্বে গ্রহণযোগ্য। এ পদ্ধতিগুলি নিম্নে বর্ণিত হল—

(১) স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন—শিশুর পিতামাতা ও পিতামাতার পরিবর্তনস্বরূপ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধকে রক্ষা করতে

হবে। পেস্টালোৎসি, ফ্রয়েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণও এ সম্বন্ধে বহু পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

(২) প্রবৃত্তির গতি-শক্তিকে যথার্থরূপে ব্যবহার করা।

(৩) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দেওয়া।

(৪) শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলা।

(৫) শাস্তি অপেক্ষা পুরস্কার, নিন্দা অপেক্ষা উৎসাহদান ও প্রশংসাসূচক অভিব্যক্তি অধিক কার্যকরী। শিক্ষার্থী প্রশংসা ও পুরস্কারের যথার্থ যোগ্য হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে নিজের গুণাগুণকে পুষ্ট করার অভিপ্রায়ে পরিশ্রমী হয়ে ওঠে।

(গ) বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার শক্তির পার্থক্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। এ পার্থক্যের কারণ বুদ্ধির পার্থক্যের জন্য হয়, এটাই আমাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল, মনঃসমীক্ষণ এ সত্য অস্বীকার করেছে। তাঁদের মতে বিষয়বস্তুর সাথে নির্জ্ঞান মনের কতটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, নির্জ্ঞান মন থেকে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভালবাসার সঞ্চার হচ্ছে কিনা তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু গ্রহণ করার শক্তি।

এ বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ব্লান্‌চার্ড (*Blanchard*) দেখেছেন যে, কোন বিষয় পড়তে গিয়ে ব্যক্তির অসুবিধার কারণ মূলত আবেগগত। দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্বের জটিলতা থেকেই পড়তে গিয়ে বাধো-বাধো ভাব, ভুল পড়া, লিখতে গিয়ে ভুল লেখা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এসকল দ্বন্দ্ব ও আবেগজর্জরতা অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই শিশুর সাথে পিতামাতার অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হয়। পিতামাতার কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত স্নেহ-ভালবাসা না পাওয়া, তাঁদের নির্মম আচরণ শিশুকে মানসিক দিক থেকে আহত করে, শিশু নিজেকে অত্যন্ত নিরাশ্রয় বোধ করে—পিতামাতা সম্পর্কে একটা ক্ষোভ ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়। একটা অনুচ্চারিত দ্বন্দ্ব একদিকে পিতামাতাকে ভালবাসা, অপর দিকে তাদের সম্বন্ধে ঘৃণাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে। এ দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য অবদমন আরম্ভ হয় এবং স্বভাবতই এ অবদমনে প্রচুর মানসিক শক্তি অপচয়িত হয়। অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ মানসিক শক্তি নিয়ে পড়াশুনা ও লেখাপড়া যাই করা হয় তাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। পড়াশুনার জন্য যে মনঃসংযোগ প্রয়োজন সে একাগ্র মনোযোগ এরা দিতে পারে না।

(ঘ) যথার্থ শিক্ষার জন্য মনঃসমীক্ষণ **সুস্থ পরিবেশ রচনায় আগ্রহী**। বিদ্যালয়ের ও গৃহের পরিবেশকে এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন শিশুর মধ্যে

অবদমনের প্রকোপ যথাসম্ভব কম ঘটে এবং প্রবৃত্তির উদ্গতি সাধনের সমস্ত প্রকার সুযোগ থাকে। সৃজনশীল আনন্দমুখর খোলামেলা পরিবেশই ব্যক্তিত্ববিকাশের অনুকূল। 'এটা কোরো না, সেটা কোরো না', এ রকম সব সময় বিধিনিষেধ আরোপ অপেক্ষা, কি করবে সেটা নির্দেশ দেওয়াই স্বাস্থ্যকর। সৃজনশীল কর্ম-প্রবাহের মধ্য দিয়ে শিশু যাতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, তার মধ্য দিয়ে যাতে সে তার যৌন প্রবৃত্তির গতি-শক্তিকে তার জৈবিক পথ থেকে সামাজিক ও আত্মকল্যাণকারী পথে ঘুরিয়ে দিতে পারে, সেই দিকেই শিক্ষকের নির্দেশনা ও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া সমীচীন।

(ঙ) শিশুদের শিক্ষাদানে **খেলার মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য** মনঃসমীক্ষণ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর মনের ইচ্ছা-অভিলাষ, আবেগ-উচ্ছলতা প্রকাশ পায়। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে। কেননা খেলার মাধ্যমেই শিশু তার ইচ্ছা, আনন্দ-উদ্বেলতা, ভয়-ভাবনা, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রতিন্যাসের প্রকাশ করে। বিভিন্ন বয়সে শিশুর স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর মনঃসমীক্ষণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বয়সের ধর্ম অনুযায়ী শিশুর খেলার সরঞ্জাম যোগাতে হবে যাতে করে তার স্বাভাবিক বিকাশ হতে পারে। খেলার সরঞ্জাম এমন হবে যা শিশুকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ নির্বাধ কল্পনাশ্রয়ী খেলায় আগ্রহী করতে পারে। আবার এমন সব সরঞ্জাম থাকবে যা দিয়ে নিয়ম-নিবদ্ধ খেলাধুলাও করা যেতে পারে। মেলানি ক্লেইন (*Melanie Klein*) প্রমুখ মনঃসমীক্ষকগণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানসিক বৈকল্য সারিয়ে তোলার জন্য খেলা-ভিত্তিক মানসিক চিকিৎসার প্রবর্তন করেছেন।

(চ) মনঃসমীক্ষণের নতুন আলোকেই 'শিশু-নির্দেশনা' (*Child Guidance*), মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা এবং শিশুর স্বাধীনতা বা তার স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দগতি প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলনের সূচনা করেছে। শিশু-নির্দেশনা আন্দোলন থেকেই শিশু-নির্দেশনা চিকিৎসাগার (*Child Guidance Clinic*) স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধ হয়েছে এবং এ থেকে বস্তুত বহু শিশু-নির্দেশনা চিকিৎসাগার স্থাপিত হয়েছে। শিশুর মূল্যায়নে, শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণ আধুনিক মানুষকে আরও সজাগ করেছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, যা আধুনিক শিক্ষাধারার মূল বৈশিষ্ট্য, তার সাথে মনঃসমীক্ষণও সুর মিলিয়ে এই সত্যকে আরও সোচ্চার করে তুলেছে।

নিয়মশৃঙ্খলা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন মনঃসমীক্ষণই

করেছে। শাসন, তর্জন-গর্জনের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা আনয়নের যে চেষ্টা পূর্বে প্রচলিত ছিল, তা যে মানসিক দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর এবং এরূপ আপাত শৃঙ্খলাপরায়ণতার আড়ালে অধিক বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনাই যে লুক্কায়িত, এবিষয়ে মনঃসমীক্ষণ তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আলোকপাত করেছে। এখন শিশুর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তার মধ্যে সুন্দর সুস্থ স্থায়ী অনুভূতি (*sentiments*) সৃষ্টি করতে হবে, জীবন সম্বন্ধে সুস্থ বোধ ও প্রতিন্যাসের উন্মেষ ঘটাতে হবে। শৃঙ্খলাকে এইভাবে অন্তর্জাত, জীবনকে সুস্থ পথে নিয়ন্ত্রণকারী একটা স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি রূপে তৈরি করতে হবে। ফ্রয়েড্ ও তাঁর অনুগামীরা শৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটি সুস্থ ধারণার প্রবর্তন করে বিদ্যালয়ের কর্মধারা, শিক্ষকের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক নতুন দিকের উন্মোচন করেছেন। শিক্ষক এখন আর কেবল বিষয়জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে শিক্ষার্থীকে তথ্যজ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করার কাজে নিযুক্ত নন। শিক্ষকের সমগ্র ব্যক্তিত্বপ্রভাবে, তাঁর যত্ন ও নিষ্ঠা দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সুস্থ জীবনবোধ ও সুস্থ আচরণের উন্মেষ ঘটানোও শিক্ষকের কাজ। শিক্ষক জীবন-শিল্পী।

(ছ) জীবনের অতি প্রত্যূষকালের জীবনাচরণ, পরিবেশ-প্রভাবই ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। ফ্রয়েডের মতে শিশুর পাঁচবছর কালের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের কাঠামো তৈরি হয়ে যায়। মনঃসমীক্ষকদের মতে শিশুর জন্য প্রথম পাঁচবছরে বিশেষ প্রযত্ন ও পরিচর্যা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়—শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সকল অপসঙ্গতি দেখা যায়, তার বীজ প্রথম পাঁচবছরের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত থাকে। গৃহ-পরিবেশের ও পরিচর্যার অসুস্থতার জন্য যে অপসঙ্গতির উদ্ভব হয়, পরে বিদ্যালয়ে তার নিরাময় করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।[1] **প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার গুরুত্ব যে প্রাথমিক স্তর অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, এ সত্য মনঃসমীক্ষণই উদঘাটন করেছে।** পিতামাতার ব্যক্তিত্ব, তাঁদের জীবন-ভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী শিশুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে শিক্ষিত করে তোলে—পিতা-মাতাই শিশুর প্রথম শিক্ষক। শিক্ষাক্ষেত্রে পিতামাতার শিক্ষাদান, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক যে কত গভীরভাবে কাজ করে, এ সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণই যথার্থভাবে আলোকপাত করে। এদিক থেকে মনঃসমীক্ষণ সন্তান প্রতিপালনের স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি অবগতির জন্য পিতামাতাকে

---

1. Many of child's class room difficulties are the surface manifestations of a deep-rooted problem which has its origin in his Pre-school experiences.
—Rivin : Education for Readjustment

নিজেদের যথার্থভাবে শিক্ষিত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সন্তানের বয়ঃক্রম অনুযায়ী খাদ্য-তালিকা, সন্তানের আবেগ-জীবনকে সুস্থ করে তোলার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ও উপায়, শিশুর মধ্যে সুস্থ অভ্যাসগঠনের কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে, এক কথায়, শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পিতামাতাকে যে যথার্থভাবে জ্ঞানী হতে হবে, এ বিষয়ে মনঃসমীক্ষণ গভীরভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

(জ) শৈশবকালেই মূল্যবোধের জন্ম হয়। **এ মূল্যবোধের ভিত্তি হল অধিশাস্তা** (Super-ego)। অধিশাস্তা শৈশবেই অনেকাংশে গঠিত হয়ে যায়। সুষম অধিশাস্তা গঠনের জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকের অনেক দায়িত্ব আছে। ইতিবাচক (*Positive*) নির্দেশনার মধ্য দিয়ে, পিতামাতা ও শিক্ষকের সুস্থ জীবনা চরণের মধ্য দিয়েই সুস্থ ও সুষম অধিশাস্তা তথা সুস্থ মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। কেবল ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে সুস্থ মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায় না। অধিশাস্তা গঠন ও জীবনে তার যে কত গভীর প্রভাব এ সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণই প্রথম আলোকপাত করে।

(ঝ) **আধুনিক যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও মনঃসমীক্ষণ যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করেছে।** শৈশবকালীন যৌন-জীবনের সত্যকে মনঃসমীক্ষণ স্বীকার করায়, যৌন-বিষয়ক জ্ঞান পূর্বে যতটা ধিকৃত হত, এখন আর ততটা হয় না। এখন একটা বয়েস পর্যন্ত এরূপ আচরণ অস্বাভাবিক নয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ফলে এ সকল বিষয়ে, অযথা পাপবোধের সৃষ্টি না করে যৌন-জীবনের স্বাভাবিক গতিবিধি ও যৌন-মানস শক্তির (*Libido*) যথার্থ উদ্গতির জন্য সুস্থ পরিবেশ রচনা করতে হবে। নবযুবক যুবতীদের যৌন-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

তাছাড়া শৈশবকালীন যৌনতা (*Infantile Sexuality*) বিষয়ে মনঃসমীক্ষণ প্রদত্ত জ্ঞান, শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করানো, তা ছাড়ানো, মল-মূত্র পরিত্যাগ বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়েও মাকে বিশেষভাবে সচেতন করে তুলেছে। শিশুর মাতৃ-স্তন্য পান, মল-মূত্র ত্যাগ প্রভৃতির সাথে যৌনতার সম্পর্ক রয়েছে ও এর সাথে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সম্পর্ক রয়েছে।

(ঞ) **মনঃসমীক্ষণের জ্ঞান শিক্ষককে শিশু-আচরণের কার্য-কারণ সম্বন্ধে বুঝতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে।** শিশুর নির্জ্ঞান-মানসকে যথাসাধ্য জানার চেষ্টা করতে হবে। ঠিক ঠিকভাবে শিশুকে পরিচালনা করতে হলে শিশুর নির্জ্ঞান মানসকে জানতে হবে। শিশুর নির্জ্ঞান আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে।[১]

১। The content of the unconscious is an essential part of the pupil's nature.

তাছাড়া মনঃসমীক্ষণের জ্ঞান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠনেও সাহায্য করতে পারে। শিক্ষকের নিজের মধ্যেই যদি গূঢ়ৈষা বা জট থাকে, সে জটের কারণ নির্ণয় ও তার মুক্তি-পথ শিক্ষক আত্ম-সমীক্ষণের মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণে আবিষ্কার করতে পারেন।

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

মনঃসমীক্ষণ, ঐতিহাসিক পটভূমি ও ফ্রয়েড্→

মানসিক রোগ চিকিৎসার গবেষণা থেকে ধীরে ধীরে মনঃসমীক্ষণের সত্যসার এসেছে। মানসিক কারণে মনের পরিবর্তন হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে **Mesmer** সম্মোহন বিদ্যাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। প্যারিসের **Charcot** স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ—হিষ্টিরিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করেন। নান্সী মতাবলম্বীরা এর বিরোধিতা করেন। বোষ্টনের মর্টন সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন—চেতন মনের নিকট আরও একটি মনোজগতের অবস্থান আছে বলে বলেন। প্যারী নগরের পিয়ারে জ্যানে (**Pierre Janet**) বলতেন—অচেতন অবস্থায় মানস ক্রিয়া-কাণ্ড সম্ভব—তিনি দেখলেন যে সংবিষ্ট অবস্থায় হিষ্টিরিয়া রোগী এমন কথা স্মরণে আনতে পারে, যেসব অভিজ্ঞতার কথা জাগ্রতাবস্থায় একেবারেই স্মরণে আনতে পারে না। মনঃসমীক্ষণের ভাবধারার উৎসমূলে জ্যানে প্রমুখ মনশ্চিকিৎসকদের চিন্তাধারা কাজ করেছে।

ফ্রয়েডের প্রয়াস পর্যায়→

ফ্রয়েড্ পরিচিতি : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রিবুর্গশহরে ফ্রয়েডের জন্ম! স্নাতক হওয়ার পূর্বে শরীরবৃত্ত বিষয়ে পড়াশুনা করেন। শাঁরকোর কাছে শিক্ষালাভ—আবেশিক রোগে বিকৃত যৌন-জীবন কাজ করে। ফ্রয়েড্ দেখলেন, শাঁরকো রোগীকে সংবিষ্ট করে হিষ্টিরিয়া রোগ লক্ষণ

---

and must be known in a general way if the pupil is to be intelligently handled. Adams, Modern Development in Education Practice.

ফুটিয়ে তুলতে পারে। সম্মোহনকেই চিকিৎসার প্রধান উপায় হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন। নান্সীদের রোগ নিরাময় পদ্ধতি দেখতে গেলেন ফ্রয়েড্। অভিভাবন (Suggestion) সমান কার্যকরী নয়।

জোসেফ্ ব্রুয়ারের প্রভাব→

ভিয়েনার চিকিৎসক। তিনি দেখলেন সংবিষ্ট অবস্থায় প্রক্ষোভঘটিত অসুবিধার কথাগুলি খুলে বললে রোগিনী ভাল হয়ে যায়। অনেক পুরানো বিস্মৃত ঘটনা মনে আসে। পুঞ্জীভূত প্রক্ষোভ বিরেচন প্রক্রিয়াকেই অভিস্ফোট (Abreaction) বলে। ব্রুয়ার ও ফ্রয়েড্ এই পদ্ধতি হিষ্টিরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

বার্নহাইমের প্রভাব→

ফ্রয়েড্ দেখলেন, মনের অনেক গোপন কথা এ অবস্থাতেও (সংবিষ্ট অবস্থায়ও) স্মৃতিতে ফিরে আসে না। সকল রোগীকে সংবিষ্ট করাও যায় না। ফ্রয়েড্ বার্নহাইমের কাছে অধ্যয়ন করতে গেলেন। চেতন মনের সাথে অবচেতন মনের সেতুবন্ধ স্থাপন। সংবিষ্ট অবস্থায় রোগী যা করে, জেগে ওঠার পর, তার আর সেসব কিছু মনে থাকে না। সংবিষ্ট না করে রোগীর কপালে হাত রেখে আস্তে আস্তে স্পর্শ করে ফ্রয়েড্ পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। ফ্রয়েড্ সংবেশন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। সম্মোহনের আবেশপ্রবণতা ও অবাধ ভাবানুষঙ্গ মিলিয়ে ফ্রয়েডের চিকিৎসা পদ্ধতি আরম্ভ হল।

স্বপ্ন বিশ্লেষণ→

স্বপ্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নির্জ্ঞান মনে প্রবেশের পথ সুগম হয়। কোন কিছু হঠাৎ ভুলে যাওয়া, কোন কিছুর বিকৃত উচ্চারণ, বিদ্রূপ প্রভৃতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েও নির্জ্ঞান স্তরস্থিত ব্যক্তির গূঢ়েষা জানা যায়। উন্মায়ু রোগের সংলক্ষণ, স্বপ্ন, অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্রান্তি, বিদ্রূপপ্রভৃতি বিশ্লেষণ করে যে অবদমিত ইচ্ছা বা গূঢ়েষার প্রকাশ পাওয়া যায় তা যৌন-ইচ্ছা সংক্রান্ত।

মনঃসমীক্ষণের আরও বিকাশ ব্যাপ্তি→

রোগীকে কেবল জানানোই হবে না, কি ও কেন তার অসুস্থতা, রোগীকে নিজে নিজে রোগ উৎপাদনকারী মূল অভিজ্ঞতাকে চেতন মানস-পটে পুনরুদ্রেক করতে হবে। শৈশবকালীন অভিজ্ঞতায় যেতে হবে, না হলে স্থায়ী আরোগ্য হয় না। মূল Complex প্রক্ষোভজনিত কোন আঘাতের ফল। শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার অধিকাংশই শৈশবকালীন কল্পনা ঃ মনোজগতে বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। মনঃসমীক্ষণের মধ্য দিয়ে শৈশবকালের ইচ্ছাগুলিকে ধরতে পারেন, তাহলেই বয়ঃপ্রাপ্তি কালের মনোবিকারের মূল কারণে পৌছানো যায়। শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার সাথে যে প্রক্ষোভ সংযোগ রয়েছে, তার পুনরুদ্রেক ঘটাতে হবে। সংক্রমণ (Transference) মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করে ব্যক্তি তার শৈশবের আবেগ মথিত অভিজ্ঞতাকে মুক্তি দিতে চায়। প্রথমে সদর্থক সংক্রমণ (Positive Transference)। অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও সংক্রমণ—এ দুটি অবস্থাকেই ফ্রয়েড্ তাঁর লক্ষ্য পথে কাজে লাগান। সকল রোগ দেহগত কারণে হয় না। সেইজন্ত কেবল তথাকথিত চিকিৎসা শাস্ত্র শিখলেই মনঃসমীক্ষক হওয়া যায় না। মনঃসমীক্ষক হতে হলে প্রথম নিজের মনঃসমীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। মনঃসমীক্ষক হওয়ার জন্ত মনঃসমীক্ষকের অধীনে প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অনুশীলন প্রয়োজন। ডাক্তার হলেই মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায় না।

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক সত্যাদি→

ফ্রয়েডের চিকিৎসা সংক্রান্ত ঘটনাগুলির মধ্যেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক সূত্রগুলি বর্তমান আছে। সংক্রমণ প্রকৃতপক্ষে মনঃসমীক্ষকের প্রতি রোগীর সদর্থক ও নঞর্থক প্রতিন্যাস (Positive & Negative attitude)। মুক্ত ভাবানুষঙ্গ দিতে গিয়ে ব্যক্তির যে বাধো বাধো ভাব তা কেবল চেতন মন থেকে আসে না—নির্জ্ঞান মন থেকেও এ বাধা আসে

মনঃসমীক্ষণের সময় অবদমনের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট হয়—অবদমনের বাধা স্মৃতি উদ্ধার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উদ্বায়ু রোগী এবং স্বাভাবিক মনঃ-সমীক্ষণেচ্ছু ব্যক্তি আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েড্ মূল দুটি সত্যের উদ্ভাবন করেন— (ক) অবদমন, (খ) শৈশবকালীন যৌনতা। মনঃসমীক্ষণের সময় অব্যবহিত অতীতের কথা বলতে বলতে শৈশবের ও অতি শৈশবকালের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তি স্মৃতি পথে ফিরিয়ে আনতে পারে, কাল্পনিক অভিজ্ঞতার কথাও মনে আসে। শৈশবকালীন আকাঙ্ক্ষার সাথে যৌনতার সম্পর্ক আছে। উদ্বায়ু রোগ শৈশবকালীন যৌনেচ্ছার অবদমন থেকেই উদ্ভূত হয়। শৈশবকালের অবদমিত যৌনেচ্ছা যে কেবল উদ্বায়ু রোগীদের মধ্যেই থাকে তা নয়, এটা সকল ব্যক্তির মধ্যেই কম বেশী থাকে। ফ্রয়েড্ শাঁরকোর সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছিলন ও তাঁর সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই উদ্বায়ু রোগীদের চিকিৎসা করেন। ফ্রয়েড্ তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে কতকগুলি সূত্র অনুসরণ করেছেন—(ক) যা কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতিই মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে ধরে নিতে হবে। (খ) মানুষ যাকে ভয় করে তাকে প্রত্যাশাও করে।

ফ্রয়েডের মূল সিদ্ধান্ত→

প্রেষণা ও গূঢ়ৈষা মানসিক রোগের কারণকে প্রেষণা, নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা ও ইচ্ছার অবদমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যক্তির ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না—ব্যক্তির ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটে, ব্যক্তি কখনো সে সম্বন্ধে অবহিত, কখনও অবহিত থাকে না। মানুষের ভুল ভ্রান্তির পিছনেও নির্জ্ঞান ইচ্ছা কাজ করে। নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্য দিয়েযে কৌশলে প্রকাশিত হয় সেই কৌশলেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি উদাহরণ : কোন ব্যক্তির স্ত্রী সম্বন্ধে মন্তব্য ; মুসোলিনী, ফ্রয়েডের নিজের অভিজ্ঞতা। স্বপ্ন, ভুল-ভ্রান্তি,

বিদ্রূপ, রোগ-লক্ষণ সবই ফ্রয়েডের মতে কার্য-কারণ সম্পর্কিত।

স্বপ্ন বিশ্লেষণ→

আমাদের যে সকল বাসনা পূর্ণ হয়নি বা যাদের পূর্ণ হবার পথে বাধা আছে, সেই সব ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ইচ্ছা বা চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকলে মনে যে অশান্তির উদয় হয়, স্বপ্নে কল্পনার সাহায্যে তারই শান্তি হয়। মনের অশান্তি দূর করে বলে স্বপ্ন নিদ্রার সহায়। সেইজন্য স্বপ্নকে **Guardian of sleep** বলে। নিদ্রাকালে মনের প্রহরী কিঞ্চিৎ অসতর্ক হয়ে পড়ে, সেই অবকাশে অবদমিত ইচ্ছা ছদ্ম-বেশে ও প্রতীকের সাহায্যে সংজ্ঞানে এসে উপস্থিত হয়। স্বপ্নে ব্যক্তি যা দেখে (**Manifest content**) তা, ব্যক্তির যে অবদমিত নির্জ্ঞান বাসনা (**Latent content**), তারই ছদ্মবেশী প্রতিফলন। স্বপ্নের কোরকে যে অবদমিত ইচ্ছাটি থাকে, তা যদি সরাসরি সংজ্ঞানে আসে, তা হলে সেটা ব্যক্তির কাছে ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক করে। যে মুহূর্তে এ ইচ্ছা সংজ্ঞানে আসার প্রয়াস করে, নির্জ্ঞান মনস্থিত প্রহরী (**Censor**) একে প্রতি-হত করে এবং পুনরায় নির্জ্ঞানে ফিরিয়ে দেয়। স্বপ্নের পিছনেও প্রেষণা থাকে। স্বপ্নের সাথেও ব্যক্তির নির্জ্ঞান অবদমিত ইচ্ছার সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক মানসিক কার্যেরই মানসিক একটি কারণ আছে।

অবদমন→

অতীতের কিছু কিছু মনে করতে না পারাটা ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—প্রেষণাবদ্ধ। এরূপ মনে করতে না পারার ঘটনাই প্রতিবন্ধ (**Resistance**), প্রতিবন্ধ থাকা মানেই পূর্বের কোন অবদমনের ইঙ্গিত।

অতীত অভিজ্ঞতা : শৈশব-কালীন অভিজ্ঞতার গুরুত্ব→

মানসিক রোগের কারণ অর্থাৎ 'ইচ্ছা'র সূত্রগুলি অতীতের ঘটনার মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে—স্বপ্ন, বিদ্রূপ বা কোন ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে যে ইচ্ছার পূরণ প্রয়াস ব্যক্ত হয়ে থাকে, সেটাও অতীতের কোন ইচ্ছা। এই সূত্রকে ধরেই ফ্রয়েড,

অব্যবহিত অতীত থেকে শৈশবজীবনের অভিজ্ঞতায় চলে যান। শৈশবকালের ইচ্ছাগুলি, সংক্রমণের সময় (Transference) সক্রিয় হয়ে ওঠার একটা উপযুক্ত অবস্থা ফিরে পায়। মনঃসমীক্ষকের মধ্যে ব্যক্তি তার পিতাকে দেখতে চায়, দেখতে পায়। এ সময়ে পিতৃ-সম মনঃসমীক্ষককে কেন্দ্র করে তার অনেক শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে, শৈশবকালীন অনেক পুঞ্জীত আবেগের প্রকাশ ঘটে।

'অবদমিত' 'শৈশবকালীন' 'যৌনতা'—এ শব্দ তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মূল তিনটি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয়েছে।

ব্যক্তির সহজাত দ্বৈততা→

শৈশবকালীন যৌনতা : আঙ্গুল চোষার মধ্য দিয়ে শিশু 'যৌন সুখ' আহরণ করে, মাতৃস্তন কামড়ানো, মলমূত্র পরিত্যাগ করা, সারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শিত ও আন্দোলিত হওয়ার মধ্য দিয়েও শিশুর 'কাম-পিপাসা' মেটে। ফ্রয়েডের মতে শিশুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা কিছু দেহগত সাংবেদনিক (Sensuous) সুখ দেয়, তার মধ্যেই 'যৌন-সুখ' থাকে। বৃহত্তরভাবে ফ্রয়েড্‌ 'যৌনতাকে' ভালবাসার সমার্থক বলে ব্যবহার করেছেন। মানসিক জীবনের দ্বৈততা : মনের তিনটি স্তর—চেতন, প্রাকচেতন ও নির্জ্ঞান। চেতন মন ও নির্জ্ঞান মন : মনের দুটি বিপরীতমুখী দিক। চেতন মন ও নির্জ্ঞান মন, মনের দুটি বিপরীতধর্মী দিক। মনের একটি দিক বাস্তবধর্মী, অপরটি সুখান্বেষী। দ্বৈততা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সাথে পরিবেশের—সুখান্বেষণের সাথে বাস্তবতার।

সৃজন এষণা (Eros) ও মরণ এষণা (Thanatos)→

বাস্তব সত্তা ব্যক্তির মধ্যে আত্মস্থ হয়—বাস্তব সত্তায় (Ego) প্রেষণা, কামশক্তির (libido) সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী না হয়ে বরং অনেকটা কামশক্তির অধীন, কামশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কখনো কখনো কামশক্তিকে অহম্‌ আবদ্ধ করে রাখে—নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। অহম

নির্জ্ঞান মনের স্বরূপ : ফ্রয়েডের মত→

অংশত কামশক্তির অন্তর্ভুক্ত। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলি ভিন্ন জাতীয় হলেও, এরা সমষ্টিগত-ভাবে কামশক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এটা আর বলা চলে না। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলি কিয়দংশে কামশক্তির অন্তর্ভুক্ত। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা পরিব্যাপ্ত কামশক্তিকে ফ্রয়েড্ বলেছেন জীবন-এষণা। এর বিপরীতমুখী ইচ্ছা মরণ-এষণা—ফ্রয়েডের দ্বৈততা প্রমাণ করে।

মনের চেতনা ও নির্জ্ঞানের দ্বৈততাকে ফ্রয়েড্ পুনর্বিবেচনা করেন। অহম্ (Ego) সম্পূর্ণ ভাবে চেতন নয়—মনঃসমীক্ষণের সময় ব্যক্তি চেতনভাবে কোন বাধা দেয় না—সে বাধা সম্বন্ধে ব্যক্তি অবহিতও থাকেন না—নির্জ্ঞানের অহম্ বাধা দেয়। অহমের চেতন দিক পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট। নির্জ্ঞান মনে সদা সক্রিয় প্রবৃত্তি-নিচয়, যন্ত্রণার উদ্রেককারী বিশেষ বিশেষ অবদমিত কামনা বাসনা ও অভিজ্ঞতা বাস করে। অন্তঃস্থিত মনের স্তরকে ফ্রয়েড্ নামকরণ করেছেন ইড্ বা অদস। মনের অহম্ বা Ego অংশ পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বটে, কিন্তু এ স্তরের উদ্ভব হয়েছে অদস্ থেকেই, ইদ=প্রবৃত্তির শক্তি=জীবন-এষণা+মরণ-এষণা। অহম্ (Ego) এক দিকে অদস ও অন্য দিকে বাস্তব জগতের দাবির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য মধ্যস্থতা করে। অদস্ ও অহমের মধ্যে তৃতীয় একটি সত্তার আবির্ভাব হয়—একে বলা হয় অধিশাস্তা (Super-Ego) ; অহম্‌ও অদসের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অধিশাস্তার উদ্ভব। অধিশাস্তা কেবল মানুষের মধ্যেই থাকে, মানব শিশুকে সমাজ আরোপিত বিধি নিষেধের মধ্যে শৈশবকাল কাটাতে হয় এবং জন্মকাল থেকে, যথার্থ যৌন জীবন আরম্ভ হওয়ার কালের মধ্যে অনেকটা সময় নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়—এ থেকেই অধিশাস্তার জন্ম হয়। অধিশাস্তা গঠনে ইডিপাস গূঢ়ৈষার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। পৌরাণিক কাহিনী : থিবসের রাজার ছেলে

ইডিপাস—ইডিপাস সম্বন্ধে থিবসের রাজা ভবিষ্যৎ বাণী শুনলেন যে, সে তাকে হত্যা করে মা'কে বিবাহ করবে। জন্মের পর তাকে পাশের রাজ্যে পাহাড়ের তলায় ফেলে দিলেন। সেই রাজ্যের রাজা তাকে কুড়িয়ে পেলেন ও মানুষ করলেন। ইডিপাস পিতৃ পরিচয় কিছু জানতে পারল না, ভবিষ্যৎবাণীও কিছু জানল না।—তার আপন পিতার সাথে পথে দেখা হল, ঝগড়া হল, যুদ্ধ হল, তাকে হত্যা করল। রাণীকে বিবাহ করল। স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাস করল, চারটি সন্তান হল, পরে জানল, রাণী তার মা। লজ্জায় ঘৃণায় সে তার চোখ তুলে ফেলল। ইডিপাস কমপ্লেক্স বা গূঢ়ৈষা বলতে বোঝায় মা'র সম্পর্কে ছেলের যৌনেচ্ছা।

মনঃসমীক্ষণ কি ?→

বলতে বর্তমানে মনোবিদ্যায় একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ বোঝায়। মনের গভীরে প্রবেশ করার প্রয়াস মনঃসমীক্ষণবাদীরাই করেছেন।

মনঃসমীক্ষণের মূল সিদ্ধান্ত→

নির্জ্ঞান মন, প্রাক্-চেতন ও চেতন মন (The unconscious)। অবস্থান বিন্যাসে (Topographical) মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। নির্জ্ঞান মনের ধারণা ফ্রয়েডের পূর্বে লেবনিজ্ (Leibnitz), হার্টম্যান (Hartman), সোফেনায়ার (Schopenhour) এবং নিৎসে (Nietzche) দিয়েছিলেন। নির্জ্ঞান মনই ব্যক্তির মানস ক্রিয়ায় অধিক সক্রিয়। চেতন মন, নির্জ্ঞান মনের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পকায় ও ক্ষুদ্রাংশ। নির্জ্ঞান মনে আছে অজস্র শৈশব-কালীন কামনা, অতৃপ্ত বাসনা, উদগ্র সুখ-তৃষ্ণা। নির্জ্ঞান অভিজ্ঞতায় তীক্ষ্ণ পুঞ্জীত আবেগ অনুষঙ্গ থাকে। নির্জ্ঞান মন যে আছে তার প্রমাণ—ঘুমের ঘোরে চলা, সম্মোহনের পরে অভিভাবনজনিত পরিবর্তন, স্বপ্নদেখা, ভুল, বিভ্রূপ, মানসিক রোগ বা বৈকল্যের সংলক্ষণ প্রভৃতি। সক্রিয়তা অনুযায়ী মনের তিনটি অংশ (functionally)—অদস্ (Id), অহম্ (Ego) ও অধিশাস্তা (super-Ego)। অদস—মানসিক

শক্তির উৎস, মনের আদিম ও অবিন্যস্ত রূপ। সর্বদা সুখ সূত্রের দ্বারা চালিত। অহম্—বাস্তব সত্তা, বাস্তব সূত্রের দ্বারা চালিত। অহম্কে একদিকে অদসের ইচ্ছার সাথে ও অন্যদিকে ভৌতিক ও সামাজিক বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। অধিশাস্তা—বিবেক সত্তা—সমাজ সংস্কৃতির দ্বারা অনুবর্তিত। অহমের আদর্শ (Ego-ideal) অধিশাস্তার জন্ম ইডিপাস স্তরে হয়। মন প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নির্জ্ঞান অদস (Id), অহম্ অদসের রূপান্তরণ থেকে উদ্ভূত হয়। পিতামাতার সাথে একাত্মীকরণের মধ্য দিয়ে অহমের 'অহম আদর্শ' (Ego-ideal) উদ্ভূত হয়।

দ্বন্দ্ব, অবদমন এবং গুঢ়ৈষা→

সকল ব্যবহারই অদস, অধিশাস্তা ও অহমের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণতি। মনের চেতন, প্রাক্-চেতন অথবা অবচেতন স্তরে সংঘটিত হয়। সমশক্তিসম্পন্ন বিপরীতমুখী ইচ্ছা থেকে দ্বন্দ্ব; ইচ্ছা ও ইচ্ছা রূপায়ণে বাধা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দ্বন্দ্ব শৈশবকাল থেকেই আরম্ভ হয়। দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের যথার্থ সমাধান ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অন্তর্দ্বন্দ্ব যাদের বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতা বেশী তাদের মধ্যে বেশী করে দেখা দিতে পারে। বুদ্ধিমান শিশুদের দ্বন্দ্ব বেশী, দ্বন্দ্ব উত্তরণের কর্মপ্রয়াসও অধিক, ফলে নতুন নতুন কর্ম প্রয়াস ও সার্থকতার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বও সামঞ্জস্য রক্ষার ক্ষমতায় অধিক সম্পন্ন হয়। ফ্রয়েডের মতে দ্বন্দ্ব আরও গভীর কারণে হয়। অদসের ইচ্ছা যখন চরিতার্থ হবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন বাস্তবের বাধা ও অধিশাস্তার শাসনে তা প্রতিহত হয় এবং দুই বিপরীতমুখী ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্ব নির্জ্ঞান স্তরেই চলতে থাকে। নির্জ্ঞান অদস ইচ্ছা নির্জ্ঞানের প্রহরী (censor) দ্বারা প্রতিহত হয়। এসব ইচ্ছা তখন অবদমিত হয়। এ প্রক্রিয়াকেই অবদমন বলে। দ্বন্দ্বের পরিণামে অবদমন দেখা দেয়। দ্বন্দ্ব

অবসানের জন্ম আমাদের মন নানাপ্রকার আত্মরক্ষাকারী কৌশল-প্রয়াস (defence mechanisms) অবলম্বন করে থাকে। অতৃপ্ত অবদমিত ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞানে সক্রিয় থাকে। ধীরে ধীরে একটি অবদমিত ইচ্ছা অন্য একটি সমধর্মী অবদমিত ইচ্ছার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং এইভাবে একই প্রকারের বহু অবদমিত ইচ্ছা একত্রিত হয়ে একটি জট বা গূঢ়ৈষা (Complex)-এর সৃষ্টি করে। কথনও কথনও প্রহরীকে (Censor) ফাঁকি দিয়ে, এই সকল অবদমিত ইচ্ছা নানাভাবে চেতন মনের স্তরে পৌঁছে যায়।

অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা→

হীনমন্যতা বোধ থেকে শিশুর মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়—হীনমন্যতা দূর করার উপায় হিসাবে গঠনাত্মক প্রয়াস করতে পারে। পরিপূরক গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানই শ্রেয়ঃ। অবস্থার পর্যালোচনা: যে অবস্থা শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটায়, সে অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখতে হবে ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণটি দূর করতে হবে।

প্রবৃত্তি ও যৌন-মানস শক্তির সিদ্ধান্ত: লিবিডোর স্বরূপ→

দ্বন্দ্ব, সুখাশ্রয়ী অদস ইচ্ছা (Id) ও বাস্তব সূত্রাশ্রয়ী অহমের (Ego) মধ্যে ঘটে থাকে। ফ্রয়েডের মতে জন্মগত দুটি মৌল জৈব-মানসিক ইচ্ছা রয়েছে—একটি জীবন-এষণা, জীবন-তৃষ্ণা, অপরটি আক্রমণ, ধ্বংস, মৃত্যুর ইচ্ছা। সকল কাজের মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ইচ্ছাগুলি কাজ করে। যে শক্তি কোন কিছু সৃষ্টি করতে, আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষায় প্রবৃত্ত করে তাকে বলে ভালবাসার প্রবৃত্তি, জীবন-তৃষ্ণা, জীবন-এষণা (Eros বা life-instinct)। যে শক্তি ও ইচ্ছা ধ্বংস, আত্মহনন ও অপরকে হননে প্রবৃত্ত করে তাকে বলে মরণ-এষণা। এ দুটি প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও পরস্পর নিরপেক্ষ শক্তি নয়। ভালবাসা ও ঘৃণা, ধ্বংস

ও সৃষ্টি, জীবন ও মৃত্যু মিলেমিশে একের সাথে অপরে জড়িয়ে আছে। ফ্রয়েডের দ্বৈততার (ambivalence) ধারণা এ থেকে এসেছে।

লিবিডোর স্বরূপ→

মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উৎস-শক্তি। ফ্রয়েড্ এ শক্তিকে যৌন-মানস শক্তি বলেছেন। সকল প্রকার ভালবাসার উৎসশক্তি হল লিবিডো। যৌন-প্রেম, আত্ম-প্রেম, পিতামাতার ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সকল প্রকার ভালবাসার মূলেই আছে যৌন-মানস শক্তি বা লিবিডো। যৌন-মানস শক্তির প্রবাহধারা—প্রবাহ পথ যদি কোন কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation) ঘটে। প্রবাহধারা কখনও কখনও সম্মুখবর্তী না হয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে থাকে (Regression)। যৌন-মানস শক্তির গতিপথকে জৈবিক যৌন-পথ থেকে অন্য সামাজিক ও আত্মকল্যাণকারী পথে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় উদ্গতি (Sublimation)। যৌন-মানস শক্তির গতি প্রবাহের তিনটি দিক আছে—স্বকাম (auto-erotic), আত্ম-প্রেম (Narcissistic Stage), অন্য ব্যক্তিতে ভালবাসার প্রবাহ। লিবিডো সকলের সমান থাকে না, লিবিডোর বিকাশ সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে হলে ব্যক্তিত্ব সুস্থ থাকে; লিবিডোর বিকাশ পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা থাকলে ব্যক্তিত্ব বৈকল্য দেখা দেয়।

লিবিডোর বিকাশ-ধারা→

যৌন-জীবনের সূচনা বয়ঃসন্ধিকালে বা নবযুবকালে হয় না। এর প্রথম প্রকাশ জন্মের অব্যবহিত পরেই দেখা যায়। যৌনতার প্রধান কাজ হল শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে সুখ আহরণ করা। যৌনতার বংশ বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক আছে সত্য, কিন্তু যৌনতা ও বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছা সর্বদা এক নয়। যৌনতা অর্থে কেবল সুখ স্পৃহা বোঝায়। যৌন-মানস শক্তির প্রবাহধারা ও বিকাশের কতকগুলি স্তর আছে—শৈশব-কাল (জন্ম থেকে ৫ বছর)—প্রসুপ্তিকাল (৫—১২ বছর)—নবযুবকাল (১২—২০/২১

শৈশবকাল (আত্ম-রতি)→

বছর)। শৈশবকাল লিবিডো বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

শিশুর যৌনতা আছে (ফ্রয়েডের মতে)। দৈহিক সুখ প্রাপ্তিই এ স্তরে যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য—শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ ব্যবহার করে এ সুখ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করা হয়। শিশু বহুমুখী অজাচারী (Polymorphoperverse)। আত্ম-রতির তিনটি অধ্যায়—মৌখিক, পায়ু, লিঙ্গ-অধ্যায়।

মনঃসমীক্ষণের মূল তত্ত্ব→

(১) প্রতিটি আচরণ কার্যকারণ সম্পর্কান্বিত। (২) অদস, অহম্ ও অধিশাস্তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তারই পরিণতি—ব্যক্তির বিকাশ। (৩) চেতন মনের দ্বন্দ্ব সাধারণত নির্জ্ঞান স্তরে অবদমনের মধ্য দিয়ে সমাহিত হয়, এরূপ দ্বন্দ্ব ও অবদমনের ফলে গূঢ়ৈষা হয়। (৪) গূঢ়ৈষার জন্য দ্বন্দ্বজনিত যে যন্ত্রণা, তা থেকে মুক্তি ও সঙ্গতি সাধনের জন্য নানা প্রকার আত্মরক্ষণ কৌশলকেই Defence Mechanism বলে। (৫) গূঢ়ৈষা যখন অত্যন্ত প্রকট হয়, তখনই এ থেকে উদ্বায়ু রোগ (Psychoneuroses) বা উন্মাদ রোগ হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগ→

মনঃসমীক্ষণ শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত করায় মনঃসমীক্ষণ সাহায্য করতে পারে। খেলার মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য মনঃসমীক্ষণ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মনঃসমীক্ষণের আলোকে 'শিশু নির্দেশনা' মানসিক স্বাস্থ্য, শিশুর স্বাধীনতা স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দগতি প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলনের সূচনা করেছে। নিয়ম শৃঙ্খলা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অতি শৈশবকালের আচরণ, পরিবেশ প্রভাবই ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। ফ্রয়েডের মতে শিশুর পাঁচ বছর কালের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের কাঠামো তৈরি হয়ে যায়। শৈশবকালেই, মনঃসমীক্ষণের মতে, মূল্য বোধের জন্ম হয়। আধুনিক যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর মনঃসমীক্ষণই গুরুত্ব দিয়েছে।

॥ অনুশীলনী ॥

1. write an essay on Freud's concept of the unconscious.
2. Discuss the role of the unconscious in the normal life of a man.
3. Elucidate the modern concept of the unconscious and its normal functions in the life of man.
4. Give a short account of the concept of the unconscious and the basic principles of psycho-analysis.
5. What are conflicts ? How are they generally formed ? Suggest a general method for solving conflicts in children.
6. Indicate the effect of mental conflicts on the mental health of an individual.
7. What are complexes ? How are they formed ? Describe the detrimental effects of complex in the life of an individual.
8. Define a complex. Explain how repressed complexes manifest themselves.
9 Delineate the basic principles of Psycho-analysis.
10. Write an essay on the influence of the psycho-analysis school of psychology upon educational practices.
11. Estimate the impact of the knowledge of psycho-analytical. principles in understanding and manipulating school problems in an effective way.
12. Does the knowledge of psychology of the unconscious help the teacher to understand some problem behaviour of his students in a better way ? Does this knowledge help him too to devise a suitable method of treatment for the problem children ?
13. Discuss accordiug to Freud different stages of the development of libido.
14. Discuss the concepts of Fixation and Regression. What role do they play in the personality development of a child.
15. Delineate the concept of Libido after Frued. In this connection discuss the views of Adler & Jung on either concept of libido.
16. What do you mean by the term "Psycho dynamics of unconscious mental function ?" What is unconscious dynamics ? Illustrate your answer.
17. Give Freud's account of Instincts ? Explain in this connection his principle of dualism.
18. Describe the phenomenon of the development of supper-ego. How is its development related to the mental health of an individual ?
19. Explain the significant characteristics of Id. Ego & Super-ego and point out their mutual relations.
20. Give a brief account of the psycho-analytical conception of mind. Add your comments.
21. Elucidate the basic concept of Psycho-analysis. How is the concept useful in Mental Hygiene ?
22. Write notes on :
(1) Resistance. (2) Transference. (3) Psycho-analysis & Education. (4) Infantile sexuality. (5) Eros & Thanatos. (6) Pleasure & reality principle. (7) Dream-analysis. (8) Development of Mind.

ষোড়শ অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস

[Defence Mechanism]

বিশেষ কতকগুলি অবস্থা ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ পথে প্রতিবন্ধের সৃষ্টি করে এবং হতাশা ও দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটায়। এই দ্বন্দ্ব ও হতাশা ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা আছে যা এই সকল মানসিক বিপর্যয় থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করার প্রয়াস করে। এ সকল প্রয়াস ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উদ্দিষ্ট। এই ভারসাম্য একদিকে অদস (*Id*), ও অন্যদিকে অহম্ (*Ego*) অধিশাস্তার বিপরীতমুখী ইচ্ছার দ্বন্দ্বের দ্বারা বিপর্যস্ত। এ সকল ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রয়াস অহমের (*Ego*) প্রয়াস। অদস ও অধিশাস্তার দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের প্রয়াস অহম্ করে থাকে। নির্জ্ঞানস্থিত অহমের ব্যক্তিত্ব-ভারসাম্য রক্ষণপ্রয়াসকেই ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস (*Defennce Mechanism* বা *Ego defence*) বলে।

শরীরের ভারসাম্য রক্ষা, তার সুস্থতা বজায় রাখার জন্য শরীরের মধ্যে কতকগুলি উপায় আছে। শারীরিক গঠন-বিন্যাস আমাদের এরূপ যে, বাইরের বিপদের সম্মুখে শরীরের মধ্যেই এমন কতকগুলি প্রক্রিয়া ঘটে যায়, যার ফলে শরীরের ভারসাম্য আবার ফিরে আসে। যেমন, শরীরের কোথাও কেটে গেলে, রক্তবন্ধ-হওয়ার চেষ্টা বাইরে থেকে করার জন্য ঔষধ পত্র দেওয়া হয় বটে, কিন্তু শরীরের মধ্যে এমন শরীরবৃত্তিক (*Psysiological*) পরিবর্তন ঘটে যে, রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার স্বাভাবিকভাবে একটা প্রবণতা শরীরের মধ্যেই উপস্থিত হয়। যদি শরীরের পক্ষে অহিতকর এমন কোন খাদ্যবস্তু কেউ খেয়ে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বমির উদ্রেক হয়। শরীরের পক্ষে মারাত্মকভাবে যা ক্ষতিকর তাকে পাকস্থলী বের করে দিতে চায়। শরীরে যদি কোন দূষিত জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে অনেক সময় শরীরের মধ্যেই এমন রাসায়নিক বস্তু (*anti-body*) সৃষ্টি হয় যা সেই জীবাণুর অহিতকর ক্রিয়াকে প্রতিহত করে।

শারীরিক দিকে যেমন শারীরিক ভারসাম্য ও সুস্থতা রক্ষার কতকগুলি উপায় আছে, মানসিক দিক থেকেও মনের কতকগুলি শক্তি আছে। মানসিক এমন কতকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটে, যা ব্যক্তিকে মানসিক দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, জর্জরতা থেকে রক্ষা করে, ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনায় সাহায্য করে। অহং সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত

হওয়ার আগেই এমন কতকগুলি প্রয়াস পর্বের অবতারণা করে যা ব্যক্তির দ্বন্দ্ব-জর্জরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করে ; ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা রক্ষা করার চেষ্টা করে, এবং অস্বস্তিকর অবস্থায় সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে সাহায্য করে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে জিনিসটা আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে। কোন একটা সমস্যার সম্মুখীন হলে বা কোন অস্বস্তি উদ্রেককারী ঘটনার দ্বারা পিষ্ট হলে ব্যক্তি নানা উপায়ে সে অবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়াস করে—নানাভাবে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। যেমন ধরা যাক, একজন ছাত্র তার বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যয়ন নিয়ে নানাপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সে বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষার ফলও খুব খারাপ করছে। এ রকম অবস্থায় ছাত্রটির মধ্যে নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সে তার ব্যর্থতাকে নানাভাবে নিতে পারে এবং এ ব্যর্থতা বিদূরণের জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে পারে। সকাল সন্ধ্যা সব সময় পাঠে রত হতে পারে, আবার এমন একটা মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে পারে যাতে সে ভেবে আনন্দ পাবে বিজ্ঞান বিষয়গুলি তেমন একটা প্রয়োজনীয় কিছু নয়, কাজেই ও সব বিষয়ে পড়াশুনার সার্থকতাই বা কি! এমনও হতে পারে, সে নিজে পড়াশুনা কিছু করল না কেবল পড়াশুনায় ভাল এমন সব ছেলেদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করল এবং একটা ভাব দেখাতে থাকল যেন ভাল ছেলেদের সাথে মিশে মিশে সে-ও ভাল হয়ে গেছে। আবার যে অধ্যাপক পড়ান তাঁর পড়ানো সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিযোগের অবতারণা করতে পারে, তার মত আরও অনেক ছাত্রেরও যে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার অসুবিধা হচ্ছে তার উল্লেখ করেও নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকার চেষ্টা করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, সে অসুস্থ হয়ে গিয়ে পরীক্ষায় যাতে না বসতে হয় তার সব ব্যবস্থা করতে পারে ; কিংবা কল্পনায় সে নিজেকে একজন কৃতী ছাত্র ভেবে মশগুল থাকতে পারে।

ব্যর্থতার সাথে সম্মুখীন হওয়ার কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পথ, কত বিভিন্ন প্রকারের প্রক্রিয়া! এ প্রক্রিয়ার শ্রেণীকরণ সম্বন্ধে সকল মনোবিদ্ যদিও একমত নন, তবু কতকগুলি প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সকলেই একমত।

প্রতিরক্ষা কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু-প্রকার। (১) অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছার বাইরে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার চেষ্টা। (২) যতটা সম্ভব অদসের ইচ্ছা ভিন্ন পথে চরিতার্থ করা। মোটের ওপর বাস্তবের সাথে যতটা সম্ভব মানিয়ে চলাই এ উপায়গুলির উদ্দেশ্য। এই কারণেই প্রক্রিয়াগুলিকে প্রতিযোজন প্রক্রিয়াও (*Adjustment mechanism*) বলা হয়ে থাকে। এ সকল প্রক্রিয়ার মধ্যে

পূরণ প্রয়াস (*Compensation*), অপযুক্তিকরণ (*Rationalisation*), অভিক্ষেপ (*Projection*), একাত্মকরণ (*Identification*), উদ্গতি সাধন (*Sublimation*), অবদমন (*Repression*), প্রত্যাবৃত্তি (*Regression*), স্বপ্নচারিতা (*Phantasy & Day dreaming*), রূপান্তর (*Conversion*), বিপরীত ক্রিয়া সংগঠন (*Reaction Formation*) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক এক ক'রে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

পূরণ প্রয়াস (Compensation) :

কোন ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের কমতিকে অন্য বিষয়ে (যাতে তার কোন কমতি নেই) ব্যুৎপত্তি লাভের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে তখন সে প্রয়াসকেই পূরণ প্রয়াস বলে অভিহিত করা হয়। ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ে ব্যর্থতাকে বা অক্ষমতাকে অন্য কোন বিষয়ে স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের সম্বন্ধে ধারণাকে উচ্চগামী করতে চায় তখন সে অবস্থাকেই বলা হয় পূরণ প্রয়াস। যেমন কোন ছেলের যদি শারীরিক কোন খুঁৎ থাকে, তাহলে তার যে অক্ষমতা ও অসমতা, তাকে পরিপূরণ করে নিজের মানকে সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পড়াশুনায় ভাল করার প্রয়াস চালাতে পারে। খেলাধূলা, নাটকানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কিংবা চলাফেরা কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা চমক আনার চেষ্টা করতে পারে যাতে বস্তুত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং সেও যে একটা কম কিছু নয় এটাকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

এ পূরণ প্রয়াস অনেক সময় ভালর দিকে হতে পারে ; যেমন পরীক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে এমন ছেলে পড়াশুনায় খুব মনোযোগী হয়ে ওঠে, পড়াশুনায় খুব ভাল ফল করতে পারে। ডেমোস্থেনিস্ প্রথমদিকে ছিলেন তোৎলা, পরে সেই ডেমোস্থেনিস্ (*Demosthenes*) প্রতিজ্ঞার দ্বারা চালিত হয়ে আপন প্রয়াসে গ্রীসদেশের বড় বাগ্মীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কখনো কখনো, এ পূরণ প্রয়াস অস্বাস্থ্যকর ও অসামাজিক রূপও নিতে পারে। যেমন কোন ছেলে বাবা ও মা'র স্নেহ প্রযত্ন থেকে বঞ্চিত, বাবা মা তার সাথে অত্যন্ত নির্মম আচরণ করে থাকে, এ অবস্থায়, বাবা মা'র স্নেহ-বঞ্চনাজনিত যে ক্ষত, নিজের সম্বন্ধে যে হীনতাবোধ তাকে পূরণ করার জন্য সেও ক্লাসের ছেলের সাথে অত্যন্ত বিরূপ আচরণ ও নির্মম আচরণ করে থাকতে পারে। মারধর করা, গালমন্দ করা, এবং তার থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছেলেদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা প্রভৃতি

সংলক্ষণমূলক (*Symptomatic*) আচরণের মধ্য দিয়ে সে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে।

অপযুক্তিকরণ (Rationalisation) :

কোন ব্যক্তি যখন তার প্রযুক্ত কাজে ব্যর্থতা বোধ করে, কিংবা কোন সমস্যার সমাধান সঠিকভাবে করতে পারে না, বা সমাজ ও আত্মিক অনুশাসন বহির্ভূত কোন কাজ করে, তখন নিজের দোষস্খালনের জন্য, কখনও বা ব্যর্থতা বোধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সপক্ষে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে থাকে। যথার্থ যুক্তি অপেক্ষা যাহোক করে একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার প্রবণতাই বেশী পরিলক্ষিত হয়।

'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা'; 'আঙ্গুর ফল টক', এ ধরনের যুক্তির অবতারণা অপযুক্তিকরণের উদাহরণ। কোন ছাত্র হয়ত পরীক্ষায় দু'তিনবার উত্তীর্ণ হতে পারল না, তখন সে নিজে এ রকম একটা যুক্তির অবতারণা করে স্বস্তি পেয়ে থাকে যে, যারা বোকার মত না বুঝে সুঝে মুখস্থ করতে পারে, আজকাল তারাই কেবল পাশ করতে পারে—ভাবখানা তার এ রকম যে, বুঝে সুঝে পড়ে বলেই সে পাশ করতে পারছে না।

কেউ হয়ত একটা বড় চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ দিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরিতে নির্বাচিত হ'ল না। এরকম অবস্থায় সে হয়ত মনকে প্রবোধ দিতে থাকল, চাকরিটা না হয়ে ভালই হয়েছে। হলে পরে কতদূর যেতে হত, মাইনে হয়ত অনেকটা বেশী হত, কিন্তু তাতে টাকার অংকটাই বেড়ে যেত, আসল উন্নতি কিছু হত না।

এ রকম যুক্তির অবতারণা ব্যক্তি যে জেনে-শুনে ভেবে-চিন্তে করে তা নয়, আপনা-আপনি এটা হয়ে যায় এবং ব্যক্তি যে আসল ঘটনাকে বিকৃত করছে ও আত্মপ্রবঞ্চনা করছে, সেটা অবহিত থাকে না। এরকম অবস্থায় ব্যক্তি তার আচরণ ও প্রতিক্রিয়ার আসল বাস্তব সম্পর্কযুক্ত কারণ সম্বন্ধে একেবারেই অবহিত থাকে না এবং এরকম কিছুদিন চলতে থাকলে তার মধ্যে ভ্রান্তবীক্ষণও দেখা দিতে পারে (*Illusions*)।

অভিক্ষেপ (Projection) :

অভিক্ষেপ অপযুক্তিকরণের এক বিশেষ উপায়। কোন ব্যক্তির নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢাকার জন্য, অদমের ইচ্ছার প্রকোপ এবং অধিশাস্তা ও অহমের তাতে

বাধাদান এবং তজ্জনিত যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা, তা থেকে মুক্তিলাভের জন্য ব্যক্তি অপরের ওপর নিজের ইচ্ছাকে আরোপ করে থাকে। নিজের ত্রুটিকে না দেখে, সেই ত্রুটি অপরের মধ্যে সে দেখে নিজেকে হাল্কা করতে চায়।

একজন ব্যক্তি হয়ত মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত। সেই ব্যক্তি আবার অন্যকে মিথ্যা কথা বলার দায়ে অভিযুক্ত করছে। একজন ছাত্র পরীক্ষায় নকল করে, সেই আবার বলে বেড়াতে থাকল যে, ক্লাসের সকলেই নকল করেছে, সকলেই বই দেখে লিখেছে। এটা প্রায়ই দেখা যায় যাদের মধ্যে দোষত্রুটি বেশী, তারাই অপরের সমালোচনায়, অপরকে গালমন্দ করায় অগ্রণী ও সদা রত হয়। নিজের দোষস্খালন ও ঢাকার এটা একটা প্রশস্ত পথ হিসাবে এরা বেছে নেয়। কোন ব্যর্থতা ত্রুটির জন্য নিজের দোষ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে দায়ী না করে যখন অপরকে দায়ী করবার চেষ্টা করা হয়, তখনই অপরকে দায়ী রে নিজের অসামাজিক ইচ্ছাজনিত যে মানসিক যন্ত্রণা ও অসমতা দেখা দেয়, তা থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস করা হয়। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে অভিক্ষেপ (*Projection*) বলা হয়। কোন স্ত্রী স্বামীকে এই বলে ঘৃণা করে যে, তার স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত এবং তার প্রতি যথাযথ মনোযোগ নেই। আসলে স্ত্রীলোকটির অবচেতন মানসে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি রয়েছে, স্বামীর প্রতি যথাযথ মনোযোগ নেই—এই ত্রুটি, এই অবৈধ ও অসামাজিক ইচ্ছা মনে উঁকি দিচ্ছে দেখে তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, তা থেকে নিজেকে হাল্কা করার জন্য নিজের ইচ্ছাকে স্বামীর মধ্যে অভিক্ষেপ করছে। এইভাবে ব্যক্তির মধ্যে অভিক্ষেপ (*Projection*) ক্রিয়াটি কাজ করে।

একাত্মকরণ (Identification) :

ইচ্ছা-পূরণের এটা একটা পরোক্ষ উপায়। আদসের অনেক ইচ্ছা যা সমাজে চরিতার্থ হবার পথে অনেক বাধা ও প্রত্যক্ষভাবে যাকে চরিতার্থ করা যায় না, তাকে পরোক্ষভাবে একাত্মকরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অবচেতনভাবে চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। নিজেকে অভিপ্রেত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম করে। তার মধ্য দিয়ে নিজের ইচ্ছা-পূরণের চেষ্টা করা হয়। নিজেকে পিতার সাথে একাত্ম করে শিশু তার অক্ষম বাসনাকে চরিতার্থ করার প্রকাশ করে। পিতার সাথে নিজেকে এক ভেবে শিশু পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সিনেমা দেখতে গিয়ে, কোন উপন্যাস পড়তে পড়তে নায়ক-নায়িকার সাথে একাত্ম হয়ে নিজেদের অবদমিত পুঞ্জীত বাসনাকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলি ডানা মেলে

উড়তে চায়। অক্ষম বাসনার পরিতৃপ্তিতে একাত্মকরণ অনেক পরিমাণে কাজ করে। ছেলে পিতার সাথে, মেয়ে মা'র সাথে একাত্মকরণ করে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে একাত্মকরণ করে থাকে এবং তাঁদের চিন্তা-ভাবনা আচার-আচরণকে অনুসরণ করে। আমাদের যে সব গুণপনা নেই, অথচ যে সব গুণপনার অধিকারী হতে আমরা সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করি, সেইসব গুণান্বিত ব্যক্তিদের সাথে একাত্মকরণ করে আমাদের অভাব পূরণ করার প্রয়াস করে থাকি। বীর পূজা (*Hero worship*) একাত্মকরণের একটি প্রকার।

একাত্মকরণের মধ্য দিয়েও চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন একদিকে যেরূপ ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় একাত্মকরণে ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হয়। যেমন, যে গুণপনা ব্যক্তি নিজেই অর্জন করতে পারে, সে ওই-গুণপনা অর্জনে প্রয়াসী না হয়ে, অভিপ্রেত গুণপনা যে ব্যক্তির আছে তাঁর সাথে একাত্মকরণ করেই কল্পনায় সেও যেন ঐরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে গেছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়। এরূপ একাত্মকরণ ক্ষতিকর। কিন্তু উন্নত আদর্শের জীবনধারার সাথে একাত্ম হ'য়ে, সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুস্থ ও সুদৃঢ় হতে পারে।

উদ্গতিসাধন (Sublimation) :

কোন ইচ্ছার যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যসাধন যদি কোন কারণে ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই ইচ্ছার কাছাকাছি বা প্রায় সমধর্মী কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াস ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। একেই বলা হয় পরিবর্ত উদ্দেশ্য-সাধন (*Substitution*)। যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিষয়ক স্নাতক ছাত্র পরীক্ষায় বার বার অকৃতকার্য হতে থাকে, সে তখন কোন সমধর্মী কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের প্রয়াস করে। একটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার জন্য ছাত্রের মধ্যে যে মানসিক যন্ত্রণা দেখা দেয়, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সে অন্য একটি সমধর্মী বিষয়ে সাফল্য-লাভের প্রয়াস করে।

উদ্গতি-সাধনের ক্ষেত্রেও আমরা মূলত এই প্রক্রিয়ারই একটু ভিন্নতর রূপ দেখি। পরিবর্ত উদ্দেশ্যসাধন প্রয়াসই উদ্গতি সাধন-প্রক্রিয়ায় দেখা যায়। সব ইচ্ছা সমাজে সরাসরি চরিতার্থ করা যায় না, সামাজিক ও আত্মিক বিধিনিষেধ, অদসের সেই সব ইচ্ছাগুলির জৈবিক চরিতার্থতার পথে বাধা দেয়। ফলে এই ইচ্ছাগুলির পূর্ব-নির্ধারিত জৈবিক উদ্দেশ্যর পটপরিবর্তন করতে হয়। জৈবিক উদ্দেশ্য পটপরিবর্তন করে সামাজিক পথে অদস (*Id*) ইচ্ছার চরিতার্থ হবার প্রয়াসকেই উদ্গতিসাধন বলে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের যৌনমূলক বা আক্রমণধর্মী ইচ্ছাবেগকে

মানুষ সরাসরি যখন তখন প্রকাশ করতে পারে না। সমাজের অনেক বিধিনিষেধ তাকে মেনে চলতে হয়। এ সকল ইচ্ছাবেগকে নিরুদ্ধ করতে হয়, অবদমিত করতে হয়। অবদমিত ইচ্ছাবেগের সাথে যে অবরুদ্ধ শক্তি থাকে, তা ব্যক্তির মধ্যে অস্বস্তি ও যন্ত্রণার উদ্রেক করে এবং ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। এই সময়ে এই নিরুদ্ধ শক্তিকে সমাজ-অনুমোদিত পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করাকেই উদ্গতিসাধন বলা হয়। সন্তানহীন অনেক বিবাহিত মহিলার নিরুদ্ধ মাতৃত্ব, শিশুকল্যাণ কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে শিশু-পরিচর্যার মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে পুঞ্জীত ক্রোধাবেগ, খেলাধুলা, শিল্পকর্ম, উদ্যান-চর্চা প্রভৃতি কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অবদমিত যৌনাবেগকেও সমাজ অনুমোদিত ও সংস্কৃত পথে, যেমন সংগীত, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজ-কল্যাণকর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উন্নীত করা যেতে পারে। উন্নতিসাধনে একদিকে ব্যক্তি যেমন পরোক্ষ-ভাবে ইচ্ছা চরিতার্থ করায় সন্তোষ লাভ করে, অন্যদিকে শক্তির উদ্গতি, কল্যাণকর পথে নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক কল্যাণও সাধিত হয়। মহৎ সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, বিজ্ঞান, গবেষণা সবকিছুই আদিম অদসশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরণের ফলস্বরূপ। কবি দান্তে (*Dante*) সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি ফ্লোরেন্সের পথ দিয়ে যেতে যেতে বিয়াত্রিস্ (*Beatrice*) নাম্নী এক যুবতীকে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়েন। বিয়াত্রিস্ সামাজিক মর্যাদায় দান্তে অপেক্ষা উঁচুতলার ছিলেন।

দান্তে তার সাথে কোনদিন একটি কথাও বলেন নি, একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁকে না পাওয়ার যে বেদনা, বিয়াত্রিসকে কেন্দ্র করে তার ইচ্ছা-নিরুদ্ধ হওয়ার যে মানসিক যন্ত্রণা, তা নিরসনের জন্য ইচ্ছাবেগকে আরও উন্নত-পথে দান্তে মুক্তি দিতে প্রয়াস করেছিলেন। তাঁর কয়েকখণ্ড কবিতাগ্রন্থ এ প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি।

এ প্রসঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে যে, উদ্গতিসাধনের জন্য সুন্দর সুস্থ পরিবেশ থাকা দরকার। শিক্ষিত ও সংস্কৃত হওয়ার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ব্যক্তি যাতে পায়, সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। বস্তুত ব্যক্তিত্ব ভারসাম্য-রক্ষাকারী ক্রিয়া-কৌশলের মধ্যে উদ্গতিসাধন-প্রক্রিয়াই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, সামাজিক ও আত্মকল্যাণকর।

অবদমন (Repression) ঃ

অবদমন সঙ্গতিরক্ষার সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর উপায়।

প্রক্রিয়া—পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রত্যাবৃত্তি (Regression) :

লিবিডো বা যৌনমানস শক্তির বিকাশপথে, যৌন-মানস শক্তি যখন কোন পর্যায়ে গিয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে বা বলা যেতে পারে শক্তির যখন সংবন্ধন (*Fixation*) ঘটে, তখন যৌন মানস শক্তির অগ্রগতি যথাযথভাবে হতে পারে না। সর্বদাই তার পিছনে ফেরার একটা প্রবণতা থাকে। বাস্তবের কোন সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি যখন সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে না, অর্থাৎ লিবিডো যখন আর বাস্তবের সাথে তাল রেখে চলতে পারে না, তখন সে এ অবস্থা ছেড়ে অতীতের সেই স্তরে ফিরে যায় যেখানে গিয়ে লিবিডো সর্বাপেক্ষা আরাম পেয়েছে বা যে স্তরে আরাম আয়াস না পাওয়ার জন্য একটা প্রবল আকুতি রয়েছে (সংবন্ধন বা *fixation* স্তর)। লিবিডোর এরূপ পিছনে ফিরে যাওয়াকেই প্রত্যাবৃত্তি বলে।

অনেক ব্যক্তিই জীবনের সমস্যাসঙ্কুল অবস্থার সঙ্গে পরিণতভাবে বা সাবালকের মত ব্যক্তিত্ব নিয়ে মুখোমুখী হয়ে যুঝতে পারে না। এ রকম অবস্থা দেখলেই এ ধরনের ব্যক্তিরা শিশুসুলভ আচরণে ফিরে যায়। শিশুর মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এ রকম আচরণকেই প্রত্যাবৃত্তি আচরণ বলে। ব্যক্তি পূর্বে এরূপ আচরণ অপেক্ষাকৃত কম সমস্যাজর্জর অবস্থায় ক'রে কিছু ফল পেয়েছে। এরকম হতে পারে যে, একজন ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে ভেবে পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মধ্যে পেটের গণ্ডগোল বা মাথা-ধরা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। এ রকম আচরণের মধ্য দিয়ে সে পরীক্ষার যে আসল সমস্যা, তা থেকে দূরে থাকতে পারে।

একটি পাঁচ বছরের ছেলে যদি অনুভব করে যে, তার একটি নতুন ভাই জন্মাবার পরই তার আদর-যত্ন কমে গেছে, তাহলে সে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করে অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করে। নিরাপত্তাবোধের অভাব তার মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে, এরকম অবস্থায় সে তার থেকে আরও অল্প বয়সের শিশুর মত আচরণ করে, যাতে এরকম করে বাড়ীর লোকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তার মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব করা, খাওয়াতে নানা প্রকার জটিলতা প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ এ সময়ে দেখা দিতে পারে।

কখনো কখনো এরূপ আচরণ যে দেখা যাবে না, এমন কথা নেই। কিন্তু সর্বদা যদি প্রত্যাবৃত্তিমূলক আচরণ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, তা হলে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ যে নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে, এ সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সর্বদা এরূপ আচরণ ব্যক্তির মধ্যে তখনই দেখা যায়, যখন ব্যক্তির অতি শৈশবকালে যৌন মানস শক্তির বিকাশপথে কোন স্তরে সংবন্ধন ঘটে গেছে।

স্বপ্নচারিতা বা দিবাস্বপ্ন (Phantasy or Day dreaming) :

স্বপ্নচারিতায় ব্যক্তি নিজেকে বাস্তব জীবন থেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের মনগড়া জগতে বিচরণ করতে থাকে। যে সকল ইচ্ছা-পূরণ বাস্তবে করা সম্ভব নয়, সে সব ইচ্ছাকে দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্ত করার প্রয়াস করে। অবদমিত অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলি স্বপ্নে নভোচারী হয়ে ওঠে। দিবাস্বপ্নে ব্যক্তি খুব সহজে এ সকল ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে।

দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে আংশিক সঙ্গতিরক্ষার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তির অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তিতে স্বপ্নচারিতা একটা সহজ ও নির্দোষ উপায়। দিবাস্বপ্ন ব্যক্তিকে ব্যর্থতা ও অবদমিত বাসনাজনিত দ্বন্দ্বজর্জরতা থেকে অনেকটা হাল্কা করে। ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যরক্ষা বিষয়েও অনেক পরিমাণে সাহায্য করে। সিনেমা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির স্বপ্নচারিতা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হতে পারে। বর্তমান জীবনের জটিলতার মধ্যে মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিমিত স্বপ্নচারিতা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এ স্বপ্নচারিতা যদি মাত্রাধিক হয়, বাস্তব জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে কেবল যদি দিবাস্বপ্ন ও স্বপ্নচারিতাতেই সব আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটাবার চেষ্টা করা হয়, তা হলে তা অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। সিজোফ্রেনিয়াতে স্বপ্নচারিতা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা যায়।

রূপান্তরণ (Conversion) :

অনেক অবদমিত বাসনা মানসিক দিক থেকে অভিব্যক্ত না হয়ে শারীরিক দিক দিয়ে প্রকাশলাভের চেষ্টা করে। রূপান্তরিত হিস্টিরিয়াতে মানসিক দ্বন্দ্বে শারীরিক অসুস্থতা যেমন আলসার, কোলাইটিস্, হাত-পা অসাড় হয়ে যাওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ব্যক্তির মধ্যে পাপবোধ যদি খুব প্রকট থাকে, তাহলে যে কাজ করতে অনীহা ও পাপবোধ হয়, সে কাজের জন্য ব্যক্তির যে অঙ্গ ক্রিয়াশীল, তা অকেজো ও অসাড় হয়ে যেতে পারে।

(*Conversion Hysteria*—বিষয়ে "মানসিক রোগের প্রকার" অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।)

বিপরীত ক্রিয়া-সংগঠন (Reaction formation) :

যে ব্যক্তি এককালে অতি কদর্য যৌন জীবন যাপন করত, তাকেই হয়ত পরবর্তীকালে দেখা গেল অত্যন্ত শুচিশুদ্ধ জীবন যাপন করতে। এরূপ আচরণকেই

বলা হয় বিপরীত ক্রিয়া-সংগঠন। যে ইচ্ছাটি অবদমিত, সেই ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কোন ইচ্ছাকে ব্যক্তি অত্যন্ত প্রশ্রয় দেয় ও পোষণ করে থাকে। এরূপ করে ব্যক্তি অবদমিত অস্বস্তিকর ইচ্ছার তীক্ষ্ণতাকে হ্রাস করতে প্রয়াস করে। অবদমিত ইচ্ছাটিকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করে। যৌনেচ্ছার প্রকট অবদমন থেকে কখনও কখনও স্বাভাবিক যৌন জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিপরীতমুখী প্রবল ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। এ থেকে যৌনজীবন সম্পর্কে একটা ভয়ের উদ্রেক হতে পারে।

এরকম আচরণ আমরা অন্যাবিধ বিষয়েও দেখতে পাই ; যেমন কোন ছেলে রোজ দেরি করে স্কুলে আসে। কঠোর শাস্তির ভয়ে দেখা গেল, সে রোজ স্কুল আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে এসে স্কুলে বসে থাকে।

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

ব্যক্তিত্ব ভারসাম্য-রক্ষণপ্রয়াস (Defence Mechanism)→	নির্জ্ঞানস্থিত অহমের ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করার বিভিন্ন প্রয়াসকেই ভারসাম্য রক্ষণ প্রয়াস **(Defence Mechanism বা Ego defence)** বলে। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা ও সুস্থতা রক্ষার জন্য শরীরের মধ্যে কতকগুলি উপায় আছে—শরীরের কোথাও কেটে গেলে রক্তবন্ধ হওয়ার চেষ্টা বাইরে থেকে করার জন্য ঔষধপত্র দেওয়া হয় বটে, কিন্তু শরীরের মধ্যে এমন শরীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে যে, রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে একটা প্রবণতা শরীরের মধ্যেই উপস্থিত হয়। একে শারীরিক **Defence Mechanism** বলা চলে। **anti-body** শরীরে তৈরি হয় বাইরের দূষিত জীবাণু আক্রমণ করলে। শারীরিক দিকে যেমন, মানসিক দিকেও তেমনি কতকগুলি মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করার মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আছে। মানসিক দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, জর্জরতা থেকে রক্ষা করে। ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে—**Defence Mechanism.**

প্রতিরক্ষা-কৌশলগুলির উদ্দেশ্য→

অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছার প্রকাশ হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার চেষ্টা অদসের (Id) ইচ্ছার যতটা সম্ভব চরিতার্থ করা—বাস্তবের সাথে যতটা সম্ভব মানিয়ে চলাই Defence Mechanism-এর উদ্দেশ্য। এই কারণে এদের Adjustment Mechanism-ও বলা চলে।

প্রতিরক্ষা-কৌশলের প্রকার→

পূরণ-প্রয়াস। অপযুক্তিকরণ। অভিক্ষেপ। একাত্মকরণ। উদ্গাতি-সাধন। অবদমন। প্রত্যাবৃত্তি। স্বপ্নচারিতা। রূপান্তর। বিপরীত ক্রিয়া-সংগঠন।

পূরণ-প্রয়াস (Compensation)→

কোন ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের স্বল্পতাকে অন্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে, তখন সে প্রয়াসকেই পূরণ-প্রয়াস বলে। এ পূরণ-প্রয়াস ভালর দিকে হতে পারে, আবার অস্বাস্থ্যকর ও অসামাজিক রূপও নিতে পারে।

অপযুক্তিকরণ (Rationalization)→

প্রযুক্ত কাজে ব্যক্তি যখন ব্যর্থতা বোধ করে, কোন সমস্যার সমাধান সঠিকভাবে করতে পারে না, সমাজরীতিবিরুদ্ধ কোন কাজ করে, তখন নিজের দোষস্খালনের জন্য, নিজের পক্ষে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করে।

অভিক্ষেপ (Projection)→

অভিক্ষেপ অপযুক্তিকরণের এক বিশেষ উপায়। নিজের দোষ ঢাকার জন্য, অদসের (Id) ইচ্ছার প্রকোপ, অধিশাস্তা ও অহমের তাতে বাধাদান, এর জন্য যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা হয় তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে অপরের ওপর আরোপ করে।

একাত্মকরণ (Identification)→

অতৃপ্ত ইচ্ছাপূরণের এটা একটা পরোক্ষ উপায়। নিজেকে পিতার সাথে একাত্ম করে শিশু তার অক্ষম বাসনাকে চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। অদসের (Id) অনেক ইচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে সমাজে চরিতার্থ হবার পথে বাধা পায়—পরোক্ষ-

ভাবে, যে ব্যক্তি চরিতার্থ করছে তার সাথে একাত্মকরণের মধ্য দিয়ে এমন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটাবার চেষ্টা চলে। বীরপূজা একাত্মকরণের একটি উপায়। একাত্মকরণের মধ্য দিয়ে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন একদিকে যেরূপ ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় একাত্ম-করণে ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা ও বিকাশ রুদ্ধ হয়।

উদ্গাতিসাধন (Sublimation)→

উদ্গাতিসাধন পরিবর্ত উদ্দেশ্যসাধন। অদস্ ইচ্ছার পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্যের পট-পরিবর্তন করে সামাজিক ও সার্বিক কল্যাণকর পথে অদসের চরিতার্থ প্রয়াসকেই উদ্গাতিসাধন বলে। দান্তে ও বিয়াত্রিসের ঘটনা—দান্তের কয়েক খণ্ড কবিতাগ্রন্থ। উদ্গাতির জন্য সুন্দর সুস্থ পরিবেশ থাকা দরকার। ব্যক্তিত্ব ভারসাম্য-রক্ষকারী ক্রিয়া-কৌশলের মধ্যে উদ্গাতিসাধন প্রক্রিয়াই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। সামাজিক ও আত্মকল্যাণকর।

অবদমন (Repression)→

সঙ্গতিরক্ষার অস্বাস্থ্যকর উপায়। অদস ইচ্ছা প্রহরী (Censor) দ্বারা প্রতিহত হয়ে নির্জ্ঞান মনেই ফিরে আসে—চেতন-স্তরে এরা পৌছতে পারে না। তখন এ সকল ইচ্ছার অবদমন ঘটে। একেই অবদমন-প্রক্রিয়া বলে।

প্রত্যাবৃত্তি (Regression)→

যৌন মানস শক্তির বিকাশ-পথে শক্তি যখন কোন পর্যায়ে গিয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে অর্থাৎ শক্তির সংবন্ধন (fixation) ঘটে তখন যৌন মানস শক্তির অগ্রগতি যথাযথভাবে হতে পারে না। বাস্তবের কোন সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি যখন সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে না অর্থাৎ লিবিডো যখন আর বাস্তবের সাথে তাল রেখে চলতে পারে না, তখন সে এ অবস্থা ছেড়ে অতীতের সেই স্তরে ফিরে যায় যেখানে লিবিডো সর্বাপেক্ষা আরাম পেয়েছে বা যে স্তরে এতটুকু আরাম আয়াস না পাওয়ার জন্য একটা প্রবল আকুতি রয়েছে

(সংবন্ধন বা fixation স্তর)। লিবিডোর এরূপ পিছনে যাওয়াকেই প্রত্যাবৃত্তি বলে।

স্বপ্নচারিতা বা দিবাস্বপ্ন (Phantasy or Day dreaming)→

স্বপ্নচারিতায় ব্যক্তি নিজেকে বাস্তব জীবন থেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের মন-গড়া জগতে বিচরণ করতে থাকে। যে সকল ইচ্ছা-পূরণ বাস্তবে করা সম্ভব নয়, সে সব ইচ্ছাকে দিবা-স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্ত করার প্রয়াস করে।

রূপান্তর (Conversion)→

অনেক অবদমিত বাসনা মানসিক দিকে অভিব্যক্ত না হয়ে শারীরিক দিক দিয়ে প্রকাশ-লাভের চেষ্টা করে। মানসিক দ্বন্দ্ব, শারীরিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

বিপরীত ক্রিয়া-সংগঠন (Reaction formation)→

অবদমিত ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কোন ইচ্ছাকে ব্যক্তি যখন প্রশ্রয় দেয় ও পোষণ করে, তখনই তাকে বিপরীত ক্রিয়ার সংগঠন বলে। যৌনেচ্ছার প্রকট অবদমন থেকে স্বাভাবিক যৌন জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিপরীতমুখী প্রবল ইচ্ছা ব্যক্তির মধ্যে আসে—এটাই বিপরীত ক্রিয়ার সংগঠন।

॥ অনুশীলনী ॥

1. Explain the term 'defence mechanism'. Describe a few defence mechanisms with illustrations.

2. Elucidate the various psychic mechanism involved in the fulfilment of repressed wishes.

3. Define a complex. Explain how repressed complexes manifest themselves.

4. Are defence mechanisms simply adjustment mechanisms? Justify your answer.

5. Write notes on : Sublimation, Projection, Repression, Regression, Rationalization, Compensation, Identification, Conversion, Day-dreaming.

সপ্তদশ অধ্যায়

মানসিক বৈকল্য, মানসিক রোগের কারণ : পারিবেশিক ও গাঠনিক

[Causes of mental diseases and difficulties : Environmental and Constitutional]

দেহের রোগের যেমন কোন-না-কোন কারণ আছে, মানসিক রোগেরও কারণ আছে। বহু ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, জন্ম থেকেই তাদের এমন দুর্বল শারীরিক গঠন যে, সামান্য অনিয়ম বা আঘাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ বহু অনিয়ম ও আঘাতকেই অনেক দিন সহ্য করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জন্মগত গাঠনিক শারীরিক কাঠামো, দৈহিক সুস্থতা-অসুস্থতার কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ নির্ণায়ক। কিন্তু শক্ত সুঠাম শারীরিক গঠন থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ হয়ে থাকে, এহেন ব্যক্তি যদি নিয়ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকে, যেমন অসময়ে বহুদিন খাওয়া দাওয়া, অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া, কিংবা খুব ঠাণ্ডা লাগানো, এরকম অবস্থায় দৈহিক গঠন সুদৃঢ় হলেও, পারিবেশিক অস্বাস্থ্যকর প্রভাবের জন্য ব্যক্তির মধ্যে নানা প্রকার দৈহিক রোগ দেখা দেয়। অবশ্য জন্মগতিতেই যদি কেউ খুব দুর্বল হয় তা হলে সে খুব তাড়াতাড়ি অসুস্থ পারিবেশিক প্রভাবের শিকার হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, কিছু কিছু দৈহিক রোগ আছে যা বংশগতিতে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে বর্তায়।

এরূপভাবে দেখা যায় যে, দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে জন্মগতি ও পরিবেশ উভয়ই কারণ হিসাবে কাজ করে· কোন ক্ষেত্রে জন্মগতি অধিক দায়ী, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবেশিক শক্তি বেশী কাজ করে।

মানসিক বৈকল্য ও রোগের ক্ষেত্রেও জন্মগতি ও পরিবেশ কাজ করে। অনেক মানসিক রোগের জন্মগতি থেকে জন্ম হয়। অনেক মানসিক বৈকল্যও জন্মগতি থেকেই হয়ে থাকে। যদি কারও মস্তিষ্কের গাঠনিক কোন বিকৃতি থাকে, তা হলেও তার মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। যৌন রোগ, মস্তিষ্কে আঘাত, অতিরিক্ত মদ্যপান প্রভৃতির জন্যও মানসিক রোগ হতে পারে। নালীবিহীন (*Endocrine glands*) গ্রন্থিরাজির কোনটির অতিমাত্রিক বা নিম্নমাত্রিক কার্য-কলাপের জন্যও মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর জন্যও মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

এ ছাড়া শিশুর মধ্যে যদি অঙ্গগত ও গাঠনিক দিক থেকে বিকৃতি থাকে, তা হলে সে নিজেকে আর সকলের থেকে হীন বোধ করে এবং এই হীনমন্যতারফলে তার প্রতিযোজন-প্রয়াস অস্বাভাবিকরূপ পরিগ্রহ করে।

মস্তিষ্কে যদি খুব শক্ত আঘাত লাগে, বা হঠাৎ কোন উঁচু জায়গা থেকে শিশু যদি মাটিতে পড়ে যায়, তা হলে মানসিক দিক থেকে তার মধ্যে যে ভয়ের উদ্রেক হয়, তা থেকেও মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।

জন্মগতি ও পরিবেশ ঘটিত কারণ:

মানসিক রোগ বংশগতিসূত্রে আসে কিনা, এ বিষয়ে ভিন্ন মতামত আছে। বংশগতি ও পরিবেশ এ দুটি শক্তির মধ্যে কোন্‌টা ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি, সুস্থতা, অসুস্থতা নির্ণয়ে অধিক কাজ করে, সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং মোটামুটিভাবে এ সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, বংশগতি ও পরিবেশ দুটিই ব্যক্তিত্বগঠনে সমানভাবে কার্যকরী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব বেশী, যেমন বুদ্ধির ক্ষেত্রে, দৈহিক গুণাগুণের (*Physical traits*) ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাবই অধিক। মেজাজ বা মনঃপ্রকৃতি (*Temperament*) কতটা বংশগতি ও কতটা পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়, এ বিষয়েও মতবিরোধ আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, যৌনেচ্ছার মূলে দৈহিক গঠন, (বিশেষ করে গ্রন্থির রস-নিঃসরণের তারতম্য, স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক কার্যের হেরফের) বিশেষভাবে কাজ করে। দেহের চাহিদা পরিপূরণের জন্য যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তা থেকে দেহকে স্থিতিতে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যক্তির যে উদ্যম-আচরণ, তাকেই মনোবিদ্‌রা **কর্মাবেগ** (*Urges or Drives*) বলেছেন। দৈহিক গাঠনিক তারতম্যের জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কর্মাবেগের পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন কারো মধ্যে যৌনস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল—কারো রাক্ষুসে ক্ষুধা। দৈহিক গঠন থেকে যেহেতু এ সকল স্পৃহার উদ্ভব ঘটে, সেই হেতু এ সকল স্পৃহা বংশগতির দ্বারা অধিক নিয়ন্ত্রিত, এটা বলা যেতে পারে। অবশ্য এটাও সত্য যে, এই সকল ইচ্ছা বা স্পৃহা গৃহ-পরিবেশ, বিদ্যালয়, সমাজ-পরিবেশের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্মিলিত-ভাবে এসকল স্পৃহার কম-বেশী ক্রিয়াকলাপ থেকেই আবার মেজাজ বা মনঃপ্রকৃতির সৃষ্টি হয়। ফ্রিম্যান (*Freeman*), নিউম্যান (*Newman*), হল্‌জিনজার (*Halzinger*) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ উনসত্তর-জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন। উনিশ-জোড়া যমজ সন্তানদের একজনকে এক পরিবেশে, অপর জনকে ভিন্ন পরিবেশে রেখে দেখলেন। অন্যদিকে অপর পঞ্চাশ-জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানকে একসঙ্গে বড়

করে তোলা হ'ল। এই ঊনসত্তরটি জোড়া যমজ সন্তানের উপর পরে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা দেওয়া হ'ল। তুলনামূলক বিচার করা হ'ল এই দুটি দলের মধ্যে। প্রথম দলে আছে সেই সব যমজ সন্তান যারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে, আর দ্বিতীয় দলে আছে সেই সব যমজ সন্তান যারা একসঙ্গে একই প্রকার পরিবেশে মানুষ হয়েছে। দেখা গেল, যদিও প্রথম দলের সাথে অপর দলের মেজাজ বা মনের প্রকৃতির দিক থেকে অনেক তফাৎ রয়েছে, তবুও দলগতভাবে অর্থাৎ যারা একসাথে বড় হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল, আর যারা আলাদাভাবে বড় হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল। সমকোষী যমজ সন্তানের দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য, তা পরিবেশের জন্য। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, বংশগতি ও পরিবেশ দুই-ই সমানভাবে এদের মনঃপ্রকৃতিগঠনে কাজ করেছে।

বুদ্ধির দিক থেকে বংশগতিই বেশী কার্যকরী। *Dr. A. F. Tredgold*-এর মতে, *"The great majority of cases of mental defect are due to inheretance."* বুদ্ধির স্বল্পতা-হেতু অনেক অপসঙ্গতি আসতে পারে। দুষ্ক্রিয়তা, সমস্যামূলক আচরণের কারণ অনেক সময় দেখা যায় ক্ষীণ বুদ্ধি।

কাজেই মনঃপ্রকৃতি ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে বংশগতির যথেষ্ট কার্যকরী অবদান রয়েছে, এবং যেহেতু ব্যক্তিত্বের সুস্থতা-অসুস্থতা মনঃপ্রকৃতির গড়নের উপর, তার বিকাশ-পর্বের উপর নির্ভর করে, সেই হেতু বলা যায়, মানসিক রোগের কারণ একদিকে যেরূপ বংশগতি, অপরদিকে সেইরূপ পরিবেশও বটে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানসিক বৈকল্য, শিশুদের সমস্যামূলক আচরণ, উদ্বায়ু রোগ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অর্থাৎ যে পরিবেশে মৌলিক চাহিদা-পূরণের ব্যবস্থা নেই এবং যে পরিবেশে মানবিক সম্পর্ক দূষিত ও বিপর্যস্ত (পিতামাতার সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্বন্ধ ; বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক প্রভৃতি)। কঠিন মানসিক রোগ বিশেষ করে বাতুলতার (***Psychoses***) ক্ষেত্রে বংশগতিই দায়ী। সিজোফ্রেনিয়া, মৃগীরোগ যে বংশগত কারণে হয়ে থাকে তা আজকাল প্রায় প্রমাণসিদ্ধ। দেখা গেছে যে, সমকোষী যমজ সন্তানদের (*Identical twins*) একজনের মধ্যে যদি সিজোফ্রেনিয়া দেখা যায়, তা হলে অপর জনের মধ্যেও তা পরিলক্ষিত হয়।

পরিবেশগত কারণগুলি সমস্যামূলক আচরণ ও দুষ্ক্রিয়তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ করব।

(ক) **ভৌতিক পরিবেশ** (খ) **মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ**

জীর্ণ ও বদ্ধ গৃহ ও বিদ্যালয়-পরিবেশ দৈহিক বিকাশ তথা মানসিক বিকাশকে বিঘ্নিত করে, এবং তা থেকে নানা প্রকার মানসিক বিকৃতি ও বৈকল্য দেখা দেয়। যে সকল পারিবেশিক অবস্থা মানসিক বিকৃতির কারণ হিসাবে কাজ করে, তা নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

(ক) সংকীর্ণ ও জীর্ণ বাসস্থান—আলো-হাওয়া ও পরিসরের অভাব

(খ) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব

(গ) খেলাধুলা, আনন্দ-আহ্লাদের কোন ব্যবস্থা না থাকা

(ঘ) গৃহে ও বিদ্যালয়ে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব

(ঙ) পিতামাতার মধ্যে সর্বদা বিবাদ ও এর জন্য সন্তানদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব।

(চ) সন্তানের প্রতি নির্মম আচরণ ও প্রত্যাখ্যান—স্নেহ-প্রযত্ন থেকে বঞ্চনা ও এর জন্য ভয় ও দুশ্চিন্তা।

(ছ) সন্তান-প্রতিপালনে পিতামাতার মধ্যে কোন নীতিগত সামঞ্জস্যহীনতা—কখনো অতিমাত্রিক শৃঙ্খলা, কখনো কোন রকম শাসন না থাকা—জীবনাদর্শ ও আচরণবিধি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি।

(জ) পিতামাতার অসুস্থ ব্যক্তিত্ব

(ঝ) ছিন্নমূল গৃহাবস্থা—নিরাপত্তাবোধের অভাব (Broken Home)

(ঞ) অসৎ সঙ্গীসাথী—উপযুক্ত নৈতিক মানের অভাব।

(ট) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ মনোযোগের অভাব—অনুপযুক্ত পাঠক্রম—ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ-পদ্ধতি—সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা না থাকা—শিক্ষা ও বৃত্তি-নির্দেশনার অভাব—শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অসুস্থ সম্পর্ক।

(ঠ) যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকা—শিশুর মধ্যে অহেতুক অস্বাস্থ্যকর অপরাধ-বোধের উদ্রেক করা। গৃহে সর্বদা সমালোচনা, নিন্দা, উপহাস, অপরের সাথে তুলনা-মূলক বিচারে হেয় করা—এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে হীনতাবোধ ও অপরাধবোধ।

(ড) অনুন্নত সামাজিক পরিবেশ।

মানসিক বৈকল্যের কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত ঃ ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত (Freud's theory) ঃ

শৈশবকালীন যৌন-জীবনে বা বয়ঃপ্রাপ্তকালীন যৌন-জীবনে যদি কোন বিচ্যুতি-বিকৃতি ঘটে, তা হলে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও অবদমন দেখা দেয় এবং

অবদমিত ইচ্ছাগুলি মানসিক রোগ-সংলক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছাগুলি মনের প্রতিবন্ধকে (*Censor*) এড়িয়ে বা পেরিয়ে চরিতার্থ হবার প্রয়াস করে। এ প্রয়াস-পর্বে অবদমিত ইচ্ছাগুলি যেভাবে প্রকাশ পায়, সেগুলিই হ'ল ফ্রয়েডের মতে মানসিক রোগ-সংলক্ষণ।

মানসিক রোগে দুই প্রকার কারণ কাজ করে—(ক) তাৎক্ষণিক কারণ (*Precipitating*) ও (খ) অতীতকালীন কারণ (*Predisposing*)।

উদ্বায়ুরোগের কারণ

অতীতকালীন কারণ — তাৎক্ষণিক বা আকস্মিক কারণ

অতীতকালীন কারণ: যৌন-গঠন (পূর্ব পুরুষদের অভিজ্ঞতা) — শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা

তাৎক্ষণিক কারণের মধ্যে পড়ে ব্যক্তির জীবনে কোন বড় রকমের শোক, আঘাত, ব্যর্থতা, আর্থিক ক্ষতি, দুর্ঘটনা প্রভৃতি। আর অতীতকালীন কারণ বলতে বোঝায় ব্যক্তির অতি-শৈশবকালীন ব্যক্তিত্বের বিকাশপর্ব—এই সময়ে শিশু তার যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তিতে যদি কোন বাধা পায়, যদি সে আঘাতের সম্মুখীন হয়, তাহলে ব্যক্তির মনের মধ্যে জটের বা গূঢ়ৈষার সৃষ্টি হয়। মানসিক রোগীর অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে প্রায়ই দেখা যায় যে, রোগীর মন শৈশবকালীন কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। একে বলা হয় **সংবন্ধন** (*Fixation*)। এ প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের লিবিডো বা যৌন-মানস শক্তির বিকাশ-পর্বের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এ যৌন-মানসশক্তির প্রবাহধারা কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়—অর্থাৎ শিশুর যৌনতা তার শরীরের মুখ, পায়ু ও পরে সামগ্রিকভাবে নিজেকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হয় এবং তার পরে মা-বাবার প্রতি, সর্বশেষে স্বকামের মধ্য দিয়ে ইতর কামে এর পরিণতি আসে। **এই লিবিডোর প্রবাহ-পর্যায়ের কোন স্তরে যদি লিবিডোর সংবন্ধন ঘটে অর্থাৎ ঐ স্তরে যদি যৌনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল-ভাবে মাত্রাধিক পরিতৃপ্ত হয় কিংবা যৌনেচ্ছা ঐ স্তরে যদি একেবারে পরিতৃপ্ত না হয়, তাহলেই লিবিডোর সেই স্তরে সংবন্ধন ঘটলো বলে অভিহিত করা হয়।** অতীতকালীন কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েড বলেছেন, যে ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা পরবর্তীকালে দেখা দেবে, তার লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন বিশেষ

করে ঈডিপাস পর্যায়ে সংবন্ধন থাকবে। এর ফলে, একদিকে অতৃপ্ত যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তির নিয়ত প্রয়াস, অপরদিকে অহমের ও অধিশাস্তার দ্বারা নিয়ত প্রতিবন্ধ (*Censor*), দুই বিপরীতধর্মী ইচ্ছা-শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে নিয়ত অবদমন (*Repression*)। এই অবদমনের ফলে স্বভাবতই ব্যক্তির অহম অত্যন্ত অপুষ্ট ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অপুষ্ট ও দুর্বল অহম বাস্তবের স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতকেও সহ্য করতে পারে না। সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে এবং লিবিডো শৈশবকালীন সংবন্ধন-স্তরে ফিরে যায় (*Regression*)। একদিকে লিবিডোর শৈশবকালীন স্তরে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ সংবন্ধন-স্তরীয় বিশেষ প্রকারের যৌনেচ্ছার প্রকাশ ও পরিপূরণের প্রয়াস, অপরদিকে প্রতিবন্ধের (*Censor*) কার্যকারিতার ফলে অবদমন। একদিকে লিবিডোর সংবন্ধন-স্তরে প্রত্যাবর্তন ও অন্যদিকে অবদমন, এর ফলেই উদ্বায়ু রোগ দেখা দেয়। সংবন্ধন-স্তরীয় শৈশবকালীন বিকৃত যৌনেচ্ছাগুলিকে অহম্ গ্রাহ্য করতে পারে না, এবং এর ফলেই আরম্ভ হয় অবদমন। স্বপ্নের মধ্যে ব্যক্তির নির্জ্ঞান বাসনার পরিপূরণের প্রয়াস থাকে। ঘুমের মধ্যে চেতন-মন সক্রিয় থাকতে পারে না, তখন অহম ও অধিশাস্তার **প্রতিবন্ধকে** (*Censor*) ফাঁকি দেবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে, নির্জ্ঞানের অবদমিত বাসনা এইভাবে প্রকাশ লাভ করতে চায়, চরিতার্থ হতে চায়। মানসিক রোগের সংলক্ষণ হচ্ছে অবদমিত বাসনার পরোক্ষ পরিপূরণ প্রয়াস। কি প্রকারের রোগ-সংলক্ষণ প্রকাশ পাবে, তা নির্ভর করে লিবিডোর সংবন্ধন কোন্ স্তরে ঘটেছে। যেমন, হিস্টিরিয়াতে লিবিডোর সংবন্ধন ঈডিপাস-স্তরে ঘটে থাকে, অবসেসনে পায়ুস্তরে, প্যারানইয়াতে স্বকামস্তরে, সিজোফ্রেনিয়াতে মৌখিক স্তরে ইত্যাদি।

ফ্রয়েডের মতে তাৎক্ষণিক কারণ বলতে আমরা যা বুঝি, তা সকলের জীবনেই কিছু-না-কিছু ঘটে থাকে। বাস্তবের আঘাত সকলের জীবনেই আসে—ব্যর্থতা, হতাশা আঘাত, অপমান, ক্ষতি সকলের জীবনেই আসে। কিন্তু সকলের মধ্যে একপ্রকারের প্রতিক্রিয়া হয় না—সকলের মধ্যে মানসিক রোগও দেখা দেয় না। কারো কারো মধ্যে দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মতে, যাদের মধ্যে অতীতকালীন কারণ বর্তমান থাকে, তারাই তাৎক্ষণিক কারণের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘুণে-ধরা মানসিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, তাতে নানাপ্রকারের জটিলতার সৃষ্টি হয়। লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন হ'ল মানসিক রোগের মূল কারণ (*Predisposing*), বাস্তবের আঘাতজনিত যে কারণ, তা হ'ল তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ কারণ মাত্র।[১]

---

[১] অবদমন, প্রত্যাবর্তন, সংবন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

এ্যাড্‌লারের সিদ্ধান্ত (Adler) :

এ্যাড্‌লার প্রথম দিকে ফ্রয়েডের অনুগামী ছিলেন, কিন্তু পরে কতকগুলি বিষয়ে ফ্রয়েডের সাথে তাঁর মতের অমিল হয়।

শৈশবকালীন যৌনতা, লিবিডো বা যৌন-মানস শক্তি, সংবন্ধন প্রভৃতি ফ্রয়েডের মূল ধারণাগুলিকে এ্যাড্‌লার অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলে অভিহিত করেন। সবকিছুর মধ্যেই (যৌনতা প্রসঙ্গ) এ্যাড্‌লারের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তাঁর মতে, কর্ম-শক্তির উৎস যৌন-মানসশক্তি নয় ; কর্মশক্তির উৎস হ'ল হীনতাবোধ (*Sense of Inferiority*)। এই হীনমন্যতা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং মাত্রা ছাড়ানো হীনমন্যতাবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তি যখন অপরের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী নানারূপ অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে, তখনই তাকে মানসিক দিক থেকে বিকৃত বলে পরিগণিত করা হয়। মাত্রাধিক বিকৃত হীনতাবোধকে পরিপূরণ করার জন্য ব্যক্তি তার সামর্থ্যের বাইরে নানারূপ কর্মকাণ্ডের অবতারণা করে থাকে—আপন সামর্থ্যের সাথে লক্ষ্যের কোন সামঞ্জস্য থাকে না, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থেকে যায়। এর ফলে জীবনধারণ ও আচরণের মধ্যে নানারূপ বিকৃতি প্রকাশ পায়, ক্রমাগত ব্যর্থতা ও হতাশা মানসিক রোগের সৃষ্টি করে।[১]

এ্যাড্‌লারের কাছে যৌনেচ্ছা অপেক্ষা আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই মানুষের জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি। এই প্রেরণা পরিবেশের প্রতিকূলতা ও ব্যক্তির স্পর্শকাতরতার জন্য বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়। এই প্রেরণা বিপর্যস্ত হলে ব্যক্তির মধ্যে আসে হীনতাবোধ। এই হীনতাবোধ থেকে মুক্তির জন্য ব্যক্তির মধ্যে আসে গঠনাত্মক কর্মপ্রেরণা, কখনও বা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ।

এ হীনতাবোধের উৎস কি? এ্যাড্‌লারই প্রথম ক্রমবর্ধমান শিশুর উপর তার পার্শ্বস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। পিতামাতার আচার-আচরণ, পিতামাতার সাথে শিশুর সম্পর্কের উপর শিশুর ব্যক্তিত্বের গড়ন নির্ভর করে। পিতামাতার কোন্ কোন্ আচার-আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের অনুকূল ও কোন্ কোন্ আচরণ প্রতিকূল, সে সম্পর্কে এ্যাড্‌লার স্পষ্টভাবে উল্লেখ

১। Like dreams, the symptoms "owe their origin to a conflict between Ego, and sexuality" and are compromises between the repressing censoring agency, the Ego, and the infantile libidinous tendencies, compromises in which "the unconscious" finds a partial satisfaction. In this way, the symptom comes into being as a derivative distorted in manifold ways, of the unconscious libidinal wish-fulfilment, as a cleverly chosen ambiguity."

করবেন। পিতামাতা যদি শিশুকে অতি আদর দেন, কিংবা সবসময় হাতের মধ্যে রাখতে চান, কিংবা শিশুকে প্রত্যাখ্যান ও ঘৃণা করেন তাহলে শিশুর মধ্যে পরবর্তীকালে অসামাজিক ও বিকৃত আচরণ দেখা দেয়। সুষমব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতা-মাতা সর্বদা সন্তানকে স্নেহ, প্রযত্ন, নিরাপদ আশ্রয় ও উৎসাহ দিয়ে তার মধ্যে অহেতুক হীনতাবোধ যাতে না আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং শিশুর এইভাবে স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করবেন। এ্যাড্‌লার শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক পটভূমিতে মা'র ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাদানের উপর অধিক মূল্য আরোপ করেছেন।

শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে এ্যাড্‌লার বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রভাবের উপরও যথার্থ দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষকের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব, শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুতঃ পারিবারিক বিন্যাসে শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে পিতা-মাতার যে স্থান, বিদ্যালয়ের অবস্থাতে শিক্ষকদের আচরণ ও ব্যক্তিত্বেরও অনুরূপ স্থান।

অস্বাভাবিক হীনতাবোধের কারণ[১]

(ক) পিতামাতা কর্তৃক শিশু যদি অত্যন্ত আদর ও আস্কারা পায়, যদি সব সময় শিশুকে সব বিষয়ে বয়সের দিকে লক্ষ্য না রেখে অহেতুক সাবধান করা হয়, সে কিছু পারবে না মনে করে শিশুর সবকিছু পিতামাতা করে দেয়, তাহলে পরোক্ষভাবে শিশুর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় ; শিশুর মধ্যে হীনতাবোধ দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে একটা ধারণা জন্মে যায় যে, সে কখনো একা কিছু করতে পারে না ও পারবে না, তার পক্ষে আত্মনির্ভরশীল হওয়া খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। অথবা—

(খ) পিতামাতা কর্তৃক শিশু যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, সর্বদা যদি শিশুকে উপহাস করা যায়, শাস্তি দেওয়া যায়, তাহলে শিশু নিজেকে ধিক্কৃতবোধ করে, তার মধ্যে

১। The problem of every neurosis is, for the patient, the difficult maintenance of a style of acting, thinking and perceiving which distorts and denies the demands of reality...As the work of individual Psychologists has abundantly proved, an individual goal of superiority is the determining factor in every neurosis, but the goal itself always originates in......the actual experiences of inferiority.

—**Adler. A. : Problems of Neurosis**

একটা অস্বাভাবিক ও তীক্ষ্ণ হীনতাবোধ দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা ও হতাশার ভাব প্রকট হয়ে ওঠে।

সে যে হীন নয়, সে যে উপহাসের পাত্র নয়, এটা প্রমাণ করার জন্য ব্যক্তি গঠনাত্মক কার্যক্রম অবলম্বন না করে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উপায়ে নিছক দৃষ্টি-আকর্ষণী কর্মকাণ্ডের অবতারণা করতে থাকে। এ থেকেই মানসিক অসুস্থতার উদ্ভব হয়।

ইউঙের সিদ্ধান্ত (Jung) ঃ

ফ্রয়েড্ অতীতকালীন কারণের উপর (*Predisposing cause*) অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাৎক্ষণিক কারণের তেমন কোন গুরুত্ব ফ্রয়েড্ দেননি। লিবিডোর সংবদ্ধনই মানসিক রোগের কারণ, ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্তকে ইউঙ্ স্বীকার করেননি। ইউঙের মতে, কোন ব্যক্তির মধ্যে শৈশবকালের অসুস্থ পারিবেশিকতার জন্য প্রতিযোজন ঠিক ভাবে না হতে পারে, কিন্তু এই শৈশবকালীন অপসঙ্গতির জন্য পরবর্তীকালেও তার মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দেবে, এমন কোন কথা নেই। বর্তমানের পরিবেশের মধ্যেই এমন কোন জটিলতা ও চাপ (*pressure*) থাকে, যার সঙ্গে ব্যক্তিকে নতুন করে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হয়। ব্যক্তি এরূপ নতুন অবস্থার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করে, কিন্তু যে শক্তি এরূপ অবস্থার সাথে প্রতিযোজন (*adjustment*) প্রয়োজন, ব্যক্তির মধ্যে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সে এরূপ অবস্থায় প্রতিযোজন প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে অতীতকালে নতুন ও জটিল পরিস্থিতিতে যেভাবে প্রতিযোজন করার চেষ্টা করত, সেই পুরানো অভ্যাসে ব্যক্তি ফিরে যেতে চায়। সে শৈশবকালে পারিবারিক পরিবেশে যে উপায়ে সঙ্গতি রক্ষা করে চলার চেষ্টা করত সেইভাবে সঙ্গতি রক্ষা করার চেষ্টা করতে থাকে। ইউঙ্ও প্রত্যাবর্তনের (*Regression*) কথা বলেছেন, কিন্তু ফ্রয়েড্ যে পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন, ইউঙ সে অর্থে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। যদি বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যথার্থভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে, তাহলে তার মধ্যে শৈশবকালীন সঙ্গতি-প্রয়াসী যে আচরণ তার উপশম ঘটবে। ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবে। কাজেই ইউঙের মতে, বর্তমান অবস্থার জটিলতা দূর করা ও সে অবস্থার সাথে যাতে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হবে মনশ্চিকিৎসকের কাজ।[১]

১। Take away the obstacle in the path of life and this whole saystem of

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইউঙ্‌ও ফ্রয়েডের 'মুক্ত অনুষঙ্গ' (*Free Association*) ও স্বপ্ন-বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। ইউঙ্‌ প্রথমে রোগীর বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশ বিশ্লেষণে বিশেষভাবে ব্রতী হন। রোগীর স্বপ্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে কেবল তার অবদমিত যৌনেচ্ছা বা ঈডিপাস স্তরই প্রতিভাত হয় তা নয়, বর্তমান পরিবেশ ও অবস্থা সম্বন্ধে ব্যক্তির নির্জ্ঞান প্রতিন্যাস (*attitude*) কি সেটাও ধরা পড়ে। সমীক্ষার মধ্য দিয়ে রোগী তার বর্তমান পরিস্থিতি ও শৈশবকালীন অতীত অভিজ্ঞতাকে এক পটভূমিতে পরিস্থাপন করে বুঝতে পারে।

'লিবিডো' সম্পর্কেও ইউঙের ধারণা ফ্রয়েডের ধারণা থেকে ভিন্নতর ছিল। ইউঙের ধারণায় লিবিডো হ'ল সামগ্রিকভাবে জীবনী-শক্তি, কর্মশক্তি—যে শক্তি থেকে বিকাশবৃদ্ধি, বিভিন্ন কর্মপ্রেরণা ও বংশবৃদ্ধির প্রেরণা উৎসারিত হয়। লিবিডো সম্পর্কে ফ্রয়েডের যে মৌল সিদ্ধান্ত—লিবিডো হ'ল যৌন-মানসশক্তি, শিশুর কর্মপ্রেরণা ও যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তি প্রয়াস,—এ সিদ্ধান্তের তিনি বিরোধিতা করেন।[২]

সুলিভানের সিদ্ধান্ত (Sullivan) ঃ

মানবিক সম্পর্কের সুস্থতা-অসুস্থতার উপরই ব্যক্তিবিকাশের সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ভর করে। মানবিক সম্পর্ক রক্ষায় অক্ষমতা ও বিকৃতভাবে সম্পর্ক রক্ষার প্রয়াসই, মানসিক বিকৃতির সূচক।[৩]

---

infantile phantasies at once breaks down and becomes again as inactive and ineffective as before. But do not let us forget that, to a certain extent, it is at work influencing us always and everywhere...Therefore I no longer find the cause of the neurosis in the past, but in the present.

—Jung. C. G : Collected Papers on Analytical Psychology

২। A strictly Freudian analysis...is exclusively a sex-analysis, based upon the dogma that the relation of mother and child is necessarily sexual. Of course any Freudian will assure you that he does not mean coarse sexuality, but psycho-sexuality'—an unscientific and logically unjustifiable extension...

—Jung, C. G : Contributions to Analytical Psychology

৩। Disorders are patterns of inadequate and inappropriate action in inter-personal relations (Sullivan).

Disorders are patterns of avoidance which serve to reduce fear but which are unadaptive (Wolpe).

Disorders are mistaken solutions to the problems of life and represent patterns (styles) which are inexpedient : (Adler) Systems of Psychotherapy, pp. 643.

গভীর দুশ্চিন্তা থেকেই আসে মানসিক বিকৃতি। দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তি নানা প্রকারের প্রয়াস করে থাকে। স্থলিভানের মতে যেখানেই মানসিক বিকার, সেখানেই দুশ্চিন্তা (*Anxiety*)। এই দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয় ব্যক্তির সম্পর্ক সম্পৃক্ত পারিবেশিক জটিলতা থেকে। শিশুর যত্ন-পরিচর্যার ভার থাকে পিতা-মাতার উপর—বিশেষ করে মা'র উপর। শিশুকে খাওয়ানো, ধোয়ানো, শোয়ানো এর সবকিছু মা'ই করে থাকেন। মা'র ব্যক্তিত্ব যদি সুস্থ না হয়—মা নিজেই যদি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাপরায়ণ হন, মা যদি শিশুর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না দেন, কারণে অকারণে তার উপর নির্মম আচরণ করেন, বিদ্রূপে উপহাসে সর্বদা বিপর্যস্ত করেন, মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের যদি ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে শিশুর মধ্যে যে গভীর **দুশ্চিন্তার উদ্রেক** হয় তা তার চিন্তা, দৃষ্টি সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রতিযোজন প্রয়াসে নানারূপ অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। পিতামাতা ছাড়া শিক্ষক ও সমবয়সী বন্ধুবান্ধবের আচার-আচরণের দ্বারাও শিশু গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

ডলার্ড ও মিলারের সিদ্ধান্ত (Dollard and Miller) :

মানবিক সম্পর্কই (*Inter-personal relationship*) মানসিক স্বাস্থ্যের মূল নির্ণায়ক। যে শিশু সুস্থ মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে, তার মানসিক স্বাস্থ্যও সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে, মানসিক কোন প্রকার বিকার তার মধ্যে দেখা দেয় না। ব্যক্তির জীবনভঙ্গী ও জীবনাচরণ শিক্ষার ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফল। শিশুর প্রথম শিক্ষাদাতা তার পিতামাতা ও প্রথম শিক্ষা পরিবেশ-পরিবার। পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যদি অসুস্থ হয়—তাদের জীবনধারণের মধ্যে যদি কোন সামঞ্জস্য ও সুস্থিরতা না থাকে, তাহ'লে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশও বিঘ্নিত হয়। বাবার যদি এক প্রকারের মতাদর্শ ও সন্তান-পালনের বিধি-নিয়ম থাকে, মা'র যদি অন্য প্রকারের মতাদর্শ ও সন্তান-প্রযত্নবিধি থাকে, তাহলে শিশুর কাছে দুইটি ভিন্ন ও বিপরীত পথ দেখা যায়, এবং এর ফলে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সে কোন্ পথ ধরবে ও কোন্টা ছাড়বে বুঝে উঠতে পারে না। তাছাড়া, পিতামাতার উপদেশনামা ও তাঁদের জীবনাচরণের মধ্যে যদি কোন সত্যাশ্রয় ও সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলেও শিশু হতবিহ্বল হয়ে পড়ে—শিশুর শিক্ষার মধ্যে কোন সংহতি থাকে না। পিতামাতার চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাচরণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শিশুকে শিক্ষিত করে তোলে। অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতা-মাতার কুশিক্ষা, শিশুকে কুশিক্ষিত করে তোলে, তার মধ্যে অস্বাস্থ্যকর মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। যা স্বাভাবিক, তাকেও কখনো কখনো অস্বাভাবিক বলে বোধ করে, আর যা

অস্বাভাবিক তাকেও কখনো স্বাভাবিক বলে ভ্রম করে। ফলে, অহেতুক দ্বন্দ্বজর্জরিত হয়ে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। সব সময় যদি শিশুকে কেবল বলা হয়, এটা করো না, সেটা করো না, এ পথে যাবে না, সে পথে যাবে না, তাহলে শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়—স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশ বিঘ্নিত হয়ে যায়।

কোন শিশুকে যদি অনবরত 'ছোট' 'খারাপ' বলে অভিহিত করা হয়—শিশুর চারদিকের সকলে যদি তাকে হেয় করে দেখে, তাহলে শিশুও নিজেকে সেইভাবে দেখতে শেখে—এবং এই শিক্ষা থেকে তার মধ্যে তীক্ষ্ণ হীনমন্যতাবোধের সৃষ্টি হয়। এর জন্যও পরে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার মানসিক বিকার দেখা দিতে পারে।

হর্ণের সিদ্ধান্ত (Horney) ঃ

ডলার্ড মিলারের মতে শিশু কি শিখছে তার উপর তার মানসিক সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ভর করে। হর্ণের মতে, শিশু কি শিখছে তার উপরই নয়, কিভাবে তাকে শেখানো হচ্ছে, তার ওপরও শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। পিতামাতা যদি অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও আক্রমণধর্মী হয়, শিশুকে ভয় দেখিয়ে যদি তারা তাঁদের মর্জিমত চালিয়ে নিতে চায়, তা হলে শিশুর মধ্যে নানাপ্রকারের মানসিক বৈকল্যের বীজ উপ্ত হয়ে যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকও যদি ভয় দেখিয়ে, মারধর করে শিক্ষার্থীকে 'মানুষ' করে তুলতে চান, তাহলে তার মধ্যে নানাপ্রকার মানসিক অসুস্থতা দেখা দিয়ে থাকে।

অটো র‍্যাঙ্ক (Otto Rank) ঃ

এর মতে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের যন্ত্রণা প্রক্ষোভিক (*Emotional*) এবং সকল রোগ-সংলক্ষণের মূলে রয়েছে ভয়। যখন কোন ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নত করা যাচ্ছে না, আবার সে ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণও করা যাচ্ছে না, এমন অবস্থাতেই উদ্বায়ু রোগ দেখা দেয়। যখন ব্যক্তির মধ্যে ভয় ও অপরাধ-বোধ অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে, তখনই ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

যে সকল মনোবিদ্ মানসিক রোগের কারণ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের কেউ-ই আশ্চর্যজনকভাবে জৈবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার বঞ্চনা যেমন তীব্র ক্ষুধা বা আর্থিক বঞ্চনা বা দারিদ্র্যের কথা বলেননি। এর কারণ এই যে, সকল মনোবিদ্‌ই

এমন সব জন-সমষ্টির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন যাদের আর্থিক দৈন্য বা জৈবিক বঞ্চনার কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু উন্মায়ু রোগ বা বাতুলতা পারিবেশিক প্রভাবে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর শিক্ষার ফল হিসাবে দেখা দেয়। একজন ব্যক্তি যদি খাদ্য না পায়, তা হলে সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ যদি তার পাশের মানুষের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পায়, পায় বঞ্চনা, অত্যাচার, নির্মম উপহাস ও অসম্মান, যদি পরিবারে সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, অমর্যাদা থাকে, তাহলে সে পরিবারে ও সমাজে যে-শিশু বড় হয়ে ওঠে, তার মানসিক রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণিত হয়।[১]

তবে এটা ঠিক যে, ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র পরিবার পরোক্ষভাবে উন্মায়ু রোগগ্রস্ত শিশু তৈরি করে, কেননা দারিদ্র্য ও ক্ষুধা পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য একে অপরকে আক্রমণ করার স্পৃহা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়।

ফ্রয়েড্, এ্যাড্লার, স্থলিভান, ডলার্ড, মিলার সকলেই কোন-না-কোন ভাবে পারিবারিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। মানসিক সুস্থতা-অসুস্থতার নির্ণায়ক হিসাবে পারিবারিক (পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক) সম্পর্কের সুস্থতার প্রসঙ্গ তুলেছেন।

॥ সংক্ষিপ্ত-সার ॥

রোগের কারণ→

দেহের রোগের যেমন কারণ আছে, মানসিক রোগেরও কারণ আছে। জন্মগত শারীরিক গঠন ও কাঠামো দৈহিক সুস্থতা-অসুস্থতার কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ কারণ। জন্মগত শারীরিক গঠন ভাল থাকলেও, খারাপ পরিবেশ স্বাস্থ্য খারাপ করতে পারে। দৈহিক রোগের

১। It is interesting that so few of the theorists pointed to condition other than interpersonal interactions as the antecedents to disorder, for instance, protracted states of physiological deprivation such as intense hunger of economic deprivations such as poverty. One wonders whether this results from the fact that they worked within reasonably affluent segments of Western cultures or whether there lies within their observations a very useful conclusion, namely that learned disorders (neuroses psychoses) are a product of the way people interact with one another. If a person is deprived of food, he becomes hungry, if he is mistreated by others he can become neurotic. It is also possible that hungry and poor families can indirectly produce neurotic children, if these conditions cause them to hate, to neglect, and to punish each other unduly.

ক্ষেত্রে যেমন, মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ই কারণ হিসাবে কাজ করে—কখনও বংশগতি, কখনও পরিবেশ রোগের কারণ হিসাবে অধিক কাজ করে। অনেক মানসিক রোগ জন্মগতি থেকে আসে—যদি কারও মস্তিষ্কের গাঠনিক ওজনে বিকৃতি থাকে, যদি নালীবিহীন গ্রন্থিগুলির কোনটি অতিমাত্রায় বা নিম্নমাত্রায় কাজ করে, তাহলে মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হতে পারে। জন্মগতিতে শিশুর মধ্যে যদি অঙ্গগত ও গাঠনিক দিক থেকে বিকৃতি থাকে, তাহলে সে নিজেকে আর সকল শিশু থেকে হীন বোধ করে—এ হীনমন্যতা তার প্রতিযোজন-প্রয়াসকে বিপর্যস্ত করে।

জন্মগতি ও পরিবেশঘটিত কারণ→

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মতামত। বংশগতি ও পরিবেশ এদুটি শক্তির মধ্যে কোন্‌টি ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি, সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ণয়ে অধিক কাজ করে সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে বংশগতি ও পরিবেশ দুটিই ব্যক্তিত্ব-গঠনে সমানভাবে কার্যকরী। কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব বেশী—যেমন বুদ্ধি ও দৈহিক গুণাগুণ, Temperament সম্বন্ধে এখনও মতবিরোধ আছে। দৈহিক গঠনের তারতম্যের জন্য, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কর্মাবেগের পার্থক্য লক্ষিত হয়—যেমন কারো মধ্যে যৌনস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল। কারও বা ভীষণ ক্ষুধা। ফ্রিমেন (Freeman), নিউম্যান (Newman) হল্‌জিন্‌জার (Halzinger) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ ৬৯ জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানের উপর পরীক্ষা করেন। ১৯ জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানদের একজনকে এক পরিবেশে, অপর জনকে ভিন্ন পরিবেশে রাখলেন। অন্যদিকে, পঞ্চাশ জোড়া সমকোষী যমজ সন্তানকে একসাথে বড় করে তোলা হ'ল। যারা একসাথে বড় হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক মিল আছে, যদিও একের সাথে অপরের মেজাজ বা মনের দিক থেকে অনেক তফাৎ রয়েছে যারা আলাদাভাবে বড়

হয়েছে তাদের মধ্যেও অনেক মিল ছিল। সমকোষী যমজ সন্তানের দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য তা পরিবেশের জন্য। এ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বংশগতি ও পরিবেশ দুই-ই সমানভাবে এদের মনঃপ্রকৃতি-গঠনে কাজ করে। বুদ্ধির তারতম্য নির্ধারণে বংশগতিই বেশী কার্যকরী—বুদ্ধি কমের জন্য অনেক অপসঙ্গতি আসতে পারে, দুষ্ক্রিয়তা, সমস্যামূলক আচরণ অনেক সময় ক্ষীণ বুদ্ধির জন্য হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানসিক বৈকল্য, শিশুদের সমস্যামূলক আচরণ, উন্মায়ু রোগ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য হয়ে থাকে। কঠিন মানসিক (Psychoses) রোগ বিশেষ করে বাতুলতার জন্য বংশগতিই দায়ী। সিজোফ্রেনিয়া, মৃগীরোগ বংশগত কারণে হয়।

অসুস্থ পরিবেশ→

মানসিক বিকৃতি ও বৈকল্যের জন্য অসুস্থ ভৌতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ দুই-ই কাজ করে।

মানসিক বৈকল্যের কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত→

ফ্রয়েডের মত→

শৈশবকালীন যৌন-জীবনে বা বয়ঃপ্রাপ্তকালীন যৌন-জীবনে যদি কোন বিচ্যুতি, বিকৃতি ঘটে, তা হ'লে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও অবদমন দেখা দেয়, অবদমিত ইচ্ছাগুলি মানসিক রোগ সংলক্ষণের (Symptom) মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। মানসিক রোগে দুই প্রকার কারণ কাজ করে:—(১) তাৎক্ষণিক কারণ (Precipitating), (২) অতীতকালীন কারণ (Predisposing)। তাৎক্ষণিক কারণ—ব্যক্তির জীবনে বড় রকমের কোন শোক, আঘাত, ব্যর্থতা প্রভৃতি। অতীতকালীন কারণ—শৈশবকালীন ব্যক্তিত্ব-বিকাশ পর্ব—এইসময় যৌনেচ্ছার পরিতৃপ্তিকে বাধা বা আঘাত গূঢ়ৈষার সৃষ্টি করে।

এ্যাড্‌লারের মত→

যৌনেচ্ছা অপেক্ষা আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই মানুষের জীবনের প্রেরণাশক্তি। কর্মশক্তির উৎস হীনতাবোধ—ফ্রয়েডের যৌন-মানস শক্তি নয়। অস্বাভাবিক হীনতাবোধ থেকেই মানসিক

বৈকল্য আসে। পিতামাতার নির্মম আচরণ, প্রত্যাখ্যান, অতি আদর, উপহাস করা, ধিক্কার দেওয়া প্রভৃতিই অস্বাভাবিক হীনতাবোধের কারণ।

ইউঙের সিদ্ধান্ত→

শৈশবকালের অসুস্থ পরিবেশের জন্য প্রতিযোজন ঠিকভাবে না হতে পারে কিন্তু এই অপসঙ্গতির জন্য পরবর্তীকালেও তার মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দেবে এমন কোন কথা নেই। বর্তমান কালের পরিবেশের মধ্যেই এমন জটিলতা ও চাপ থাকে যাতে করে বৈকল্য আসতে পারে। শৈশবের জটিলতা থাকলেও, বর্তমান পরিবেশ সুস্থ হলে শৈশবকালের জটিলতা কমে যেতে পারে। বর্তমান অবস্থার জটিলতা দূর করা ও সে অবস্থার সাথে যাতে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হবে মনশ্চিকিৎসকের কাজ। লিবিডো বলতে সামগ্রিক জীবন-শক্তি বোঝায় —কেবল যৌন-মানস শক্তি বোঝায় না।

সুলিভানের সিদ্ধান্ত→

মানবিক সম্পর্কের সুস্থতা-অসুস্থতার উপরই ব্যক্তিবিকাশের সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ভর করে। অসুস্থতা—পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে দুশ্চিন্তা আসে—দুশ্চিন্তাই মানসিক বিকৃতি আনে।

ডলার্ড ও মিলারের সিদ্ধান্ত→

পিতামাতার সন্তানের সাথে সম্পর্ক বিশেষভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে প্রভাবিত করে। অসুস্থ সম্পর্ক মানসিক বিকৃতি আনে।

হর্নের সিদ্ধান্ত→

শিশু কি শিখছে তার উপর নয়, কিভাবে তাকে শেখানো হচ্ছে, তার উপর শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

অটো র‍্যাঙ্ক→

মানসিক রোগের কারণ আবেগগত ও সব রোগ-সংলক্ষণের মূলে রয়েছে ভয়। প্রবল ভয় ও অপরাধবোধ থেকে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিশু-নির্দেশনা ও শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র

(Child Guidance & Child Guidance Clinic)

শিশু-নির্দেশনার ধারণাটি মনোবিদ্যার গবেষণার একটি নতুন ফলশ্রুতি। ব্যক্তিত্ব-গঠনের বিভিন্ন পর্যায়, ব্যক্তিত্ব-গঠনে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, ততই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের জীবনে শৈশবকাল হ'ল ব্যক্তিত্ব গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময়। বস্তুতঃ একটু নিবিষ্ট হয়ে দেখলে দেখা যাবে মানব-শিশু একদিকে যেমন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা নিতান্ত অসহায়, অন্যদিকে সকল প্রাণী অপেক্ষা নমনীয় (*flexible*)। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানব-শিশু তার পিতা-মাতার উপর তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। অন্যান্য প্রাণীদের যত অল্প প্রযত্ন-পরিচর্যা হলে চলে, মানবশিশুর ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী মনোযোগ, অনেক বেশী ও অনেকটা সময় ধরে সাবধানতা ও প্রযত্ন প্রয়োজন হয়। পিতামাতার যত্নে ও নির্দেশে শিশু একদিকে যেমন বড় হতে থাকে, অন্যদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে শিশু বড় হয়ে উঠতে থাকে। নির্দেশনা ভিন্ন মানবশিশু তার পথে যথার্থভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও আধুনিক মনোবিদ্যার একটি মূল্যবান আবিষ্কার—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৈহিক গঠন ও আদলে যেমন পার্থক্য রয়েছে, মানসিক দিক থেকেও তেমনি পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। সকল মানবশিশুর মৌলিক-চাহিদা যদিও একরূপ, শৈশবকালীন আচার-আচরণও প্রায় একরূপ, তবু প্রতিটি শিশুর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সম্ভাবনা, বুদ্ধি, মেজাজ, রুচি, প্রবণতা। শক্তি-সামর্থ্য সকলের সমান নয়—কারও বেশী কারও কম। প্রবণতা কারও একদিকে, কারও অন্যদিকে। সকলকে যদি একই ভাবে, একই ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়, জীবনে ব্যর্থতা আসে, বিকৃতি আসে, মানবিক শক্তির প্রভূত অপচয় ঘটে। নির্দেশনা সেইজন্যই মানবশিশুর পক্ষে অপরিহার্য।

তাছাড়া, মানুষকে কেবল ভৌতিক পরিবেশের সাথেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয় না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথেও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। মানবিক সম্পর্ক যথাযথভাবে রক্ষা করে চলার ক্ষমতা ও শক্তি ব্যক্তির সুস্থভাবে বিকাশলাভের উপর নির্ভর করে। যে শিশু যথাযথ খাদ্য ও আশ্রয় পায় না, যে শিশু পারিবারিক অসুস্থ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে, যেমন যে শিশু পিতামাতার

আদর-যত্ন থেকে বঞ্চিত বা পিতামাতার নির্মম বা উদাসীন আচরণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, যে পরিবারে পিতামাতার মধ্যে নিয়ত কলহ-বিবাদ চলতে থাকে, সেখানে শিশুর মানসিক বিকাশে যে সব বিকৃতি আসে, তা থেকেই পরে নানাপ্রকারের অপসঙ্গতি দেখা দেয়। সে যথাযথ সামঞ্জস্য রেখে সকলের সঙ্গে চলতে পারে না।

একটি শিশুর জন্মগত শক্তি-সামর্থ্য ও চাহিদা যদি পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সম্যকভাবে বিকাশলাভের ও পরিতৃপ্তির সুযোগ না পায়, এবং শিশুটি যদি তার দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ-বৃদ্ধির সুযোগ না পায়, তাহলেই শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী ও বয়স-ধর্মানুযায়ী পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণই নির্দেশনা। নির্দেশনা অর্থে আমরা উপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া বুঝি না।** সকল ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য-ইচ্ছা-প্রবণতা নির্বিশেষে একভাবে, এক ছাঁচে তৈরি করার প্রচেষ্টা নির্দেশনা নয়। **নির্দেশনা বলতে বোঝায় শিশুর আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারী বিকাশকে সাহায্য করা—নিজের পায়ে নিজে যাতে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য সাহায্য করা**—এ সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক, মনোবিদ্ ও শিক্ষকের যে উপদেশ ও নির্দেশ দান, তাকেই বলা হয় **নির্দেশনা** বা *Guidance*।[১]

নির্দেশনার যেমন একটা ব্যাপক তাৎপর্য আছে আবার এর খণ্ড-তাৎপর্যও আছে —যেমন শিক্ষা-নির্দেশনা, বৃত্তি নির্দেশনা, বিপথগামী শিশুদের নির্দেশনা। নির্দেশনার ব্যাপক তাৎপর্য বলতে আমরা বুঝি পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকস্থানীয় যে কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিশুর সুনিয়ন্ত্রিত স্বপ্রকাশ বা বিকাশ। শিক্ষা-নির্দেশনা ব্যাপক অর্থে গৃহে ও বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন। বিদ্যালয়ের যে কোন কার্যক্রমই যেমন খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠ্যক্রম, পাঠ্যক্রম-নির্ধারণ, সব কিছুই শিক্ষা-নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। 'কিন্তু শিক্ষা-নির্দেশনা' বলতে নির্দিষ্টভাবে আমরা যা বুঝি, তা হ'ল শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, প্রবণতা বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য (*special abilities*), রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী তাকে তার সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠ্যক্রমে পরিচালনা করা। বৃত্তি-নির্দেশনার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর রুচি, বুদ্ধি, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, সমাজ-প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে তার সর্বাপেক্ষা উপযোগী বৃত্তি-নির্বাচনে সাহায্য করা।

১। Guidance is not direction. It is not the imposition of one person's point-of view upon another. It is not making decisions for an individual which he should make for himself. It is not carrying the burden of another's life. Rather guidance is *assistance* made available by competent Counsellor to an individual of any age to help him direct his own life, develop his own point of view, make his own decisions and carry his own burden.
—Crow D. L. & Crow A. An Introduction to Guidance Principles and Practices.

বিপথগামী শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশনা বলতে বোঝায়, এমন শিশুর নির্দেশনা যার সাধারণ নির্দেশনার ক্ষেত্রে কোন-না-কোন স্তরে গণ্ডগোল ছিল, যেমন গৃহের পরিবেশ বা বিদ্যালয়ের পরিবেশে সুস্থতা ছিল না ও যথার্থ নির্দেশনাও ছিল না, অর্থাৎ, যে সকল শিশু যথার্থ সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারছে না। অপসঙ্গতিমূলক বা সংলক্ষণমূলক আচরণ যাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে তাদের নির্দেশনা, তাদের পুনরায় সুস্থ করে তোলা, সুস্থ জীবনযাপনে ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা। বিপথগামী শিশুদের নির্দেশনাই হ'ল *Child Guidance Clinic*-এর কাজ। এখানে *Clinic* কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে—এর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। *Clinic* শব্দটির অর্থ হল **চিকিৎসাগার**। *Child Guidance Clinic*-এ এমন সব শিশুদের নির্দেশনা দেওয়া হয়, যারা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, যাদের সমাজ-সঙ্গতি বিঘ্নিত, যাদের আচার-আচরণ অস্বাভাবিক ও সংলক্ষণপূর্ণ। অসুস্থ শিশুদের জন্মগত শক্তি-সামর্থ্য, লালন-পালনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দৈহিক ও মানসিক সকল তথ্য জেনে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করা ও তাদের নিরাময় ও পুনর্বাসনে সাহায্য করাই শিশু-চিকিৎসাগারে নির্দেশনার কাজ। চুরি করা, স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, স্কুল-পালানো, মারধর করা, পড়াশুনায় অমনোযোগিতা, ভয়াকুলতা, স্বপ্নচারিতা, এরকম নানাবিধ সমস্যামূলক আচরণের প্রকাশ পেলে গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এর প্রতিকার করতে গিয়ে অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত বাবা-মা ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, শিশু অত্যন্ত খারাপ ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। একে শাস্তি দিয়ে ঠিক পথে না আনতে পারলে ছেলের ও পরিবারের সমূহ ক্ষতি। কিন্তু মনোবিদ্যায় আলোকপ্রাপ্ত অভিভাবক ও শিক্ষকগণের নিকট এগুলো মানসিক-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা। শিশুর মনের গভীরে যে দ্বন্দ্বজর্জরতা, যে গূঢ়ৈষা ও জটিলতা রয়েছে, এ সকল আচরণ তারই অভিব্যক্তি। মনের গভীর প্রদেশের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, চিন্তাস্রোতের গতিবিধি, অবদমিত ইচ্ছা ও আচরণের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। শিশুমন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ মনোবিদ্ ও চিকিৎসকের নির্দেশনাই শিশু-নির্দেশনা চিকিৎসালয়ে দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-নির্দেশনা বলতে বিপথগামী শিশুদের বিপথগামী হওয়ার কারণ নির্ণয় অর্থাৎ বিপথগামী শিশুদের মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতার কারণ নির্ণয় ও তার দূরীকরণের প্রয়াসকেই বোঝায়।[১]

১। A Clinic in general is an institution that offers diagnostic, therapeutic or preventive treatment to ambulatory patients.

—Encyclopaedia Britannica

সংক্ষেপে বলা যায়, ক্লিনিক বলতে বোঝায় এমন একটি সংস্থা যা রোগ-নির্ণয়, রোগ-নিরাময়ে ও রোগ-প্রতিরোধে রোগীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করে।

শিশু-নির্দেশনা চিকিৎসালয় এমন একটি সংস্থা যা সেইসব বিপথগামী ও মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত শিশুদের নিরাময়মূলক, প্রতিরোধমূলক, শিক্ষা ও সামাজিক পুনর্বাসন-মূলক প্রযত্নে সাহায্য করে, যাদের মৌলিক চাহিদা অতৃপ্ত, যারা তাদের সমাজ পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারছে না। দৈহিক ও মানসিক বিকাশ রুদ্ধ হওয়ায় নানাপ্রকারের অপ্রত্যাশিত অসামাজিক ব্যবহার এদের মধ্যে প্রকাশ পায় ও সামাজিক ও বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন বিষয়ে প্রত্যাশিত সাফল্যমানের সাথে এরা তাল রেখে চলতে পারে না।

নির্দেশনার দুই দিক ঃ

নির্দেশনা মাত্রেরই দুটি দিক আছে—(ক) ভবিষ্যকথন (*Prediction*) (খ) নিয়ন্ত্রণ (*Control*)।

শিশুর দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশকে মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে, এর বিকাশ-বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করে, ভবিষ্যতে এ শিশু কিরূপ আচরণ করবে, শিশু কতটা বুদ্ধিমান হবে, সমাজে সে কতটা সার্থক নাগরিক হতে পারবে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যকথন করা যেতে পারে। স্বাভাবিক বিকাশধারা থেকে শিশুর যেকোন বিচ্যুতি, নির্দেশনা কেন্দ্রে জানাতে হবে। যে-সব পারিবেশিক অবস্থা বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছে, তার সম্বন্ধেও জানাতে হবে।

পরিবেশের এইসব অসুস্থ প্রভাবকে পরিবেশ থেকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ (*Control*) করতে হবে। গৃহ-পরিবেশ, বিদ্যালয়-পরিবেশকে সুস্থ ধারায় নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় নির্ধারণ ও নির্দেশনার একটি প্রয়োজনীয় দিক।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনের ইতিহাস ঃ

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিপথগামী শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা প্রথম আরম্ভ হয় আমেরিকায়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ উইলিয়াম হিলী (*William Healy*) প্রথম নির্দেশনা-কেন্দ্র জাতীয় একটি সংস্থা স্থাপন করেন। দুষ্ক্রিয়তা সৃজনে পরিবেশের প্রভাব ও পারিবেশিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ দুষ্ক্রিয়তা দূরীকরণে সাহায্য করে দেখে, উইলিয়াম হিলী প্রথম চিকাগো শহরে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র জাতীয় একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দুষ্ক্রিয়তার পূর্বে গৃহে শিশুর

মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যামূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়, বর্তমানে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র পরিস্থাপন করে এই সকল সমস্যামূলক আচরণকারী শিশুদের গোড়াতেই শোধন করার প্রয়াস করা হয়, যাতে এ সমস্যামূলক আচরণ (*problem behaviour*) ক্রমে দুষ্ক্রিয়তার (*delinquency*) রূপান্তরিত না হয়। অনেক ক্ষেত্রে গৃহ-চিকিৎসক শিশু সাধারণ ও মৃদু সমস্যামূলক আচরণের কারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ণয় করে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু সমস্যামূলক আচরণ যখন অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির হয়, তখন তার কারণ নির্ণয় ও সেই কার্য দূরীকরণের জন্য বিশেষ প্রকারের চিকিৎসা ও নির্দেশনা কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়।

এরও পূর্বে **১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে উইট্‌মার (Witmer) পেনসিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মনস্তত্ত্বভিত্তিক চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা করেন।** এখানেও আধুনিক কালের শিশু-চিকিৎসা ও নির্দেশনা-কেন্দ্রের মত মনোবিদ্‌, চিকিৎসক ও শিক্ষক স্বতন্ত্রভাবে একটি বিপথগামী শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যার জাতীয় সংস্থা যখন মানসিক স্বাস্থ্য-উন্নয়নের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখনই প্রকৃতপক্ষে 'শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র' (*Child Guidance Clinic*) নামটির প্রথম অবতারণা করা হয়। ক্রমে মনোবিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে এর কর্মবিন্যাস ও প্রসার ফলপ্রসূ হতে থাকে।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞ ও তাঁদের কাজঃ

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে বিভিন্ন ব্যক্তি মিলে একটা গোষ্ঠী ও সংস্থা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিপথগামী শিশুর বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে আরম্ভ করে। শিশুর আচরণ সমস্যাটিকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে তার নিগূঢ় কারণটি আবিষ্কারের প্রয়াস করে। এইজন্য শিশু-নির্দেশনা সংস্থায় নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেন—

(ক) **মনশ্চিকিৎসক অধিকর্তা** (*Psychiatrist*)—এঁর প্রধান কাজ হ'ল আনীত বিপথগামী শিশুর দৈহিক ও সাধারণ মানসিক পরীক্ষা।

(খ) **মনোবিদ্‌**—এর কাজ হ'ল বিভিন্ন প্রকার মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ

১। Child guidance clinics aim at the correction of such disorders before they reach serious proportions. While the general medical practitioner with his direct observation of the family situation can do much useful work in this field, difficult cases with more complex factors need fuller investigation in a special clinic. —Dawson, W. S.: Aids to Psychiatry

করে শিশুর বুদ্ধি, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, অর্জিত ক্ষমতা, প্রবণতা, মনঃপ্রকৃতি প্রভৃতি নির্ণয় করা। শিশুর শিক্ষা বিষয়ে অসুবিধার কারণ নির্ণয়, শিক্ষা-নির্দেশনা ও প্রয়োজনবোধে বৃত্তি-নির্দেশনা।

(গ) **সমাজ-সেবী**—এঁরা গৃহ-পরিবেশ, বিদ্যালয়-পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে শিশুর সামাজিক অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হন।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কার্যাবলী বিবিধ ও বহুমুখী। একটি শিশু যখন শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে আনীত হয়, তখন প্রথমে শিশুটির অতি শৈশবকালীন ও শৈশবকালীন বিকাশ পর্বের পরিবেশ সম্বন্ধে যত বেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়।

প্রথমেই মনোবিদ্ শিশুটির জীবন-ইতিহাস সংগ্রহে প্রয়াসী হবেন। জীবন-ইতিহাস চয়নে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে—

(ক) **ব্যক্তিগত জীবনপঞ্জী**—(১) পরিবারে স্থান (সন্তানক্রমে তার স্থান কোথায়—বড়, মেজ, সেজ, ছোট ইত্যাদি)।
(২) জন্মক্ষণে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা (স্বাভাবিক প্রসব, না অস্ত্রোপচারে প্রসব)।
(৩) অতি শৈশবকালীন স্বাস্থ্য—প্রথম দাঁত ওঠার বয়স, প্রথম হাঁটার বয়স।
(৪) পরিপাক ও পুষ্টির কোন প্রকার অসুবিধা-সংক্রান্ত তথ্য।

(খ) **শৈশবকালীন স্বাস্থ্য** (দৈহিক ও মানসিক)—
(১) শৈশবকালে কোন আঘাত বা কঠিন রোগাক্রান্তি।
(২) স্নায়বিক দুর্বলতা।
(৩) নখ-কামড়ানোর অভ্যাস।
(৪) আঙ্গুল চোষার অভ্যাস।
(৫) তোৎলামির অভ্যাস।
(৬) অস্বাভাবিক ভয়।
(৭) অনিদ্রা, ঘুমিয়ে ভীতিকর স্বপ্ন দেখা।
(৮) যৌন-অভ্যাস।

(গ) বিভিন্ন বিষয়ে মনোভাব ও প্রতিন্যাস—

(১) গৃহে ও বিদ্যালয়ে সঙ্গী-সাথী সম্বন্ধে মনোভাব—নেতৃত্ব করে, না নেতৃত্ব মেনে চলে; নির্দেশ দিয়ে চলতে ভালবাসে, না নির্দেশ মেনে চলতে ভালবাসে।

(২) পারিবারিক সম্পর্ক—পিতামাতা সম্বন্ধে মনোভাব; পিতামাতার সন্তান সম্বন্ধে মনোভাব।

(৩) খেলাধূলায় স্পৃহা, ক্লাব ও অন্যান্য আনন্দপ্রদ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ ও অংশগ্রহণ কতটা।

(ঘ) সাধারণ ব্যক্তিত্ব—

(১) মনঃপ্রকৃতি/অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী।

(২) আত্মবিশ্বাস।

(৩) প্রক্ষোভিক স্থিরতা/অস্থিরতা।

(৪) বুদ্ধির পরিমাপ/তীক্ষ্ণ-সাধারণ—সাধারণ অপেক্ষা কম।

(৫) মানসিক কোন জটিলতা—গূঢ়ৈষা, দ্বন্দ্ব।

(ঙ) গৃহ-পরিবেশ—

(১) গৃহ-সংস্থান ও চারিদিকের লোকালয় ও তাহার প্রকৃতি।

(২) কয়টি ঘর, থাকার ব্যবস্থা কিরূপ, শয়ন-কক্ষ ও শয়ন-ব্যবস্থা অর্থাৎ একই ঘরে বাবা, মা, ভাই, বোন সকলে নিদ্রা যায় কিনা।

(৩) পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি।

(৪) নিয়মশৃঙ্খলা—নির্মম ও আচার-সর্বস্ব, স্বাভাবিক, অত্যন্ত ঢিলে-ঢালা ভাব।

(৫) গৃহে নির্মল আনন্দচয়নের আয়োজন—বেতার, গ্রামোফোন, শিশুদের উপযোগী বই-এর সংগ্রহ, ছবি-সংগ্রহ, খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহ।

(৬) পিতামাতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক —সহযোগিতাপূর্ণ—পরস্পর বিশ্বাস—একমুখী কর্ম-প্রবাহ, সন্তান-প্রতিপালনে একমত/মতবিরোধ/পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক—নির্মম আচরণ, উদাসীনতা, প্রত্যাখ্যানের ভাব, অতিরিক্ত আদর, যা চাই তাই পাই, এরূপ মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া।

(চ) পারিবারিক ইতিহাস—(১) পরিবারের কারো মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতা—পিতামাতা, পিতামহ, মাতামহ, ভাই-বোন, মামা, মাসিমা, পিসিমার মানসিক কোন রোগ, আত্মহত্যার নজির, পরিবারের কেউ খুনী, মদ্যপ আছে কিনা জানা।

(২) **পিতামাতার ব্যক্তিত্ব**—বিষাদপূর্ণ/অস্থির চিত্ত/আত্মবিশ্বাসহীন/আনন্দময়/স্থিরশান্ত/আত্মবিশ্বাসে সংহত।

উপরোক্ত বিষয়ে মনোবিদ্, তথ্যাদি সংগ্রহ করার পর আনীত শিশুর উপর কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন—গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপনের জন্য মনঃপরিমাপনমূলক (*Psychometric*) অভীক্ষা, মনঃপ্রক্ষেপণমূলক (*Projective*) অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন। এর মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের একটা সামগ্রিক চিত্ররূপ পাওয়া যাবে। মানসিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতার স্বরূপ এবং প্রকৃতিও এর মধ্য দিয়ে আরও নৈর্ব্যক্তিকভাবে (*objectively*) আবিষ্কৃত হতে পারে।

চিকিৎসকের কাজ ঃ

শিশু-পরিচালনা কেন্দ্রে **চিকিৎসকেরও** (*Medical man*) একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য-বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন। অতি শৈশবে তার কোন কঠিন রোগ হয়েছিল কিনা, হাঁপানী, টাইফয়েড্, রিকেট্ রোগ ছিল কিনা, দাঁত, চোখ ও কানের গঠনগত বা

কার্যকারিতার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা, এ সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া, আনীত শিশুর ওজন, উচ্চতা, বয়স প্রভৃতি বিষয়েও সাধারণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। বয়স ও উচ্চতার সাথে সমতা অসমতা বিচার করে সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। মোটের উপর, চিকিৎসক শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বপ্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন।

সমাজ-সেবীর কর্তব্যঃ

(১) সমাজ-সেবীদের প্রথম কাজ হ'ল শিশুর গৃহ, শিশুর পাড়া-প্রতিবেশী, খেলার সাথী, বিদ্যালয়, ক্লাব ও অন্যান্য সংস্থা থেকে শিশুর ভৌতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সংক্রান্ত সকল প্রকার সম্ভাব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা। ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে বিচার্য হবে শিশুর বাসস্থানের প্রকৃতি, যেমন—ক'টা ঘর, ঘরে আলো-হাওয়া আছে কিনা, বাড়ী স্যাঁতসেঁতে না নতুন, বাড়ীতে খেলাধুলার স্থান কতটা আছে, খেলাধুলার সরঞ্জাম আছে কিনা, বাড়ীটি কিরূপ লোকালয়ে অবস্থিত, শিল্প-এলাকা ও ঘন বসতিপূর্ণ কিনা, লোকালয়ের সংস্কৃতির মান ইত্যাদি। মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে পড়বে শিশুর মৌলিক মানসিক চাহিদাপূরণের ব্যবস্থা গৃহে ও বিদ্যালয়ে আছে কিনা, সে সম্পর্কে সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করা। এছাড়া, শিশুর প্রতি পিতামাতার প্রতিন্যাস ও আচরণ, পিতামাতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাই-বোনের মধ্যে সম্বন্ধ, গৃহে নিয়মশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়েও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লোকালয় ও তার সাংস্কৃতিক মান, বিদ্যালয়ের ঘরের অবস্থা, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, খেলাধুলা ও অন্যান্য সহপাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা আছে কিনা, এসব বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

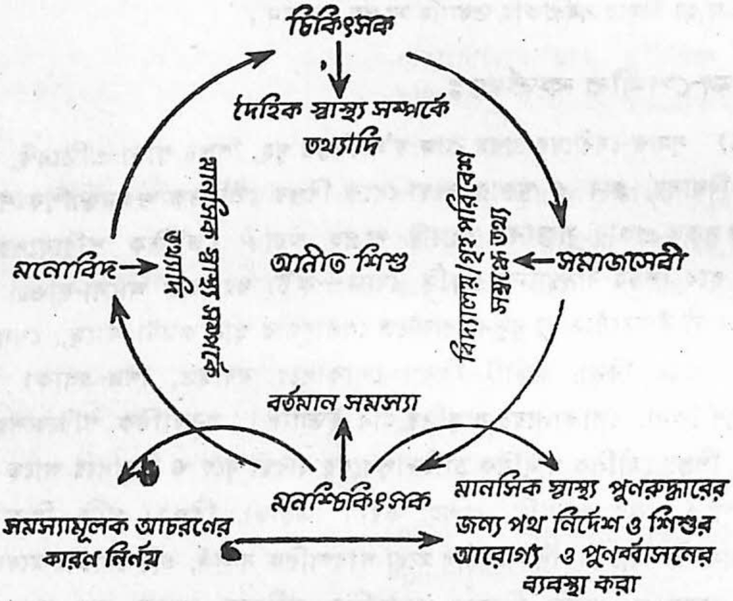
(২) আনীত শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে মনোবিদ্, সমাজসেবী ও চিকিৎসকের তথ্যের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হবে, তা প্রয়োগ করে কতটা ফল পাওয়া যাচ্ছে, তার নিরীক্ষা করাও সমাজসেবীদের কর্তব্য।

(৩) সমস্যামূলক আচরণ, ক্লাবে খেলাধুলা ও অন্যান্য আনন্দপ্রদায়ী সংস্থায় যোগ দিয়ে বা যথাযথ কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে প্রশমিত হচ্ছে কিনা, তার পর্যবেক্ষণ করাও সমাজসেবীর কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) শিশু-নির্দেশনাকেন্দ্রের অধিকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, গৃহে বা বিদ্যালয়ে যদি কোন পরিবেশান্তরের প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা করা,

পিতামাতার সন্তান-প্রযত্নে যে ত্রুটি ধরা পড়বে, তা শোধন করার জন্য পিতামাতার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের এ বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার আলোকে আলোকান্বিত করে সচেতন করে তোলা।

চিকিৎসক, মনশ্চিকিৎসক, মনোবিদ্ ও সমাজসেবী-চক্র



শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রে আলোচনা-চক্র

আনীত শিশু সম্বন্ধে চিকিৎসক, মনোবিদ্ ও সমাজসেবী-প্রদত্ত তথ্যাদি, শিক্ষক বা পিতামাতা কর্তৃক শিশু সম্বন্ধে যে অভাব-অভিযোগ ও বিকৃতির বিবরণ এবং শিশুর সাথে কথোপকথনের (*Interview*) মধ্য দিয়ে যে তথ্য আবিষ্কৃত হয়, তার ভিত্তিতে চিকিৎসক, মনোবিদ্, মনশ্চিকিৎসক ও সমাজসেবীর মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা হয় এবং পরস্পর আলোচনার মধ্য দিয়ে শিশুর সংলক্ষণপূর্ণ (*Symptomatic*) আচরণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা হয়। এই কারণ দূরীকরণের জন্য কোন্ পথ যথার্থভাবে অবলম্বিত হওয়া সমীচীন, তাও নির্ধারিত হয়।

শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রে যেসব শিশু আনীত হয়, তাদের মধ্যে দুই প্রকারের সমস্যা ও সংলক্ষণ দেখা যায়—(১) শিশুর আচরণে অত্যন্ত অস্থিরতা ও ধ্বংসাত্মক ভাব প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন—বদ মেজাজ, অবাধ্যতা, স্কুল পালিয়ে যাওয়া, চুরি করা, স্কুলের ও বাড়ীর জিনিসপত্র ভাঙ্গা প্রভৃতি। (২) সব সময় ভয়-ভয় ভাব, হাত-পা ঘামা, অল্পতেই অস্থির হয়ে যাওয়া।

প্রায়শই এই দুই প্রকারের সংলক্ষণই শিশুর মধ্যে মিশ্রিতভাবে দেখা যায়। যে শিশু আপাত আক্রমণমুখী তার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও অপরাধবোধ প্রবলভাবে কাজ করে এবং উদ্বায়ুগ্রস্ত (*Neurotic*) শিশু তার অবদমিত ক্রোধকে চিকিৎসাকালেই নানাভাবে প্রকাশ করে। একটি শিশু প্রায়শই একটি সংলক্ষণপূর্ণ আচরণের জন্য যদিও শিশু-নির্দেশনাকেন্দ্রে আনীত হয়, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, আরও গভীর ও বিপজ্জনক অসুখ সেই শিশুর মধ্যে রয়ে গেছে। এই কারণে চিকিৎসা কখনই কেবল সংলক্ষণ দূরীকরণের দিকে উদ্দিষ্ট থাকে না। এই সংলক্ষণের পিছনে যে গভীর ও গোপন কারণ শিশুর বিকৃত ব্যক্তিত্বের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং যে সব অবস্থা ব্যক্তিত্ব-বিকৃতির কারণ, তা দূরীকরণে প্রয়াস করে। এইসব কারণ একদিকে যেমন শিশুর মধ্যে, অপরদিকে পরিবেশের মধ্যে, একদিকে যেমন অতীতে, তেমনি বর্তমান অবস্থার মধ্যে নিহিত থাকে। কখনও দৈহিক বিকাশ-বিকৃতির জন্য, কখনও শিশুর প্রক্ষোভিক (*emotional*) ও সামাজিক (*social*) স্বাভাবিক বিকাশ-বিচ্যুতির জন্য সংলক্ষণপূর্ণ আচরণ শিশুর মধ্যে প্রকটিত হয়ে ওঠে। সেইজন্য চিকিৎসায় শিশুর জীবনের বিশেষ জায়গায় সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, এবং এর উপরই নির্ভর করবে শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কার প্রয়োজন কোন্ ক্ষেত্রে কতটা লাগবে। অবশ্য সকল আনীত শিশুর ক্ষেত্রে নির্দেশনা-কেন্দ্রের সকল বিশেষজ্ঞই আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসবেন।[১]

শিশু-নির্দেশনাকেন্দ্র স্থাপন—তার প্রয়োজনীয় উপাদান (Organisation & establishment of a Child Guidance Clinic) :

শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রাথমিক যে সব প্রয়োজন সেগুলির সংস্থান যৌথভাবে করতে হবে। **প্রথমতঃ,** শিশু-নির্দেশনার সামাজিক উপযোগিতা ও এর ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে যথার্থই যে শিশু-স্বাস্থ্য উন্নীত হতে

১। Treatment is not so much based on the symptoms, as on the degree and depth of the general disturbance in the child's personality and on the different causes or factors behind it. Now these causes are both in the child and in his environment ; they are in the past and in the present ; they are social, intellectual and emotional ; hence the type of treatment will be directed according to where the main stresses are to be found, while the role of the different members of the team will vary accordingly. —Burns C. L.: Maladjusted Children

পারে, এ সম্বন্ধে সমাজ-সচেতনতা নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পিত প্রচারকার্য চালাতে হবে। যথার্থভাবে মনোবিদ্যার প্রয়োগ বিষয়ে ও শিশু-নির্দেশনার উপযোগিতা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ না ঘটে ও এতে তাঁরা গভীরভাবে বিশ্বাস না করেন, তাহলে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে আর্থিক দায়-দায়িত্ব তা মেটাবার ভার এককভাবে সরকার নিতে পারেন, বা সরকারী ও বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টায়ও তা মিটতে পারে। আবার সমস্ত অর্থই বেসরকারী কোন জনকল্যাণকামী সংস্থার উদ্যোগে সংগৃহীত হতে পারে। কিন্তু এ অর্থসংগ্রহের পরিমাণ নির্ভর করে এ সম্বন্ধে সামাজিক চেতনার ওপর। কাজেই সরকারী ও বেসরকারী মহলকে দেশ-বিদেশে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র কিভাবে গড়ে উঠ্ছে ও তা কিভাবে মানবিক শক্তির যথার্থ ব্যবহারে ও সমাজ-সুস্থতা রক্ষা করতে সাহায্য করেছে, এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

যদি এককভাবে শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র স্থাপন আর্থিক দিক থেকে একবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মানসিক চিকিৎসাগারের বহির্বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে, কিংবা বিদ্যালয়ের সাধারণ চিকিৎসা-কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রেখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থেকেও শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এতে আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সাশ্রয় হতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের সাথে জনসাধারণের পরিচিতি হতে পারে। শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের উপযোগিতা সম্বন্ধেও জনসাধারণ বুঝতে পারে। এর দ্বারা যথার্থই যে শিশুর কল্যাণ সাধিত হয়, এ সম্বন্ধে জনসাধারণ যদি গভীরভাবে আস্থাশীল হয়ে ওঠে, তা হলে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হতে পারে।

শিশু-পরিচালনা গৃহ-সংস্থান ও তার উপকরণঃ

একটি শিশু-পরিচালনা গৃহে অন্তত চার থেকে ছয়টি বড় বড় ঘর থাকা প্রয়োজন। একটি ঘর হবে মনশ্চিকিৎসকের, একটি হবে মনোবিদের, একটি সমাজ-সেবীদের, আর বাদ বাকী ঘরগুলির মধ্যে একটি হবে পিতামাতা ও অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তিদের বসার ঘর। একটি অফিস ঘর ও একটি হবে মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা

প্রয়োগের ঘর। এছাড়া, খেলাধূলার জন্য খোলা কিছু জায়গা, ছোট একটু বাগান থাকবে। প্রতিটি ঘর সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো থাকবে। পরিচ্ছন্নভাবে সমস্ত কিছু পরিপাটি করা থাকবে। ঘরগুলোতে আলো হাওয়ার প্রাচুর্য থাকবে। মোটের উপর ঘরগুলো এমন সুন্দর ও উজ্জ্বল হবে যে, শিশুকে যখন সেখানে নির্দেশনার জন্য আনা হবে, তখন ঐ পরিবেশে সে আকৃষ্ট হবে। সমস্ত পরিবেশটি যেন প্রচ্ছন্নভাবে বন্ধুর মত তাকে হাতছানি দেবে।

এদিক থেকে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রটি এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শ্রেয়। যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে বিদ্যালয়ের সাথেই শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এতে স্থান-সঙ্কুলানের সমস্যাটি অত প্রকট হয় না। কিন্তু এতে অসুবিধাও দেখা দেয়, বিদ্যালয়ের প্রশাসনের সাথে শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রের প্রশাসন একত্রিত হলে নানা প্রকারের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। প্রায়শই বিদ্যালয়ের বিষয়েই কর্তৃপক্ষের অধিক মনোযোগ থাকে, এদিকে তেমন নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। বিদ্যালয়ের ছেলেদের গণ্ডগোল অনেক সময় নির্দেশনা-কেন্দ্রের কাজে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসাগারের সাথে কখনও কখনও শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হয়; এতেও স্থান-সঙ্কুলানের সমস্যা থাকে না, এবং দৈহিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলেই তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু এর অসুবিধা হ'ল যে, শিশুদের মনে প্রথম থেকেই চিকিৎসাগারের পরিবেশ দেখে একটা ভয়-ভয় ভাবের উদ্রেক হতে পারে। মানসিক চিকিৎসাগারের সাথে শিশু নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হলে আরও অসুবিধা দেখা দেয়। পিতামাতা ও অভিভাবকগণ মানসিক চিকিৎসাগার সংশ্লিষ্ট শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে ছেলেমেয়ে আনতে ইতস্তত করেন। সামাজিক দিক থেকে এতে ছেলেমেয়েদের পাগল বলে আখ্যায়িত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বলে এঁদের একটা ভয় ও সংশয় থাকে। এইসব কারণে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সবদিক থেকে বাঞ্ছনীয়।

নিম্নলিখিত উপকরণাদি শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রে একান্তভাবে থাকা দরকার।

(১) দৈহিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য—যাবতীয় উপকরণ, যেমন, স্টেথোস্কোপ, চোখ-কান পরীক্ষা করার সবরকম সাজসরঞ্জাম, ওজন নেওয়ার যন্ত্র, উচ্চতা-পরিমাপক যন্ত্র প্রভৃতি।

(২) মানসিক অভীক্ষা—বুদ্ধি-পরিমাপক অভীক্ষা (টারমান মেরিলের ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত সংস্করণ, ওয়েসলার বেলভিউ টেস্ট), সম্পাদনী অভীক্ষা (পাস-এ্যালঙ, কালার মেটরেসিস, ব্লক ডিজাইন), স্মৃতি-অভীক্ষা (জাসট্রোস মেমোরি

এ্যাপারেটাস্), ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (টি. এ. টি টেস্ট, রসাক্) *Thematic Apperception Test*, রসাক্ (*Rorschach Test*), নিউরোটিক ইন্‌ভেন্‌টোরী (*Bernreuter Neurotic Inventory*), প্রবণতার অভীক্ষা (*Interest Inventory*), প্রতিক্রিয়াকাল পরিমাপক অভীক্ষা (*Reaction time vernier chronoscope*), স্থিরতা-পরিমাপক অভীক্ষা (*Steadiness apparatus*)।

এ ছাড়া, কেস হিস্ট্রি ফর্মও (*case history form*) থাকবে। এতে শিশুর বিকাশ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি ধারাবাহিক বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়। দিনলিপি যথাযথভাবে রাখার জন্য ডায়েরী সিটেরও (*Diary sheet*) প্রবর্তন করা হবে। এতে আনীত একটি শিশুর আচরণ, বিশেষ ঘটনা, উন্নতি-অবনতির একটি মোটামুটি খসড়া করা যায়।

(৩) খেলাধূলার জিনিসপত্র—কাঠের ব্লক, রড্, দোলনা, ছোট বল, ক্যারম, বাগা টেলি, ছোটদের জন্য নানারকম খেলনা পুতুল, রঙ-বেরঙে্র ছবি প্রভৃতি থাকবে। দৈনন্দিন জীবনে শিশু যে সব বস্তুর সংস্পর্শে আসে, খেলনাগুলো তারই আদর্শে নির্মিত হবে।

(৪) অন্যান্য আসবাবপত্র—চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক, ইজি-চেয়ার, আলমারী কাগজপত্র, ফর্ম ইত্যাদি রাখার জন্য বিশেষ আলমারী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বসার উপযোগী চেয়ার ও টেবিলের ব্যবস্থা থাকবে। মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা-প্রয়োগের জন্য বড় চৌকোন টেবিল, অভীক্ষাগুলি রাখার জন্য দুটি বড় আলমারী, খেলার ঘরের জন্য বড় সতরঞ্জির ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দেশে শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও অসুবিধা ঃ

শিশুর মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য যে আর্থিক ও অন্যবিধ আনুকূল্য থাকা দরকার, তার জন্য যৌথ প্রয়াস করতে হবে। গৃহ-পরিবেশ ও বিদ্যালয়-পরিবেশে যাতে প্রত্যেকটি শিশু সুষম খাদ্য, খেলাধূলা, আলো-হাওয়াযুক্ত প্রশস্ত বাসস্থান লাভের সুযোগ পায়, তার জন্য সামগ্রিকভাবে প্রয়াস করতে হবে। অন্যদিকে শিশুপ্রযত্নে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান যাতে পিতামাতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তার জন্য শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার করে যেতে হবে।

মানসিক শক্তি অমূল্য সম্পদ। এর অপচয় দেশের সমূহ ক্ষতি করে। দেশের সমৃদ্ধি ও সুস্থতা মানসিক শক্তির যথার্থ নিয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব। মানসিক শান্তি ও শৃঙ্খলা পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহিষ্ণুতা ও প্রত্যেকের যথার্থ কর্মসংস্থান ও কর্মে সার্থকতার মধ্য দিয়েই আসে। আমাদের দেশে মানবিক শক্তির অপচয় অত্যন্ত প্রকট। শিশুর মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের সম্যক্ ব্যবস্থাও আমাদের দেশে এখনও অপর্যাপ্ত। সন্তান-প্রযত্নের মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমাদের দেশের পিতামাতা ও শিক্ষকগণ যথাযথভাবে আলোকপ্রাপ্ত নন। প্রত্যেকটি শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী তার সর্বাধিক উপযোগী বিষয়ে পঠন-পাঠন ও কর্মসংস্থানের জন্য শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রও আমাদের দেশে বিরল। এ বিষয়ে গণ-চেতনা ও আর্থিক সংস্থান দুই-এরই আমাদের দেশে অভাব। ছাত্র-বিক্ষোভ ও অসন্তোষ এখন যেরূপ প্রকট হয়ে উঠছে, তাতে প্রতিটি ছাত্রের অভাব-অভিযোগ, সামান্যতম অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ পরিলক্ষিত হলে গোড়াতেই তার প্রতিকার ও অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের তাৎপর্য ও তার কার্যকারণ সম্বন্ধে জ্ঞানদান বিষয়ে শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রের বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র যত বেশী স্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। এককভাবে শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র স্থাপন যদি আর্থিক দিক থেকে অসম্ভব হয়ে পড়ে, তা হলে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-নির্দেশনার (*Educational Guidance*) সাথে শিশু-নির্দেশনা (*Guidance for maladjusted children*) চলতে পারে। বিদ্যালয়ের চিকিৎসক, শ্রেণীশিক্ষক, মনস্তাত্ত্বিক ও *Career Master* ও সমাজ-সেবীদের সাহায্য নিয়ে ও বিদ্যালয় এবং বাড়ীর মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষক, চিকিৎসক, মনোবিদ্ বা *Career Master* ও মনশ্চিকিৎসকের মধ্যে আনীত বিপথগামী শিশু সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েও যদি শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব না হয়, তা হলে এক-একটি এলাকায় কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে যাতায়াতের সুবিধা হয় এরকম কেন্দ্র-স্থানীয় কোন স্কুলের সঙ্গে শিশু-নির্দেশনা সংস্থা স্থাপিত হতে পারে। এছাড়া, বেসরকারী উদ্যোগে জন-কল্যাণকর সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েও শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এরূপ কেন্দ্রে একজন বা দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারাও কাজ চালিত হতে পারে। বর্তমানে পল্লী অঞ্চলে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। এই সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েও শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এই সকল শিশু-নির্দেশনার ব্যয়ভার সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ বহন করতে পারে। বিদ্যালয়ে শিশু-

নির্দেশনার ব্যবস্থা করা হলে তার ব্যয়ভার অর্ধেক সরকারী সমাজ-কল্যাণ বিভাগ ও বাকী অর্ধেক শিক্ষা-দপ্তর বহন করতে পারে।

ভারতীয় জীবনযাত্রার ও পারিবারিক কাঠামো, ভারতীয় জীবনমান ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক রেখে মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষাগুলিকে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে হবে। বিপথগামিতার কারণ নির্ণয়ে কেবল বিদেশীয় তত্ত্বকে সার করলে চলবে না, দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ও সম্পর্ক-নিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ বিশ্লেষণে ব্রতী হতে হবে।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কার্যকারিতা (Functions and utilities of Child Guidance Clinic) ঃ

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কাজ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—(ক) সমস্যামূলক বা অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের কারণ নির্ণয় এবং কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা ও শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ (*Diagnosis*)।

(খ) ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতিকে সারিয়ে তোলার জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতির উদ্ভাবন (*Prognosis*)।

শিশুর অপসঙ্গতি জন্মগত দৈহিক কারণে ঘটতে পারে, আবার অসুস্থ পারিবেশিক প্রভাবের জন্য শিশুর অবচেতন মনে দ্বন্দ্ব ও জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। যেমন শিশু যদি মা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে শিশুর মানসিক অভিজ্ঞতা এমন হবে যে, সে তার মা সম্পর্কে একটা গভীর গূঢ়ৈষায় ভুগতে থাকবে। এরূপ প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা তার বিচার-বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে এবং স্বাভাবিক সঙ্গতি ব্যাহত করতে পারে। মনের গভীরে কি জটিলতা কাজ করছে, তার আবিষ্কার করা ও শিশুর অপসঙ্গতির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা খুবই কঠিন কাজ। বিশেষজ্ঞ ভিন্ন এ সম্ভব নয়। মনোবিদ্ মনশ্চিকিৎসকের ঐকান্তিক প্রয়াস ভিন্ন এ কাজ করা যায় না। তা ছাড়া, শিশুর প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও ভালবাসা, শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রের পরিচ্ছন্ন আনন্দকর পরিবেশ শিশুকে মনশ্চিকিৎসকের কাছে তার গভীর গোপন কথা, তার প্রকৃত অসুবিধার কথা খুলে বলতে উদ্দীপ্ত করে। শিশুকে জানার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হয় ; নিম্নপ্রকারের মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষাও প্রয়োগ করা হয়—

(ক) সাক্ষাৎকার (*Interview*)

(খ) প্রশ্নোত্তরভিত্তিক অভীক্ষা (*Questionnaire*)

(গ) জীবন-বিকাশ পর্বের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখন-পদ্ধতি (*Case History Method*)

(ঘ) অভিক্ষেপণমূলক অভীক্ষা (*Projective Tests*) :

(১) রসাক্ অভীক্ষা (*Rorschach Test*)

(২) থেমাটিক অভীক্ষা (*Thematic Apperception Test*)

(৩) শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (*Word Association test*)

প্রত্যক্ষ পরিচিতি (Interview) :

প্রত্যক্ষ পরিচিতির মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে চিকিৎসক ও মনস্তাত্ত্বিক, আনীত সমস্যামূলক শিশু সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। শিশুর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুভাবে মিশে তার সুবিধা-অসুবিধার কথা জানতে পারে। তার বাড়ীতে কি অসুবিধা, বাড়ীর বাবা-মা সম্বন্ধে তার প্রতিন্যাস, বিদ্যালয়ে তার কি সুবিধা-অসুবিধা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি তার ধারণা, তার শক্তি-সামর্থ্য ও প্রবণতা, এ সকল বিষয়ে একটা প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক ধারণা করা যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিশুর বিপথগামিতার কারণও নির্ণয় করা যেতে পারে। এরূপ সাক্ষাৎকার কখনও পূর্ব-পরিকল্পিত (*structured*) হতে পারে, অর্থাৎ কি কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা পূর্ব থেকেই ঠিক করে নেওয়া হয়। আবার কখনও কখনও খোলাখুলি নানা বিষয়ে প্রয়োজনমত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় (*Unstructured*)।

প্রত্যক্ষ পরিচিতি একদিকে যেমন অনেক তথ্যাদি আহরণে সাহয্য করে, অন্যদিকে এর ত্রুটিও আছে। এ সকল তথ্যাদি যথার্থভাবে নৈর্ব্যক্তিক নাও হতে পারে। শিশু তার মনের গভীর কথা নাও বলতে পারে। ভুল ও মিথ্যা তথ্যের দ্বারা বিপথে চালিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

জীবন-বিকাশের ইতিহাস (Case-history Method) :

ব্যক্তিত্ব হঠাৎ গড়ে ওঠে না। মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থা থেকে বিকাশ-পর্ব আরম্ভ হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পারিবেশিক প্রভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্বের সুস্থতা-অসুস্থতা পারিবেশিক শক্তির স্বরূপের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে—সুস্থ পরিবেশ সুস্থ ব্যক্তিত্বগঠনে সহায়তা করে। অসুস্থ পরিবেশ ব্যক্তিত্বকে অসুস্থ করে ফেলে।

শিশুর ক্রমপর্যায়ী ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস-লিপিগ্রহণ শিশুর বিপথগামিতার

কারণ নির্ণয়ে একান্তভাবে অপরিহার্য। অতীত ও বর্তমান পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের সমাজ-কর্মিগণ (*Social worker*) বাড়ীতে পিতা-মাতা ও বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণী-শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকেন।

কেস্‌-হিস্ট্রি ফর্মের নমুনা ঃ

শিশুর সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্যাদি

নাম— ভাইবোনের সংখ্যা

বয়স— ও তাদের বয়স—

ঠিকানা—

বিদ্যালয়ের পাঠক্রম—

যাঁদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, তাঁদের নাম ও শিশুর সাথে তাঁদের সম্পর্ক ঃ

তথ্যদানকারীদের মতে আনীত শিশুর সমস্যামূলক আচরণের বিবরণ ও শিশুদের সম্বন্ধে অভিযোগ—

এ সকল সমস্যামূলক আচরণের আরম্ভ কিভাবে ও কতদিন হ'ল, সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা—

(ক) পারিবারিক বিবরণী

(১) পিতা

পিতার নাম— পিতার স্বাস্থ্য—

বয়স— ব্যক্তিত্ব—রাগী, ধীর-স্থির/অস্থির-

শিক্ষাগত মান— চিত্ত ও রাগী,

পেশা— অন্তর্মুখী/বহির্মুখী,

আয়— বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দমুখর,

পিতা ছেলের সাথে হতাশা ও বিষাদাক্রান্ত

থাকে, না চাকুরির জন্য

প্রবাসে থাকে—

আনীত শিশুর জন্ম-

সময়ে পিতার বয়স—

(২) মাতা

নাম—
বয়স—
শিক্ষাগত মান—
গার্হস্থ্য/চাকুরি—
আয়—

শিশুর জন্মসময়ে
মাতার বয়স—
মাতার স্বাস্থ্য—
মাতার ব্যক্তিত্ব—আক্রমণধর্মী, সব সময় সন্তানের সাথে খিটিমিটি ভাব,
অন্তর্মুখী/বহির্মুখী,
বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দমুখর,
হতাশা ও বিষাদাক্রান্ত

(খ) ভাইবোন

ভাইবোনের সংখ্যা—

তাদের জন্ম-সন্—

ভাইবোনের সম্পর্ক (প্রীতিপূর্ণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, হিংসা ও দ্বেষ জর্জরিত, উদাসীন, অনুকরণসাপেক্ষ, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল)।

(গ) কি ধরনের পরিবার—যুক্ত বা একাকী।

(ঘ) পরিবারের মা, বাবা ও ভাইবোন ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তি—তাদের সাথে শিশুর সম্পর্ক ও পরিবারে তাদের স্থান।

(ঙ) পরিবারে কারও মানসিক রোগ আছে কিনা, তা জানা।

(১) বর্তমান পরিবারের, অর্থাৎ পিতামাতা, ভাইবোন এদের কারো মধ্যে।

(২) পিতার দিক থেকে, যেমন ঠাকুরদাদা, কাকা, জ্যাঠা, পিসি প্রভৃতি।

(৩) মাতার দিক থেকে, যেমন—দিদিমা, মাসিমা, মামা প্রভৃতি কারো মধ্যে মানসিক ব্যাধি ছিল কিনা জানা।

(চ) পারিবারিক শৃঙ্খলা—দুর্বল/অত্যন্ত কঠোর/অসামঞ্জস্যপূর্ণ—একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সন্তানের সাথে বিভিন্ন প্রকার আচরণ করে থাকে, বিভিন্ন প্রকার আচরণমান অনুসরণে প্ররোচিত করে।

সর্বদা শিশুদের সর্বপ্রকার কাজে বাধা ও সমালোচনা, জোর করে পরিবারে নিয়ম-শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা।

(ছ) পরিবারে সাংস্কৃতিক আনন্দ-আহরণের সুযোগ (বেতার, ছোটদের উপযোগী সাহিত্য, খেলাধূলার উপকরণ)।

(জ) গৃহের ভৌতিক পরিবেশ—খোলামেলা, বদ্ধ/সুস্থির/অস্থির গৃহ-পরিবেশ। গৃহে আবেগ-পরিবেশ।

(ঝ) পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক—মধুর/কলহপূর্ণ/সুস্থির/উত্তেজনাপূর্ণ।

শিশুর বিকাশ-পর্ব :

(১) গর্ভাবস্থায় মাতার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য।

(২) শিশুর প্রসব-প্রকার (জন্মকালে কোন আঘাত, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্ম, না স্বাভাবিক প্রসব)।

(৩) শিশু জন্মাবার পর প্রথম দু'মাস মাতার স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল।

মাতা-সন্তানের বিভিন্ন দিকের সম্পর্ক :

(ক) স্তন ছাড়ার বয়স।

(খ) মলমূত্র পরিত্যাগে মা'র শিক্ষাদান-পদ্ধতি—বিছানায় প্রস্রাব করার অভ্যাস আছে কিনা।

(গ) খাদ্যাভ্যাস (খাদ্যের সুষমতা, দুবার খাদ্যের মধ্যে সময়-পার্থক্য)।

(ঘ) **নিদ্রাভ্যাস :**

নিদ্রার সময়—নিয়মিত/অনিয়মিত/প্রশান্ত নিদ্রা/নিদ্রাকালে ভয়াবহ স্বপ্ন, নিদ্রাসঙ্গী—বাবা/মা/ভাই/বোন/আর কেউ, নিদ্রা-ব্যবস্থা। নিদ্রার আবেগগত অসুবিধা।

(ঙ) মার সাথে শিশুর বিচ্ছেদের কোন ইতিহাস যদি থাকে, তার স্বরূপ। বিচ্ছেদের সঠিক সময়।

পিতা-সন্তানের সম্পর্ক :

সন্তানের সাথে পিতার সম্পর্ক—বন্ধুত্বপূর্ণ। সন্তানকে অত্যন্ত আদর দেওয়া আক্রমণমূলক/উদাসীনতা।

খেলার সাথী ও বন্ধুবান্ধব :

(ক) খেলায় আগ্রহ।

(খ) খেলার সাথীদের বয়স—বেশী বয়েসী/
কম বয়েসী/
সমবয়েসী/

(গ) খেলাধূলার বিষয়ে বাবা, মা বা অন্য অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদের কা? থেকে নিয়ত বাধা পেয়েছে কিনা।

শিক্ষাগত জীবন :

প্রথম বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা/বা নার্সারী/কিণ্ডারগার্টেন

বিদ্যালয়ে ভর্তির তারিখ—

কোন্ ক্লাসে ভর্তি হয়—

কোন ক্লাসে অকৃতকার্য হয়েছিল কিনা—

শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ—

শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (নেতৃস্থানীয়/অন্য কোন ছেলের নির্দেশ মেনে চলা/ একাকী থাকতে ভালবাসা/নিজ থেকে অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীর সাথে মেশার প্রবণতা।)—

বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল :

অধীত বিষয়	বিগত বাৎসরিক পরীক্ষার নম্বর	এ বছরের অর্ধ-বাৎসরিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর	বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত-কার্যতা	কোন্ কোন্ পাঠ্য বিষয়ে অধিক আগ্রহ

বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক বিষয়ে উৎসাহ ও অংশগ্রহণের মাত্রা।

নিজের রুচিমত পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ, না অন্যের চাপে কোন বিষয় পাঠে বাধ্য হওয়া।

বিদ্যালয়ে বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত।

বিদ্যালয়ে খেলাধূলা অন্যান্য সহপাঠক্রমিক বিষয়ের ব্যবস্থা কতটা আছে, তার হিসাব—

দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

উচ্চতা, ওজন—

সাধারণ স্বাস্থ্য—
চোখের অবস্থা/চোখের কোন অসুখ আছে কিনা—
দাঁতের অবস্থা/দাঁতের কোন অসুখ আছে কিনা—
কানের অবস্থা/শোনার কোন অসুবিধা আছে কিনা—
তোৎলামি, অপুষ্টি, অজীর্ণতা, ক্লান্তি, মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ আছে কিনা-

ব্যক্তিত্ব	১ অত্যন্ত খারাপ	২ খারাপ	৩ সাধারণ	৪ ভাল	৫ অত্যন্ত ভাল
পরিবারে, বিদ্যালয়ে সঙ্গতির স্বরূপ—					
বুদ্ধি—					
প্রক্ষোভিক পরিণতি—					
অধ্যবসায়—					
মনোযোগ—					
পরিচ্ছন্নতা—					
আত্ম-সমালোচনা—					
নেতৃত্বের ক্ষমতা—					
ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ—					
সততা—					
আত্মবিশ্বাস—					
আনুগামিতা—					
সহযোগিতা—					

নিম্নলিখিত কোন্ ব্যক্তিত্ব-সংলক্ষণ আনীত শিশুর মধ্যে পরিস্ফুট হয় বলে মনে হয়—

বিষণ্নতা, আলস্যপরায়ণতা, ভয়াকুলতা, সন্দেহপরায়ণতা, উত্তেজিত ভাব, অধিক কথন, মিথ্যাকথন, অপহরণপ্রবণতা, নিষ্ঠুরতা, জিনিসপত্র ভাঙাচোরা, একগুঁয়েমি, হঠাৎ রেগে যাওয়া, দিবাস্বপ্নচারিতা প্রভৃতি।

উপসংহার ও সিদ্ধান্ত :

বিদ্যালয়ের জন্য নির্দেশাবলী—
গৃহের জন্য নির্দেশাবলী—

উপরোক্ত বিষয়ে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে ও তার বিচার-বিশ্লেষণ করে আনীত শিশুর মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ ও তার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ নির্ণয় করা হয় ও এই কারণ দূরীকরণে মনশ্চিকিৎসক নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই পদ্ধতির মধ্যেও ভুল-ভ্রান্তি, একদেশদর্শিতা থাকতে পারে, সেজন্য অন্যান্য আরও নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি আনীত শিশুকে জানার বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়।

প্রশ্নোত্তরভিত্তিক অভীক্ষা (Questionnaire)ঃ

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক প্রশ্ন লিখিতভাবে ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। প্রশ্নোত্তরগুলি 'হ্যাঁ' বা 'না'-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মানসিক সংগঠন কিছু পরিমাণে ধরা পড়ে। প্রত্যক্ষ পরিচিতিতে ব্যক্তি লজ্জা ও সঙ্কোচে অনেক কথা বলতে দ্বিধা বোধ করে, কিন্তু প্রশ্নোত্তরে সেসব কথা বলা সহজ হয়। ব্যক্তিকে তার চিন্তাধারা, অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিন্যাস-সংক্রান্ত নানা দিকে প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নোত্তর নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাস্রোতকে অনুসন্ধান করে দিতে পারে। এই প্রশ্নোত্তরগুলি ভুল-শুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় না।

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্য আহরণের জন্য নির্দিষ্ট ও আদর্শায়িত অভীক্ষা বর্তমানে প্রচলিত। এর মধ্যে বার্ণরয়টার ইন্‌ভেণ্টরি (*Bernreuter Inventory*), মিনেসোটা মাল্টিফেসিক্‌ পার্সোনালিটি ইন্‌ভেণ্টরি (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বার্ণরয়টার ও এম্‌. এম্‌. পি. আই. অভীক্ষা দুটি প্রধানত মানসিক দিক থেকে অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করা হয়—মানসিক অসুস্থতার প্রকৃতি ও অসুস্থতা কতটা প্রকট, তা এই অভীক্ষাগুলি থেকে বহুল পরিমাণে নির্ধারণ করা যায়।

প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষা (Projective tests)ঃ

প্রত্যক্ষ পরিচিতি ও প্রশ্নোত্তর অভীক্ষার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে প্রতিফলিত হলেও মনের গভীর প্রকৃতি ও নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব ও তার গতি-প্রকৃতি প্রতিভাত করার জন্য প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এতে অভীক্ষার উদ্দীপকটি কোন নিশ্চিত আকৃতি বা প্রকৃতির মধ্যে থাকে না। উদ্দীপকটি দেখে ব্যক্তি তার মানস-প্রকৃতি অনুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে সাড়া দেয়। প্রদত্ত উদ্দীপক চিত্র-বিশ্লেষণের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। উদ্দীপকটি কিভাবে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ (*Perceive*) করে, কিভাবে তা বিচার করে, এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মনন-ভঙ্গী থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-ভঙ্গী (*Personality pattern*) সম্বন্ধে জানা যায়।

এরূপ অভীক্ষার প্রধান দু'টি অভীক্ষার একটি হ'ল রসাক টেস্ট (*Rorschach test*), অপরটি থেমাটিক এ্যাপারসেপসন্ টেস্ট (*Thematic Apperception test*)।

রসাক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন হারমান্ রসাক, এবং পরে ব্রনো ক্লফার (*Bruno Klopfer*) ও সামুয়েল বেক্ (*Samuel Beck*) এ পদ্ধতিকে আরও উন্নত করেন। এতে দশটি কার্ড পূর্ব নির্ধারিত ধারায় পরপর দেখানো হয়। প্রত্যেকটি কার্ডে একটা নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন কালির ছোপ থাকে। শেষের তিনটি কার্ডে রং-এর ছোপও থাকে। ব্যক্তি এ কার্ডগুলো দেখে যেসব সাড়া দেয়, তার বিচার ও সাড়া দিতে কতটা সময় লাগে তার হিসাব রাখা হয়। প্রত্যেকটি সাড়া সম্বন্ধে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়, কেন সে এরূপ সাড়া দিল, এরূপ সাড়া দিতে তাকে কি কি অভিজ্ঞতা ও অনুষঙ্গ প্ররোচিত করেছে, কোন্ স্থানটি দেখে কি সাড়া দিল ইত্যাদি বিষয়ে তার কাছ থেকে জানা হয় ও এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এর পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়। রসাক-অভীক্ষা মূলত এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে, ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি, প্রত্যক্ষণের প্রকৃতির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। একই উদ্দীপককে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে, তার কারণ হ'ল বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক সংগঠন এক প্রকারের নয়, সাংগঠনিক ভিন্নতাই বিভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের (*Perception*) প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এই প্রত্যক্ষণ প্রকারের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ধরা পড়ে।

থেমাটিক এ্যাপারসেপসন্ অভীক্ষাও মূলত এই আদর্শের ভিত্তিতেই সৃষ্ট। হেন্‌রি মারে (*Henry Murray*) এই অভীক্ষাটির উদ্ভাবন ও প্রচলন করেন। এতে কুড়িটি ছবি আছে—দশটি করে এক এক বারে দেওয়া হয়। ছবিগুলি পূর্ব-নির্ধারিত ক্রমে পর পর ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এবং তাকে এই ছবি দেখে, ছবির উপর ভিত্তি করে একটি গল্প তৈরি করতে বলা হয়। ছবিগুলি প্রায় অনির্দিষ্ট প্রকৃতির। ক্রমে ছবিগুলি আরও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে আসে। ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি যে গল্পের কথা বলে, সেটি হুবহু লিখে নেওয়া হয়, এবং এই গল্পগুলির সংব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বোঝার প্রয়াস করা হয়।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি প্রতিক্ষেপণ অভীক্ষা আছে। এর মধ্যে **শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test)** ও ছবিপূরণ অভীক্ষা উল্লেখযোগ্য। শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ পর পর অভীক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা হয়। শব্দটি শোনার পর যে শব্দ তার প্রথম মনে আসে, সেটি লিখে নেওয়া হয়। একটি শব্দ-শোনার ও অভীক্ষার্থীর উত্তরদানের মধ্যে যে সময় বিরতি, সেটি লিপিবদ্ধ

করা হয়। কোন শব্দে এই বিরতিকাল যদি অস্বাভাবিকভাবে বেশী হয়, তাহলে সেই শব্দের সঙ্গে ব্যক্তির কোন বিশেষ সংবন্ধন আছে বা নির্জ্ঞান-মনের কোন জটিলতা আছে বলে অনুমান করা হয়। উদ্দীপক শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি সাড়া-স্বরূপ যে শব্দগুলি উচ্চারণ করে, তার বিচার-বিশ্লেষণ করে অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রকার ও ব্যক্তির নির্জ্ঞানে যে দ্বন্দ্ব-জটিলতা আছে তার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়।

প্রত্যক্ষ পরিচিতি, কেস হিষ্ট্রি, প্রশ্নোত্তর অভীক্ষা ও আরও নৈর্ব্যক্তিকভাবে আনীত শিশুর মানস-সংগঠনকে জানার জন্য উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করা হয়। শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের কোন স্তরে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, মানসিক জটিলতার স্বরূপ কি, অপসঙ্গতিমূলক আচরণের প্রকৃত কারণ কি, তা এইসব অভীক্ষার ফলাফল ও সাড়া বিশ্লেষণ করে জানার চেষ্টা করা হয়।

কারণ নির্ণয় করার উপযুক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্ণয় করা শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রের কাজ। উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে শিশুটিকে রেখে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একাদিক্রমে চিকিৎসা করে যাওয়া, গৃহ, বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে শিশুর চিকিৎসা করা, মৌলিক চাহিদা-পূরণে কোন অন্তরায় থাকলে তা দূরীকরণের প্রয়াস শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য পিতামাতা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আনীত শিশু সম্পর্কে, আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে যথাযথ পরিবর্তন আনয়নে সাহায্য করার বিষয়েও শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার উপযুক্ত পাঠ্যবিষয়ে পরিচালনা, প্রয়োজন হলে তার জন্য বিশেষ পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত বৃত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করা, এর জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থার সাথে যোগাযোগ করে শিশুকে কর্মে নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাও শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

অল্পব্যয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যলাভের জন্য শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। এদিক থেকেও সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নের শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে একটি আবাসিক শিক্ষায়তন থাকতে পারে—যেখানে শিশুর একদিকে যথাযথ চিকিৎসা চলবে, অন্যদিকে নিয়মিত খেলাধূলা, যৌথ-কর্মসম্পাদনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটা সুনিয়ন্ত্রিত যৌথ জীবন যাপনের অভ্যাস গঠিত হবে—সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনার ব্যবস্থাও থাকবে। যে সকল শিশুর বিপথগামিতার জন্য গৃহের অসুস্থ পরিবেশই দায়ী, সেসব ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ-সংশোধনী আবাসিক

শিক্ষায়তন (*Correctional Home for Problem children*) বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে। শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের এরূপ শিক্ষায়তন পরিচালনা করাও একটি কাজ।

তাছাড়া শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের সাথে একটি গবেষণা-শাখাও থাকতে পারে। আনীত শিশুদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্যাদি, নানাপ্রকারের সমস্যামূলক আচরণ প্রভৃতির ভিত্তিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, বিচ্যুতি ও সমস্যামূলক আচরণের সাথে কার্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন সত্যের আবরণ উন্মোচিত হতে পারে। এরূপ গবেষণার ভিত্তিতে নতুন সত্যের উদ্ভাবন করাও শিশু নির্দেশনা কেন্দ্রের একটি পরোক্ষ কাজ।

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

শিশু-নির্দেশনা→

শিশু-নির্দেশনার ধারণাটি মনোবিদ্যার গবেষণার একটি নতুন ফলশ্রুতি; নির্দেশনা ভিন্ন মানবশিশু তার পথে যথার্থভাবে বিকাশলাভ করতে পারে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্য, প্রতিটি শিশুর মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনা রয়েছে। নির্দেশনা বলতে বোঝায় শিশুর আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারী বিকাশকে সাহায্য করা—নিজের পায়ে নিজে যাতে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য সাহায্য করা—এ সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক, মনোবিদ্ ও শিক্ষকের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে উপদেশ ও নির্দেশদান, তাকেই বলা হয় নির্দেশনা বা Guidance। নির্দেশনার যেমন একটা ব্যাপক তাৎপর্য আছে, আবার এর খণ্ড তাৎপর্যও আছে—যেমন শিক্ষা-নির্দেশনা, বৃত্তি-নির্দেশনা, বিপথগামী শিশুদের নির্দেশনা। নির্দেশনার ব্যাপক তাৎপর্য—পিতামাতা শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবকস্থানীয় যে কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিশুর সুনিয়ন্ত্রিত স্বপ্রকাশ বা বিকাশ। খণ্ড-তাৎপর্য—শিক্ষা-নির্দেশনা ব্যাপকভাবে গৃহে ও বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন বা বিদ্যালয়ের যে কোন কার্যক্রমই যেমন খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠ্যক্রম, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, সবকিছুই শিক্ষা-নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা-নির্দেশনা, খণ্ডিত

অর্থে, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, প্রবণতা, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী তার সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠ্যক্রম পরিচালনা করা। বৃত্তি-নির্দেশনার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর রুচি, বুদ্ধি, বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য, সমাজ-প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সর্বাপেক্ষা উপযোগী বৃত্তিতে পরিচালনা করা। বিপথগামী শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশনা বলতে বোঝায়, এমন শিশুর নির্দেশনা যার ব্যাপক অর্থে নির্দেশনার কোন-না-কোন স্তরে গণ্ডগোল ছিল, যেমন গৃহের পরিবেশ বা বিদ্যালয়ের পরিবেশে সুস্থতা ছিল না ও যথার্থ নির্দেশনাও ছিল না। বিপথগামী শিশুদের নির্দেশনাই হ'ল Child Guidance Clinic.

নির্দেশনার দুই দিক→

(ক) ভবিষ্যকথন (Prediction), (খ) নিয়ন্ত্রণ (control)।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপনের ইতিহাস→

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ উইলিয়াম হিলী (William Healy) প্রথম নির্দেশনা কেন্দ্র জাতীয় একটি সংস্থা স্থাপন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে উইট্‌মার (Witmer) পেনসিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মনস্তত্ত্বভিত্তিক চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় মানসিক স্বাস্থ্য-বিদ্যার জাতীয় সংস্থা যখন মানসিক স্বাস্থ্য-উন্নয়নের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখনই প্রকৃতপক্ষে 'শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র' নামটির প্রথম অবতারণা করা হয়।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞ ও তাঁদের কাজ→

মনোবিদ্—বিভিন্ন প্রকার মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ—শিক্ষা-বিষয়ে অসুবিধার কারণ নির্ণয়, শিক্ষা-নির্দেশনা, প্রয়োজনবোধে বৃত্তি-নির্দেশনা, সমাজসেবী—গৃহ-পরিবেশ, বিদ্যালয়-পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ। মনশ্চিকিৎসক অধিকর্তা—বিপথগামী শিশুর দৈহিক ও সাধারণ মানসিক পরীক্ষা।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে আলোচনা-চক্র→

আনীত শিশু সম্বন্ধে, চিকিৎসক, মনোবিদ্ ও সমাজসেবী-প্রদত্ত তথ্যাদি নিয়ে চিকিৎসক, মনোবিদ্, মনশ্চিকিৎসক ও সমাজসেবী

আলোচনায় বসেন—শিশুর রোগের বা অসামাজিক আচরণের কারণ নির্ণয় করেন ও তার চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্ণয় করেন।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন—তার প্রয়োজনীয় উপাদান→

পরিকল্পিত প্রচার-কার্য—জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা। আর্থিক দায়-দায়িত্ব—সরকারী বা বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টা। মানসিক চিকিৎসাগারের বহির্বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে, কিংবা বিদ্যালয়ের সাধারণ চিকিৎসা-কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রেখে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন।

শিশু-পরিচালনা গৃহ-সংস্থান ও তার উপকরণ→

শিশু-পরিচালনা আবাসে অন্ততঃ চার থেকে ছয়টি বড় বড় ঘর থাকবে। ঘরগুলোতে আলো হাওয়া যাতে প্রচুর থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দৈহিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য উপকরণ। মানসিক অভীক্ষা। Case-history forum. খেলাধূলার জিনিসপত্র।

শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের কার্যকারিতা→

Diagnosis. Prognosis. Diagnosis-এর উপায়—Interview, প্রশ্নোত্তর-ভিত্তিক অভীক্ষা, Case-history Method, অভিক্ষেপণমূলক অভীক্ষা, রসাক, থেমাটিক, শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা। আচরণ-সংশোধনী আংশিক শিক্ষায়তন।

॥ অনুশীলনী ॥

1. What do you mean by 'Child Guidance'? Describe the minimum requirements for organising a 'Child Guidance Clinic'.
2. Write an essay on Child Guidance Clinic.
3. Describe the nature of the equipments and organisations of clinics for child guidance that you consider suitable for India.
4. What are the functions of a 'Child Guidance Clinic'? Show your acquaintance with the personnel of a 'Child Guidance Clinic' pointing out the programme of work designated for each.
5. Enumerate the personnel of a 'Child Guidance Clinic' and state the duties of each person.
6. How would you equip a Child Guidance Clinic? Discuss in this connection the duties and functions of a psychiatrist in such a clinic.
7. Describe fully the type of Child Guidance Clinic you would like to establish for your children.
8. Justify the idea of the necessity of establishing Child Guidance Clinics in India.
9. Elucidate the term 'Guidance' and show how far the meaning of this term can be realized in a Child Guidance Clinic.

উনবিংশ অধ্যায়
মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসা
[Treatment of Maladjustment and Mental Diseases]

বিপথগামী শিশুই হোক বা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিই হোক এদের চিকিৎসা সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সাধারণ চিকিৎসক এদের চিকিৎসা করতে পারে না। এর জন্য মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন। এছাড়া, দৈহিক রোগ চিকিৎসায় যে পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বিত হয়, মানসিক রোগ চিকিৎসায় সে পথ অবলম্বিত হয় না, মানসিক চিকিৎসার বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হয়। দৈহিক রোগে যেরূপ ঔষধ-পথ্যাদি ও কখনো কখনো শলাকা-চিকিৎসা *(Operation)* করা হয়, মানসিক চিকিৎসায় ঔষধ পথ্যাদি ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি আছে, যেগুলি মানসিক রোগ-নিরাময়ের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। ঔষধ-পথ্যাদি দিয়ে যে চিকিৎসা, তাকে বলা হয় মেডিকো থেরাপী *(Medico therapy)*। *Therapy* কথাটির অর্থ 'চিকিৎসা'। মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসায় যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে বলা হয়, **মানসিক চিকিৎসা** *(Psycho-therapy)*। মানসিক চিকিৎসা বহু প্রকারের হতে পারে।

মানসিক চিকিৎসা বলতে কি বোঝায়? বৃহত্তর অর্থে দেখলে সাইকোথেরাপি বা মানসিক চিকিৎসা বলতে বোঝায় একজন সুশিক্ষিত ও মানসিক রোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা মনস্তাত্বিক উপায়ে (ঔষধ দ্বারা নয়) মানসিক রোগগ্রস্ত বা অপসঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তির রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করা ও পুনরায় মানসিক সঙ্গতিসাধনে ও কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করা। অসুস্থ ব্যক্তির মানসিক যন্ত্রণা তার অনুভূতি, চিন্তা, আচরণ, ঘনিষ্ঠ জনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক সব কিছুকে বিকৃত করে ফেলে। সকল প্রকার মনশ্চিকিৎসাই ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা শক্তি ও অনুভূতি ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করে, যা দ্বারা সে তার ভয়, দুশ্চিন্তা, দ্বন্দ্বজর্জরতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন শক্তি ও উদ্যমে নতুন বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সার্থক-ভাবে তার জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এই চিকিৎসাপদ্ধতির মূল ভিত্তি হ'ল চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থী বা চিকিৎসার্থীদের মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক বা কখনো কখনো কোন বিশেষ যৌথ কার্যসম্পাদন।

থেরাপি একটি প্রক্রিয়াবিশেষ, যে প্রক্রিয়াতে চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থী সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। মানসিক চিকিৎসায় চিকিৎসার্থী যদি যথাযথরূপে

সক্রিয় ও উৎসাহী না হয়, তাহ'লে মানসিক চিকিৎসার কোন ফলই পাওয়া যায় না। অতএব, মানসিক চিকিৎসাকে একটি প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে, যে প্রক্রিয়াতে মূলত চিকিৎসক রোগীকে মনোযোগ দিয়ে দেখেন, তাকে বোঝার চেষ্টা করেন ও প্রয়োজনমত সাহায্য করার প্রয়াস করেন। ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোনক্রমেই করা হয় না।

চিকিৎসক যখনই চিকিৎসার্থীর সাথে বন্ধুভাবে যন্ত্রণা উদ্রেককারী রোগ-সমস্যার কারণ-নির্ণয়ে ও রোগীর কাছে সে কারণ উপস্থাপনে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে রোগীর মনে প্রফুল্লতা, কাঙ্ক্ষিত আত্ম-বিশ্বাস ও কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে, তখনই মানসিক চিকিৎসার কাজ আরম্ভ হয়েছে বুঝতে হবে। অধুনা মানসিক চিকিৎসাকে, সম্পর্কভিত্তিক চিকিৎসাও (*Relationship Therapy*) বলা হয়ে থাকে। সকল প্রকার মানসিক চিকিৎসার মধ্যেই চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কোনটায় চিকিৎসক অনেকটা কর্তৃত্বের মনোভাব নিয়ে থাকেন (*Directive Counselling*)। এতে শিশুকে প্রায় নির্দেশ দেওয়া হয়, কখনো কখনো এতে চিকিৎসক শিশুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এইসব ক্ষেত্রে শিশুর আচরণ সামান্য বিকৃত। সে কি ভাবে চলবে, তার দিনলিপি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

আর এক প্রকারের সম্পর্ক আছে, যাতে চিকিৎসক রোগীর সঙ্গে এমন একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন যাতে করে চিকিৎসক রোগীর অস্বস্তির কারণ, কবে, কি ভাবে এ সকল অস্বস্তির উদ্ভব হ'ল, নির্জ্ঞান মনে যে গূঢ়ৈষা (*Complex*) রয়েছে তার স্বরূপ কি, এ সব বিষয় রোগীর চেতন মনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। রোগীর চিকিৎসকের কাছে বাধাবন্ধহীনভাবে আত্ম-কথনের মধ্য দিয়ে যে সকল অভিজ্ঞতার সাথে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় পুঞ্জীভূত থাকে, তা বাষ্পীভূত (*Abreaction*) হয় ও ধীরে ধীরে অবচেতন মানস উদ্ঘাটিত হয়। এরূপ আত্ম-কথনের মধ্য দিয়ে রোগীর মন অনেক হাল্কা হয়ে যায়, সে যেন প্রাণ খুলে বলে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এতদিন যেন রোগী তার মনের কথা খুলে বলতে পারে, এমন লোক খুঁজে পাচ্ছিল না।

শিশুর ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসা শিশুর উদ্দীপনায় আরম্ভ হয় না, শিশুর পিতামাতাই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে থাকেন। শিশু নিজে তার অপসঙ্গতি ও অস্বস্তির স্বরূপ ও কারণ বুঝতে পারে না। পিতামাতা ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিগণই শিশুর মানসিক অস্বস্তি ও অপসঙ্গতি ধরতে পারেন এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। মনশ্চিকিৎসকের সঙ্গে শিশুর বিকৃত আচরণ বিষয়ে পরামর্শ পিতামাতাই

প্রথম আরম্ভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টা কিছুটা স্বতন্ত্র—এরা অনেক ক্ষেত্রে *Psychoneurosis*, বিশেষ করে মৃদু মানসিক বিকৃতিতে নিজেরাই বুঝতে পারে ও মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে থাকে। এদের সাথে মনশ্চিকিৎসকের প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে ওঠে। ফলে, মনের কথা খুলে বলতে মনের বাধা (*Resistance*) শীঘ্র দূর হয়। এই মনের কথা বলতে বলতে ব্যক্তি এলোমেলো অনেক কথা বলে, যার কোন অর্থ আছে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় না। এই আপাত এলোমেলো কথনের মর্মমূলে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা থাকে, দ্বন্দ্ব-গূঢ়ৈষা কাজ করে। আপাত এলোমেলো কথনের সূত্র ধরে চিকিৎসক রোগীর নির্জ্ঞান-মনের গতি-প্রকৃতির পরিচয় পান ও নির্জ্ঞানে যে জট রয়েছে, যা অগোচরে ব্যক্তির চিন্তা ও আচরণকে বিকৃত করছে, তাকে ব্যক্তির চেতন মনে উদ্ঘাটিত করে দেন। এরূপ উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজের বিকৃতির কারণ খুঁজে পায়। বেশ কিছুকাল মনঃসমীক্ষণের পর ব্যক্তি নিজের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে পুঞ্জীভূত আবেগ-নিষ্কাষিত পরিচ্ছন্ন বাস্তবমুখী বিচারবুদ্ধি দিয়ে নতুনভাবে পুনরায় বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে। ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, স্বচ্ছন্দবোধ ও কর্মক্ষমতা ফিরে পায়।

এরূপ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে (মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি) চিকিৎসার্থী ও মনঃসমীক্ষকের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন, চিকিৎসার্থীর যেরূপ আপন উদ্যম ও নিজের অস্বাভাবিকতা ও বিকৃতি সম্বন্ধে চেতনা থাকা প্রয়োজন, বদ্ধপাগল (*psychotics*) ও শিশুদের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া সম্ভব হয় না। ফলে, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি উদ্বায়ু রোগীদের ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য।

শিশুদের অপসঙ্গতি দূরীকরণে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি কতটা কার্যকরী, এ সম্বন্ধে ভাববার আছে। এটা একটা সমস্যা। মনঃসমীক্ষা শিশুদের মানসিক অসুস্থতা সারিয়ে তুলতে কতটা সাহায্য করতে পারে, এ বিষয়ে ভিন্ন মত আছে। শিশুরা মনঃসমীক্ষণে অগ্রণী হতে পারে না। তাদের পিতামাতাদের এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হয়। এছাড়া, শিশুদের জন্য মনঃসমীক্ষণের ভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। মেলানি ক্লেইন (*Melanie Klein*) শিশুদের জন্য ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা, মুক্ত অনুষঙ্গ (*Free Association*) পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক কার্যকরী বলে অভিহিত করেছেন। শিশু-মনঃসমীক্ষণে ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ। একটি শিশু যখন চিকিৎসার জন্য বিশেষ ধরনের কোন খেলনা নিয়ে খেলা করে, তার একটা বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য আছে। শিশুমনের নির্জ্ঞান-বাসনা ও দ্বন্দ্ব এ খেলনার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হতে পারে। এ্যানা ফ্রয়েড

অবশ্য খেলনা প্রতীকী তাৎপর্যে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে শিশুর ক্ষেত্রেও মনঃসমীক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মনঃসমীক্ষককে অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে শিশুর সাথে একটা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শিশু যেন চিকিৎসককে নিজের পিতার মত করে গ্রহণ করতে পারে—আবেগমধুর সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। শিশুদের মনঃসমীক্ষণে শিশুর স্বপ্ন-বিশ্লেষণে বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়া সমীচীন। এ সব সত্ত্বেও শিশুর মনঃসমীক্ষণ বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার উর্ধ্বে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের যেসব প্রতীকী (*Symbols*) তাৎপর্য ব্যবহার করা হয়, শিশুদের স্বপ্ন-বিশ্লেষণে অনেক সময় সেসব প্রতীকী বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা যায় না।

এইসব কারণে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক রোগে, অপসঙ্গতির তীক্ষ্ণতা ও গুরুত্ব অনুসারে, বয়স অনুসারে, মানসিক চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক চিকিৎসা নানাপ্রকার হতে পারে। নিম্নে মানসিক চিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy) ঃ

শিশুদের মানসিক চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ক্রীড়াভিত্তিক-চিকিৎসা একটি বিশেষ ধরনের শিশু-চিকিৎসা পদ্ধতি। ফ্রয়েড্ (*Freud*) ও ইয়ুং (*Jung*) প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকদের নির্জ্ঞান মন ও মানসিক অসুস্থতার কার্য-কারণ সম্বন্ধে সত্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই ম্যালানি ক্লেইন (*Melanie Klein*), এ্যানা ফ্রয়েড্ (*Auna Freud*), সুজান আইজাক্ (*Susan Isaac*), মারগারেল লোয়েন-ফেল্ড (*Margarel-Lowenfeld*) ও অন্যান্য মনশ্চিকিৎসকগণ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা প্রয়োগ করেন। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত ইচ্ছা দ্বন্দ্বজর্জর আবেগ-মুক্তির একটা পথ পায়।

মানসিক রোগগ্রস্ত শিশুর খেলার প্রকৃতি, সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশুর খেলার প্রকৃতি থেকে নানা দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়। খেলায় অংশগ্রহন, খেলার সময় আচার-আচরণ ও খেলার সময় প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন, সুস্থ ও অসুস্থ শিশুর মধ্যে ভিন্নতর হয়। খেলায় অংশগ্রহণের নমুনা, কি প্রকারের খেলায় অংশগ্রহণ করেছে, তাতে শিশুর আচরণ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শিশুর মানসিক বিকৃতির প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণতা অনুধাবন করা যায়।

খেলা দু'দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়। শিশু কি ধরনের খেলার সামগ্রী

পছন্দ করে, ভিন্ন ভিন্ন খেলার সরঞ্জাম থেকে কোন্ ধরনের খেলার সরঞ্জাম শিশু বেছে নেয় এবং সে কি ধরনের খেলা অধিক পছন্দ করে, তার প্রকৃতি কিরূপ, খেলায় অংশগ্রহণকালে শিশুর যে অভিব্যক্তি ও আচার-আচরণ, এর সবকিছু বিশ্লেষণ করে শিশুর ব্যক্তিত্বের বীক্ষণ হতে পারে। ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি যদি কিছু থাকে, তা হ'লে তা উদ্ঘাটিত হতে পারে। অতি-চিন্তন, অত্যধিক প্রকাশোন্মুখ অথচ অবরুদ্ধ ক্রোধ, হীনমন্যতা বা অতিমাত্রিক অপরাধবোধজনিত কোন ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি ও অপসঙ্গতি-মূলক আচরণ যদি প্রকটিত হয়, তাহলে ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে তা ধরা পড়ে। মোটের উপর, শিশুর মানসিক বিকাশ সুস্থ কি অসুস্থ ধারায় হচ্ছে, তা মনস্তত্ত্বভিত্তিক বিশেষভাবে পরিকল্পিত ক্রীড়ায় শিশুর অংশগ্রহণের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ধরা যায়।

এটা অবশ্য ঠিক যে, কতকগুলি খেলার সামগ্রী, যেমন জল, কাদা, বালু, রং ও তুলি বিষয়ে মানসিক দিক থেকে সুস্থ ও অসুস্থ শিশু নির্বিশেষে সমানভাবে আগ্রহী। কিন্তু বিশেষ বিশেষ খেলার উপকরণ বিষয়ে সুস্থ ও অসুস্থ শিশুর মধ্যে গ্রহণ-বর্জনে তারতম্য দেখা যায়। সুস্থ শিশুরা যে খেলার উপকরণ পছন্দ করে, অসুস্থরা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যাবে তা বর্জন করে। আবার অসুস্থরা যা গ্রহণ করে, সুস্থ শিশুরা তা বর্জন করে ; এরূপ গ্রহণ-বর্জন থেকে শিশুর মানসিকতার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। খেলার পটভূমিতে রেখে শিশুর মধ্যে মানসিক অপসঙ্গতি যে শুধু ধরা পড়ে তা নয়, কি প্রকারের অপসঙ্গতি তার মধ্যে দেখা দিয়েছে, কোন্ মানসিক অসুস্থতায় সে ভুগছে, তাও নির্ণীত হ'তে পারে।

অসুস্থ শিশুর খেলায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিবিম্বিত হয়, তা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ :—

(ক) বাধো-বাধো ভাব অর্থাৎ শিশু স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে যেন খেলায় অংশ নিতে পারে না।

(খ) খেলার জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলার প্রবণতা।

(গ) খেলতে গিয়ে অত্যন্ত এলোমেলো ও অস্থির ভাব প্রকাশ পাওয়া।

(ঘ) প্রত্যাবৃত্তি—খেলতে গিয়ে কেবল নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা।

(ঙ) খেলতে খেলতে একটি বিশেষ আচরণের পুনরাবৃত্তি করা।

(চ) অতিমাত্রায় খেলার ক্রীয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করা ; খেলতে গিয়ে খুব ছট্‌ফট্ করা, হৈ চৈ করা।

(ক) দুশ্চিন্তাপরায়ণ শিশুদের মধ্যেই খেলার বিষয়ে একটা বাধো-বাধো ভাব

বেশী করে দেখা যায়—স্বচ্ছন্দভাবে এরা খেলতে পারে না। এক পা এগুলে তিন পা পিছিয়ে আসতে চায়। খেলার সাজসরঞ্জামে ভরা ঘরে শিশুকে পৌঁছে দিলেও সে জড়সড় হয়ে খেলার জিনিসগুলো ছুঁতে চায় না। কোনক্রমে যদি তা ধরিয়ে দেওয়া হয়, তা হলেও তা দিয়ে খেলতে চায় না, খেলার জিনিসগুলোকে কোন কাজেই লাগাতে পারে না।

(খ) উদ্বায়ুগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এরা অত্যন্ত দ্বন্দ্বজর্জর থাকে, বিপরীতমুখী ইচ্ছার টানাপোড়েনে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে—খেলার জিনিসপত্র নিয়ে খেলার ধৈর্য আর তাদের থাকে না—তারা খেলার উপকরণকে ভাঙ্গতে আরম্ভ করে।

(গ) কোন কোন অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশু খেলতে গিয়ে এমন আচার-আচরণ করে যেন সে তার বয়সের তুলনায় অনেক ছোট—ছোট, স্বল্পবয়সী হয়ে থাকার একটা চেষ্টা সে সব সময় করতে থাকে। হয়ত এরকম দেখা যাবে যে, ছয়-সাত বৎসরের একটি শিশু খেলার জিনিসগুলি বাক্সে একবার ভরছে, আবার বের করছে, কিংবা বালি-মাটি নিয়ে কেবল তালগোল পাকাচ্ছে—এ রকম আচরণ সাধারণত তিন চার বছরের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়।

(ঘ) প্রত্যাবর্তমূলক খেলায় শিশুর অপসঙ্গতি প্রকাশ পায় নানাভাবে—খেলার উপকরণ নির্বাচন ও তাকে নিয়ে নাড়াচাড়ার মধ্য দিয়েই যে এর প্রকাশ পায় তা নয়, খেলার বিশেষ প্রকারও শিশুর অপসঙ্গতি সূচিত করে। এ ধরনের খেলায় শিশু কল্পনায় অন্যের ভূমিকা অবলম্বন করে ঐ রকম আচরণ করতে থাকে। কখনও সে মা'র ভূমিকায়, কখনও বা শিক্ষকের ভূমিকায়, কখনও বা ছোট্ট শিশুটির ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করে সেই রকম হাবভাব চলাফেরা করতে থাকে। দ্বন্দ্বজর্জর মুহূর্তে সে এমনি করে আবার তার অস্তিত্বকে ফিরিয়ে নিয়ে তার খেলার মধ্য দিয়ে তার দ্বন্দ্বটিকে পরিস্ফুট করে তোলে, দ্বন্দ্বের স্বরূপটি এতে প্রকটিত হয়ে পড়ে।

(ঙ) কখনও কখনও অসুস্থ শিশুদের খেলার অংশগ্রহণে একটা অত্যন্ত জড়তা দেখা যায়—তাদের ক্রীড়াচরণ অত্যন্ত স্থবিরের মত হতে দেখা যায় এবং বহুবিধ খেলার সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও একই খেলার সামগ্রী নিয়ে এরা একই ভাবে ক্রীড়া-কৌশলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এরা কোন খেলা আরম্ভ করে শেষ না করেই, আবার অন্য একটি খেলা আরম্ভ করতে চায়—সব সময়েই এদের মধ্যে একটা অস্থিরচিত্ততা দেখা যায়। কোন খেলার শেষ পর্যন্ত এরা যেতে পারে না—একটা চিন্তার দ্বারা তাড়িত হয়ে, মাঝপথে আবার অন্য একটি চিন্তা এসে তাড়া করতে থাকে।

এদের খেলতে গিয়ে উত্তেজনা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং একটা সময় আসে যখন তারা আর কোন রাশ টেনে রাখতে পারে না।

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশেষভাবে পরিকল্পিত এই সকল খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য যেমন একদিকে কিছু কিছু প্রতিভাত হয়, অন্যদিকে শিশু যে দ্বন্দ্বের জন্য অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করছে, সে দ্বন্দ্বের স্বরূপও উদ্ঘাটিত হয়।

শৈশবকালীন ব্যক্তিত্ব-বৈকল্য ও অপসঙ্গতিমূলক আচরণ, পরবর্তী বয়ঃপ্রাপ্তিকালের মানসিক রোগেরই পূর্বাবস্থা। শৈশবকালীন এ বৈকল্যের কারণ নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্বের জন্য প্রায়শই হয়ে থাকে। মনশ্চিকিৎসামূলক ক্রীড়ার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল এ সকল দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা, শিশুকে তার দ্বন্দ্বের ও তজ্জনিত বিকৃত আচরণের কারণ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে অবহিত করে তোলা। এদিক থেকে মনশ্চিকিৎসা-মূলক ক্রীড়ার সাথে মুক্ত অনুষঙ্গ-পদ্ধতিতে বা অন্যবিধ কথোপকথন-পদ্ধতিতে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা-পদ্ধতির মিল আছে।

শিশু-চিকিৎসায় ক্রীড়া-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় কেন? শিশু-চিকিৎসায় খেলার তাৎপর্যই বা কি?ঃ

শিশু স্বপ্নচারী—স্বপ্নিল কত আশা-আকাঙ্ক্ষার জালই না সে বুনে চলে। এ স্বপ্নকে সে আপন মনে বাস্তবে রূপ দিতে চায়—জীবন্ত রূপায়ণে সে অধীরভাবে কত প্রয়াসই না করে। শিশুর এটা একটা বৈশিষ্ট্য। আপন মনে শিশু নিজেকে নানা সাজে সাজায়, নানাভাবে ভাবায়; স্বকল্পিত ভূমিকায় এক-এক সময় এক-এক রূপে অবতরণ করে; এমনি করে শিশুর আবেগমুক্তি ঘটে, আবেগের স্বচ্ছন্দ-বিকাশ ঘটে। কখনও বা কথা বলে, কখনও বা খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার কল্পনার জগৎকে বাস্তবায়িত করে তুলতে চায়। শিশুর এই স্বাভাবিক ক্ষমতা, খেলায় অকৃত্রিম আগ্রহকে মনশ্চিকিৎসক তার চিকিৎসা-কাজে লাগান। তিনি জানেন যে, শিশু তার খেলায় খেলার সরঞ্জাম চয়ন ও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং স্বপ্নচারিতার মধ্য দিয়ে শিশুর যে মানসিকতার প্রকাশ ঘটে, তাকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে এবং এ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি যথার্থরূপে আয়ত্ত করতে পারলে, শিশুদের মানসিক চিকিৎসা অনেক সুগম ও ফলপ্রসূ হয়। বিভিন্ন প্রকার খেলার সরঞ্জামে এবং নাটককেন্দ্রিক খেলায় অনেক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান আছে। শিশুর খেলায় অংশগ্রহণ ও তার মধ্য

দিয়ে তার যে মানসিকতা প্রতিভাত হয়, তার যথাযথ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই ক্রীড়াভিত্তিক শিশু-মনশ্চিকিৎসার উদ্ভব হয়েছে। শিশুর খেলার বিশ্লেষণের সাথে সাথে, তার স্বপ্ন-বিশ্লেষণও করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় শিশু তার স্বপ্নের কথা গুছিয়ে বলতে পারে না, স্বপ্নের কথা তার সর্বদা মনেও থাকে না। কিন্তু স্বপ্নের বিষয়বস্তুকে সে তার কাঁচা হাতে এঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তুলির টানে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চায়, কিংবা অভিনয় করে স্বপ্নের রূপটা ব্যক্ত করতে চায়।

খেলার মাধ্যমে বিরেচন (Catharsis) ঃ

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবদমিত ক্রোধ, ঘৃণা ও আক্রমণাত্মক বাসনা মুক্তিলাভ করে, পুঞ্জিত আবেগ প্রশমনের মধ্য দিয়ে শিশু তার আবেগ-ভারসাম্য অনেকটা ফিরে পায়। এর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর খেলাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে তার মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয় করে, তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। প্রয়োজন হলে দ্বন্দ্বের মূল কারণ যদি অসুস্থ পরিবেশ হয়, তা হলে পরিবেশ-শোধন বা পরিবেশান্তরও করা হয়ে থাকে।

খেলার প্রকার ঃ

শিশুর বিকাশ-পর্যায় অনুযায়ী—খেলা চার প্রকারের হতে পারে ঃ (ক) অঙ্গ-সঞ্চালনমূলক খেলা, (খ) কথনমূলক খেলা, (গ) অনুকরণমূলক খেলা, (ঘ) স্বপ্ন-চারিতামূলক খেলা। বিভিন্ন খেলা বিভিন্ন প্রকারের বলে অভিহিত করা হলেও বস্তুত একের সাথে অপরের কোন-না-কোন ভাব সংশ্লিষ্ট। অঙ্গসঞ্চালনমূলক খেলার সাথে শিশুর কথন-ক্রিয়া চলতে থাকে। অনুকরণমূলক খেলার সাথে স্বপ্নচারিতা জড়িয়ে থাকে। অতি শৈশবকালে অঙ্গসঞ্চালন খেলাই বেশি প্রাধান্য পায়। স্বপ্নাচারী খেলা সবচেয়ে পরে শিশুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

সুস্থ শিশুর ভিন্ন পর্যায়ের খেলাগুলি ঠিকভাবে সমাধা হয়। সে সকল প্রকার খেলা খেলে, সুস্থ আবেগ-জীবনের অধিকারী হয়। কিন্তু যেসব শিশু স্বাভাবিক ভাবে খেলার কোন সুযোগ পায় না, তাদের আবেগ-জীবন, তথা ব্যক্তিত্ব অসুস্থ হয়ে

পড়ে। একটি পর্যায়ের খেলা যদি সুষ্ঠুভাবে শিশু সম্পাদন করতে না পারে, তা হলে পরবর্তী পর্যায়ের খেলা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। একটি স্বাভাবিক সংযোগ-সূত্র যেন শিশুর খেলায় দেখা যায় না। এই সংযোগ-সূত্র শিশুর কোন পর্যায়ের খেলায় অনুপস্থিত পরিলক্ষিত হলেই বুঝতে হবে শিশুর খেলায়, অব্যবহিত পূর্ববিকাশ-পর্বে কোন অসুবিধার উদ্রেক হয়েছিল। কোন পর্যায়ের শিশুর খেলায় শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিলেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণকে সূচিত করবে। উদ্বায়ুগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায় যে, তারা যে বয়সের যে খেলা তা না খেলে, যে কোন বয়সে যে কোন খেলা এলোমেলোভাবে খেলতে আরম্ভ করে—তাদের খেলার মধ্যে একটা স্বাভাবিক গতি থাকে না। সব সময়ই যেন একটা কিছু নেই মনে হতে থাকে। মনশ্চিকিৎসক অসুস্থ শিশুর খেলা তার বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারেন কোন্ পর্যায়ের বিকাশ-পর্বে শিশুর জটিলতা রয়েছে। এই পর্যায়ের খেলাগুলি স্বচ্ছন্দভাবে শিশুকে খেলতে দিয়ে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টাও মনশ্চিকিৎসক করে থাকেন।

ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসায় মনশ্চিকিৎসক প্রথমেই শিশুর সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে সচেষ্ট হন। প্রত্যক্ষ পরিচিতিতে শিশুর পরিবেশ, তার বংশগতি, দৈহিক ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। শিশুর কোন প্রকার দৈহিক অসুস্থতা আছে কি না এবং তার জন্য তার স্বাভাবিক খেলাধূলায় ছেদ পড়েছে কি না, পিতামাতা ও অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিদের ক্রমাগত বাধায় শিশুর স্বাভাবিক ক্রীড়া-চঞ্চলতা ব্যাহত হয়েছে কি না, সেসব বিষয়েও অনুসন্ধান করতে হয়।

এর পর শিশুকে বিভিন্ন খেলার উপকরণ দিয়ে দেখতে হবে সে কি ধরনের খেলা পছন্দ করে, তার বয়স অনুযায়ী সে খেলা গ্রহণ করে কি না, তার খেলা স্বচ্ছন্দ ও সুশৃঙ্খল কি না, তার খেলায় স্বাভাবিক বয়ঃক্রমিক যোগসূত্র আছে কি না, এসব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে শিশুর মানসিক অসুস্থতার কারণ ও স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে।

এর পর শিশুকে তার উপযোগী খেলায় উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করে একদিকে তার পুঞ্জীত অবদমিত আবেগ মুক্তির পথ করে দিতে হবে, অন্যদিকে খেলায় তার আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করে মানসিক দ্বন্দ্বের কারণটি ধীরে ধীরে শিশুর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। এমনি করে শিশু একদিকে সুস্থ আবেগ-জীবনে ফিরে যাবে, অন্যদিকে দ্বন্দ্বের কারণটি উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে

মনশ্চিকিৎসক পরিবেশ শোধন বা পরিবেশান্তর করে শিশুকে সুস্থ করে তুলতে পারেন। ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসায় যেমন মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে (*Diagnosis*), অন্যদিকে অবদমিত ক্রোধ-বাসনা ও পুঞ্জীভূত আবেগের মুক্তির পথ করা যেতে পারে (*Catharsis*)। শিশুদের সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রোগ-কারণ-নির্ণয় প্রায়শই অসম্ভব, সেইজন্যই দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয়ে খেলার মাধ্যম অবলম্বন করা হয়। প্রতিযোজন অক্ষম শিশুকে খেলার সুযোগ দিয়ে মনশ্চিকিৎসক তার খেলার প্রকৃতি ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে শিশুর গহন মনের দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন ও সেইভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

সহৃদয় উপদেশদান (Persuasion) :

বিপথগামী শিশুদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে, সহানুভূতি ভালবাসা দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে সহৃদয় উপদেশদান (*Persuasion*) বলে। মনশ্চিকিৎসার এটাও একটা উপায়। বিপথগামী শিশুর বিকৃত আচরণের সাথে যে কোন এ আচরণ নিছক আবেগজড়িত এটা শিশুকে বোঝাতে হবে। সামাজিক ও যুক্তিগত ভিত্তি নেই এই জিনিষটাই শিশুকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। পারিবারিক অশিক্ষা ও কুশিক্ষা থেকেই যে শিশুর মধ্যে বিকৃত আচরণের উদ্ভব হয়েছে, সেসব আচরণের কারণ যে শিশু নিজে নয়, সে যে ভুল পথে চলতে শিখেছে, এ বিষয়ে শিশুকে সহৃদয়তার সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। শিশুকে তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে পুরাতন বিকৃত অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন সদভ্যাস তৈরি করতে প্রবুদ্ধ করা হয়। বিপথগামী শিশুর বর্তমান আচরণ তার জীবনে, পরিণামে যে কত বিপদ ও অসাফল্য নিয়ে আসবে, সেটা শিশুকে মনশ্চিকিৎসক বুঝিয়ে বলবেন। এইভাবে চিকিৎসার প্রথম কথা হ'ল চিকিৎসকের সহানুভূতি ও ভালবাসা, চিকিৎসকের উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী।

এ উপায়ে সামান্য বিপথগামী শিশুদের চিকিৎসা করা হয়। যাদের মানসিক বিকৃতি অন্তত জটিল ও পুরাতন তাদের ক্ষেত্রে এ উপায়ে চিকিৎসা সম্ভব নয়। তবে চিকিৎসার প্রথম সোপান হিসাবে সহৃদয় উপদেশদান চলতে পারে।

অভিভাবন (Suggestion) :

মনশ্চিকিৎসায় অভিভাবন একটি বহুলপ্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি। এ পদ্ধতি-প্রক্রিয়া মানসিক চিকিৎসার সকল পদ্ধতিতেই অল্পবিস্তর বর্তমান। চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ-স্থাপন (*Rapport*), এ চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রধান

ভিত্তি। চিকিৎসার্থী এ সব ক্ষেত্রে (*Mild disorders*) স্বভাবতই রোগ নিরাময়ে উন্মুখ থাকে—চিকিৎসকের কাছে গেলে সে ভাল হয়ে যাবে এরকম একটা বিশ্বাস তার মধ্যে কাজ করে। চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীলতার একটি ভাব নিয়েই সে আসে। চিকিৎসক তার ব্যক্তিত্বের গুণপনায় চিকিৎসার্থীকে আপনার করে নেওয়ার চেষ্টা করে—চিকিৎসার্থীর নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসক তার মনের কাছে কিছু আবেদন রাখেন, কিছু ধারণা তার মনের কাছে তুলে ধরেন, তার রোগের কারণটি তাকে বুঝিয়ে বলা হয়। বিকৃত চিন্তা ও আচরণ রীতির পরিবর্তন ক'রে নতুন চিন্তা ও আচরণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চলে।

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে অভিভাবনের প্রয়োগ-কৌশল কিছু পরিমাণে বর্তমান। অভিভাবন পদ্ধতিতেও চিকিৎসার্থীকে শরীর মন এলিয়ে দিয়ে একটা নিদ্রাচ্ছন্ন ভাবে মনকে নিয়ে যেতে বলা হয়। কখনও কখনও কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে মনকে একত্র করতে বলা হয়।

মনশ্চিকিৎসামূলক অভিভাবনের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল : (ক) অসুস্থ ব্যক্তিকে নতুন স্বাস্থ্যকর চিন্তায় উদ্বোধিত করা এবং তার মধ্যে যে দুর্বল হীন ধারণা তা দূর করে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা ; নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে সুস্থবোধ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

(খ) যে ভয় ও দুশ্চিন্তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তা থেকে চিকিৎসার্থীকে মুক্তি-দানের চেষ্টা করা হয়।

মৃদু মানসিক অসুস্থতা, পারিবেশিক চাপে সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য-হীনতা, অধিক মদ্যপানজনিত ব্যক্তিত্বের অসুস্থতা, সাধারণ উদ্বায়ুরোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভিভাবন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সমবায় মনশ্চিকিৎসা পদ্ধতি (Group Therapy) :

অনেক রোগীকে একসঙ্গে দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে একজন রোগীকেই এককভাবে চিকিৎসা করতে হয়। কিন্তু মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এককভাবে যেমন চিকিৎসা করা যায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক মানসিক রোগীকে, অনেক বিপথগামী শিশুকে একসঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসা করা যায়। এটা আধুনিক মনশ্চিকিৎসার একটি নবতম চিকিৎসা পদ্ধতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই সমবায় মনশ্চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়।

সবক্ষেত্রে এই সমবায় মানসিক চিকিৎসা সম্ভব নয়—এর উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক মনশ্চিকিৎসক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। জ্যাকসন (*Jackson*) ও টডের (*Todd*) মতে, যে সকল মানসিক রোগ জটিল ও নির্জ্ঞান মনের গভীরে কোন্ কারণের জন্য হয়, সে সব রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির একক চিকিৎসা অপরিহার্য। যে সকল মানসিক রোগের কারণ মূলত অব্যবহিত অসুস্থ পরিবেশ, সেসব ক্ষেত্রেই সমবায় মনশ্চিকিৎসা পদ্ধতি ফলপ্রসূ হতে পারে।

যেসব শিশু মূলতঃ সামাজিক প্রতিযোজনে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন, তাদের ক্ষেত্রে একক মনশ্চিকিৎসা অপেক্ষা সমবায় মনশ্চিকিৎসা অধিক কার্যকরী হতে পারে।

সমবায় চিকিৎসাতে একসঙ্গে বহু জনের চিকিৎসা চলে। সমবায় মনশ্চিকিৎসার মূল ভিত্তি হ'ল এই যে, ব্যক্তিজীবন সর্বদাই গোষ্ঠীজীবন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ব্যক্তি যে গোষ্ঠীতে থাকে সে সেই গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছাপ সেই ব্যক্তির চিন্তায়, কর্মে ও সার্বিক ব্যক্তিত্বে পড়ে। তাছাড়া, ব্যক্তি যে গোষ্ঠীতে আছে, সে গোষ্ঠী থেকে যদি সে প্রত্যাখ্যাত বোধ করে, তা হলে সে যেমন মানসিক দিক থেকে আহত ও হতাশ হয়, ঠিক তার বিপরীতভাবে কোন ব্যক্তি যদি গোষ্ঠীর মধ্যে সাগ্রহে গৃহীত হয়, উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায় তা হলে মানসিক দিক থেকে সে নিজেকে প্রতুল মনে করে। তার আত্মবিশ্বাস, অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এ গোষ্ঠীজীবন বলতে আমরা পরিবার, বিদ্যালয়, বৃহত্তরভাবে সমাজজীবনের কথা বুঝি। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজবদ্ধ। সমাজের কাছে সে সাদরে গৃহীত, এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কত না প্রয়াস। পরিবারের ও সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলে পরিবারে ও সমাজে নিজের অস্তিত্বের যাথার্থ্য সপ্রমাণে সকলেই সচেষ্ট। মানুষের এই মৌল আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহাতীত হয়েই এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে সমবায় মনশ্চিকিৎসার উদ্ভাবন ঘটেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী হবে, ভাব বিনিময় পরস্পর পরস্পরের সুবিধা ও সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে অন্তরঙ্গ হবে, একে অপরের প্রতি সশ্রদ্ধ ও সহনশীল হবে এমনি একটা পরিবেশ সমবায় মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে রচনা করার আন্তরিক প্রয়াস করা হয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল, এ রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলে মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে পারে, হীনমন্যতা বোধ দীর্ণ হতে পারে, নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা আত্মসমীক্ষণ প্রসূত স্বচ্ছ আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সুস্থ গোষ্ঠীজীবন যাপনের ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পেতে পারে।

সমবায় মনশ্চিকিৎসার প্রকারঃ

গ্রুপ থেরাপী চিকিৎসার্থীর প্রকার ভেদে ও চিকিৎসার প্রকার ভেদে নানা প্রকারের হতে পারে। যৌথ ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত সুপরিকল্পিত সংহত হতে পারে (*Directive Group Therapy*)। আবার কর্ম-সোপানে স্থিতিস্থাপকতা থাকতে পারে, চিকিৎসা পদ্ধতিতে কেবল জিজ্ঞাসাবাদ, কথোপকথন ও পরস্পরে মোটামুটি স্বাধীনভাবে মেলামেশার প্রচলন থাকতে পারে (*Free interaction or Inerviewed group therapy*)। মানসিক চিকিৎসাগার, শিশু-চিকিৎসা কেন্দ্র (বিদ্যালয়ের সাথে সংলগ্ন) প্রভৃতি স্থানে সমবায়িক মনশ্চিকিৎসা চলতে পারে। চিকিৎসার্থীরা একেবারে নতুন ও পরস্পরের অপরিচিত হতে পারে, আবার কোন চিকিৎসার্থীকে তার পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে রেখে চিকিৎসাগারের একই ওয়ার্ডের মানসিক রোগীদের নিয়ে একসঙ্গে সমবায়িক মনশ্চিকিৎসা করা হতে পারে।

পারিবারিক পরিবেশে চিকিৎসা (*Family Therapy*) পরিবারের সকলকে নিয়ে পরিবারস্থিত কোন অসুস্থ ব্যক্তির যে মানসিক চিকিৎসা তা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও পারিবারিক সহজ পরিবেশে হয়ে থাকে। পারিবারিক সম্পর্কের অসুস্থতা জনিত যে মানসিক বৈকল্য দেখা যায়, তার নিরাময় পারিবারিক যৌথ চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে হতে পারে। অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রথমদিকে তার পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে মুখোমুখি করলে, হয়ত দেখা যাবে তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে, যার সম্বন্ধে তার অনীহা তাকে সে বরদাস্ত করতে পারছে না, কিংবা এমনও দেখা যেতে পারে যে সে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে কোন কথাই বলছে না। মোটের উপর পারিবারিক যৌথ চিকিৎসায় পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে জটের উদ্ভব হয়েছে, তাকে নতুন ভাবে গড়তে ও বুঝতে সাহায্য করে। পারিবারিক যৌথ চিকিৎসায় পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান কিভাবে হওয়া সমীচীন, সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক রচনায় পরিবারের কোথায় কোথায় প্রতিবন্ধ রয়েছে তাকে উদঘাটিত করতে সাহায্য করে। এই প্রতিবন্ধ দূর করার বাস্তব শিক্ষাদানও পারিবারিক যৌথ চিকিৎসার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু এ উদ্দেশ্য রূপায়ণ খুব সহজসাধ্য নয়। অনেক পরিবার আছে যেথানে পরস্পর কথোপকথন পর্যন্ত বন্ধ। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পরিবারে একের সাথে অপরের মানসিক কোন যোগাযোগ নেই। এক পরিবারের একজন অপরজন থেকে যেন বিচ্ছিন্ন—বিচ্ছিন্নতা যেন পরিবারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে (*Alienation*)। আবার এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে পরিবারের সকলের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়

বটে, কিন্তু নিয়ত এরা যে-কোন খুঁটিনাটি নিয়ে মারামারি করে। একে অপরকে সর্বদা সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে—দোষ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এমনি সব পরিবারে যৌথ চিকিৎসা খুব সহজ নয়। চিকিৎসক প্রথমত পরিবারের ব্যক্তিদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একত্রিত করার চেষ্টা করেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদের অসারতা বুঝিয়ে বলেন, ঝগড়ার মূল কারণ কোথায় কেন্দ্রীভূত, তা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

চিকিৎসকের প্রধান ভূমিকা হ'ল, পিতার ভূমিকা। পারিবারিক পর্যায়ে মনশ্চিকিৎসায় চিকিৎসক পিতার ভূমিকা নিয়ে থাকেন। চিকিৎসকের সক্রিয়তা ও প্রাণবন্ত উৎসাহ পরিবারের সকলকে একত্রিত করবে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণটি কোথায় কোন্ ঘটনায় বা কোন্ অবস্থায় নিহিত রয়েছে সেটা চিকিৎসক খুঁজে বের করবেন এবং এ দ্বন্দ্বের সমাধান কিভাবে করা যায় তার কার্যকরী পথ নির্দেশ করবেন। পরিবারের সকলকে নিয়ে বসে তিনি তাদের চোখের সামনে এমন একটি আদর্শ পারিবারিক সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরবেন, তাদের সাথে আলোচনা করে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করবেন, কেন তারা সেই আদর্শ পারিবারিক সম্পর্কে উত্তীর্ণ হতে পারছে না। চিকিৎসক ঘন ঘন পরিবারের সকলকে নিয়ে বসবেন ও পরিবারকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যা নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার অবতারণা করবেন। পারস্পরিক আলোচনার পথে যেসব আপাত বাধা তা দূর করার দায়িত্ব যৌথ চিকিৎসায় চিকিৎসকের হাতেই প্রধানত ন্যস্ত থাকে। পরিবারে যে অসুস্থ বলে চিহ্নিত, শুধু তাকে নয়, পরিবারের সকলকেই সমানভাবে যৌথ মনশ্চিকিৎসায় অংশ নিতে হয়। শিশুর সমস্যামূলক আচরণের চিকিৎসায়, কেবল শিশুর প্রতি দৃষ্টি দিলেই চলবে না, শিশুর পিতামাতা, ভাই বোন সকলকে নিয়ে যৌথভাবে চিকিৎসার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পিতামাতার দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্য শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করতে পারে; কাজেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও তার সমস্যামূলক আচরণ বিদূরণে পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করায় অধিক মনোযোগ দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ও দ্বন্দ্ব, তাদের পারস্পরিক জটিল সম্পর্ক সন্তানের মনের উপরও গভীরভাবে রেখাপাত করে ও তার ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিঘ্নিত করে। কাজেই একের সম্পর্ক অপরকে প্রভাবিত করে। সম্পর্ক একক কিছু নয়। সম্পর্ক বহুজনের আবেগ-সান্নিধ্যজনিত একটি অবিমিশ্র ফলশ্রুতি। এই অবিমিশ্র সম্পর্কটি উন্নত করার জন্য চিকিৎসক পরিবারের সকলকে সমানভাবে উদ্দীপ্ত করতে প্রয়াস চালিয়ে যান।

যৌথ মানসিক চিকিৎসা পরিবার ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে দশজনের বেশী চিকিৎসার্থী একটি গোষ্ঠীতে থাকা সমীচীন নয়। তবে অধিক মদ্যপানের জন্য যে মানসিক অস্বাস্থ্য তার যৌথ চিকিৎসায়, দলে পঁচিশ ত্রিশজন ব্যক্তিও থাকতে পারে।

মানসিক রোগ যত জটিল, ব্যক্তির আচরণ যত বিকৃত, তত সুপরিকল্পিত যৌথ চিকিৎসা প্রয়োজন (*Directive group therapy*)।

সামান্য মানসিক বৈকল্যে কথোপকথনকে যৌথ চিকিৎসার অবলম্বন করা যেতে পারে (*Free Interaction or Interview group therapy*)। এক্ষেত্রে চিকিৎসার্থীকে অনেক বেশী সক্রিয় হতে হয়; দলভুক্ত অন্যান্যদের সাথে মেলামেশা, সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা ও পারস্পরিক মানসিক সমস্যা বুঝতে অনেক বেশী তৎপর হতে হয়।

চিকিৎসার্থীনির্ভর মুক্ত যৌথ মনশ্চিকিৎসা (Free Interaction Method) ঃ

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের ফলশ্রুতি হ'ল এই স্থিতিস্থাপক যৌথ মনশ্চিকিৎসা। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি অনেক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

এই পদ্ধতিতে কয়েকজন চিকিৎসার্থীকে নিয়ে একটি ছোট দল গঠন করা হয়। এরা চিন্তায়, কথাবার্তায়, ভাব প্রকাশে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এরা বাধাবন্ধনহীনভাবে একে অপরকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অভিরুচি, স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে। এর মধ্য দিয়ে তাদের পুঞ্জীত আবেগ (*Ego*) মুক্তি ঘটে, দ্বন্দ্বজর্জরতা অনেক পরিমাণে কমে যায়। দ্বন্দ্বের ফলে অহং সত্তার (*Ego-strength*) দুর্বলতা দেখা যায়। দ্বন্দ্বজর্জরতা কমে যাওয়ায়, ব্যক্তি তার অহং সত্তার শক্তি অনেক পরিমাণে ফিরে পায়। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে, অবরুদ্ধ আবেগ বাষ্প বিকিরিত (*Catharsis*) হওয়ায় বাস্তববোধ ও দৃষ্টি অনেকটা ফিরে আসে।

গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের জন্য যে সভার উদ্যোগ আয়োজন করা হয় তা চিকিৎসার্থীরাই করে থাকে। সভার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও তাদের উপর বর্তিত থাকে। মনশ্চিকিৎসক সে সভায় পরোক্ষভাবে এই ভাব বিনিময়ে সহায়তা করেন।

মনশ্চিকিৎসামুলক গোষ্ঠী (Therapeutic Community) ঃ

মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠী বলতে বোঝায় কোন মানসিক চিকিৎসালয় বা শিশু-

নির্দেশনা কেন্দ্র বা কোন মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সংস্থা যেখানে মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের ও সংস্থার চিকিৎসক ও কর্মীদের মধ্যে একটি সক্রিয় ও সহৃদয়পূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমবায় চিকিৎসায় কেবল রোগীদের পরস্পরের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠভাবে ভাবের আদান-প্রদান হলেই চলবে না, একে আরও কার্যকরী করার জন্য রোগী ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথেও একটা সহৃদয় সংযোগ ঘটাবার চেষ্টা করতে হবে।

এরজন্য একদিকে রোগীদের ছোট ছোট দলের মধ্যে তাদের সমস্যা নিয়ে ভাবের আদান-প্রদান চলবে, অন্যদিকে রোগীদের ছোট ছোট দল (পঞ্চাশ ষাটজন নিয়ে) ও হাসপাতাল বা সংস্থার কর্মকর্তাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় নানা বিষয়ে মাঝে মাঝে সভা হতে পারে। এই সকল সভায় রোগীদের দৈনন্দিন সমস্যা ও হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। এই সভায় রোগীরা কেমন করে কথা বলে, কোন্ কোন্ সমস্যার অবতারণা করে ও কিরূপ আচার-আচরণ করে, সেসব লক্ষ্য করার চিকিৎসকদের পক্ষে একটি সুযোগ ঘটে। ঐরূপ অবস্থার অবতারণা না করলে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রোগীদের বোঝা যায় না—তাদের উন্নতি-অবনতি সম্যকভাবে ধরা যায় না। এই ব্যবস্থায় রোগীদের রোগ নির্ণয়ও যেমন অনেকটা স্পষ্ট হয়, তেমনি অন্যদিকে নতুন সামাজিক শিক্ষায় রোগীরা পারস্পরিক সহযোগিতাও শিখতে পারে। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে রোগীদের উৎসাহিত করা হয়। বাইরের সাধারণ সমাজ কাঠামোতে রোগীরা যেসব কথা বলতে পারে না, সামাজিক বাধার জন্য তারা যেসব ভাব ব্যক্ত করতে পারে না, মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠীতে তারা সেসব ভাব ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে—সেসব ভাব খোলাখুলিভাবে বলার জন্য তাদের উদ্দীপ্ত করা হয়। এর মধ্য দিয়ে তাদের অবরুদ্ধ প্রক্ষোভের বিরেচন ঘটে। রোগীদের মানসিক যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়—বহুজনের মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ, মানসিক জটিলতা ও সমস্যা প্রায় একই প্রকারের হয়ে থাকে—এটা রোগীরা পরস্পর আলোচনা করে যখন আবিষ্কার করে, তখন তাদের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয় ও নিজের সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টির উন্মোচন হয়—তারা নিজেদের মানসিক বৈকল্যের কারণকে নিজেরাই অনেকটা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করে। তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক পরিমাণে ফিরে আসে ও পারস্পরিক সমাজ-আচরণও অনেকটা বাস্তবসিদ্ধ হয়।

রোগীদের নিয়ে হাসপাতাল-চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে সভা হয়ে যাওয়ার পরই, আলাদাভাবে হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা, মনোবিদ্ ও সমাজ-কর্মীদের (*Social worker*) নিয়ে একটি সভা হয়। রোগীদের আলাপ-আলোচনা ও তাদের আচার-আচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, এই সভায় আলোচনা হয়।

এতে চিকিৎসক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজকর্মী প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব বিচারে গোষ্ঠী-সভায় প্রত্যেকটি রোগী যেভাবে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে তার কথা ব্যক্ত করেন। এর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি রোগীর সমস্যা ও তার প্রতি চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্মীদের আচরণ ধারা কিরূপ হবে এ-সম্বন্ধে নীতি নির্ধারিত হয়। এই রকম সভাকে রোগী বিষয়ক আলোচনা-চক্র (*Case-conference*) বলে।

কর্মকেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা (Occupational Therapy) ঃ

মানসিক রোগীর প্রথম প্রয়োজন মানসিক পুনর্বাসন—মানসিক রোগ সংলক্ষণ, যেমন দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, দ্বন্দ্বজর্জরতা প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস। এর জন্য একক এবং যৌথ, একক অথবা যৌথ-মনশ্চিকিৎসা করতে হবে। একজন মনশ্চিকিৎসক, সমাজকর্মী, মনোবিদ্ ও অন্যান্য সহকর্মীদের সহায়তায় রোগীর চিকিৎসার কাজ আরম্ভ করবেন। এতে কোন কোন জটিল রোগীর ক্ষেত্রে অনেক সময় নিতে পারে। এসব রোগী ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠবে, কিন্তু ভালর দিকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রোগী যাতে সমাজ জীবন-যাপন সব দিক থেকে উপযুক্ত হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। তার কর্মসংস্থানের সকল প্রকার চেষ্টা করতে হয়। এর জন্য তার কোন্ জীবিকায় অধিক আকর্ষণ ও আগ্রহ, কোন্ দিকে তার কতটুকু শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে তার যাচাই করে তাকে ধীরে ধরে কর্মসম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করাতে হয়। এর জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয়. যাঁর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে রোগীকে তার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী কর্মে নিয়ন্ত্রিত করা। একদিকে তার রোগ নিরাময়ে সাহায্য করা, অপরদিকে সমাজ-জীবনে কর্ম সংস্থানে সহায়তা করে স্ব-নির্ভর করে তোলাই হল কর্মকেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসার উদ্দেশ্য।

তাছাড়া, কর্মকেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসায় সাময়িকভাবে হলেও রোগীর কতকগুলি উপকার হয়, যেমন রোগীর মধ্যে যে ক্লান্তি বাসা বাঁধে, সৃজনধর্মী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার অনেক উপশম ঘটে, কর্মে অনীহা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়, কর্মে নতুন উৎসাহের সঞ্চার ঘটে, কর্মপ্রয়াস ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে নতুন করে আত্মবিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। নতুন নতুন কল্যাণকর পথে কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে রোগীর মধ্যে নব জীবনের দিগন্ত তুলে ধরা হয়। ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস্ ও সিজোফ্রেনিয়াতে কর্মকেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা কিছুটা সুফল নিয়ে আসতে পারে।

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে যখন রোগ নিরাময় অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে ওঠে, তখন কর্ম-কেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা রোগ-যন্ত্রণা ও সংলক্ষণের কিছুটা উপশম ঘটাতে পারে।

কর্মকেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসায় এমন সব কাজের অবতারণা হয় যাতে খুব বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনার অবকাশ থাকে না। অনেকক্ষণ ধরে একটা কাজ করতে হয় না ও গভীর মনোসংযোগেরও প্রয়োজন হয় না, অথচ সে কাজের মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে ও সৃজনশীলতার অবকাশ আছে। এইসব কাজের মধ্যে আছে বাঁশের বাক্স তৈরি করা, সূচীকর্ম, তাঁতের কাজ, জাল বোনা, চামড়ার কাজ, ছোট ছোট খেলনা তৈরি, কাঠের কাজ, বই বাঁধানো, বাগান পরিচর্যা করা, চিত্র-কলা ইত্যাদি। রোগীর মানসিকতা বুঝে, তার মানসিক রোগের জটিলতা বুঝে কর্ম নির্বাচন করতে হবে।

সাইকোড্রামা (Psychodrama) ঃ

যৌথ মনশ্চিকিৎসায় বর্তমানে সাইকোড্রামা চিকিৎসা পদ্ধতি একটি নতুন মূল্যবান সংযোজন।

এই পদ্ধতিতে রোগী স্বরচিত নাটকের মধ্য দিয়ে আপন সমস্যাজাল উদ্ঘাটিত করে নায়ক-চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার নিজের সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা, আহত বাসনা ও মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। এতে তার অবরুদ্ধ-আবেগমুক্তি ঘটে, অবদমিত বাসনাকে কল্পনায় চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। এমনি নাটকে রোগীদের একাংশ অভিনয় করে। একাংশ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মনশ্চিকিৎসক এতে কখনো দর্শক, কখনো অভিনেতা, কখনো পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনশ্চিকিৎসক নাটক পরিচালনার ভার নিয়ে থাকেন।

নাট্যানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মনশ্চিকিৎসক দর্শক ও অভিনেতাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং এতে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং এই সকল চরিত্রের দ্বন্দ্ব, গূঢ়ৈষা কোথায় কিভাবে কাজ করছে, এবং কিভাবে এই সকল গূঢ়ৈষা (*Complex*) নাটক চরিত্রের ব্যক্তির আচার-আচরণকে প্রভাবিত করছে, এ সকল বিষয়ে মনশ্চিকিৎসক দর্শক ও অভিনেতাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সাইকোড্রামায় দুটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—(১) রোগীর সম্মুখে অপর একজন ব্যক্তি রোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—এতে রোগী তার নিজের আচার-আচরণগুলির বিকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে তার চিন্তা ও আচরণ যে কতটা বাস্তব বর্জিত সেটা সে অনেকটা বুঝতে পারে।

(২) কখনও রোগী নিজে তার পরিবারের কারো ভূমিকায় অভিনয় করে এবং অপর কোন ব্যক্তি রোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এতে পারিবারিক সম্পর্কের কোথায়

জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই জটিলতা মানসিক বৈকল্য কিভাবে নিয়ে এসেছে তা প্রতিবিম্বিত করে। মানসিক বৈকল্যের এই সব কার্য-কারণ সম্বন্ধ রোগী যখন তার চোখের সামনে দেখে ও তাকে যখন মনশ্চিকিৎসক এ সকল বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তখন রোগী যেন নতুন করে তাকে দেখতে শেখে, তার মধ্যে যেন অন্তর্দৃষ্টির অভ্যুদয় ঘটে।

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি—মানসিক রোগের চিকিৎসায়, বিশেষ করে উদ্বায়ু রোগীদের চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি (*Psycho-analysis*) বিশেষভাবে কার্যকরী বলে প্রতীত হয়েছে। (এ সম্বন্ধে 'মনঃসমীক্ষণ' অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে)।

শক্ থেরাপা (Shock Therapy) ঃ

কতকগুলি মানসিক রোগ আছে যেগুলির মনশ্চিকিৎসায় (*Psycho-therapy*) চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ও সহৃদয় সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার তা কোন ভাবেই স্থাপন করা যায় না, বিশেষ করে যেসব রোগী অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত, উদ্দাম ও মারমুখী। উন্মাদ রোগীদের (*Psychosis*) প্রায়শই মনশ্চিকিৎসার আওতায় আনা যায় না। এসব ক্ষেত্রে রোগীদের উৎক্ষিপ্ততা ও মারমুখীভাব প্রশমিত করে মনশ্চিকিৎসার উপযোগী করে তোলার জন্য কখনও ঔষধপত্র, কখনও বা শক্ (*Shock therapy*) দেওয়া হয়ে থাকে। শক্ দু প্রকারের হতে পারে—একটি বৈদ্যুতিক (*Electric shock*), অপরটি ইন্সুলিন (*Insulin shock*)।

El ctric shock দিয়ে মানসিক রোগ চিকিৎসা কিছুদিন হ'ল প্রচলিত হয়েছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এর প্রচলন হয়। এতে ইলেকট্রোড দুটি রোগীকে শুইয়ে মাথায় লাগিয়ে দেওয়া হয়, এবং মস্তিষ্কের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সন্নিবেশিত করা হয়। রোগীর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁপুনির ভাব দেখা দেয়। ক'বার শক্ দেওয়া হবে সেটা রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে।

Insulin shock সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে বেশী দেওয়া হয়ে থাকে। ইন্সুলিন শকে ইন্সুলিন অন্তঃমাংসপেশীতে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়। এরূপ ইনসুলিন অনুপ্রবেশ প্রায় দু সপ্তাহ চলতে থাকে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে দু'তিন মাস পর্যন্ত ইনসুলিন অনুপ্রবেশ এরূপভাবে চলতে পারে। শরীরে ইনসুলিন প্রবিষ্ট হওয়ার পরই রোগী দুর্বল ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

শক্ থেরাপী ও ইন্সুলিন থেরাপী যদিও এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে, তথাপি এর স্থায়ী ফল সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

মানসিক রোগ ও মানসিক চিকিৎসা→

দৈহিক রোগে ঔষধ পথ্যাদি দিয়ে, কখনো শলাকা চিকিৎসা হয়—এরূপ চিকিৎসা পদ্ধতিকে (Medico-therapy) বলে। Therapy কথাটির অর্থ চিকিৎসা। মানসিক রোগ ও অপসঙ্গতির চিকিৎসায় যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে বলা হয় মানসিক চিকিৎসা (Psycho-therapy)।

মানসিক চিকিৎসা→

মানসিক চিকিৎসা বস্তুত একজন সুশিক্ষিত ও মানসিক রোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা।

থেরাপি→

থেরাপি একটি প্রক্রিয়া বিশেষ—রোগের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা ও রোগীর আত্মবিশ্বাস, কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হলেই মানসিক চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে বুঝতে হবে।

মানসিক চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য→

মানসিক চিকিৎসা সম্পর্কভিত্তিক চিকিৎসা। পিতামাতা ও অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিগণই শিশুর মনশ্চিকিৎসায় অগ্রণী হন। আপাত অনর্থবোধক কথনের মূলে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা, দ্বন্দ্ব, গূঢ়ৈষা কাজ করে। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি (Psycho-analysis) উদ্বায়ু রোগীদের ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য।

শিশুদের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ→

শিশুদের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি তেমন কার্যকরী নয়। শিশুদের জন্য মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি অপেক্ষা ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ। শিশুমনের নির্জ্ঞান বাসনা ও দ্বন্দ্ব খেলনার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়—শিশুদের স্বপ্নে প্রতীকীর (Symbols) তাৎপর্য একপ্রকার থাকে না।

ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy)→

ম্যালানি ক্লেইন, এ্যানা ফ্রয়েড, শিশুর ক্ষেত্রে ক্রীড়াভিত্তিক চিকিৎসা প্রয়োগ করেন। খেলা দুভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়—শিশু কী

ধরনের খেলার সামগ্রী পছন্দ করে, কী ধরনের খেলা অধিক পছন্দ করে। খেলার উপকরণ বিষয়ে সুস্থ ও অসুস্থ শিশুর মধ্যে গ্রহণ বর্জনে তারতম্য দেখা যায়। অসুস্থ শিশুর খেলার বৈশিষ্ট্য : (১) বাধো বাধো ভাব, (২) খেলার জিনিস ভাঙ্গার প্রবণতা, (৩) খেলায় এলোমেলো ভাব, (৪) খেলতে গিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, (৫) একটা বিশেষ আচরণের পুনরাবৃত্তি করা, (৬) খেলার ক্রিয়াকর্মে অংশ-গ্রহণ করা। শিশু স্বকল্পিত ভূমিকায় এক এক সময় এক এক রূপে অবতরণ করে। খেলায় অকৃত্রিম আগ্রহ—শিশুর খেলার বিশ্লেষণের সাথে তার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা হয়।

খেলার মাধ্যমে বিরেচন (Catharsis)→

শিশুর অবদমিত ক্রোধ, ঘৃণা ও আক্রমণাত্মক বাসনা মুক্তি পায়। খেলার প্রকার—শিশুর বিকাশ-পর্যায় অনুযায়ী খেলা চার প্রকার : (ক) অঙ্গসঞ্চালনমূলক খেলা, (খ) কথনমূলক খেলা, (গ) অনুকরণমূলক খেলা, (ঘ) স্বপ্নচারিতা-মূলক খেলা। শৈশবকালে অঙ্গসঞ্চালনমূলক খেলা বেশী প্রাধান্য পায়, স্বপ্নাচারী খেলা, সব চেয়ে পরে শিশুর মধ্যে দেখা যায়। সুস্থ শিশুর ভিন্ন পর্যায়ের খেলাগুলো ঠিকভাবে সমাধা হয়। অসুস্থ শিশুর বিশৃঙ্খলা খেলা। উদ্বায়ুগ্রস্ত শিশুরা যে বয়সের যে খেলা তা না খেলে যে কোন বিষয়ে যে কোন খেলা এলোমেলো খেলতে আরম্ভ করে।

সহৃদয় উপদেশ দান→

বিপথগামী শিশুদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে সহানুভূতি ভালবাসা দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে সহৃদয় উপদেশ দান বলে। সামান্য বিপথগামীদের ক্ষেত্রে এ উপায়ে চিকিৎসা করা হয়।

অভিভাবন (Suggestion)→

চিকিৎসক ও চিকিৎসার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি। চিকিৎসক, বন্ধুর মত, চিকিৎসার্থীর মনের

কাছে কিছু আবেদন রাখেন, কিছু ধারণা তার মনের কাছে তুলে ধরেন, তার রোগের কারণটি তাকে বুঝিয়ে বলেন। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতেও অভিভাবকদের প্রয়োগ কৌশল কিছু পরিমাণে বর্তমান।

সমবায় মনশ্চিকিৎসা পদ্ধতি (Group Therapy)→

অনেক রোগীকে একসঙ্গে দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে একজন রোগীকেই এককভাবে চিকিৎসা করতে হয়। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে যৌথভাবে চিকিৎসা করা যায়, অনেক বিপথ-গামী শিশুকে একসঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসা করা যায়। সমবায় মনশ্চিকিৎসার মূল ভিত্তি হল, যে ব্যক্তিজীবন সর্বদা গোষ্ঠীজীবন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। Group therapy অনেক প্রকারের হতে পারে—(১) Directive group therapy—সুপরিকল্পিত চিকিৎসা যাতে চিকিৎসকের ভূমিকাই প্রধান। (২) Free-interaction—জিজ্ঞাসাবাদ, কথোপকথন ও পরস্পরে মোটামুটি স্বাধীনভাবে মেলামেশা। (৩) Family therapy—পারিবারিক পরিবেশে চিকিৎসা।

মনশ্চিকিৎসামূলক গোষ্ঠী (Therapeutic Community)→

রোগীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয়। রোগী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সভা, ভাবের আদান-প্রদান প্রভৃতির ব্যবস্থা। মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সংস্থায় মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের ও সংস্থার চিকিৎসক ও কর্মীদের মধ্যে একটি সক্রিয় ও সহৃদয়পূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা।

কর্মকেন্দ্রিক মনশ্চিকিৎসা (Occupational Therapy)→

কর্ম সংস্থানের চেষ্টা করা হয়। জীবিকার আগ্রহ, কোন্‌দিকে রোগীর কতটুকু শক্তির সামর্থ্য রয়েছে তার যাচাই করে তাঁকে ধীরে ধীরে কর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করা। সৃজনধর্মী কর্ম প্রচেষ্টায় রোগীর মধ্যে নতুন উৎসাহ ও বিশ্বাস ফিরে আসে। এমন কাজ দিতে হবে যাতে খুব চিন্তা ও কল্পনা ও বুদ্ধির প্রয়োজন না হয়, অথচ সে

কাজে নতুনত্ব আছে। সূচীকর্ম, ছোট ছোট খেলনা তৈরি, বাঁশের কাজ, বাগান পরিচর্যা করা। এইরকম নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা।

সাইকোড্রামা (Psychodrama)→ এ পদ্ধতিতে রোগী স্বরচিত নাটকের মধ্য দিয়ে আপন সমস্যা-জাল উদ্ঘাটিত করে। নায়ক-চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার নিজের সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা, আহত বাসনা ও মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে।

শক্ থেরাপী→ উন্মাদদের ক্ষেত্রে Electric shock দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। Insulin shock-এ injection দেওয়া হয়।

॥ অনুশীলনী ॥

1. Discuss the method of psycho-analysis as a method of psycho-therapy. How far psycho-analysis is applicable to maladjusted children ?
2. What is psycho-therapy ? How does it differ from Medico-therapy ? Discuss the main forms of psycho-therapy.
3. Indicate the nature of play. Examine whether play can be utilized as a therapy for releasing the tensions of maladjusted children.
4. What are the chief characteristics of group-therapy ? Where and how can you apply this therapeutic procedure ? How many forms of group therapy are in use ?
5. Write notes on :
   (1) Occupational therapy
   (2) Psycho-drama
   (3) Suggestion
   (4) Persuation
   (5) Free-Association Method
   (6) Dream-analysis
   (7) Therapeutic community
   (8) Family therapy.

বিংশ অধ্যায়

প্রতিরোধক সংস্থা ও উপায়—গৃহপরিবেশ ও পিতামাতা ঃ বিদ্যালয় পরিবেশ ও শিক্ষক

রোগ হয়ে গেলে তার চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলার চেয়ে রোগ যাতে আদৌ না হয় তার সর্ববিধ ব্যবস্থা করাই শ্রেয়। অপসঙ্গতি শিশুর মধ্যে দেখা দিলে তার চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়েছে ; কিন্তু এই অপসঙ্গতি যাতে না দেখা দেয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে অক্ষুণ্ণ ও সুস্থধারায় হয় সে সম্পর্কে সর্ববিধ প্রযত্ন নেওয়া সব দিক থেকেই কাম্য।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে একদিকে বংশগতিতে প্রাপ্ত তার দেহ-মানস বৈশিষ্ট্য যেমন কাজ করে, অন্যদিকে পারিবেশিক প্রভাব-শক্তিও কাজ করে। দুটি শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কতকগুলি মৌলিক পারিবেশিক অবস্থার প্রয়োজন। একটি অঙ্কুরের বিকাশ-বৃদ্ধির জন্য যেমন উপযুক্ত জল, বায়ু, আলো প্রয়োজন, বৃক্ষ-বিকাশ-ক্ষয়ী পোকামাকড়ের প্রকোপ অবরোধ প্রয়োজন, ঠিক তেমন একটি মানব-শিশুর যথাযথ বিকাশ-বৃদ্ধির জন্য তার কতকগুলি মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ প্রয়োজন—প্রয়োজন শিশুর উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আলো হাওয়া যুক্ত প্রশস্ত নিরাপদ আশ্রয়, পিতামাতার স্নেহ-প্রযত্ন, উৎসাহ-সহানুভূতি, শিশুর উজ্জ্বল প্রাণ-শক্তির নিয়ন্ত্রণক্ষম আনন্দদায়ী খেলাধুলার ব্যবস্থা, গৃহে পিতামাতা, ভাই-বোন সকলের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক, স্বতঃপ্রণোদিত নিয়ম-নিষ্ঠা। এ ছাড়া চাই শিশুর বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী তাকে তার সর্বপেক্ষা উপযোগী পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন ও সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন। মোটের ওপর প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি গৃহে ও বিদ্যালয়ে সম্যক লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তাও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করাই অপসঙ্গতি প্রতিরোধের প্রকৃষ্টতম উপায়।

এই পরিবেশ রচনার দায়িত্ব মূলত গৃহে পিতামাতার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের। পিতামাতার ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন তার গৃহ পরিবেশের উপর পড়ে। সুস্থ পিতামাতাই, অর্থাৎ যে সকল পিতামাতা দেহে ও মনে সুস্থ, যাঁদের কর্মক্ষমতা অটুট, যাঁরা সকলের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে সক্ষম, দায়িত্ববান, রুচিসম্পন্ন, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে

কল্যাণকর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সুস্থ মূল্যবোধসম্পন্ন, সন্তান প্রতিপালনে শিল্পনিষ্ঠ, কেবল তাঁরাই যথার্থ সুস্থ গৃহ পরিবেশ রচনা করতে পারেন। অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতামাতা কোন না কোন ভাবে গৃহ পরিবেশের সুস্থতাকে বিঘ্নিত করে। এই অসুস্থ পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে, অসুস্থ জীবন-বিন্যাসে বিপর্যস্ত হয়ে শিশুরা অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এছাড়া শিশুর শিক্ষারম্ভ ও সমাজীকরণ তার পিতামাতার কাছ থেকেই হয়ে থাকে। পিতামাতা যদি অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয় তাহলে তাঁদের হাতে সন্তান যে শিক্ষা পায় তা কু-শিক্ষারই নামান্তর, সমাজীকরণও (*Socialization*) ঠিকভাবে এদের হাতে হতে পারে না। নানাপ্রকারের বদভ্যাস, অসুস্থ-চিন্তা ও মানসিক জট্ এদের মধ্যে দেখা যায়। সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য গৃহে সার্বিকভাবে সুস্থ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। পিতা মাতার সম্পর্ক, পিতা মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক সবদিক থেকেই সুস্থ থাকবে অর্থাৎ সম্পর্কটি পারস্পরিক প্রীতি, বিশ্বাস, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, যথাযথ মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিকভাবে পিতামাতার সুস্থ ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার। সুস্থ সম্পর্ক সুস্থ ব্যক্তিত্বেরই ফলশ্রুতি।

এই সকল দিক থেকে গৃহ পরিবেশের প্রভাব তথা গৃহ পরিবেশ নির্মাতা পিতামাতার প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কাজ করে। সুস্থ পিতামাতা ও সুস্থ গৃহ পরিবেশ রচনাই শিশুর অপসঙ্গতি তথা বয়ঃপ্রাপ্তিকালে মানসিক রোগ প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট ও একমাত্র পথ।

এ প্রসঙ্গে বহু মনোবিদ্‌ও তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রথমতঃ ফ্রয়েড্ শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনে পিতামাতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। পিতামাতার সাথে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে যে কী গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ফ্রয়েড্ তা ব্যাখ্যা করেন। শিশুর প্রথম সম্পর্ক তার মা'র সাথে। তার জৈবিক ও মানসিক খাদ্য মা'ই প্রথম যোগায়। মাতৃস্তন্য পানে শিশুর জৈবিক ক্ষুধা যেমন নিবৃত্ত হয়, মা'র স্নেহভরা মুখ, তাঁর আদর, শিশুর মনকে ভরায়, শিশুর মনের ক্ষুধা মেটায়। তার মধ্যে নিরাপত্তা বোধের সঞ্চার হয়। মা'র উদাসীনতা, অবহেলা, সর্বদা ক্রোধ শিশুকে পীড়িত করে, ক্ষুব্ধ করে, অবসন্ন করে। ফ্রয়েড্ মা'র শিশু পরিচর্যা পদ্ধতি, মা'র ব্যক্তিত্বের গুণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লিবিডো বিকাশের সুস্থধারা বহুলাংশে নির্ভর করে মা'র ব্যক্তিত্বের উপর, তাঁর পরিচর্যা পদ্ধতির উপর। তাছাড়া লিবিডো বিকাশের ঈডিপাস স্তরে, ফ্রয়েড্ দেখিয়েছেন শিশুর মধ্যে কী ভাবে প্রধানত অধিশাস্তা (*Super-ego*) গড়ে ওঠে। অধিশাস্তা যদিও ঈডিপাস স্তরের পূর্ব অধ্যায়

থেকেই গঠিত হতে আরম্ভ করে, তবু ঈডিপাস স্তরে পিতামাতার ব্যক্তিত্বের ছাপ, শিশুর অধিশাস্তা গঠনে সবচেয়ে বেশী কাজ করে। পিতামাতার নীতিবোধ, তাঁদের ঔচিত্যবোধ, পাপবোধ, নানাবিধ সংস্কার শিশুর ব্যক্তিত্বে গ্রথিত হয়ে যায়। শিশু পিতামাতার সাথে ঈডিপাস স্তরে একাত্মীকরণ করে থাকে। অধিশাস্তার গড়নের উপর পরবর্তীকালে শিশুর ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ভর করে। অতিমাত্রিক অধিশাস্তা (যার মধ্যে প্রকট পাপবোধ কাজ করে), ব্যক্তিকে যেমন অত্যধিক দ্বন্দ্ব-জর্জর করে তোলে, উদ্বায়ুগ্রস্ত করে ফেলতে পারে, আবার ক্ষীণ অধিশাস্তা ব্যক্তিকে অদসের আপাত সুখের স্পৃহা চরিতার্থ কর'য় কোন বাধা দেয় না, ফলে ব্যক্তির মধ্যে নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচার দেখা যায়। এদিক থেকেও ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা-অসুস্থতায় পিতামাতার প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না।[১]

এই কারণে পিতামাতার সুস্থ ব্যক্তিত্ব সন্তানের সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। মানসিক অসুস্থতার প্রতিরোধ করতে হলে, গোড়া থেকেই পিতামাতার জীবনাচরণকে সুস্থ ও সংযত করে তুলতে হবে, গৃহকে আনন্দ ও সদাদর্শের একটি আকর করে গড়ে তুলতে হবে।

ফ্রয়েড্ ছাড়া এ্যাড্লারও (*Adler*) শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতামাতার প্রভাবের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। শিশুর মধ্যে অত্যধিক হীনমন্যতাবোধ, যা থেকে শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের উদ্ভব হয়, তার কারণও পিতামাতার ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী। পিতামাতার অবহেলা, নিয়ত আক্রমণ ও সমালোচনা, পদে পদে উপহাস, নিজের সঙ্গে তুলনা করে শিশুদের ছোট করা, উৎসাহের পরিবর্তে সদা ভয় দেখানো, ভাই বোনদের মধ্যে একের সাথে অপরের তুলনা করে একজনকে ছোট করা, অতি আদর দেওয়া বা প্রত্যাখ্যানের ভাব প্রভৃতি অবস্থা শিশুর মধ্যে অতিমাত্রিক হীনমন্যতার উদ্রেক ঘটায়। এই অতিমাত্রিক হীনমন্যতাই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে ও নানাপ্রকারের অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সৃষ্টি করে। কাজেই এ্যাড্লারও দেখিয়েছেন যে, পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী, সন্তান সম্পর্কে

১। In the parent-child interaction, the child takes over the features of the parents by identification and makes them a part of his own self. Although the child's adult behaviour may be determined, to some extent, by the socio-economic factors yet, the first few years of parent-dependent life is certainly decisive in the formation of personality"—Freud, S.: Introductory Lectures on Psycho-analysis, 1911.

আচরণ-রীতি, সন্তানের ব্যক্তিত্বের সুস্থতা অসুস্থতা নির্ণয়ে কি গভীরভাবে কাজ করে। শিশুর মানসিক অস্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি রোধে পিতামাতার সুস্থ ব্যক্তিত্ব প্রথম ও প্রধান সোপান।

ফ্লুগেল (*Flugel*) বলেছেন, শিশুর প্রতি পিতামাতার ভালবাসা শিশুর পরিবেশের একটি নিশ্চিততম নিয়ামক ; শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব-গঠনের জন্য একটি অপরিহার্য অভিপ্রেত অঙ্গ। জেরার্ডের (*Gerard*) মতে সন্তানের প্রতি পিতামাতার যেসব প্রতিন্যাস (*attitudes*) সন্তানের মধ্যে শৈশবকালে সমস্যার উদ্ভব করে, যদি পিতামাতা যথা সময়ে তার পরিবর্তন না করে, তাহলে তা শিশুর স্বাভাবিক ও যথাযথ বিকাশে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে। হর্নের (*Horney*) মতে, পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যদি দ্বন্দ্বজর্জর অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহলে তার কারণ কেবল যৌনেচ্ছা-সংক্রান্ত আক্রমণতা নয় (ফ্রয়েড্ ঈডিপাস-স্তরে যার কথা বলেছেন), এর কারণ হ'ল সন্তানের মধ্যে দুশ্চিন্তার উদ্রেক। এই দুশ্চিন্তা আসে পিতামাতার নির্মম আচরণ থেকে, প্রত্যাখ্যান বা উদাসীনতা থেকে। শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার ভাব দেখা দেয়—শিশু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশ রুদ্ধ হয়। ছিন্ন গৃহকোণ (*Broken Homes*) অর্থাৎ যে গৃহে পিতামাতার মধ্যে নিত্য ধূমায়িত কলহ, দ্বন্দ্ব, এমন কি বিচ্ছেদ, যে গৃহ-কোণে শান্তির পরিবর্তে সর্বদা অস্থিরতা, অশান্তি বা যে গৃহ-পরিবেশে শিশু লালিত-পালিত হয়েছে, হঠাৎ কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে সে গৃহ-পরিবেশ থেকে উৎপাটিত বৃক্ষের মত ছিন্ন হয়ে ভেসে বেড়ানো—(*Refugees*) এরকমের অবস্থা শিশুর মধ্যে নিয়ে আসে গভীর নিরাপত্তাহীনতা আর দুশ্চিন্তা। শিশু-মন সজীবতা হারিয়ে ফেলে, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিত্ব জীর্ণদীর্ণ হয়ে যায়।

এ সকল আলোচনা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব-গঠন তথা অপসঙ্গতি ও মানসিক রোগ প্রতিরোধে গৃহ-পরিবেশের সুস্থতা কত গভীর-ভাবে প্রয়োজনীয়। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সাথেও পিতা-মাতার পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কি কি অবস্থা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ন করে, কি কি সংলক্ষণ শিশুর অপসঙ্গতি ও মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার সূচক, এ সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে পরিচিতি থাকা দরকার। সামান্যতম মানসিক অসুস্থতার আভাসেই যেন পিতামাতা তার প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে, শিশু-চিকিৎসা কেন্দ্রের সাহায্য বা মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে পিতামাতা গোড়া থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে পারেন।

গৃহ-পরিবেশে যাতে স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃপ্রণোদিত নিয়ম-নিষ্ঠা থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা অপসঙ্গতি ও মানসিক বৈকল্য প্রতিরোধে পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করতে পারি—

(ক) শিশুর মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের জন্য পিতামাতার যথাযথ আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা করা।

(খ) শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা, যথাযথ মনোযোগ, পরিবারে শিশুর অস্তিত্বের যথাযথ মূল্য ও গুরুত্ব দান।

(গ) অতিরিক্ত শাসন বা অতিরিক্ত আদর না করা।

(ঘ) পদে পদে শিশুকে উপহাস না করা, অথবা সমালোচনা না করা ; তার স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্ঠ-অনিষ্ঠ নিরপেক্ষ কর্মপ্রয়াসে বাধা না দেওয়া।

(ঙ) পিতামাতার সুস্থ মূল্যবোধ থাকা।

(চ) অহেতুক শিশুকে শাস্তি না দেওয়া বা ভয় না দেখানো ; শিশু যেন কখনও পিতামাতার আচরণ থেকে অনুভব না করে যে তাকে প্রত্যাখ্যান বা অবহেলা করা হয়।

(ছ) খেলাধুলা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখা।

(জ) গৃহে স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম-নিষ্ঠা।

(ঝ) সন্তান-প্রতিপালনে পিতামাতার মধ্যে মতৈক্য।

(ঞ) পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে যেন প্রীতি, সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থপরতার ভাব থাকে।

(ট) সকল সন্তান সম্পর্কে পিতামাতার সমান মনোযোগ ও পক্ষপাতশূন্য মনোভাব।

(ঠ) শিশুকে পঠন-পাঠনে শিশুর বয়স, শক্তি-সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা।

(ড) পিতামাতার পূত চরিত্র, কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকা।

বিদ্যালয়-পরিবেশ ঃ শিক্ষক ঃ

গৃহের প্রভাবের পরই বিদ্যালয়ের প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে সবচেয়ে বেশী কাজ করে। শৈশবকালের নমনীয় দৈহিক ও মানসিক পটভূমিতে পরিবেশ-প্রভাব-শক্তি অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে ও গভীরভাবে শিশুর জীবনে কাজ করে। শিশুর ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তিভূমি এমন সময়েই স্থাপিত হয়ে যায়। গৃহের পরিবেশ থেকে প্রথমেই স্বাভাবিকভাবে শিশু বিদ্যালয়ের পরিবেশের মুখোমুখী হয়। গৃহ ও বিদ্যালয়, বৃহত্তর ভাবে সমাজ, শিশুকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বে পরিবার ও পরিবারস্থিত পিতামাতা শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত যা কিছু শেখে তার সবটাই পরিবার-পরিসর থেকে। কিন্তু তারপর থেকে গৃহ-পরিবেশের সাথে সাথে বিদ্যালয় বেশ কিছুদিন ধরে, অর্থাৎ প্রায় দশ-এগারো বছর পর্যন্ত জীবনকে নানাভাবে গড়ে তোলার কাজে প্রয়াসী হয়। এই সময়টাও দেহের ও মনের দিক থেকে অত্যন্ত নমনীয়, ফলে এই বয়সের শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়ার সময়।

বিদ্যালয়ের কাজ এখন আর কেবল পুঁথিগত বিদ্যাদান নয়। শিশুর সার্বিক বিকাশই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। সম্পূর্ণ ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব-গঠনের কাজেই বিদ্যালয়ের এখন নিযুক্ত থাকার কথা। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ের যুগপৎ পরিচর্যা বিদ্যালয়ের কাজ। আর সেইজন্য বিদ্যালয়ে এখন পাঠদানের সাথে সাথে খেলাধূলা ও অন্যান্য সহ-পাঠ্যক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অবতারণা করা হয়ে থাকে।

শিশুর অনেকগুলি মৌলিক মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি বিদ্যালয়-পরিবেশে ঘটানো সম্ভব এবং সেটা বিদ্যালয়েই একমাত্র সম্ভব, গৃহে নয়। সমবয়সীদের সাথে এক সাথে চলা, তাদের সাথে কখনো প্রতিযোগিতা, কখনো সহযোগিতা বা সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে চলার যে সুস্থ তাড়না প্রত্যেক শিশুর মধ্যে আছে তার সুস্থ ও নিয়ন্ত্রিত পরিতৃপ্তি বিদ্যালয়েই ঘটানো সম্ভব। এদিক থেকে বিদ্যালয়ের ভূমিকা বড় একটা কম নয়। বৃহত্তরভাবে সমাজ-জীবন যাপনের শিক্ষা, অর্থাৎ সমাজীকরণের (*Socialization*) মূল সূত্রগুলির সাথে শিশুর বিদ্যালয়েই প্রধানত

পরিচিতি ঘটে। গৃহ-পরিবেশের অসুস্থ আবহাওয়া থেকে যদি শিশু বিদ্যালয়ে আসে, তাহলে সে বিদ্যালয়কে যেভাবে গ্রহণ করে আর যে শিশু সুস্থ গৃহ-পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে আসে, সে বিদ্যালয়কে ভিন্নতর ভাবে গ্রহণ করে। এসব শিশুর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব আরও গভীর, কেন না এ সকল শিশু যদি বিদ্যালয়েও নিবিড় ও ঘনিষ্ট মনোযোগ ও প্রযত্ন না পায় তা হলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

সাধারণভাবে এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পিতামাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়—প্রত্যেকটি শিশুর প্রতি এককভাবে মনোযোগ দিতে হয়—শিশুর গৃহ-পরিবেশের ও শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতি যত্ন নিতে হয়। **শিক্ষক-মনোবিদ্‌-পিতামাতার মধ্যে একটি সক্রিয় সম্বন্ধ স্থাপন করে, বিদ্যালয় প্রত্যেকটি শিশুর সম্বন্ধে সর্বপ্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করবে।** গৃহ-পরিবেশে যদি কোন স্বাস্থ্য-হানিকর অবস্থা থাকে, তা হলে তা দূর করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। বিদ্যালয়েও অসুস্থ গৃহ-পরিবেশগত শিশুর প্রতি অত্যন্ত সহৃদয় দৃষ্টি দেওয়া হবে। তার মধ্যে অপসঙ্গতির সামান্য লক্ষণ দেখা দিলে পৃথকভাবে বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রের (*Child Guidance Clinic*) সহায়তায় তার জন্য সর্বপ্রকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের এরূপ ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়াও সাধারণভাবে কতকগুলি মানসিক স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। বিদ্যালয়-পরিবেশে শিশু যেন তার মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্তির স্বাস্থ্যকর সকল সম্ভাবনা খুঁজে পায়। সুস্থ বিদ্যালয়-পরিবেশে লালিত ও শিক্ষিত হলে শিশু সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠবে। মানসিক অসুস্থতা ও অপসঙ্গতি প্রতিরোধের এটাই সার্থক ভিত্তি।

বিদ্যালয়ের পরিবেশের দুটি দিক আছে—একটি তার ভৌতিক দিক (*Physical environment*) অপরটি মনস্তাত্ত্বিক দিক (*Psychological*)। ভৌতিক পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে রচনা করা প্রয়োজন। প্রশস্ত পরিসর, বিদ্যালয়ের চারদিকে পরিচ্ছন্নতা, ছাত্রদের বসা, শিক্ষকের পাঠদানের স্থান সব কিছুই সুপরিকল্পিত ও সুরুচিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত আলো-হাওয়ার যাতে কোন প্রকার অভাব না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন।

মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মৌল উপাদান বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক। বিদ্যালয়ে প্রধানত তিন প্রকারের সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক সম্পর্ক। এই সকল সম্পর্ক যদি সহৃদয়তা ও

পারস্পরিক মর্যাদা ও বোঝাপড়ার (*mutual understanding*) উপর স্থাপিত না হয়, তা হলে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশটি নষ্ট হয়ে যায়। এই পরিবেশে শিশুর যথার্থ শিক্ষাও হয় না, ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশও বিঘ্নিত হয়। কাজেই বিদ্যালয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক যাতে বিপর্যস্ত না হয়, সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টিদান প্রয়োজন।

কিন্তু বিদ্যালয়ের যে প্রভাব ও শক্তি শিশুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করে, তাহ'ল শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র। গৃহে পিতামাতার ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্ব ও জীবনভঙ্গী যেভাবে গঠিত হয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্ব ও জীবন-ভঙ্গী সেইভাবে গঠিত হয়ে থাকে। শিক্ষকের ভালবাসা, সহানুভূতি, ছাত্রের সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি, শিক্ষকের উৎসাহ-উদ্দীপনা, শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, আন্তরিকতা, সততাই, ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষক সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ করে তোলে এবং শিক্ষকদের প্রতি এই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও অনুভূতিই ছাত্র-ছাত্রীকে সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উৎসাহিত করে তোলে—বিদ্যালয় সম্পর্কে সার্থক (*Positive*) প্রতিন্যাসের (*Attitude*) সৃষ্টি করে। ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক চেতনা, সমাজ-চেতনা, মূল্যবোধ, শিক্ষকের ব্যক্তিত্বেরই বহুলাংশে প্রতিফলন। অধিশাস্তা (*Super-ego*) গঠনে পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যেমন বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে, শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিত্বেও প্রায় ততটাই কাজ করে। তা ছাড়া, শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বিদ্যালয়-পরিবেশটি রচনা করে থাকেন। তাদের ধ্যান-ধারণা ও ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে বিদ্যালয়ের পরিবেশটি কি ভাবে পরিকল্পিত হবে। অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে বিষিয়ে ফেলে। সুপরিকল্পনার অভাবে বিদ্যালয়ের কাজ-কর্মের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অসুস্থ বিদ্যালয়-পরিবেশ স্বভাবতঃই ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে বিঘ্নিত করে। সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর সুস্থ ব্যক্তিত্ব-গঠনের প্রধান নিয়ন্তা। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সুস্থ ব্যক্তিত্ব-গঠনে তথা অপসঙ্গতি-প্রতিরোধে সমধিক ও প্রায় একক।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে নীচে বলা হ'ল :—

(১) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে মনোযোগ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠদান-পদ্ধতি নির্ণয়—পাঠ্যক্রম-নির্ধারণ—বিশেষ বিষয়ে যেমন বিজ্ঞান, মানবিক শাখা, শিল্প, কৃষি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে নিয়ন্ত্রণ।

(২) খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন—প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যাতে এতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যোগ দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(৩) মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস অর্থাৎ বুদ্ধির মাপ অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করা।

(৪) মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে পাঠদান—পাঠদানের সময় প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে শিক্ষকের সমান মনোযোগ দান।

(৫) বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিদান, প্রবৃত্তি-উদ্গমনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা। যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন।

(৬) শিক্ষা-নির্দেশনা (*Educational Guidance*) ও বৃত্তি-নির্দেশনার (*Vocational Guidance*) সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা।

(৭) স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম-নিষ্ঠায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যস্ত করে তোলা।

(৮) শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত যেন এমন হয় যাতে শিক্ষক সকল ছাত্রের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেন।

(৯) অপসঙ্গতির সামান্য আভাস পেলে শিশুকে শিশু-নির্দেশনা কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে তার অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয় করা ও তা দূর করার জন্য শিক্ষক-অভিভাবকের যৌথ প্রয়াস চালানো।

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

গৃহ-পরিবেশ ও পিতামাতা →

শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে একদিকে বংশগতিতে প্রাপ্ত তার দেহ-মানস বৈশিষ্ট্য যেমন কাজ করে, অন্যদিকে পারিবেশিক প্রভাব-শক্তিও কাজ করে। দুটি শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য কতকগুলি মৌলিক পারিবেশিক অবস্থার প্রয়োজন। এই পরিবেশ রচনার দায়িত্ব মূলতঃ গৃহে পিতামাতার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের। সুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতামাতা সুস্থ গৃহ-পরিবেশ রচনায় সক্ষম। সুস্থ পরিবেশে—সুস্থ মানবিক সম্পর্ক বিরাজ করবে—পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে যদি প্রীতি, স্নেহ, বিশ্বাস, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা বর্তমান থাকে, তাহলেই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সুস্থ পরিবেশ রচিত হয়েছে বুঝতে হবে।

পিতামাতার ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, রুচিই গৃহ-পরিবেশের সুস্থতা অসুস্থতার জন্য প্রধানত দায়ী। এই দিক থেকে গৃহ-পরিবেশ নির্মাতা পিতামাতার প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজ করে।

Freud-এর মত →

ফ্রয়েড্ শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে পিতামাতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। মা'র শিশু পরিচর্যা-পদ্ধতি, মা'র ব্যক্তিত্বের গুণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধিশাস্তা (Super-Ego) গঠন, যদিও ঈডিপাস স্তরের পূর্ব অধ্যায় থেকেই গঠিত হতে আরম্ভ করে, তবু ঈডিপাস স্তরে পিতামাতার ব্যক্তিত্বের ছাপ, শিশুর অধিশাস্তা গঠনে সবচেয়ে বেশী কাজ করে। পিতামাতার নীতিবোধ, তাঁদের ঔচিত্যবোধ, পাপবোধ, নানাবিধ সংস্কার শিশুর ব্যক্তিত্বে গ্রথিত হয়ে যায়। অধিশাস্তা গঠনের সাথে মূল্যবোধ ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কান্বিত।

Adler-এর মত →

এ্যাড্লার (Adler) শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতামাতার প্রভাবের কথা বলেছেন। শিশুর মধ্যে অত্যধিক হীনমন্যতাবোধ, যা থেকে শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের উদ্ভব হয়, তার কারণও পিতামাতার ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী। পিতামাতার অবহেলা, নিয়ত আক্রমণ ও সমালোচনা পদে পদে উপহাস, উৎসাহের পরিবর্তে সর্বদা ভয় দেখানো, ভাই-বোনদের মধ্যে একের সাথে অপরের তুলনা করে একজনকে ছোট করা, অতি আদর দেওয়া বা প্রত্যাখ্যানের ভাব প্রভৃতি অবস্থা শিশুর মধ্যে অতিমাত্রায় হীনমন্যতার উদ্রেক ঘটায়। অতি-মাত্রিক হীনমন্যতাই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে।

Flugel-এর মত →

ফ্লুগেল (Flugel) বলেছেন, শিশুর প্রতি পিতামাতার ভালবাসা শিশুর পরিবেশের একটি নিশ্চিততম নিয়ামক, শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব-গঠনের জন্য একটি অপরিহার্য অভিপ্রেত অঙ্গ। ছন্ন-

ছাড়া বাড়ীর পরিবেশ—শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়।

অপসঙ্গতি ও মানসিক বৈকল্য প্রতিরোধে পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য→

শিশুর মৌলিক চাহিদা-পূরণের ব্যবস্থা করা, শিশুর প্রতি মনোযোগ, পরিবারে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বীকৃতি, অতিরিক্ত শাসন ও অতিরিক্ত আদর না করা, পিতামাতার সুস্থ মূল্যবোধ ও পূতচরিত্র, খেলাধুলার ব্যবস্থা করা, সকল সন্তান সম্পর্কে সমান দৃষ্টি।

বিদ্যালয় পরিবেশ : শিক্ষক→

গৃহের পরেই ব্যক্তিত্ব-গঠনে বিদ্যালয়ের স্থান। প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বে পরিবার ও পরিবারস্থিত পিতামাতা শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ের যুগপৎ পরিচর্যা বিদ্যালয়ের কাজ। বিদ্যালয়ে পাঠদানের সাথে সাথে খেলাধুলা ও অন্যান্য সহ-পাঠ্যক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অবতারণা অধুনা করা হয়ে থাকে। সমবয়সীদের সাথে এক সাথে চলা, তাদের সাথে কখনো প্রতিযোগিতা, কখনো সহযোগিতা বা সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে চলার যে সুস্থ তাড়না প্রত্যেক শিশুর মধ্যে আছে তার সুস্থ ও নিয়ন্ত্রিত পরিতৃপ্তি বিদ্যালয়েই ঘটানো সম্ভব। সামাজীকরণের প্রধান ক্ষেত্র বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্ব ও জীবন-ভঙ্গী গঠিত হয়—শিক্ষকের উৎসাহ, উদ্দীপনা, শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান, আন্তরিকতা, সততাই ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষক সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ করে তোলে এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ও অনুভূতিই ছাত্র-ছাত্রীকে সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উৎসাহিত করে তোলে। ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক চেতনা, সমাজ চেতনা, মূল্যবোধ, শিক্ষকের ব্যক্তিত্বেরই বহুলাংশ প্রতিফলন। অধিশাস্তা (Super-Ego) গঠনে পিতামাতার ব্যক্তিত্ব যেমন বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে, শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিত্বও

	প্রায় ততটাই প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষক-শিক্ষিকাই বিদ্যালয়ের পরিবেশ রচনা করে থাকেন।
বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্তব্য →	ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পর্যবেক্ষণ—সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্ধারণ। খেলা ও সহ-পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন। মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে শ্রেণী-বিন্যাস ও পাঠদান। বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ দৃষ্টি দান। যৌন-শিক্ষার প্রবর্তন। শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনার ব্যবস্থা। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক। অপ-সঙ্গতির সামান্য আভাস পেলে, সেদিকে দৃষ্টিদান ও তা দূরীকরণের ব্যবস্থা।

॥ অনুশীলনী

1. What are the preventive agencies and measures against problem behaviour and delinquency of the children ?
2. Explain the importance of emotional adjustment in the life of the child.
3. Discuss how the teacher-pupil relation contribute to the mental health of both the teacher and the pupil.
4. Discuss the responsibilities of parents and guardians in respect of healthy mental development of the child.
5. Briefly discuss the methods by which the teacher can help the development of whole some personality of the child.
6. Discuss the role of the family on the mental health of the child.
7. What measures should the parents and teachers adopt to prevent maladjustment in the children ?

একবিংশ অধ্যায়

মাদকাসক্তি

(Drug addiction or Drug dependence)

ড্রাগ বলতে আমরা বুঝি ওষুধ। ওষুধ বলতে মনে আসে রোগ নিরাময়ের কথা। ড্রাগ এই অর্থে জীবনদায়ী, স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে এমন শক্তিমান কিছু। শরীরের অভ্যন্তরে গিয়ে এই ওষুধ রোগের কারণ, অসুখের কারণকে উৎপাটন করতে সাহায্য করে। কিন্তু ড্রাগের আসক্তি বা মাদকাসক্তি বলতে আমরা বুঝি অন্য এক ধরনের ড্রাগের কথা। এই সব ড্রাগ বা ওষুধ গ্রহণ করলে কেবল যে শরীরকেই প্রভাবিত করে তা নয়, সমস্ত মনকে, মনের ক্রিয়াকলাপকে আচ্ছন্ন করে। একদিকে এই সব ওষুধ বোধবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, বিচারশক্তি ও বাস্তববোধকে বিপর্যস্ত করে, অন্যদিকে ক্ষণিকের প্রমোদ কল্পনায় ওষুধ গ্রহণকারী বিভোর হয়ে থাকে। ড্রাগাসক্তি বা drug addiction বলতে আমরা ব্যক্তির এমন একটা অবস্থাকে বুঝি, যে অবস্থায় ব্যক্তি ড্রাগের দাস হয়ে পড়ে, ড্রাগ না খেয়ে সে থাকতে পারে না, তার শরীর ও মনের ভারসাম্য রাখার জন্য ও বিষণ্ণতা ও হতাশাকে ঠেলে ফেলার জন্য সে মাদকদ্রব্য বা ড্রাগ না খেয়ে পারে না। প্রথম যখন কেউ এই সব ড্রাগ খেতে আরম্ভ করে, তখন থাকে ক্ষণিকের প্রমোদ বাসনা, অলীক কল্পনা বিহারের উত্তেজনা, কিন্তু ধীরে ধীরে শরীর-মন এমনভাবে এই ওষুধে অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, এই ওষুধ না খেলে শরীর-মনের আপাত সাধারণ স্বস্তি ও ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। স্নায়ুতন্ত্র, শরীরের পেশী ও অন্যান্য অংশ এমনভাবে আবিল ও প্রভাবিত হতে থাকে যে, পরবর্তীকালে এই ওষুধ না খেলে তার আর রেহাই থাকে না। এই ওষুধ খাওয়ার জন্য ও পাওয়ার জন্য ছটফট সে করে। এইরকম শরীর-মনের অবস্থা যখন প্রকটিত হয়, তখনই বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তি মাদকাসক্ত বা ড্রাগাসক্ত হয়ে পড়েছে।

"Drug dependence as defined by the WHO subcommittee is a state arising from repeated administration of a drug on a periodic or continuous basis. Its characteristics vary with the agent involved so that one can speak of Drug Dependence of amphetamine type of caunabis or morphine, coccaine, LSD or barbiturate type. From psychological standpoint, it can be said that a person who cannot maintain his adjustment without drug or one who has some kind of pseudo adjustive behaviour with aids of some drugs is psychologically dependent on drugs. The person concerned feels inadequate and inefficient without drug."

ড্রাগাসক্ত ব্যক্তির আচরণের সাথে উদ্বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণের ও সংলক্ষণের একটা সম্পর্ক আছে। একজন উদ্বায়ুরোগীর সংলক্ষণ (symptoms) যেমন তার কোন রকমে ভারসাম্য রক্ষা করার একটা উপায়, ড্রাগাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মাদকদ্রব্য গ্রহণ কোন রকমে তার ভারসাম্য রক্ষার উপায় মাত্র।

হেরোইনের নাম আজকাল আমরা শুনছি। হেরোইন একটি মাদকদ্রব্য যার বিষময় প্রতিক্রিয়া আমাদের যুবসমাজকে নানাভাবে বিধ্বস্ত করছে। বহু তরুণ-তরুণী এই হেরোইন-চক্রের শিকার হচ্ছে। এদের জীবন বিষময় হচ্ছে—অকালে এদের শরীর মন নিঃশোষিত হয়ে যাচ্ছে, এদের সাথে সাথে এক একটি পরিবার শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এই হেরোইন সম্পূর্ণ নূতন একটি কৃত্রিম বস্তু। পূর্বে যে সব মাদকদ্রব্য প্রচলিত ছিল তা থেকে আলাদা। প্রকৃতিতে মদ-গাঁজা-আফিম আছে, কিন্তু হেরোইন নেই। আফিম বিশ্লেষণ করে মরফিন পাওয়া যায় ১৮০৫ সালে। এর সাথে এ্যাসেটিক এ্যাসিড যোগ করে ১৮৯৭ সালে জার্মানীর বেয়ার কোম্পানি প্রস্তুত করে সেমি-সিন্থেটিক এক রসায়ন—এরই নাম হেরোইন। এই ওষুধটির নিঃশব্দ ব্যবহার বাড়ীর লোকদেরও প্রথম কিছু বুঝতে দেয় না। অনভিজ্ঞ কিশোর-কিশোরীরা ক্ষণিকের আমোদ-রোমাঞ্চের আকর্ষণে প্রথম হেরোইন খেতে আরম্ভ করে। কখনো কখনো তথাকথিত বন্ধুবান্ধবরা এসে আমোদ-রোমাঞ্চের লোভ দেখিয়ে এদের 'নেশা-চক্রের' মধ্যে নিয়ে যায়। কিছুদিন হেরোইন খাওয়ার পর, এরা হয়ে যায় হেরোইনের ক্রীতদাস। স্নায়ুতন্ত্র ও শরীরের অন্যান্য অংশ হেরোইনের প্রতিক্রিয়ায় এমনভাবে আক্রান্ত হয় যে, কিছুদিন বাদে, হেরোইন না খেলে শরীরে অসহ্য ব্যথা আরম্ভ হয়। শুধু সেই ব্যথা ও শারীরিক অন্যান্য উপসর্গের সাময়িক উপশমের জন্য আবার সেই ওষুধ খেতে হয়। এই ব্যথা উপশমের সাথে সাথে একটা শারীরিক আরাম আসে, কিন্তু ক্ষণিকের এই কৃত্রিম আরামের পিছনে পিছনে আসে শরীর স্বাস্থ্যের চিরতরে বিনাশ। এরা হীনবল, হীনমন্য, অকর্মণ্য হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে।

যে সব ওষুধ বা ড্রাগের অপব্যবহার হচ্ছে বা বলা যেতে পারে যে সব ওষুধে মাদকাসক্তি ঘটছে সেগুলিকে মোটামুটিভাবে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়।

নারকোটিকস্—এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আফিম ও আফিমের দ্বারা তৈরী ওষুধ। মাত্রামত খেলে এ ওষুধ মাথাধরা সারায়।

সিডেটিভস্—বারবিটুরেটস্ মাত্রামত খেলে স্থিরভাব আনে, একটু শান্তভাব আসে; বেশী খেলে বা মাত্রাতিরিক্ত খেলে অলীকবীক্ষণ হয়, বিষণ্ণতা আনে, উন্মাদের মত ভ্রান্ত সব বিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

উত্তেজক ওষুধ—কোকেন, এ্যামফিটেমিনস্—মাত্রামত খেলে কাজে উদ্দীপনা আসে, স্নায়বিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

মৃদু ঘুমের ওষুধ—মেপট্রোবামাটিকস্ ঘুমের মৃদু ওষুধ হিসাবে কাজ করে, বেশী খেলে নেশা হয়—ঘুমের নেশা।

অলীকবীক্ষণ উদ্রেককারী ওষুধ—মারিজুয়ানা, এল্, এস্ ডি হচ্ছে এমন ওষুধ যা খেলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মত প্রাণবন্ত অথচ অলীক অভিজ্ঞতা, আবেগের সঞ্চার, হৃদস্পন্দন ও রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়া—এই সব শারীরিক উপসর্গ দেখা দেবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত গাছগাছরা থেকে যে সব ওষুধ তৈরী হচ্ছে তা মাত্রামত ব্যবহার করলে যেমন অসুখের উপশম হয়—মাত্রাধিক খেয়ে নেশা করতে গেলে তেমনি প্রচুর ক্ষতি হয়। এ ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে যে সব ওষুধ তৈরী হয়, যেমন হেরোইন, এল্, এস্ ডি সেগুলো ব্যক্তির অশেষ ক্ষতি করে।

এই সব ড্রাগের অন্তত দুটি তিনটি যেমন হেরোইন, এল্, এস্ ডি (Lysergic Acid Diethylamide) এমফিটামাইনস্ প্রকৃতিদত্ত গাঁজা, আফিম প্রভৃতি বস্তুর সাথে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে, সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রকমের রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করে, এইসব মাদক দ্রব্যের উৎপাদন হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেক ওষুধের কোম্পানী এইসব ওষুধ তৈরী করে শুধু মাদক দ্রব্য হিসাবে এর প্রচলনের জন্য। এই সব ওষুধের মাঙ্গলিক কোন দিক নেই। শুধু নেশা ধরিয়ে দিয়ে ব্যবসা করাই এই সব ওষুধ তৈরীর উদ্দেশ্য। এই সব ওষুধ নিয়ে ব্যবসা করার প্রবণতা ও চক্রকে যত প্রতিরোধ করা যাবে ততই মঙ্গল। এর বিরুদ্ধে শিক্ষার মধ্য দিয়ে গণ চেতনার উন্মেষ, গণ প্রতিরোধকে যেমন একদিকে সক্রিয় করে তুলতে হবে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে আরও কঠোর ও আইনিষ্ঠ করে তুলতে হবে।

নেশার শিকার কারা হয়? কেন নেশা করে? সকলেই তো আর নেশা করে না। কারা করে, কোন্ অবস্থায় নেশা ধরে, কোন্ মানসিকতা এদের বিপথে নিয়ে যায়, সেই মানসিকতা কি ভাবে, কী অবস্থায় তৈরী হয়—মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এর বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ মাদকাসক্তির পেছনে যেমন অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে, দুষ্ট লোকের অপরাধমূলক ব্যবসা চক্র তাদের ব্যবসা বাড়াবার জন্যও নানা ছলে, নানা কৌশলে তরুণ-তরুণীদের এই চক্র জালে ধরার চেষ্টা করে। এরাও সাময়িক রোমাঞ্চের মোহে এর শিকার হয়ে পড়ে। এটা হল সামাজিক কারণ। বহু সুস্থ ভাল ছেলেও এই চক্রের শিকার হয়ে পড়ে।

কিন্তু বহু তরুণ-তরুণী হতাশাবোধ থেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। প্রশ্ন হতে পারে এই বিপথগামীতা কি একটা অসুখ, না একটা অপরাধ? যারা এই সব ওষুধ নিয়ে ব্যবসা করে, তরুণ-তরুণীদের এই জালে ফেলে মুনাফা লোটে তারা অপরাধী—আইনের দিক থেকেও কঠোরভাবে দণ্ডনীয়। কিন্তু যে সব তরুণ-তরুণী হতাশায় আবদ্ধ হয়ে, ড্রাগ ধরে আপাতমুক্তির আশায় তারা কী অপরাধী? একজন অপরাধীকে আমরা যেভাবে দেখবো, এই সব মাদকাসক্তদেরও কি আমরা সেইভাবে দেখবো?

একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা দেখি, সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একজন drug addictকেও আমরা দেখবো? যে drug addict হয়, সে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ। তার সমস্ত আচরণকেই অসুস্থতার সংলক্ষণ হিসাবে দেখতে হবে। সামাজিক দিক থেকে ও আইনের চোখে এটা নিশ্চয়ই অপরাধ, কেননা সমাজ ও আইনকে ফাঁকি দিয়ে এই অপরাধ চলতে থাকে; যে সব ওষুধ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয় তরুণ-তরুণীরা, তারা সেই সব ওষুধ কেনে চোরাগোপ্তা পথে, বেআইনী রন্ধ্রে, মুনাফাখোর বিক্রেতারাও বেআইনীভাবেই এসব বিক্রি করে। মাদকাসক্ত যারা হয় তাদের বয়স বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ষোল থেকে পঁচিশের মধ্যে (শতকরা ৫৭.১৭ জন); তারপর ছাব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে শতকরা ৩২.৫ জন। ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের

মধ্যে শতকরা ৭ জন। মোটের উপর কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরাই এর শিকার হয় সব চেয়ে বেশী। আমাদের দেশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এইরকম একটা চিত্র পাওয়া গেছে। আরও দেখা গেছে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরাই এর শিকার হয় বেশী। মাদকাসক্তদের শতকরা ৯৬ জন ছেলে, এবং শতকরা ৪ জন মেয়ে।

মাদকাসক্তিকে যদি আমরা অসুখ হিসাবে দেখি তাহলে সেটা কি বংশগতির দ্বারা প্রভাবিত? পরিষ্কার ভাবে বলা চলে, drug addict কে হবে, আর কে হবে না সেটা কখনই বংশগতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তবে এটা কিয়দংশে বলা চলে যে বংশগতি (genetic factor), কে কোন্ নেশা ধরুবে, তা অনেকাংশে নির্ণয় করে দিতে পারে। Goodwin (1970) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়, কে উত্তরাধিকার সূত্রে এই নেশার অসুখে পড়বে, তবে কে কোন্ নেশা ধরবে, কে হেরোইন ধরবে, আবার কেই বা ঘুমের ওষুধ খাবে, সেটা বংশগতির উপর কিছুটা নির্ভর করতে পারে। এমন হতেই পারে যে একজন জন্মসূত্রে তার শরীরের কাঠামো অনুযায়ী হেরোইন সহ্য করতে পারে না এবং সে এতে আসক্ত হলেও অন্য ওষুধের দিকে যেতে চাইবে। যদি কেউ আসক্ত হয় তাহলে কোন্ ওষুধ কতটা খেলে তার নেশা হবে, সেটা তার hereditary constitution-এর উপর নির্ভর করবে।

এই পটভূমিতে drug addiction সম্পূর্ণভাবে সমাজগতির দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি অসুখ বা বিকৃতি। সামাজিক দায়িত্ব তাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী।

আরও নিবিষ্টভাবে দেখলে দেখা যাবে সমস্যার প্রথম জট আরম্ভ হয় পরিবারে, শৈশবকালের জীবন পর্বে। যারা নেশার শিকার হয় তাদের বেশ কিছুর মধ্যে থাকে প্রথম জীবনের বঞ্চনা। কিসের বঞ্চনা? ভালবাসা থেকে বঞ্চনা, আর্থিক বঞ্চনা, যা আরও গভীরতর ক্ষত সৃষ্টি করে মনে। বঞ্চনাবোধ শিশুর মধ্যে প্রকট ভাবে দেখা দেয় যখন শিশু আকারে ইঙ্গিতে হলেও বুঝতে পারে, মা বাবা তার প্রতি উদাসীন, কিংবা মা বাবা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রশ্ন হতেই পারে মা বাবা শিশুর প্রতি কী কখনও এমন আচরণ করতে পারে? বাবা মা'র ভালবাসা স্নেহপ্রযত্ন তো শিশুর জন্যই উদ্দিষ্ট! বাবা মা'র সম্পর্কের মধ্যে যদি সুস্থতা না থাকে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথার্থ মর্যাদাপূর্ণ স্থিত সম্পর্কের বিন্যাস না থাকে, তা হ'লে পরিবারের মধ্যে যে অনুচ্চারিত অস্থিরতার ঢেউ বইতে থাকে তা শিশুর মনোজগতে আনে এক নিরাপত্তা-হীনতার ভাব, একটা শঙ্কা। বাবা মা'র মধ্যে যে অস্থির সম্পর্ক সে সম্পর্কের শিকার হয় সন্তানরা, বাবা মা'র সমস্ত রাগ, কখনো বা বিষণ্ণতা সন্তানের উপর গিয়ে বর্তায়, ফলে সন্তান কখনো হয় আক্রান্ত, কখনো হয় অন্ধকারময় বিষণ্ণতায় বিমর্ষ, বিলীন। সন্তানের মধ্যে আসে একটা গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব, সমস্ত সমাজ সংসারকে দেখে একটি বঞ্চনার কারাগার হিসাবে, একটা অপূর্ণতার ভাব তার সমস্ত মনোজগতকে অধিকার করে বসে। বঞ্চিতের ক্ষত নিয়ে শিশু যখন এইভাবে বড় হতে থাকে, তার মনোলোক হয়ে থাকে অবদমিত আক্রোশে পূর্ণ, আত্মপ্রত্যয়হীন ছন্নছাড়া উদভ্রান্ত আবেগে দিশাহীন। আর এরা যখন বয়ঃসন্ধিকালের দোরে এসে পৌঁছে তখন হয়ে ওঠে আরও দিকভ্রান্ত। বাড়ীর দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে মুক্তির ক্ষণিক আরামের হাতছানি তখন তাদের মুহূর্তে উদ্বেল করে ফেলে। পাড়ার বন্ধু, স্কুলের বন্ধু, কলেজের বন্ধুবেশী যে কেউ এসে একবার সব ভুলিয়ে দেয় এমন ওষুধ ধরাতে পারলে,

আর পায় কে ! তারপর এই ওষুধের নেশায় কিছুক্ষণের জন্য মেতে থাকা, সব ভুলে থাকা, একটা মজায় থাকা মন্দ কি ! তারপর তো চক্রের মধ্যে পড়ে যাওয়া। ওষুধ খাবো না প্রতিজ্ঞা করেও আর লাভ হয় না, শরীর তখন এ ওষুধ না পেলে ছটফট্ করতে থাকে, শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে ওষুধ খেতে হয়—প্রথম মাত্রামত, তারপর ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়াতে হয়। তারপর ওষুধের দাস হয়ে যেতে হয়।

বঞ্চনাবোধ থাকলেই যে একজন তরুণ-তরুণী ড্রাগ ধরবে এমন কোন কথা নেই। কেউ উদভ্রান্ত হয়ে বিপথগামী হতে পারে, হতে পারে অপরাধী কিশোর, সমাজের নিয়ম নীতি ভেঙ্গে সে হতে পারে ডাকাত, সে হতে পারে ওয়াগন ব্রেকার, লিপ্ত হতে পারে অসামাজিক অনৈতিক কোন আচরণে, যা সমাজের ও পরিবারের প্রত্যক্ষ ক্ষতি করতে পারে।

ড্রাগের শিকার হওয়া বা বিপথগামী অপরাধ-প্রবণ কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা আজ ধনতান্ত্রিক পশ্চিমি দুনিয়ায় যে এত বেশী, তার একটা কারণ সেখানকার পরিবার জীবনের ভাঙ্গন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যে হৃদয়হীনতা, বিচ্ছেদ, কৃত্রিমতা দেখা গিয়েছে, তার পরিণাম ভোগ করছে সন্তান সন্ততিরা। তাদের মানসিক জীবন ভেঙ্গে পড়ছে, ছন্নছাড়া দিশাহীনতা তাদের পেয়ে বসছে। অর্থনৈতিক বঞ্চনার থেকেও পিতামাতার উষ্ণ স্নেহ থেকে বঞ্চনা, পিতামাতার হৃদয়হীন বিবেকহীন নির্বিশেষ দৈহিক সম্পর্কের যে ক্লান্তিকর চিত্র বিবেকাংখী শিশুরা, তরুণ-তরুণীরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করছে তারই পরিণামে এরা হয়ে উঠছে বিষণ্ণ হতাশ আগ্রাসনধর্মী রাগী যুবক-যুবতী। এরা কখনো মাতছে নেশার ঘোরে কখনো মাতছে সব ভেঙ্গেচুড়ে দেবার নেশায়। তারা বিচ্ছিন্নতা বোধের প্রকট একাকীত্ব বোধের দুঃসহ চাপে, বাইরের সামান্য প্রলোভনের কাছে নুয়ে পড়ছে—বিপথে চলে যাচ্ছে। পরিবারের ভালবাসার বাঁধন, পবিত্র নিয়ম শৃংখলার বাঁধন মনের মুক্ত বাঁধনকে শক্ত করে তোলে বাইরের অশুভ প্রলোভন নিমেষে এদের হারিয়ে দিতে পারে না। মনের জোরে, নিজের স্বচ্ছ বিচার বুদ্ধি দিয়ে এঁরা বুঝে নিতে পারে কোন্‌টা গ্রহণ করার আর কোন্‌টা বর্জন করার। এদের আত্মপ্রত্যয় ও সংহতি এমন একটা রাশ টানার ক্ষমতা দেয় যে যদি কখনো কৌতূকভরে, মজা করার জন্যও কোন নেশা করে, সে আবার নিজেকে তার থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে, সরিয়ে নিতে পারে। আমাদের দেশের কিছু উচ্চবিত্তবান সমাজের জীবনযাত্রার মধ্যে এমন সব মূল্যবোধ জন্ম নিয়েছে যার ফলে তারা আজ হোটেলে পার্টি, কাল প্যারিস্, পরশু হংকং ছোটাছুটি করে সাহেবীয়ানাকে জীবনাদর্শ করে ধরে রাখতে চান। ফলে এক ধরণের শূন্যতা সেই বাড়ীর সন্তান সন্ততিদের পেয়ে বসে। এক কুটিল ভয় ও ক্রোধ তাদের মনের মধ্যে গুমরে মরতে থাকে—নেশা পেলে এ দুঃখ ভুলে থাকা যায়। বিষয় বৈভবে থেকেও এরা মনে মনে বড় অসহায়, একাকীত্বের অন্ধকারে ডুবে থাকে। নেশা ধরে উঠতে গিয়ে আরও অতলে তলিয়ে যায়। বাবা মা'র ভালবাসা না পেলে, বাবা মার সাথে আত্মীয়তার উষ্ণতা যদি শিশু বোধ না করে, তা হলে বাবা মা'র সাথে একাত্মতার বোধটি নষ্ট হয়ে যায়—সে কে, কার সন্তান, কোন্ পরিচয়ে সে সমাজে স্বীকৃত হবে, মাথাটি উঁচু করে বলবে, 'আমি ওমুকের ছেলে'—সেই পরিচয় বোধটিও আচ্ছন্ন হয়ে যায়—সে যে সঠিকভাবে কে এই বোধটুকুও সহজ নিশ্বাসের সাথে বুঝে উঠতে পারে না। এক

দমবন্ধ করা আত্মপরিচয়হীন, আত্মপ্রত্যয়হীন 'আমিত্বের' সংশয়ে মনে মনে ক্লান্ত ছিন্ন হতে থাকে—এই রকমের তরুণ-তরুণীরা (Identity Crisis)।

বয়ঃসন্ধিকালে নবযুবক-যুবতীদের মনে আসে নূতন জোয়ার—শৈশবের নির্ভরতা থেকে সাবালকের স্বনির্ভরতার দোরে পেঁাছে যেতে যেতে তার মনে আসে নূতন চেতনা, নূতন প্রশ্ন। দেহে আসে পরিবর্তন, আসে যৌন-চেতনা—সমাজিক বিধি-নিষেধের সাথে চলে বোঝা পড়া, প্রশ্ন, টানা পোড়েন দ্বন্দ্ব, সংশয়, ভয়। প্রশ্ন করে প্রচলিত নিয়ম-কানুনকে, প্রশ্ন করে উত্তর খোঁজে নিজে নিজে, পথ করে নিতে চায় আপন নিয়মে। সমাজপরিবর্তন, সমাজবোধ, পরিবারে দায়িত্ব, কর্মজীবনে প্রবেশ করার প্রস্তুতি সব মিলিয়ে পরিবেশের সাথে যুঝতে গেলে যে আত্মপ্রত্যয় দরকার, যে সংহত 'আমি'র দরকার তা যদি শৈশবের বঞ্চনাক্লিষ্ট 'আমি'কে আগেই দুর্বল করে রাখে তাহলে কী করে আর নূতন জীবন যুদ্ধের সম্মুখীন হবে। দ্বন্দ্বে জর্জর হয়ে থাকতে থাকতে ক্ষণিকের আরামের টানে, ক্ষণিকের স্বপ্নে মেদুর হয়ে যাওয়ার টানে নেশার হাতছানি তাকে বিপথে টেনে নেয়, সে নেশার চক্রে পড়ে যায়। এই কারণে এটা লক্ষণীয় যে, drug addicts দের সংখ্যা এই বয়সের যুবক যুবতীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী। শিশুদের মধ্যে এর হার কম, খুব বয়স্কদের মধ্যেও এর প্রকোপ কম।

হতাশার এই কারণ ছাড়াও আরও কারণ তো রয়েছে। এক নির্মল জীবন-বোধের উদ্বোধনের জনই তো দরকার সঠিক শিক্ষা—একেবারে বাল্যকাল থেকে সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ। সে পরিবেশটা বাড়ীতেও যেমন থাকবে বিদ্যালয়েও তেমনি থাকবে সমানভাবে। একটা আর একটার পরিপূরক হিসাবে সব সময় কাজ করে। সাধারণভাবে এটা আমরা কেউ বুঝতে চাই না। বাড়ীতে যেমন তেমন হোক, ভাল স্কুলে দিতে পারলেই, বা টাকা থাকলে ভাল ভাল অনেকগুলো মাষ্টার রেখে দিতে পারলেই বাবা মা বাড়ি থাকুন না থাকুন, যেমন খুশি তেমন চলুন, ছেলেরা সব মানুষ হয়ে যাবে—এই রকম একটা ভুল ধারণা তো আমাদের অনেকের মধ্যে বেশ বদ্ধমূল হয়ে আছে। কিন্তু এটা ভুল। বাপ মার সহৃদয় সযত্ন উপস্থিতি, অনাবিল আনন্দমুখর বাড়ীর পরিবেশ যে কতটা শিশুর জীবনবোধ উন্মেষে কাজ করে, সেটা পরিষ্কার ভাবে আমাদের বুঝতে হবে। আত্মপ্রত্যয়ী জীবনমুখী গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটানো যে শিক্ষার সবচেয়ে বড় কাজ, এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ অনেকটাই অনুপস্থিত। এর জন্য অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় এমন একটা বাতাবরণ তৈরী করতে হবে যাতে প্রতিটি কিশোর, প্রতিটি যুবক তার শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী একটা কর্ম-সংস্থানের নিশ্চিতি পেতে পারে। স্ব-উদ্যোগ কর্মই হোক বা কোন সংস্থার কাজেই হোক—সমাজে অর্থনৈতিক পরি-কাঠামোতে এর সুনিশ্চিত ব্যবস্থা রাখতেই হবে। যে অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামো এর নিশ্চয়তা দিতে পারে না, যে শিক্ষাব্যবস্থা বুদ্ধি-শক্তি-প্রবণতা অনুযায়ী সকলের শিক্ষার সুযোগের বাতাবরণ তৈরী করতে পারে না—সে শিক্ষা ব্যবস্থাও পরিবর্তিত করতে হবে। এ সব কথা অনেক মোটা কথা—এর সাথে ড্রাগ addiction-এর যোগ কোথায়, এমন প্রশ্ন অনেকেই করতে পারেন। যোগটা এইখানে যে শিশুর মধ্যে, কিশোরের মধ্যে যদি সদর্থক জীবন-ভঙ্গি, তার অস্তিত্বের সমাজ-প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা জীবনবোধ সৃষ্টি না হয়, তাহলেই সে সবরকম অপসংস্কৃতির শিকার হয়ে উঠবে।

যদি কোন সৈনিক গোড়া থেকেই উদ্বায়ুগ্রস্থ থাকে, তাহলে সে সহজেই এই অবস্থায় ভেঙে পড়তে পারে।

এ ছাড়া, আরও কতকগুলি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ আছে, যা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মানসিক অবস্থা নির্ধারণ করে। যুদ্ধ কেন করছে এবং সেটা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কি-না—এর বিচার ও গ্রহণযোগ্যতা। সৈনিকদের দেশপ্রেম ও ন্যায়নীতির বোধ অনেকসময় যুদ্ধে মনের শক্তি যোগায়, কিন্তু সৈনিকরা যদি বুঝে যে এ যুদ্ধ অন্যায় ও নীতিহীন তাহলে যুদ্ধে সৈনিকরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। যদিও এটা সত্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রেরণা। নেতৃত্বের গুণগত মানও একটা প্রয়োজনীয় নির্ধারক। নেতৃত্বের মধ্যে যদি অটুট মনোবল থাকে তাহলে সহজে সৈন্যরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে না। সৈন্যদের মধ্যে একাত্মবোধ, আত্মসংহতি, আত্মপ্রত্যয়ের একটা বিশেষ উপাদান। এ ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাদের যথার্থ শত্রু হিসেবে ঘৃণা করতে পারলে সৈনিকদের মনোবল সহজে নষ্ট হয় না।

মোটের উপর যুদ্ধে সৈনিকদের মধ্যে মানসিক বৈকল্য দেখা দেবে কি দেবে না, সেটা কেবলমাত্র যুদ্ধের ভয়ঙ্কর, নির্মম ও অনিশ্চিত অবস্থার উপর নির্ভর করে না, সৈনিকদের ব্যক্তিত্ব, যুদ্ধক্ষেত্রের নেতৃত্ব, সৈনিকদের মধ্যে একাত্মতাবোধ, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নীতি নির্ভর বিশ্বাস— সব কিছু মিলে মিশে, সৈনিকদের যুদ্ধের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা দেয়। এই চাপ সহ্য করতে না পেরে যে মানসিক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দেখা দেয় তা থেকে পরবর্তিকালে স্থায়ী মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা : যুদ্ধে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এমন সৈন্যদের যুদ্ধের অবস্থান থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে নেওয়া এবং তাদের মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এইসব সৈন্যদের যাতে ঠিকমত ঘুম হয়, যথাযথ আহার দেওয়া হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

যুদ্ধে সৈন্যদের এই মানসিক বৈকল্য দূর করতে হলে, কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। **প্রথমত :** সৈন্যদের নেওয়ার সময় তাদের ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা দিয়ে ব্যক্তিত্বকে বুঝে নিতে হবে, যুদ্ধের অবস্থাকে মুখোমুখী হওয়ার জন্য তাদের আত্মবিশ্বাস, মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা (Stress tolerance), আরও অন্যান্য মানসিক বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে হবে।

সৈন্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সৈন্যদের মধ্যে যাতে মনোবল ঠিক থাকে তার জন্য ওদের মধ্যে বন্ধুভাব, পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভাব বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া নাগরিক জীবনে যে সব অঘটন ঘটে ও তার জন্য মানসিক বিপর্যয় ও তা থেকে নিষ্কৃতি

কোন ব্যক্তি যদি হঠাৎ একটা নিদারুন অঘটনের মুখোমুখী হয় : বিধ্বংসী আগুনে বাড়িঘর পুড়ে গেল, আপনজন মারা গেল, প্রচুর ধনসম্পত্তি অপহৃত হল ; ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যায় ঘরবাড়ী সব শেষ হয়ে গেল, আপনজনের আচমকা মৃত্যু সংবাদ শুনল বা চোখের সামনে আপনজনের হত্যা দেখল— এই সব অবস্থায় মানসিক যে আঘাত ব্যক্তি পায়, তা থেকেও মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। এই বৈকল্য কারও কারও ক্ষেত্রে সাময়িক— আবার কারও কারও ক্ষেত্রে স্থায়ী হয়ে যায়।

সাধারণ ভাবে এই মানসিক আঘাতের ফল তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়—

(ক) প্রথম ''আঘাতের পর্যায়''— এই অবস্থায় ব্যক্তি হতচকিত নিঃসার হয়ে যায়— তার যে কত ক্ষতি হল সেটা বোঝার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে যায়।

(খ) তারপর হয়ে যায় পরমত নির্ভর, যে যা বলে তাই করতে যায়, নিজের বোধ, নিজের উপর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। পরে দুঃখ ভোলার জন্য ও হৃত মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য, অন্যের দুঃখ ও বিপদে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে, যদিও তার দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেও একটা শিথিলতা থাকে।

(গ) ধীরে ধীরে ব্যক্তির এই আঘাতের তীক্ষ্ণতা হ্রাস পেতে থাকে— মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসতে থাকে— এটা ত্বরান্বিত হয়, সাহায্যকারী মনোচিকিৎসার মধ্য দিয়ে। এই মানসিক আঘাতের, যুদ্ধক্ষেত্রের বিবিধ আঘাতের মত, রেশ অনেকদিন থেকে যেতে পারে— এই বৈকল্যকে অনেক সময় ''traumatic neurosis''-ও বলা হয়ে থাকে। এর সংলক্ষণগুলি হল, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, ক্লান্তি, অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়া, জোরে শব্দ শুনলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়া, রাত্রে ঘুমের মধ্যে সেই দুর্ঘটনার দুঃস্বপ্ন দেখা ইত্যাদি।

এ ছাড়া এই সব মানসিক বিপর্যয়কারী দুর্ঘটনার শিকার যারা হল, তারা সামাজিক মেলামেশা থেকেও নিজেদের গুটিয়ে নেন, যৌন ইচ্ছাও অনেক পরিমাণে কমে যায়। মোটের উপর একটা অনির্দিষ্ট চাপা মানসিক ভার এদের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত দেখা যায়।

অনেক সময় পারিবারিক সম্পর্কের বিপর্যয় থেকেও সাময়িক ও সাময়িক থেকে কখনও কখনও স্থায়ী মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। বিবাহ বিচ্ছেদ, হঠাৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনকারী ব্যক্তির চাকুরী চলে যাওয়া, হঠাৎ বাড়ী থেকে ছেলে বা মেয়ের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, চাকুরী থেকে অবসর নেওয়া, পরিবারের কারও হঠাৎ মৃত্যু— এই সব অবস্থা মনের উপর প্রায় অনতিক্রম্য চাপ সৃষ্টি করে— এই চাপ (Stress) মন ও শরীরের উপরে নানারকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই চাপের সাথে যুদ্ধ করতে হয় সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য— ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। সঠিকভাবে যুঝতে না পারলে— মন খেই হারিয়ে ফেলে, নানা রকমের অসংলগ্ন আচরণ প্রকাশ পেতে থাকে। কখনও কখনও এই মানসিক চাপ শারীরিক অসুখও নিয়ে আসতে পারে। যেমন— মাথা ধরা, হজমের গণ্ডগোল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট। আজকাল যেগুলোকে আমরা Psycho-somatric disease বলি, তা এই সব মানসিক চাপ থেকে হতে পারে। এইসব মানসিক চাপ উপশমের জন্য মনোচিকিৎসা অর্থাৎ চিকিৎসকের সাথে এমন একটা নিরাপদ আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী করবে যেখানে অসুস্থ ব্যক্তি তার সমস্যার কথা চিকিৎসককে খুলে বলতে পারে ও তাতে মনের ভার হাল্কা করতে পারে। এ ছাড়া যে ঘটনা থেকে তার এই ভয় ও মনের উপর চাপ, সেই ঘটনার মধ্যে ফিরে গিয়ে নিজের আত্মবিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা— এবং এই সব ঘটনা ও অবস্থা থেকে যে মানসিক চাপ ও শঙ্কার উদ্ভব হয়েছে সেটা যে বারবার হবে না, আকস্মিক কোন কারণে একবারই হয়েছে, এই সচেতনতায় বুঝিয়ে বুঝিয়ে চিকিৎসক তাকে ফিরিয়ে আনবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অল্প কিছুদিনের মধ্যে ওরা সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে আসে, কিন্তু অল্প কিছু ক্ষেত্রে এইরকম অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তিদের সারাতে সময় লাগে। উপসর্গগুলি চলে গেলেও, ভয় ভয় ভাব অনেকদিন থাকতে পারে।

যুদ্ধে Concentration Camp-এ নিক্ষিপ্ত হয়ে সেখানে যাদের দিনের পর দিন কাটাতে হয় তাদের অনেকের মধ্যেই Concentration Camp থেকে ছাড়া পেয়েও মানসিক নানারকম

বৈকল্য অনেকদিন পর্যন্ত থেকে যায়। অবসন্নতা, অস্থিরতা, স্মৃতির ক্ষীণতা, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, অসহিষ্ণুতা, মাথা ধরা এই সব উপসর্গ অনেকদিন পর্যন্ত থেকে যায়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। বর্তমানে নভোচররা আকাশযানে যখন বিচরণ করে তখন তাদের শরীর ও মনের উপর, স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম মাটি, জল, বিরল শূন্যে ভাসমান অবস্থার জন্য অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য, ওষুধ দিয়ে অনেকক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখা, শরীরের উত্তাপ, জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা— এই ধরনের নানাবিধ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে এই সব ভাসমান আকাশ-যাত্রীদের যেতে হয়। অক্সিজেন সরবরাহ, তাপবিকীরণ, ভারহীনতার বোধের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা, পৃথিবী থেকে বহুদূর গিয়ে যে নিঃসঙ্গতা, বদ্ধ স্থানে অনেকদিন আবদ্ধ হয়ে থাকার যে দম-বন্ধ করা অবস্থা এবং অনিশ্চিত বিপদের মুখোমুখী হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া—এইসব অবস্থাই কিভাবে কাটাতে হবে তার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি দরকার। এবং এর জন্যই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য নভোচরদের জন্য, অবস্থার বিশেষ পরিকল্পনা ও এইরকম বাস্তব সদৃশ অবস্থা সৃষ্টি করে, প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এই সব প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও, সুস্থ কোন নভোচারী এই সব অবস্থার চাপে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ হয়ে উঠতে পারে— এদের স্মৃতি বিভ্রম ঘটতে পারে, সংবেদনক্ষমতা কমে যেতে পারে, চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

মোটের উপর, সাময়িক অবস্থার চাপে যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এটা পরিষ্কার যে Stress ও Strain, কীভাবে ও কতটা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসুস্থ করে তুলতে পারে, এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বর্তমান জীবনে যে দ্রুততা, অস্থির প্রতিযোগিতা ও তারজন্য মনের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে Neuro Hormonal System-এর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে কী ভাবে একজনকে মানসিক কারণে দৈহিক রোগের সৃষ্টি করে তার অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে এবং তদনুসারে মানসিক চিকিৎসার মধ্য দিয়ে শারীরিক বহুরোগের নিরাময় ব্যবস্থা করা গেছে। বিশেষ করে Psycho-somatric disease, যেমন—migrane (মাথার যন্ত্রণা), Peptic ulcer (আন্ত্রিক ক্ষত), Asthma (হাঁপানী রোগ), Coronary disease (হৃদরোগ), Hypertension (মানসিক অত্যধিক অস্থিরতা ও চাপ), High Blood Sugar (রক্তে মাত্রাতিরিক্ত শর্করা বস্তুর প্রাদুর্ভাব) ইত্যাদি।

Therapeutic Measure

Behavirouristic Catharsis : আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনোরোগ চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন মূলত কতকগুলি পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ভিত্তি করে। রাশিয়ার প্রখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী আইভান প্যাভলভের সাপেক্ষ অনুবর্তবাদের (Conditioned Reflex) উপর ভিত্তি করে প্রধানত এই চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। পরে অবশ্য জে. বি. ওয়াটসন, ই. এল. থর্নডাইক এবং বি. এফ্ স্কিনার প্যাভলভের ধ্রুপদী অনুবর্তবাদের চিন্তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছু নূতন সত্যে উপনীত হন। যেমন স্কিনারের অনুবর্তবাদকে সাপেক্ষ ইচ্ছানির্ভর সক্রিয়তাভিত্তিক অনুবর্তবাদ (Operant Conditioning) বলে।

প্যাভলভের এক ছাত্র-গবেষক পরবর্তীকালে সাপেক্ষ প্রত্যাবর্ত ছাঁদের বৈজ্ঞানিক সংব্যাখ্যান দিয়ে মানসিক বিকারের কারণ নির্ণয় করেছেন। একটা কুকুরকে একটি বৃত্ত ও একটা ক্রান্তিবৃত্তের **(ellipse)** মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখানো হয়। ক্রান্তিবৃত্তটির আকার ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে বৃত্তের কাছাকাছি আকারে নিয়ে আসা হয়, শেষ পর্যন্ত এই দু'টি আকৃতির মধ্যে কুকুরটি আর সঠিকভাবে পার্থক্য করতে পারে না। পরবর্তীকালে একই পরীক্ষার তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে কুকুরটির দু'টি আকৃতির মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতাই প্রায় হারাতে বসল। এর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটির মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত আচরণের লক্ষণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল। প্রথমদিকে শান্ত কুকুরটি ধীরে ধীরে ক্ষিপ্ত ও অস্থির হতে থাকল। এই মানসিক অবস্থাকেই প্যাভলভ বলেছেন উদ্বায়ু বা নিউরোসিস।

ওয়াট্‌সন পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, কি করে একটি শিশু প্রথমদিকে আনন্দদায়ী একটি খরগোস থেকে খরগোসের সাথে খুব জোরে শব্দের অনুষঙ্গ ঘটিয়ে, ভয়ের উদ্রেক ঘটাতে পারা যায়। পরিবেশ ও ভুল অনুষঙ্গ ও শিক্ষাই, বিশেষ করে শৈশব ও কৈশোরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও কুশিক্ষা ও সংস্কারই মানসিক অসুস্থতার কারণ, আচরণবাদীরা এইরকম সিদ্ধান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পৌঁছেছেন। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা এটাই দেখাতে চেয়েছেন, মানুষের জীবনে যখন সমস্যার জটিলতা তীক্ষ্ণ হয় ও জটিলতার কারণগুলি এত অস্পষ্টভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে, সমস্যাটির সমাধানের জন্য সঠিক পথটি বেছে নিতে দ্বন্দ্বজর্জর হতে হতে মানসিক বিকারের শিকার হয়। প্যাভলভ মানসিক বিকারের কারণ হিসেবে সমস্যাজর্জরিত অতি দ্রুত পট পরিবর্তনকারী পরিবেশের চাপের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। পরিবেশের চাপ বলতে একদিকে অত্যধিক প্রতিযোগিতা, জীবনের অতিদ্রুততা, প্রতিনিয়ত সমাজজীবনে নানা জটিল সমস্যা ও সেই সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে নিতে গিয়ে ব্যক্তির খেই হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি অবস্থা বুঝায়। ওয়াট্‌সন, স্কিনার ও বাণ্ডুরা প্রমুখ আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরাও সমাজ ও পরিবেশের অস্থিরতাকেই মানসিক বিকারের কারণ হিসেবে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ওয়াট্‌সন এর সাথে এটাও সবিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভুল শিক্ষা অর্থাৎ কুশিক্ষা ও অনুষঙ্গও মানসিক বিকারের একটি প্রধান কারণ। তাঁর মতে রাগ, ভয়, ভালবাসা এই তিনটি মৌল আবেগ শৈশবকাল থেকে পরিবার ও সমাজ পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ছাঁদে অনুবর্তিত হতে হতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। একটি বিকল ও অস্থির পরিবেশ, অন্যদিকে ভুল অভ্যাস ও অনুষঙ্গ, এই প্রতিক্রিয়া ছাঁদগুলিকে অস্বাভাবিকরূপে গড়ে তুলে, আবেগ জীবনে অসুস্থতা দেখা যায়।

এই প্রেক্ষাপটে মানসিক চিকিৎসার মূল কথাই হল ভিন্ন-অনুবর্তন, অর্থাৎ যে অভ্যাস ও কুশিক্ষা ও সংস্কার ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাকে দূর করে নূতন শিক্ষা ও নূতন অভ্যাস ও আঙ্গিক তৈরী করতে সাহায্য করা। এর জন্য পুরানো পরিবেশ থেকে নূতন উদ্দীপনাকারী পরিবেশে চিন্তা ও কর্মের নবায়ন ঘটানোই হল, আচরণবাদী ধারায় মানসিক চিকিৎসা। এটা শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে যতটা ফলদায়ী, বয়স্কদের ক্ষেত্রে ততটা ফলদায়ী নাও হতে পারে। এ ছাড়া আরও একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে মানসিক বিকারের প্রকৃতি ও জটিলতা, অসুস্থ ব্যক্তির বয়স সবদিক বিচার বিবেচনা করে মানসিক চিকিৎসার কোন্ ধারাটি সবচেয়ে বেশী ফলদায়ী হবে সেটা ঠিক করা হবে।

আচরণবাদী মনোচিকিৎসকদের চিকিৎসার ধারার ক্ষেত্র বিশেষে কিছু হেরফের হতে পারে—কিন্তু মূল আচরণবাদী সূত্রটি মোটামুটি একই থাকছে।

যদি শিশুর মধ্যে কোন সদাভ্যাসের অবতারণা করতে হয় তাহলে বাবা মা ঠিক ঠিক সময়ে সেই কাঙ্ক্ষিত আচরণটির জন্য শিশুকে পুরস্কৃত করবেন। কাঙ্ক্ষিত আচরণ ও পুরস্কার এক সাথে গ্রথিত হতে হতে শিশু শেষে সেই আচরণটি করার জন্য পরবর্তীকালে আপনা থেকেই একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা অনুভব করে। একটা খারাপ আচরণ দূর করতে হলে একটা ভাল আচরণকে এইভাবে তার পরিবর্ত করতে হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার তিরস্কৃত করে বা শাস্তি দিয়ে অশালীন ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণটিকে দূর করতে হয়। যেমন একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করা হয় শাস্তি দিয়ে, অর্থাৎ যখনই তার মধ্যে নেশা করার ইচ্ছা হয় বা মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে, তখনই তাকে একটা ইলেকট্রিক শক্ দেওয়া হয়। ইলেকট্রিক শক্ দেওয়ার যন্ত্রটি এমন যে তাকে যখন প্রয়োজন তখনই হাতে করে সেটাকে এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া যায়।

আবেগ অস্থির শিশুদের ক্ষেত্রে দেখতে হবে তাদের বিকৃত আচরণ যাতে কোনভাবেই আদৃত বা গৃহীত না হয়, তাদের এইসব আচরণকে বাবা মা, শিক্ষক শিক্ষিকা কোনভাবেই আমল দেবে না। এই ধরনের বিকৃত অস্থির আচরণ করে যদিও প্রায়শঃই এরা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে, তবু কোনভাবেই এদের প্রতি এই কারণে দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন হবে না। এটাও এক ধরনের শাস্তি— এখানে উদাসীন থাকাটাই এক ধরনের শাস্তি। এরা অনেক সময় আত্মহত্যা করার ভয় দেখায়, কখনো বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখায়। এই সব ভয় দেখানোকে কোনভাবে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। "এটা না দিলে আমি মরব, আমি আত্মহত্যা করব," "এটা না দিলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, এইভাবে ভয় দেখিয়ে কার্য হাসিল করার প্রবণতাকে কোনভাবেই উৎসাহিত করা ঠিক নয়, বিচক্ষণ উদাসীনতাই এর যথার্থ প্রতিষেধক।

একটি বাচ্চা সাদা খরগোস বা লোমশ কোন প্রাণী দেখলেই ভয় পেত। বাচ্চাকে তার প্রিয় খাবার দেওয়া হত, খরগোসকে আড়ালে রেখে। ধীরে ধীরে খরগোসটাকে আড়াল থেকে বাচ্চাটার কাছাকাছি আনা হতে থাকল, বাচ্চাটা তার প্রিয় খাবার খেতে খেতে খরগোশটাকে দেখতে লাগল, তার ভয় ভয় ভাবটা যেন এই অবস্থায় একটা ভাল লাগা উদ্দীপকের পটভূমিতে কমে যেতে থাকল। এই রকমভাবে অবস্থার বার বার পুনরাবৃত্তি হতে হতে বাচ্চার খরগোশ বা ঐ জাতীয় লোমশ প্রাণী থেকে ভয়ের ভাব কেটে গেল।

একজন বহুদিনের বাকস্তব্ধ সিজোফ্রেনিক রোগীকে ধীরে ধীরে কথা বলার চেষ্টার সাথে সাথে পুরস্কৃত করে তার কথা বলার আগ্রহ ও শক্তিকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

ওয়েলার, উল্প, লোভাস, মেরী জোনস, আইজাক ও গোলডায়মণ্ড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষা থেকে আচরণবাদী মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিভিন্ন দিকের প্রসার হতে থাকে।

মনঃসমীক্ষণ ভিত্তিক একক ব্যক্তি মনোচিকিৎসা সম্বন্ধে পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।